ভূতি সম্ভব, আর সকলেরই ইহা হইতে পারে। মানবের এই শক্তি খুলিয়া গেলেই ধর্ম্ম আরম্ভ হয়। সকল ধর্ম্মেরই ইহাই সার কথা, আর এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, একজনের খুব ভাল বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে, তাহার যুক্তিসমূহ অকাট্য আর সে খুব উচ্চ উচ্চ প্রকার ভাব প্রচার করিতেছে; তথাপি সে শ্রোতা পায় না—আর একজন অতি সামান্য ব্যক্তি, নিজের মাতৃভাষাই হয় ত ভাল করিয়া জানে না, কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় তাহার দেশের অর্দ্ধেক লোক তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে। ভারতে এরূপ হয় যে যখন কোনরূপে লোকে জানিতে পারে যে, কোন ব্যক্তির এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়াছে, ধর্ম্ম তাহার পক্ষে আর আন্দাজের বিষয় নহে, ধর্ম্ম, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর প্রভৃতি গুরুতর বিষয় লইয়া সে আর অন্ধকারে হাতড়াইতেছে না, তখন চারিদিক্ হইতে লোকে তাহাকে দেখিতে আসে। ক্রমে লোকে তাহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করে।

পূর্ব্বকথিত মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার একটী মূর্ত্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার পূজা নির্ব্বাহ করিতে হইত। এইরূপ করিতে করিতে এই একভাব আসিয়া তাঁহার মনকে অধিকার করিল যে, "এই মূর্ত্তির ভিতর কিছু বস্তু আছে কি? ইহা কি সত্য যে জগতে আনন্দময়ী মা আছেন? ইহা কি সত্য যে, তিনি সত্য সত্যই আছেন ও এই ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মন করিতেছেন? না, এ সব স্বপ্নতুল্য মিথ্যা? ধর্ম্মের মধ্যে কিছু সত্য আছে কি?" সকল হিন্দু বালকের ভিতরই এই সন্দেহ আসিয়া থাকে। এই সন্দেহই আমাদের দেশের বিশেষত্ব—আমরা যাহা করিতেছি, তাহা সত্য কি? কেবল মতবাদে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। অথচ ঈশ্বরসম্বন্ধে যত মতবাদ এ পর্য্যন্ত ভারতে সেই সমুদয়ই আছে। শাস্ত্র বা মতে আমাদিগকে কিছুতেই তৃপ্ত করিতে পারিবে না। আমাদের দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির মনে এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতির আকাঙ্খা জাগিয়া থাকে। এ কথা কি সত্য যে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন? যদি থাকেন, তবে আমি কি তাঁহাকে দেখিতে পাইতে পারি? আমি কি সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম? পাশ্চাত্যজাতীয়েরা এগুলিকে কেবল কল্পনা—কাযের কথা নয়, মনে করিতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহাই বিশেষ কাযের কথা। এই ভাব আশ্রয় করিয়া লোকে নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন করিবে। এই ভাবের জন্য প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু গৃহ পরিত্যাগ করে এবং অতিশয় কঠোর করাতে অনেকে মরিয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতির

মনে ইহা আকাশে ফাঁদ পাতার ন্যায় বোধ হইবে আর তাহারা যে কেন এইরূপ মত অবলম্বন করে, তাহারও কারণ আমি অনায়াসে বুঝিতে পারি, তথাপি যদিও আমি পাশ্চাত্যদেশে অনেকদিন বসবাস করিলাম, কিন্তু ইহাই আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সত্য—কাযের জিনিষ বলিয়া মনে হয়।

জীবনটা ত মুহূর্ত্তের জন্য—তা তুমি রাস্তার মুটেই হও আর লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্ই হও। জীবন ত ক্ষণভঙ্গুর—তা তোমার স্বাস্থ্য খুব ভালই হউক, অথবা তুমি চিররুগ্নই হও। হিন্দু বলেন, এ জীবনসমস্যার একমাত্র মীমাংসা আছে—ঈশ্বরলাভ, ধর্ম্মলাভই এ সমস্যার একমাত্র মীমাংসা। যদি এইগুলি সত্য হয়, তবেই জীবনরহস্যের ব্যাখ্যা হয়, জীবনভার দুর্ব্বহ হয় না, জীবনটাকে সম্ভোগ করা সম্ভব হয়। তাহা না হইলে জীবনটা একটা বৃথা ভারমাত্র। ইহাই আমাদের ধারণা, কিন্তু শত শত যুক্তিদ্বারাও ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। যুক্তিবলে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া অবধারিত হইতে পারে, কিন্তু ঐখানেই শেষ। সত্য সকলকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে, আর ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে গেলে উহাকে সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। ঈশ্বর আছেন, এইটী নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে হইবে। নিজে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমাদের নিকট ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না।

বালকের হৃদয়ে এই ধারণা প্রবেশ করিল, তাঁহার সারাদিন কেবল ঐ ভাবনা—কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে। প্রতিদিন তিনি কাঁদিয়া বলিতেন, "মা, সত্যই কি তুমি আছ, না, এ সব কবিকল্পনা? কবিরা ও ভ্রান্ত জনগনই কি "এই আনন্দময়ী জননীর কল্পনা করিয়াছেন, অথবা সত্যই কিছু আছে?" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা যে অর্থে শিক্ষা শব্দ ব্যবহার করি, তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না; ইহাতে বরং ভালই হইয়াছিল—অপরের ভাব, অপরের চিন্তা ক্রমাগত লইয়া লইয়া তাঁহার মনের যে স্বাভাবিকত্ব ছিল, মনের যে স্বাস্থ্য ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যায় নাই। তাঁহার মনের এই প্রধান চিন্তা দিন দিন বাড়িতে লাগিল, শেষে তিনি আর কিছু ভাবিতে পারিতেন না।

ক্রমশঃ।
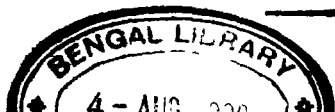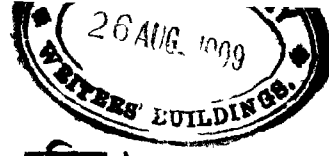
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]   [শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।

শঙ্কর ঘোষের নাম কলিকাতাবাসীদের মধ্যে সুবিখ্যাত। ঠন্‌ঠনিয়ার কালীবাড়ী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাহারই নিকট শঙ্কর ঘোষের গলিতে তদ্বংশীয়-গণের বর্ত্তমান বাস। বিষয় বৈভব তাদৃশ না থাকিলেও ঐ বংশীয়গণের কলি-কাতা-সমাজে এখনও বেশ মান আছে। সুবোধ এই বংশের সন্তান, বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৭।১৮র অধিক নহে। একদিন পিতার নিকট একখানি ছোট পুস্তক পাইল—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসেব উক্তি"। রামকৃষ্ণদেবের জনৈক শিষ্য শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দত্ত তাঁহার কতকগুলি উক্তি সংগ্রহ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করেন—উহা তাহাই। সুবোধের পিতাঠাকুর একজন পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভাল পুস্তকাদি পাইলেই সুবোধকে পড়িতে দিতেন। সুবোধের পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বড় ভাল লাগিল। পিতাকে বলিল, "পুস্তক-খানি পাঠ করিয়া পরমহংসদেবকে দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।" পিতা বলিলেন, বেশ কথা, আফিসের যখন ছুটী থাকিবে, তখন বাড়ীর সকলে মিলিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংসদেবকে দর্শন করিবেন। কিন্তু সুবোধের বিলম্ব অসহ্য; সে তাহার জনৈক প্রতিবেশী বালক বন্ধুকে ডাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইবার প্রস্তাব করিল এবং দুই এক দিন পরেই কোন কারণে বিদ্যালয়ের সকাল সকাল ছুটী হইলে, দুই বন্ধুতে মিলিয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিল। ইতিপূর্ব্বে বাড়ী হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া সে এতদূরে কখনও কোথাযও যায় নাই। পথে সুবোধ বন্ধুকে বলিল, "দেখ, বাড়িতে ব'লে আসা হয় নাই—টের পেলে ব'ক্‌বে; খুব শীগ্‌গির শীগ্‌গির চ'লে যাই চল—সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে।" এই বলিয়া দুজনে খুব বেগে চলিতে চলিতে একেবারে আঁড়িয়াদহে উপস্থিত। পথে একজনকে "পরমহংসমশাই কোথায় থাকেন" জিজ্ঞাসা করায় লোকটী বলিল, "আপনারা পথ ভুলে দূরে এসে প'ড়েছেন।" পরে একটী ধেনো জমীর মধ্যবর্ত্তী আল পথ দেখাইয়া বলিল, "এই-খান দিয়ে যান, শিগ্‌গীর রাসমণির বাগানে পৌছিবেন।" সুবোধ ইহার পূর্ব্বে মাঠে চাসাদের কৃষিকার্য্য করিতে কখনও দেখে নাই; ধানক্ষেৎ দেখিয়া তাহার

মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল—অমনি তাহার চলনও ঢিলা হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে ধীরপদে কিয়দ্দূর যাইলে পর প্রতিবেশী বালক তাহাকে বলিল, "চল চল, দেরী হচ্চে।" সুবোধের হুঁস হইল যে পরমহংস-দেবকে দর্শন করিয়া সন্ধ্যার অগ্রেই ফিরিতে হইবে, আবার বেগে চলিল এবং অল্পক্ষণেই রাসমণির বাগানে পৌঁছিল। সুবোধের ধারণা—পরমহংস একজন বাজীকর, নানা ভেল্কি দেখায়। কিন্তু এ পরমহংসের উক্তি পড়িয়া মনে হইয়াছে—ইনি একজন সাধু। সাধুর সহিত কথোপকথন সুবোধ ইতিপূর্ব্বে কখনও করে নাই; পাছে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলে, তাই বন্ধুকে বলিল, "দেখ্, তুই এগিয়ে পরমহংসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবি। আমি সাধুদের সঙ্গে কেমন ক'রে মান্য ক'রে কথা কইতে হয়, জানিনি। তুই এগিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইবি। আমার পরিচয় চান্ তুই সব ব'ল্বি, যা জান্তে চান্ ব'ল্বি। আমি কিন্তু কথা কইব না। তোর পেছনে থাক্ব, কথা কইব না। তুই এগিয়ে থাক্বি।" বন্ধু বলিল, "আচ্ছা।"

অতঃপর রামকৃষ্ণদেবের ঘরের দ্বারে প্রবেশ করিয়াই করযোড়ে তাঁহাকে দুজনে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আস্ছ?"

প্রতিবেশী বন্ধু বলিল, "ক'ল্কেতা থেকে।" পরমহংসদেব বলিলেন, "ও বাবুটী অতদূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওগো বাবু, অতদূরে কেন, এগিয়ে কাছে এসনা।" সুবোধ বন্ধুর সঙ্গে বন্দোবস্ত মত পশ্চাতে একেবারে দ্বারের নিকট ছিল ও বন্ধুটী ঘরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত কথা কহিতে-ছিল। রামকৃষ্ণদেবের সাদর আহ্বানে সুবোধ একটু অগ্রসর হইল, রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি শঙ্কর ঘোষের বাড়ীর—না?"

সুবোধ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ—আপনি কেমন ক'রে জান্লেন?"

রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম, তোদের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে তোদের বাড়ীতে কতবার গেছি, তুই তখন জন্মাস্নি। তুই এখানে আসবি জান্তুম। যাদের হবে, মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন। তুই অত দূরে কেন, কাছে আয় না—কাছে আয়।"

বারম্বার কাছে আসিতে বলায় বালক তাঁহার নিকটে আসিল। নিকটে আসিবামাত্র রামকৃষ্ণদেব তাহার হাত ধরিলেন। হাত ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া কিছু ক্ষণ রহিলেন। পরে বলিলেন, "দেখ্, তোর হবে; মা বল্লেন—তোর হবে। আপ-

নার তক্তপোষ দেখাইয়া বলিলেন, "এই বিছানায় বোস্।" ডাক্তারেরা যেমন হাত ধরিয়া লোকের শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতা জানিতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তদ্রূপ লোকের হাত ধরিয়া তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া তাহার ধর্ম্মলাভ হইবে কি না, যথাযথ বুঝিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সকল শিষ্যেরাই একবাক্যে সাক্ষ্যদান করেন।

বালক কহিল, "না মশাই; ইস্কুলের কাপড়—কতলোককে ছুঁয়েছি, প্রস্রাব করেছি, এ কাপড়ে আপনার কাছে ও বিছানায় ব'স্‌ব না।"

রামকৃষ্ণদেব তাহা শুনিলেন না—হাত ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে নিকটে বসাইলেন। অগত্যা বালক অল্পক্ষণ বসিয়া তথা হইতে নামিয়া সম্মুখে মেঝেয় বসিল। রামকৃষ্ণদেব তখন ব্যস্ত হইয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে একখানি আসন আনিতে বলিলেন। রামলাল দাদা আসন আনিলে সুবোধ তদুপরি এবং তাহার বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আসনের নিকট যে পাপোষখানি ছিল, তাহার উপর বসিল।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তোমরা কেমন করে এখানে এলে?" সুবোধ তাঁহার আদর যত্ন পাইয়াছে, আর মনে ভয়ের ভাব নাই। কলিকাতার ছেলেরা যেমন করে, সকল কথায় চোটপাট জবাব দিতে লাগিল। সুবোধ কহিল, "হেঁটে এলুম।" রামকৃষ্ণদেব আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "বলিস কিরে? এতটা পথ হেঁটে এলি। তা এখানকার খবর পেলি কি করে?"

সুবোধ বলিল, "আপনার উক্তি প'ড়ে বড়ই ভাল লাগ্‌ল, আপনার কি চমৎকার কথা। আপনার কত নাম, আপনি কতই মহৎ লোক, তাই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি।"

এই কথা বলিবামাত্র রামকৃষ্ণদেবের ভাবান্তর হইল। তিনি অমনি বলিলেন, "আমি গুয়ের কীটেরও অধম, আমার আবার নাম কি? আমি গুয়ের কীটেরও অধম।" বালক এই কথার সঙ্গে তাঁহার মুখের অপূর্ব্ব দীনভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরমহংসদেব আবার কহিলেন, "যাদের ধর্ম্ম হবে, মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন। তা দেখ্, এখানে শনি মঙ্গলবারে আসিস্। এখানে শনি মঙ্গলবারে আসা ভাল। তোদের পাড়ার কতলোক শনি মঙ্গলবারে আসে। তুইও আসিস্।" সুবোধ বলিল, "তা হ'লে মশাই বাড়ীতে জান্‌তে পার্‌বে। আপনার বল্‌বার যা আছে, তা এখনই সব ব'লে ফেলুন না। শনিবারে ত আস্‌তে পারবোই না—সে দিন বাবার সকাল সকাল অফিসের ছুটি হয়।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "নারে, মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে, তা ক'রতেই হবে; এই যে দ্যাখ্ না—যেখানে অমুক দিন যাব বলি, তা ঝড় হোক্, বৃষ্টি হোক্, বাদল হোক্, যেতেই হবে। ইচ্ছে না থাক্‌লেও মা সেখানে নিয়ে যাবেনই যাবেন, কিছুতেই নিস্তার নেই। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, শনিবার কি মঙ্গলবারে এখানে আসিস্।"

কাজেই সুবোধ রাজী হইল ও ভাবিল, 'আজ আর বেশীক্ষণ থাকিব না—আজ আর বেশী কিছু কথাও হবে না।' অতঃপর বাটী ফিরিয়া যাইবার জন্য উঠিল। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কিছু খাবি ?" সুবোধ বলিল, "না।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "এতদূর হেঁটে এসেছিস্, ক্ষিদে পায়নি ?" সুবোধ উত্তর করিল, "তা বাড়ী গিয়ে খাব এখন।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "একটু মিষ্টি খেয়ে জল খা, তারপর যাবি।" এই বলিয়া লাটুকে একটু মিষ্টান্ন ও জল আনিতে বলিলেন। সুবোধ ও তাহার বন্ধু জলযোগের পর ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলে পরমহংসদেব আবার কহিলেন, "অনেকটা দূর, ছেলেমানুষ, হেঁটে যেতে কষ্ট হবে, পয়সা দিতে বলি, গাড়ী কি নৌকায় যা।"

সুবোধ—"সাঁতার জানিনি, নৌকায় যাব না।"

রামকৃষ্ণদেব—"তবে গাড়ী করে যা।"

সু—"না হেঁটেই যাব।"

রা—"নারে, কষ্ট হবে, ছেলেমানুষ, এতটা পথ হাঁট্‌তে পার্‌বি কেন ?"

সু—"এই বয়সে হাঁট্‌ব না ত হাঁট্‌ব কবে ? আর আপনি পয়সা দেবেন কেন ? আপনি পয়সা পাবেন কোথায় ?"

রা—"ওরে এখানে অনেকে দেয়, তোর তা কিছু ভাব্‌তে হবে না। পয়সা দিতে ব'ল্‌ছি, গাড়ী ক'রে যা।

সুবোধ কিছুতেই পয়সা লইতে রাজী হইল না। রামকৃষ্ণদেব অবশেষে অপর বালকটিকে বলিলেন, "তুমি পয়সা নাও, দুজনে গাড়ী করে যেও।" সুবোধ বন্ধুকে বলিল, "নারে, পয়সা নিস্‌নি, হেঁটেই যাব।" অগত্যা পরমহংসদেব আর জিদ্ না করিয়া কহিলেন, "আবার আসিস্, শনি মঙ্গলবার দেখে আসিস্।" শ্রীচরণের পদধূলি লইয়া বন্ধুদ্বয় হন্ হন্ করিয়া বাড়ী অভিমুখে চলিলেন।

ইতিপূর্ব্বে সুবোধ হেয়ার স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িত। গণিত বিদ্যায় তাহার একটু বেশী প্রীতি ছিল। প্রতিবার পরীক্ষার সময় মনে করিত, "এবার ফুল মার্ক পাব।" পাছে না পায় সেজন্য ঠাকুর দেবতার শরণ লইয়া পরীক্ষা দিতে

যাইত। আবার দুই চারি নম্বর কম পাইলে দেবতার উপর রাগ করিয়া বলিত, "দেবতা টেব্‌তা সব মিথ্যা।" বাল্যকালে দেবদেবীর উপর যে ভাবভক্তি ছিল, কিছুদিন স্কুলে পড়ার পর আর তাহা তেমন রহিল না। যদি বা কখন একটু বিশ্বাস আসিত, তাহা ঐপ্রকারে দেবদেবীর ক্ষমতা পরীক্ষায় নিয়োজিত হইয়া ভাসিয়া যাইত। এই সময়ে সে চতুর্থ শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিল। এই সময়ে তাহার বিবাহের কথা বাড়ীতে উত্থাপিত হইল। বড়বংশ, কাজেই ভাল ভাল ঘরের সহিত সম্বন্ধের কথা আসিতে লাগিল। সুবোধের কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপরিস্ফুট ছবি অহরহ মনোমধ্যে জাগিয়া থাকিত। সে মাঝে মাঝে ভাবিত—আমি বিবাহ করিব না, কারণ, বাড়ীতে ত থাকিব না। নানাদেশে ঘুরিয়া বেড়াইব, পর্ব্বত জঙ্গল দেখিয়া বেড়াইব। অতএব বিবাহের প্রয়োজন নাই। অতঃপর পিতামাতাকে স্পষ্ট একদিন কহিল, "আপনারা আমার বিবাহ দেবেন না। আমি বিবাহ করব না।"

পিতা বলিলেন, "কেন, বিবাহ ক'র্‌বে না কেন? এই বছরটা উঠে প'ড়ে ভাল ক'রে পাশ কর, বেশ ভাল জায়গায় বিবাহ হবে।" সুবোধ কহিল, "দেখুন, আপনারা যদি জিদ্ ক'রে বে দেন,ত আমার আর উপায় নেই, আপনাদের কথা ত অগ্রাহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না, বে ক'র্‌ব ; কিন্তু আমার বাড়ীতে থাকা হবে না। কোথায় কোন্‌দেশে চ'লে যাব, তার কিছুই ঠিক নাই। বাড়ী থেকে সংসার করা আমার পোষাবে না। তাই ব'ল্‌ছি—মিথ্যা একটা বিবাহ দিয়ে আমার ছেঁড়া লেঠা জড়ানর আর দরকার কি?"

পিতা বলিলেন, "আচ্ছা, এ বৎসরটা ত ভাল ক'রে পড়, তারপর বোঝা যাবে।" সুবোধ তাঁহার কথার আভাষে বেশ বুঝিল, এবার পরীক্ষার ফল ভাল হ'লেই পিতা বিবাহ দিবেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল—এ বৎসর তাহার পরীক্ষার ফল যেন খুব মন্দই হয়। পড়াশুনায় আর তাহার মন লাগিল না। ফলেও তাহাই হইল। স্কুলের শিক্ষকেরা পরীক্ষার পর পরামর্শ করিয়া কহিলেন, "এ বৎসর সুবোধ তৃতীয় শ্রেণীতে থাকিলে পরে ভাল হইবে।" পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ায় সুবোধের পিতার বিবাহ দিবার ঝোঁকও কমিয়া গেল। অতঃপর সুবোধ হেয়ার স্কুল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। অতএব সে যখন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে যায়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল।

প্রথম দর্শনের পরেই যে শনিবার আসিল, সেই শনিবারে সুবোধ বন্ধুকে সঙ্গে

লইয়া, স্কুল পলাইয়া দ্রুতপদে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, ঠাকুরের ঘরে অনেকগুলি লোক। ঘরের দ্বারে উঁকি মারিয়া করযোড়ে প্রণাম করিবামাত্র পরমহংসদেবের সঙ্গে তাহার চোখাচোখী হইল। রামকৃষ্ণদেব অভয় কর উত্তোলন পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিলেন, ঐখানেই থাক। বালকের মনোভাবও তাহাই, সে ঘরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক, পাছে পাড়ার কোন লোক থাকে ও তাহাকে দেখিয়া তাহার পিতাকে বলিয়া দেয়। রামকৃষ্ণদেব সুবোধকে ইঙ্গিত করিয়া উপস্থিত ভদ্র-লোকদের "তোমরা একটু বস, আমি এখনি আস্‌ছি" বলিয়া বাহিরে আসিলেন। বেলা তখন প্রায় ৩টা।

রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় মানসপুত্র রাখাল সেখানে ছিলেন, তাঁহাকে গঙ্গাজল আনিতে বলিলেন। গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠের দক্ষিণেই যে শিব-মন্দির তাহার সিঁড়ির উপরে আপনি আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন এবং সুবোধ ও তাহার বন্ধুকে বসিতে বলিলেন। এবারেও সুবোধ পূর্ব্ববারের ন্যায় তাহার বন্ধুকে সকল বিষয়ে অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছিল। রামকৃষ্ণদেব এইবার দুইজনকেই জামার বন্ধ খুলিতে বলিলেন এবং অপর বালকটিকে জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। সে জিহ্বা বাহির করিলে তাহাতে কি লিখিয়া দিলেন এবং তাহার নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত হস্তস্পর্শ করিলেন। এইবার সুবোধের পালা। সুবোধের ইংরাজি ডোলের কামিজ, এখনও সকল বন্ধ খোলা হয় নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের আর বিলম্ব সহ্য হয় না—কি যেন এক ভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে। তিনি স্বহস্তে ফড় ফড় করিয়া সুবোধের বোতাম খুলিয়া দিলেন এবং পূর্ব্বোক্তভাবে তাহার জিহ্বা ও শরীর স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "জাগো মা ব্রহ্মময়ী, জাগো মা ব্রহ্মময়ী, জাগো মা ব্রহ্মময়ী !!"

পরে উভয়কে ধ্যান করিতে বলিলেন। ধ্যান করিতে আরম্ভ করিবামাত্র সুবোধের সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইতে লাগিল এবং তাহার মেরুদণ্ড-মধ্যে এক প্রবল স্রোত উত্থিত হইয়া মস্তিষ্ক-মধ্যে ধাবিত হইতেছে, বোধ হইতে লাগিল। পরে সর্ব্বাঙ্গে এক অপূর্ব্ব আনন্দের ভাব উপস্থিত হইল এবং ভিতরে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন হইতে লাগিল। ধ্যান ক্রমে গভীর হইল এবং "আমি কে, কোথায় আসিয়াছি, কাহার কাছে আছি, কি করিতেছি," সুবোধ সমস্ত কথা বিস্মৃত হইল। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির মধ্যে ক্রমে কত দেব, কত সুপ্রসন্ন দেবীমূর্ত্তি একে একে উদিত হইয়া অনন্তে বিলীন হইতে লাগিল। তৎপরে সুবোধের আর সংজ্ঞা রহিল না। যখন পুনরায় সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন সুবোধ দেখিল, পরমহংসদেব তাহার মস্তক

হইতে নাভি পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ করিয়াছিলেন, তদ্বিপরীত ভাবে তাহার শরীরে হস্ত বুলাইতেছেন। রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, তুই কি বাড়ীতে ধ্যান ক'রতিস্?"

সু—"একটু আধটু ঠাকুরদেবতার বিষয়ে মার কাছে যা শুনতুম, তাই ভাবতুম।"

প—"তাই তোর এত শীগ্‌গির হল।" পরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিছু দেখ্‌তে টেখ্‌তে পেলে হা?" সে কহিল, "না।"

প—"পরে পাবে।"

সুবোধ প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি তাহাদের আবার বলিলেন, "এখন যা, পঞ্চবটীতে গিয়ে একটু ধ্যান কর্‌গে"—এই বলিয়া গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে গেলেন।

এদিকে সুবোধ পঞ্চবটী কাহাকে বলে, তাহার কিছুই জানে না। নহবৎ-খানার নিকট যাইয়া (যেখানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অবস্থান করিতেন) দেখিল, স্ত্রীলোকের জনতা। সুবোধ ঐ স্থানেই পঞ্চবটী ভাবিয়া বন্ধুকে বলিল, "তুই পঞ্চবটীতে যা, আমি কালীমন্দিরে যাই।" এই বলিয়া সুবোধ কালীমন্দিরে যাইয়া ধ্যান করিতে লাগিল। একটু পরে তাহার বন্ধুও তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, সুবোধ ধ্যানমগ্ন। বালকের ধ্যানাবসানে বন্ধু কহিল, "ওখানে অনেক মেয়েরা বসেছেন, তাই আমি চ'লে এলুম।" পরে দুজনে বিদায় লইবার জন্য পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাঁহার ঘরে জনতা এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বিদায় লইবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেব সে দিনও জিদ্ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন এবং গাড়ী করিয়া বাটী যাইবার জন্য তাহাদের অনুরোধ করিলেন।

সুবোধ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় কহিলেন, "তবে একটা ছাতি নিয়ে যা, এখনও বড় রদ্দুর।"

সুবোধ কহিল, "মশাই আবার কবে আস্‌তে পারব না পারব, এখানকার ছাতি নিয়ে যাব না।"

রামকৃষ্ণদেব অবশেষে সুবোধের বন্ধুকে কহিলেন, "ওগো, তুমি একটা ছাতি নিয়ে যাও।"

সুবোধ তাহাকে বলিল, "নারে, এখানকার ছাতি নিয়ে যাবি, আবার ওঁদের কখন দরকার হবে তখন পাবেন না, নিয়ে যাস্ নি।"

পরমহংসদেব কহিলেন, "না দরকার হবে না। ফেরৎ দেবার জন্যে কোন

ভাবনা ক'রতে হবে না। তোরা একটা ছাতি নিয়ে যা।" একজনকে তাহাদের একটী ছাতি দিতে অনুমতি করিলেন। অগত্যা সুবোধ আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তোদের পাড়ায় মহেন্দ্র মাষ্টার আছে, সে এখানে আসে, বেশ লোক, তার কাছে যাস্, আর মাঝে মাঝে এখানে আসিস্।" সুবোধ কোন উত্তর করিল না। আসিতে পারিবে কি না পারিবে, সেজন্ত।

বাল্যকাল হইতেই সুবোধের রাত্রে অন্ধকারে বড় ভয়। একেলা শয়ন করিতে ভয়, সেইজন্ত তাহার বিছানার পার্শ্বেই তাহার ঠাকুরমার বিছানা থাকিত; রাত্রে উঠিতে হইলে বৃদ্ধা সঙ্গে যাইতেন। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ লাভ করিয়া অবধি তাহার পূর্ব্বের ভাব খুব বাড়িয়া উঠিল। তখন সে ভাবিল, বাড়ীতে থাকা ত কখনই হইবে না। কিন্তু মাঠে, ঘাটে, গাছতলায়, কোথায় কত দেশে থাকিতে হইবে, এত ভয় ডর হইলে কেমন করিয়া চলিবে? অতঃপর ভয় কমাইবার চেষ্টা করা উচিত, রাত্রে উঠিবার আবশ্যক হইলে আর ঠাকুরমার সাহায্য লইব না। তদবধি রাত্রে উঠিয়া অন্ধকারে বুক দুর দুর করিলেও সুবোধ একাকীই যাওয়া আসা করিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাওয়ার পর হইতে সুবোধ নিজ ভ্রূমধ্যে একটা জ্যোতিঃ কখন কখন দেখিতে পাইত। বালকের মনের সকল কথাই তাহার মাতার সহিত হইত। কারণ, মাতা বাল্যকালে তাহাকে নানা গল্প ও উপদেশ শুনাইতেন—রামায়ণ ও মহাভারতের কথা, সত্য পালন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতার সুখ-পরিণাম, তাঁহার অত্যন্ত কৃপা যথা—সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতৃস্তনে তাহার আহারের যোগাড় করিয়া রাখা ইত্যাদি এবং উহা হইতেই যে তাহার মনে ধর্ম্মবিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও ঐরূপ জ্যোতিদর্শনের কথা আপনার মাতাকে বলিলে তাহার মাতাঠাকুরাণী তাহাকে কহিলেন, "বাবা, আর কাকেও এসব কথা ব'ল না, এসব বড় ভাগ্যে হয়, সবাইকে ব'ল্‌লে ক্ষতি হয়।"

বালক উত্তর করিল, "মা ক্ষতি কি হবে? ও সব নিয়ে আমি কি ক'র্‌ব? যে বস্তু থেকে এই আলোর উৎপত্তি, সেই বস্তুই যদি না পাই ত আমার ও আলোটালোর কায কি?"

সুবোধের আর লেখাপড়া করিতে মন লাগে না। সদাই পরমহংসদেবের নিকট যাইতে বাসনা হয়। আপন ভাবে কখন ধ্যান, কখন জপ, কখন বা ঈশ্বর-চিন্তা লইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব ইহার পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথকে সুবোধের

কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয় তজ্জন্য প্রায়ই পত্র লিখিয়া সুবোধকে ডাকিয়া পাঠান। পত্র পাইলে সুবোধ বালক-বুদ্ধিতে ভাবে, "মাষ্টার মহাশয় স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘর করেন, তাঁহার কাছে যাইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম আবার কি শিখিব? যদি ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয় ত কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী পরমহংসের কাছেই শিখিব। সংসারী লোকের কাছে যাইব না।"

দিন কয়েক পরে আবার দক্ষিণেশ্বরে গেল। সে দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সঙ্গে সুবোধের পরিচয় করিয়া দিলেন। সুবোধ, শরৎ ও শশীকে দেখিয়া ভাবিল—"এদের দাড়ী আছে, বোধ হয় বাঙ্গাল।" কিন্তু নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহাদের কলিকাতায় চাঁপাতলায় বাড়ী, কথাবার্ত্তাও দেখিল, ঠিক কলিকাতার লোকের ন্যায়—তথাপি তাহাদের দাড়ী দেখিয়া স্থির করিল—ইহারা নিশ্চয়ই বাঙ্গাল।

যাহা হউক, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শরৎ ও শশীকে বলিলেন, "তোদের বাড়ী থেকে এদের বাড়ী কত দূর? তোরা এর বাড়ী যাবি।" আবার সুবোধের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুইও এদের বাড়ী যাবি, আলাপ ক'র্‌বি।"

সুবোধ, শরৎ ও শশীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আমি আপনাদের বাড়ী যাব। আপনারা আমাদের বাড়ী যাবেন না।" সুবোধের কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কেন রে? তুই ওদের বাড়ী যাবি, আর ওরা তোদের বাড়ী যাবে না কেন?"

সুবোধ বলিল, "বাবা রাগ ক'র্‌বেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শরৎ ও শশীকে বলিলেন, "তোরা নরেনের সঙ্গে এর আলাপ ক'রে দিবি। এর বাড়ী থেকে নরেনের বাড়ী কাছে।" তাহার পর সুবোধকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, নরেন বড় ভাল ছেলে, যেমন পড়াশুনাতে, তেমনি গাইতে বাজাতে, তেমনি বল্‌তে কইতে, এখানে প্রায়ই আসে, আমাকে খুব ভালবাসে।" ক্ষণিক পরে রামকৃষ্ণদেব সুবোধকে আবার বলিলেন, "হ্যাঁরে মাষ্টারের বাড়ী তোর বাড়ী থেকে খুব কাছে। তার কাছে যাসনি কেন? যাস্।"

সুবোধ উত্তর করিল, "মশাই তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করেন, তাঁর কাছে কি ক'র্‌তে যাব?" সুবোধের বৈরাগ্যপূর্ণ কথায় রামকৃষ্ণদেব উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ওরে সে আর কোন কথাই কইবে না, এইখানকার কথাই কইবে। তুই যাস্ তার কাছে।"

সুবোধ অগত্যা কহিল, "আপনি যখন বল্‌ছেন, যাব।"

ইহার দুই একদিন পরেই মাষ্টার মহাশয় আবার একখানি চিরকুট লিখিয়া সুবোধকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুবোধ গেল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে খুব আদর যত্ন করিয়া কহিলেন, "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখানে আস্‌তে বলেন—আসনা কেন?"

সুবোধ উত্তর করিল, "আপনি সংসারী ব'লে আপনার কাছে এতদিন আসিনি। তবে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) ব'ল্‌লেন, আপনি তাঁর কথাই কইবেন, তাই এলুম।"

মাষ্টার কহিলেন, "সে কথা ঠিক্, আমরা সামান্য মানুষ। তবে সাগরের ধারে বাস করি, এক আধ কলসী সাগরের জল এনে রাখি, কেউ এলে সেই জলই দিই, এই পর্য্যন্ত। তাঁর কথা ছাড়া আর কি কথা কইব? এই যে এতটা পড়াশুনা ক'র্‌লুম, তাঁর কাছে গিয়ে সব মিথ্যা হ'য়ে গেল। লেখাপড়া শিখে মনে হ'য়েছিল, দুনিয়ার সব তত্ত্বই জেনে ফেলেছি। ও মা! তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখ্‌লুম, সব বিদ্যা—অবিদ্যা, সব কোথায় ভেসে গেল, মনে হ'ল, কি আশ্চর্য্য, এই বিদ্যা নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কারও হয়!"

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সুবোধের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। পরে মাষ্টার মহাশয় তাহাকে মিষ্ট মুখ করাইয়া বিদায় দিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সেবকেরা এইরূপে পরস্পর এক অপূর্ব্ব ভালবাসার সূত্রে গ্রথিত হইতেছিলেন।

সুবোধের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর টান দিন দিন বাড়িতে লাগিল; এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গলায় ক্ষত হওয়ায় চিকিৎসার জন্য ভক্তেরা তাঁহাকে চিৎপুরের নিকট কাশীপুরে একটী বাগানবাটী ভাড়া করিয়া তাহাতে রাখিয়াছিলেন। সুবোধ ঘন ঘন স্কুল পলাইয়া তথায় গমন করে। সমস্ত দিন তথায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী আসে। একদিন আবশ্যক হইলে পরমহংসদেব তাহাকে "সীতাপতি রামচন্দ্র" ইত্যাদি গানের একটী চরণ লিখিতে বলিলেন। হাতের লেখা ভাল নয় বলিয়া সে উহা লিখিতে নারাজ হইল। রামকৃষ্ণদেব তথাপি বলিলেন, "লেখা যেমনই হোগ্ তুই লেখ না, না হয় একটু খারাপই হবে।" সুবোধ কিছুতেই সম্মত হইল না। তখন রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "দূর বোকা, কেবল বুঝি খেলিয়ে বেড়িয়েছিস্।" সুবোধ এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন ও তাহাকে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোকে যে গা'ল দিলুম, তুই রাগ কর্‌লিনি?" সুবোধ ত্বরিত উত্তর করিল, "মশাই, আপনার গালাগালও মিষ্টি।" রামকৃষ্ণদেব অমনি আহ্লাদে সকলকে

ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে শোন্, শোন্, এ বলে কি শোন্। বলে—গালাগালও মিষ্টি লাগে।" তৎপরে স্নেহময়ী জননীর মত হস্তদ্বারা সুবোধের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন।

আজ প্রায় মাসাবধি ঠাকুরের গলায় বেদনা বাড়িয়াছে, শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। তাঁহার ত্যাগী বালব্রহ্মচারী শিষ্যেরা প্রায় সকলেই কাছে থাকে। সুবোধ একদিন এই সময়ে দেখা করিতে যাইয়া বলিল, "মশাই, দক্ষিণেশ্বরে আপনি যে স্যাঁতানি ঘরে থাকিতেন, বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগে আপনার গলায় ব্যথা হয়েছে, আপনি চা খেতে পারেন না? আমরা সব চা খাই, আপনি চা খান, বেদনা সেরে যাবে। আমার বাবার চায়ের আপিস আছে, আমাদের বাড়ীতে খুব ভাল ভাল চায়ের নমুনো আসে, আমি আপনার জন্য উৎকৃষ্ট চা এনে দেব।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হ্যাঁরে, এই চা খেলে গলার বেদনা সেরে যাবে?"

সুবোধ কহিল, "হ্যাঁ, মশাই; আমাদের গলায় ব্যথা হ'লে চা খাই, ভাল হ'য়ে যায়।" সেখানে রাখাল প্রভৃতি প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাখালকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রাখাল, তবে চা খাওয়াই যাগ্, এ চা এনে দেবে ব'ল্‌ছে।"

রাখাল কহিলেন, "চা কি আপনার সহ্য হবে?'

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "সহ্য হবে না?"

রাখাল কহিলেন, "সে যে বড় গরম। তাই ব'ল্‌ছি, আপনার হয় ত সহ্য হবে না। উল্‌টে গরম হ'য়ে যাবে।"

রামকৃষ্ণদেব অমনি ছেলে মানুষের মত কহিলেন, "তবে কায নেই বাপু, আবার গরম হ'য়ে যাবে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এইরূপ বালকের মত স্বভাব দেখিয়া সুবোধ মুগ্ধ হইয়া রহিল।

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

২৯শে সেপ্টেম্বর, '৯৪।

প্রিয় আ—,

তুমি যে সকল কাগজ পাঠাইয়াছিলে, তাহা যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর এতদিনে তুমিও নিশ্চিত আমেরিকার কাগজে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু পাইয়া থাকিবে। এখন সব ঠিক হইয়াছে। সর্ব্বদা কলিকাতায় চিঠি পত্র লিখিবে। বৎস, এ পর্য্যন্ত তুমি সাহস দেখাইয়া আপনাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছ। জিজিও বড়ই অদ্ভুত ও সুন্দর কার্য্য করিয়াছে। হে মদীয় সাহসী নিঃস্বার্থ সন্তানগণ, তোমরা সকলেই বড়ই সুন্দর কার্য্য করিয়াছ। আমি তোমাদের কথা স্মরণ করিয়া বড়ই গৌরব অনুভব করিতেছি। ভারত তোমাদের লইয়া গৌরব অনুভব করিতেছে। তোমাদের যে খবরের কাগজ বাহির করিবার সংকল্প ছিল, তাহা ছাড়িও না। খেতড়ির রাজা ও কাঠিওয়াড়স্থ লিমড়ির ঠাকুর সাহেব যাহাতে আমার কার্য্যের বিষয় সর্ব্বদা সংবাদ পান, তাহা করিবে। আমি মান্দ্রাজ অভিনন্দনের একটী সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখিতেছি। যদি সস্তা হয়, এখান হইতেই ছাপাইয়া পাঠাইয়া দিব, নতুবা টাইপ রাইট করিয়া পাঠাইয়া দিব। ভরসায় বুক বাঁধ—নিরাশ হইও না। এরূপ সুন্দর ভাবে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর, যদি আবার তোমার নৈরাশ্য আসে, তাহা হইলে তুমি মূর্খ। আমাদের কার্য্যের আরম্ভ যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, আর কোন কার্য্যের আরম্ভ তদ্রূপ দেখা যায় না, আমাদের কার্য্য ভারতে ও তাহার বাহিরে যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ভারতে আর কোন আন্দোলন তদ্রূপ হয় নাই।

আমি ভারতের বাহিরে কোনরূপ প্রণালীবদ্ধ কার্য্য বা সভাসমিতি করিতে ইচ্ছা করি না। ঐরূপ করিবার কোন উপকারিতা বুঝি না। ভারতই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র আর বিদেশে আমাদের কার্য্যের আদরের এইটুকু মূল্য যে, উহাতে ভারত জাগিবে। এই পর্য্যন্ত। আমেরিকার ব্যাপার ভারতে আমাদের কার্য্য করিবার অধিকার ও সুযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এখন ভাববিস্তারের জন্য আমাদিগের দৃঢ়মূল ভিত্তির প্রয়োজন। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা—এক্ষণে এই দুইটী কেন্দ্র হইয়াছে। অতি শীঘ্রই ভারতে আরও শত শত কেন্দ্র হইবে।

যদি পার, তবে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র উভয়ই বাহির কর। আমার যে

সকল ভ্রাতৃগণ চারিদিকে ঘুরিতেছেন, তাঁহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিবেন—আমিও অনেক গ্রাহক যোগাড় করিব এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু টাকা পাঠাইব। মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইও না—সব ঠিক হইয়া যাইবে।

ইচ্ছাশক্তিই জগৎকে পরিচালিত করিয়া থাকে। হে বৎস, যুবকগণ খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যাইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইও না। আমাদের নিজের দোষেই ইহা ঘটিতেছে। (এইমাত্র রাশীকৃত সংবাদপত্র ও পরমহংসের জীবনী আসিল—আমি সমুদয় পড়িয়া তার পর আবার কলম ধরিতেছি) আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ মান্দ্রাজে এক্ষণে যে প্রকার অযথা নিয়ম ও আচার-বন্ধন রহিয়াছে, তাহাতে তাহারা ঐরূপ না হইয়াই বা করে কি? উন্নতির জন্য প্রথম চাই—স্বাধীনতা। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই ধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেহকে যতপ্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাযেকাযেই সমাজের বিকাশ হইল না। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত—সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা—ধর্ম্মে কিছুমাত্র নাই। ইহার ফলে তথায় ধর্ম্ম নিতান্ত অপরিণত ও সমাজ সুন্দর উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে প্রাচ্যদেশীয় সমাজের চরণ হইতে বন্ধন-শৃঙ্খল ক্রমশঃ দূর হইতেছে, পাশ্চাত্য ধর্ম্মেরও ঠিক তাহাই হইতেছে। তোমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে ও সহিষ্ণুতার সহিত কায করিয়া যাইতে হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ আবার ভিন্ন ভিন্ন। ভারতে ধর্ম্মমুখী বা অন্তর্ম্মুখী, পাশ্চাত্যে বহির্ম্মুখী। পাশ্চাত্যদেশ ধর্ম্মের এতটুকু উন্নতি করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায় আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তি লাভ করিতে হইলে তাহা ধর্ম্মের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়।

এই কারণে আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্ম্মকে নাশ না করিয়া সংস্কারের আর কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথও হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন—আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্ম্মের প্রসূতি'কে বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের মধ্য দিয়া যান নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি। আমি বলি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য হিন্দুধর্ম্ম নাশে কোন প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুর ধর্ম্ম, প্রাচীন রীতিনীতি ও আচার পদ্ধতি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া যে

সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে, কিন্তু ধর্ম্মভাবসকলকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেরূপ ভাবে লাগান উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা। আমি আমাদের প্রচীন শাস্ত্রসমূহ হইতে ইহা বিস্তারিত ভাবে প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। আমি ইহাই শিক্ষা দিতেছি আর আমাদিগকে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ইহাতে সময় লাগিবে—অনেক সময় ও দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার প্রয়োজন। সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর ও কায করিয়া যাও। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং'—নিজ আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

আমি তোমাদের অভিনন্দনের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত আছি। ইহা ছাপাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। তা যদি সম্ভব না হয়, খানিকটা খানিকটা করিয়া ইণ্ডিয়ান মিরর ও অন্যান্য কাগজে ছাপাইবে।

তোমারই—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কেবল উন্নত আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন জনগণের জন্য গঠিত—আর সকলকেই উহা নির্দ্দয়-ভাবে পিষিয়া ফেলে। কিন্তু যাহারা সাংসারিক অসার বিষয় যথা রূপরসাদি একটু আধটু সম্ভোগ করিতে চায়, তাহারা কোথা পাইবে? তোমাদের ধর্ম্ম যেমন উত্তম মধ্যম ও অধম সকল প্রকার অধিকারীকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তোমাদের সমাজেরও উচিত—তদ্রূপ উচ্চ নীচ ভাবাপন্ন সকলকে গ্রহণ করা। ইহার উপায়—প্রথমে তোমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, তৎপরে—সামাজিক বিষয়ে উহা লাগাইতে হইবে। ইহা অতি ধীরে ধীরে হইবে, কিন্তু ইহাতে পাকা কায হইবে।

ইতি বি—

মদীয় আচার্য্যদেব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [স্বামী বিবেকানন্দ।

তিনি আর নিয়মিতরূপে পূজা করিতে অক্ষম হইলেন, তিনি আর সব খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করিতে অক্ষম হইলেন। সময়ে সময়ে তিনি প্রতিমায় সম্মুখে ভোগ রাখিতে ভুলিয়া যাইতেন, কখন কখন

আরতি করিতে ভুলিতেন, আবার সময়ে সময়ে সব ভুলিয়া ক্রমাগত আরতি করিতেন। অবশেষে তাঁহার পক্ষে মন্দিরের নিয়মিত পূজা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চবটীতে গিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের এই ভাগ সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন, কখন সূর্য্য উদয় হইল, কখন বা অস্ত গেল, তাহা জানিতে পারিতেন না। তিনি নিজের দেহভাব একেবারে ভুলিয়া গেলেন, আহার করিতে পারিতেন না। এই সময়ে তাঁহার জনৈক আত্মীয় তাঁহাকে খুব যত্নপূর্ব্বক সেবাশুশ্রূষা করিতেন, তিনি ইঁহার মুখে জোর করিয়া খাবার দিতেন—অজ্ঞাতসারে কতকটা উদরস্থ হইত।

এইরূপে সেই বালকের দিনরাত্রি চলিয়া যাইতে লাগিল। দিবাবসানে সন্ধ্যাকালে যখন মন্দিরের আরতির শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তাঁহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত, তিনি কাঁদিতেন ও বলিতেন, 'মা, আর একদিন বৃথা চলিয়া গেল, এখনও তোমার দেখা পাইলাম না। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আর এক দিন চলিয়া গেল, আমি সত্যকে জানিতে পারিলাম না।' অন্তঃকরণের প্রবল যন্ত্রনায় তিনি কখন কখন মাটীতে মুখ ঘষড়াইয়া কাঁদিতেন।

মনুষ্যহৃদয়ে এইরূপ প্রবল ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে। শেষাবস্থায় এই ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, মনে কর, একটা ঘরে এক থলি মোহর রহিয়াছে, আর তার পাশের ঘরে একটা চোর রহিয়াছে, তুমি কি মনে কর, সেই চোরের নিদ্রা হইবে? তাহার নিদ্রা হইতেই পারে না। তাহার মনে ক্রমাগত এই উদয় হইবে যে, কি করিয়া ঐ ঘরে ঢুকিয়া মোহরের থলিটী লইব? তাই যদি হয়, তবে তুমি কি মনে কর, যাহার এই দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, এই সকল আপাতপ্রতীয়মান বস্তুর পশ্চাতে সত্য রহিয়াছে, ঈশ্বর বলিয়া একজন আছেন, অবিনাশী একজন আছেন, এমন একজন আছেন, যিনি অনন্ত আনন্দস্বরূপ, যে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে ইন্দ্রিয়-সুখ সব ছেলেখেলা বলিয়া বোধ হয়, সে কি তাহাকে লাভ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে? এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি সে এ চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। সে উহা লাভের জন্য উন্মত্ত হইবে।" সেই বালকের হৃদয়ে এই ভগবদুন্মত্ততা প্রবেশ করিল। সে সময়ে তাঁহার কোন গুরু ছিল না, এমন কেহ ছিল না যে, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কিছু সন্ধান দেয়, কিন্তু সকলেই মনে করিত, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে। সাধারণে ত এইরূপ বলিবেই। যদি কেহ সংসারের অসার

বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে, লোকে তাহাকে উন্মত্ত বলে; কিন্তু এইরূপ লোকই যথার্থ সংসারের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ পাগ্‌লামী হইতেই জগৎ-আলোড়নকারী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, আর ভবিষ্যতেও এইরূপ পাগ্‌লামী হইতেই শক্তি উদ্ভূত হইয়া জগৎকে আলোড়িত করিবে। এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টায় কাটিল। তখন তিনি নানাবিধ অলৌকিক দৃশ্য, অদ্ভুত রূপ দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার নিজ স্বরূপের রহস্য তাঁহার নিকট ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল। যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে লাগিল। জগন্মাতা নিজেই গুরু হইয়া এই বালককে তাঁহার অন্বেষিত সত্যপ্রাপ্তির সাধনে দীক্ষিত করিলেন। এই সময়ে সেই স্থানে পরমা সুন্দরী, পরমা বিদুষী এক মহিলা আসিলেন। শেষাবস্থায় এই মহাত্মা তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন যে, বিদুষী বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়—তিনি বিদ্যা মূর্ত্তিমতী। যেন সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতী মানবাকার ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। এই মহিলার বিদ্যাবত্তার বিষয় আলোচনা করিলেও তোমরা ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষত্ব বুঝিতে পারিবে। সাধারণতঃ হিন্দুরমণীগণ যেরূপ অজ্ঞানান্ধকারে বাস করে এবং পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে স্বাধীনতার অভাব বলে, তাহার মধ্যেও এইরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন রমণীর অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল। তিনি একজন সন্ন্যাসিনী ছিলেন—কারণ, ভারতে স্ত্রীলোকেরাও বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ও বিবাহ না করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় জীবন সমর্পণ করে। তিনি এই মন্দিরে আসিয়াই এই বালকের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁহার নিকট হইতেই তিনি প্রথম সহায়তা পাইলেন। তিনি একেবারেই তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার ন্যায় যাহার উন্মাদ আসিয়াছে, সে ধন্য। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই পাগল—কেহ ধনের জন্য, কেহ সুখের জন্য, কেহ নামের জন্য, কেহ বা অন্য কিছুর জন্য পাগল। সেই ব্যক্তিই ধন্য, যে ঈশ্বরের জন্য পাগল। এইরূপ ব্যক্তি বড়ই অল্প।" এই মহিলা বালকটীর নিকট অনেক বর্ষ ধরিয়া থাকিয়া তাঁহাকে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীর সাধন শিখাইতে লাগিলেন, নানাপ্রকারের যোগসাধন শিখাইলেন এবং যেন এই বেগবতী ধর্ম্ম স্রোতস্বতীর গতিকে নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধ করিলেন।

কিছুদিন পরে তথায় একজন সন্ন্যাসী আসিলেন—তিনি একজন পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি মায়াবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, জগতের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই আর তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গৃহে বাস

করিতেন না, রৌদ্র ঝড় বর্ষা সকল সময়েই তিনি বাহিরে থাকিতেন। তিনি ইঁহাকে বেদান্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু শীঘ্রই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, শিষ্য গুরু অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি কয়েকমাস ধরিয়া তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন।

মন্দিরের পূজারী অবস্থায় যখন তাঁহার অদ্ভুত পূজাপ্রণালী দেখিয়া লোকে তাঁহার একটু মাথার গোল হইয়াছে স্থির করিয়াছিল, তখন তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে দেশে লইয়া গিয়া একটী অল্পবয়স্কা বালিকার সহিত বিবাহ দিল—মনে করিল, ইহাতেই তাঁহার চিত্তের গতি ফিরিয়া যাইবে, মাথার গোল আর থাকিবে না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তিনি ফিরিয়া আসিয়া ভগবান্‌কে লইয়া আরো মাতিলেন। অবশ্য তাঁহার যেরূপ বিবাহ হইল, উহাকে ঠিক বিবাহ নাম দেওয়া যায় না। যখন স্ত্রী একটু বড় হয়, তখনই প্রকৃত বিবাহ হইয়া থাকে, আর এই সময়ে স্বামীর শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রীকে নিজগৃহে লইয়া আসাই প্রথা। এ ক্ষেত্রে কিন্তু স্বামী একেবারেই ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী আছে। সুদূর পল্লীতে থাকিয়া বালিকাটী শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী ধর্ম্মোন্মাদ হইয়া গিয়াছেন, এমন কি, অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়াই বিবেচনা করিতেছেন। তিনি স্থির করিলেন, এ কথার সত্যতা জানিতে হইবে—তাই তিনি বাহির হইয়া তাঁহার স্বামী যথায় আছেন, পদব্রজে তথায় যাইলেন। অবশেষে যখন তিনি স্বামীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন না। যদিও ভারতে নরনারী যে কেহ ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করে, তাহারই আর কাহারও সহিত কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না, তথাপি ইনি স্ত্রীকে দূর করিয়া না দিয়া ইঁহার পদতলে পতিত হইলেন ও বলিলেন, "আমি জানিয়াছি, সকল রমণীই আমার জননী, তবে আমি, এখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই মহিলা বিশুদ্ধস্বভাবা ও অতিশয় উচ্চাশয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বামীর মনোভাব সব বুঝিয়া তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি করিতে সমর্থা ছিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়াই তাঁহাকে বলিলেন, "আমার আপনাকে জোর করিয়া সংসারী করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল আপনার নিকট থাকিয়া আপনার সেবা করিতে ও আপনার নিকট সাধন-ভজন শিখিতে চাই।" তিনি তাঁহার একজন প্রধান অনুগত শিষ্যা হইলেন—তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি-পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার স্ত্রীর অনুমতি পাইয়া তাঁহার শেষ বাধা অপ-

সারিত হইল—তখন তিনি স্বাধীন হইয়া নিজ রুচি অনুযায়ী মার্গে বিচরণ করিতে সক্ষম হইলেন।

তার পর ইঁহার অন্তরে প্রবল পিপাসা হইল যে, বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীতে কি সত্য আছে, তাহা জানিবেন। এ পর্য্যন্ত তিনি নিজের ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না। এক্ষণে তাঁহার বাসনা হইল, অন্যান্য ধর্ম্ম কিরূপ তাহা জানিবেন। অতএব তিনি অন্যান্য ধর্ম্মের গুরু খুঁজিতে লাগিলেন। গুরু বলিতে ভারতে আমরা কি বুঝি, এটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। গুরু বলিতে শুধু কেতাবকীট বুঝায় না—যিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সাক্ষাৎ সত্যকে জানিয়াছেন—অপর কাহারও নিকট শুনিয়া নহে। তিনি জনৈক মুসলমান সাধু পাইয়া তাঁহার প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী অনুসারে সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, তিনি যে অবস্থায় পৌছিয়াছেন, এই সকল সাধনপ্রণালীর অনুষ্ঠানও ঠিক সেই অবস্থায় পৌছাইয়া দেয়। তিনি যীশুখ্রীষ্টের সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াও সেই একই ফললাভ করিলেন। তিনি যে কোন সম্প্রদায় সম্মুখে পাইলেন, তাহাদেরই নিকট গিয়া তাহাদের সাধনপ্রণালী লইয়া সাধন করিলেন, আর তিনি যে কোন সাধন করিতেন, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাকে সেই সেই সম্প্রদায়ের গুরুরা যেরূপ যেরূপ করিতে বলিতেন, তিনি তাহার যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেন, আর সকল ক্ষেত্রেই তিনি একই প্রকার ফললাভ করিতেন। এইরূপে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একই উদ্দেশ্য—সকলেই সেই একই জিনিষ শিক্ষা দিতেছে—প্রভেদ প্রধানতঃ সাধনপ্রণালীতে, আরো অধিক প্রভেদ ভাষায়; ভিতরে সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্ম্মেরই সেই এক উদ্দেশ্য।

তার পর তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে একেবারে লিঙ্গজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন; কারণ, আত্মার কোন লিঙ্গ নাই, আত্মা পুরুষও নহেন, স্ত্রীও নহেন। লিঙ্গভেদ কেবল দেহেই বিদ্যমান আর যিনি সেই আত্মাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার লিঙ্গভেদ থাকিলে চলিবে না। তিনি নিজে পুরুষদেহধারী ছিলেন—এক্ষণে তিনি সকল প্রকারে এই স্ত্রীভাব আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেকে রমণী বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ করিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, পুরুষের ভাব সব ছাড়িয়া দিলেন, রমণীমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন—এইরূপে অনেক বর্ষ ধরিয়া সাধন করিতে করিতে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত

হইয়া গেল, তিনি লিঙ্গজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গেলেন—তাঁহার নিকট জীবনটা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গেল।

আমরা পাশ্চাত্য প্রদেশে নারীপূজার কথা শুনিয়া থাকি, কিন্তু সাধারণতঃ এই পূজা নারীর সৌন্দর্য্য ও যৌবনের পূজা। ইনি কিন্তু নারীপূজা বলিতে বুঝিতেন, সকল নারীই সেই আনন্দময়ী মা ব্যতীত অন্য কিছু নহেন—তাঁহারই পূজা। আমি নিজে দেখিয়াছি, সমাজ যাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, তিনি এরূপ স্ত্রীলোকদের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পদতলে পতিত হইয়া বলিতেছেন, "মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ আর একরূপে তুমি সমগ্র জগৎ হইয়াছ। আমি তোমাকে প্রণাম করি, মা, আমি তোমাকে প্রণাম করি।" ভাবিয়া দেখ, সেই জীবন কিরূপ ধন্য, যাঁহা হইতে সর্ব্ববিধ পশুভাব চলিয়া গিয়াছে, যিনি প্রত্যেক রমণীকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেছেন, যাঁহার নিকট সকল নারীর মুখ অন্য আকার ধারণ করিয়াছে, কেবল সেই আনন্দময়ী ভগবতী জগদ্ধাত্রীর মুখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাই আমাদের প্রয়োজন। তোমরা কি বলিতে চাও, রমণীর মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, তাহাকে ঠকাইতে পারা যায়? তাহা কখন হয় নাই, হইতেও পারে না। উহা সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। উহা অব্যর্থভাবেই সমুদয় জুয়াচুরি কপটতা ধরিয়া ফেলে, উহা অভ্রান্তভাবে সত্যের তেজ, আধ্যাত্মিকতার আলোক ও পবিত্রতার শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকে। যদি প্রকৃত ধর্ম্মলাভ করিতে হয়, তবে এইরূপ পবিত্রতা অত্যাবশ্যক।

এই ব্যক্তির জীবনে এইরূপ কঠোর, সর্ব্বদোষ-বিরহিত পবিত্রতা আসিল। আমাদের জীবনে যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের সহিত সংঘর্ষ রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে তাহা আর রহিল না। তিনি অতি কষ্টে ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিয়া মানবজাতিকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন—তখন তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রচারকার্য্য ও উপদেশদান আশ্চর্য্য ধরণের। আমাদের দেশে আচার্য্যের খুব সম্মান, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞান করা হয়। আচার্য্যকে যেরূপ সম্মান করা হয়, পিতামাতাকেও আমরা সেরূপ সম্মান করি না। পিতামাতা হইতে আমরা দেহ পাইয়াছি, কিন্তু আচার্য্য আমাদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। আমরা তাঁহার সন্তান, তাঁহার মানসপুত্র। কোন অসাধারণ আচার্য্যের অভ্যুদয় হইলে সকল হিন্দুই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আইসে, লোকে তাঁহাকে ঘেরিয়া তাঁহার নিকট ভিড় করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু এই আচার্য্যবরের, লোকে

তাঁহাকে সম্মান করিল কি না, এ বিষয়ে কোন খেয়ালই ছিল না, তিনি যে এক জন আচার্য্যশ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না—তিনি জানিতেন—মাই সব করিতেছেন, তিনি কিছুই নহেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "যদি আমার মুখ দিয়া কোন ভাল কথা বাহির হয়, তাহা আমার মায়ের কথা—আমার তাহাতে কোন গৌরব নাই।" তিনি তাঁহার নিজ প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এ ধারণা ত্যাগ করেন নাই। ইনি কাহাকেও ডাকিতে যাইতেন না। তাঁহার এই মূলমন্ত্র ছিল—প্রথমে চরিত্র গঠন কর—প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব উপার্জ্জন কর—ফল আপনি আসিবে। তাঁহার প্রিয় দৃষ্টান্ত এই ছিল—"যখন কমল প্রস্ফুটিত হয়, তখন ভ্রমরগণ আপনাপনিই মধু খুঁজিতে আসিয়া থাকে। এইরূপে যখন তোমার হৃৎপদ্ম ফুটিবে, তখন শত শত লোক তোমার নিকট শিক্ষা লইতে আসিবে।" এইটী জীবনের এক মহা শিক্ষা। মদীয় আচার্য্যদেব আমাকে শত শত বার ইহা শিখাইয়াছেন, তথাপি আমি প্রায়ই ইহা ভুলিয়া যাই। খুব কম লোকেই চিন্তার অদ্ভুত শক্তি বুঝিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গুহায় বসিয়া উহার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া যথার্থ একটী মাত্রও মহৎ চিন্তা করিয়া মরিতে পারে, সেই চিন্তা সেই গুহার প্রাচীর ভেদ করিয়া সমগ্র আকাশে বিচরণ করিবে, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে ঐ ভাব সংক্রামিত হইবে। চিন্তার এইরূপ অদ্ভুত শক্তি। অতএব তোমার ভাব অপরকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। প্রথমে দিবার মত কিছু সঞ্চয় কর। তিনিই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, যাঁহার কিছু দিবার আছে, কারণ, শিক্ষাপ্রদান বলিতে কেবল বচন বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝান নহে; শিক্ষাপ্রদান অর্থে ভাব-সঞ্চার। যেমন আমি তোমাকে একটী ফুল দিতে পারি, তদ্রূপ ধর্ম্মও দেওয়া যাইতে পারে। ইহা কবিত্বের ভাষায় বলিতেছি না, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভারতে এই ভাব অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান, আর পাশ্চাত্য প্রদেশে যে 'প্রেরিতগণের গুরুশিষ্যপরম্পরা' (Apostolic succession) মত প্রচলিত আছে, তাহাতেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতএব প্রথমে চরিত্র গঠন কর—এইটীই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য। আগে নিজে সত্য কি তাহা জান, পরে অনেকে তোমার নিকট শিখিবে, তাহারা সব তোমার নিকট আসিবে। মদীয় আচার্য্যদেবের ইহাই ভাব ছিল—তিনি কাহারও সমালোচনা করিতেন না।

বৎসর বৎসর ধরিয়া আমি এই ব্যক্তির সহিত বাস করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার

জিহ্বা কোন সম্প্রদায়ের নিন্দাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, শুনি নাই। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁহার সমান সহানুভূতি ছিল। তিনি উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিয়াছিলেন। মানুষ হয় জ্ঞানপ্রবণ, না হয় ভক্তিপ্রবণ, না হয় যোগপ্রবণ, না হয় কর্ম্মপ্রবণ হইয়া থাকে। বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহে এই সকল বিভিন্ন ভাবসমূহের কোন না কোনটীর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তথাপি এক ব্যক্তিতে এই চারিটী ভাবের বিকাশই সম্ভব এবং ভবিষ্যৎ মানব ইহা করিতে সমর্থ হইবে। ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি কাহারও দোষ দেখিতেন না, সকলের মধ্যে ভালই দেখিতেন। একদিন আমার বেশ স্মরণ আছে, কোন ব্যক্তি ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেছিলেন—এই সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠানাদি নীতিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তিনি কিন্তু তাহাদেরও নিন্দা করিতে প্রস্তুত নহেন—তিনি স্থির-ভাবে কেবলমাত্র বলিলেন—কেউ বা সদর দরজা দিয়া বাড়ীতে ঢোকে, কেউ বা আবার পাইখানার দোর দিয়ে ঢুকতে পারে। এইরূপে ইহাদের মধ্যেও ভাল লোক থাকিতে পারে। আমাদের নিন্দা করা উচিত নয়। তাঁহার দৃষ্টি কুসংস্কার-শূন্য নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাব, তাহাদের মূলতত্ত্ব তিনি সহজেই বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিজ অন্তরের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র করিয়া সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব্ব মানুষকে দেখিতে, তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার প্রত্যেক কথাতেই একটা শক্তি মাখান থাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া দিত। কথায় কিছু নাই, ভাষাতেও কিছু নাই, যে ব্যক্তি সেই কথা বলিতেছে, তাহার সত্তা তিনি যাহা বলেন তাহাতে জড়াইয়া থাকে, তাই কথায় জোর হয়। আমরা সকলেই সময়ে সময়ে ইহা অনুভব করিয়া থাকি। আমরা খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিয়া থাকি, উত্তম সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব সকল শুনিয়া থাকি, তার পর বাড়ী গিয়া সব ভুলিয়া যাই। আবার অন্য সময়ে হয়ত অতি সরল ভাষায় দুই চারিটী কথা শুনিলাম—সেগুলি আমাদের প্রাণে এমন লাগিল যে, সারা জীবনের জন্য সেই কথাগুলি আমাদের হৃদয়ে গাঁথিয়া গেল, আমাদের অঙ্গীভূত হইয়া গেল, স্থায়ী ফল প্রসব করিল। যে ব্যক্তি তাঁহার কথাগুলিতে নিজের সত্তা, নিজের জীবন প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারই কথার ফল হয়, কিন্তু তাঁহার মহাশক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার অর্থই আদানপ্রদান—আচার্য্য দিবেন, শিষ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আচার্য্যের

কিছু দিবার বস্তু থাকা চাই, শিষ্যেরও গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই।

এই ব্যক্তি ভারতের রাজধানী, আমাদের দেশের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র—যেখান হইতে প্রতি বৎসর শত শত সন্দেহবাদী ও জড়বাদীর সৃষ্টি হইতেছিল—সেই কলিকাতার নিকট বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, অনেক সন্দেহবাদী, অনেক নাস্তিক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেন। আমি এই ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে গেলাম। তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের মত বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। তিনি অতি সরল ভাষায় কথা কহিতেছিলেন, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি একজন বড় ধর্ম্মাচার্য্য কিরূপে হইতে পারে? আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সারা জীবন ধরিয়া অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"হাঁ"। "মহাশয়, আপনি কি তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন?" "হাঁ। "কি প্রমাণ?" "আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি, বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখিতেছি।" আমি একেবারে মুগ্ধ হইলাম। এই প্রথম আমি এমন লোক দেখিলাম, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন, আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি, ধর্ম্ম সত্য—উহা অনুভব করা যাইতে পারে—আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণ স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট আসিতে লাগিলাম—আর ধর্ম্ম যে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমি বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন মহাপুরুষগণের বিষয় পাঠ করিয়াছিলাম—তাঁহারা উঠিয়া বলিলেন—সুস্থ হও আর সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল। আমি এখন দেখিলাম, ইহা সত্য আর যখন আমি এই ব্যক্তিকে দেখিলাম, আমার সকল সন্দেহ ভাসিয়া গেল। ধর্ম্মদান সম্ভব, আর মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন, "জগতের অন্যান্য জিনিষ যেমন দেওয়া নেওয়া যায়, ধর্ম্ম তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া নেওয়া যাইতে পারে।" অতএব আগে ধার্ম্মিক হও, দিবার মত কিছু অর্জ্জন কর, তার পর জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহা দাও গিয়া। ধর্ম্ম বাক্যাড়ম্বর নহে অথবা মতবাদবিশেষ নহে অথবা সাম্প্রদায়িকতা

নহে। সম্প্রদায়ে বা সমাজে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম—আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। উহা লইয়া সমাজ কি হইবে? ঐরূপ সমাজ করিলে ধর্ম্ম ব্যবসাদারিতে পরিণত হয় আর যেখানে এইরূপ ব্যবসাদারি ঢোকে, সেখানেই ধর্ম্মের লোপ। মন্দির বা চার্চ্চ নির্ম্মাণ অথবা সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধর্ম্ম হয় না। অথবা কোন গ্রন্থে বা বচনে বা বক্তৃতায় বা সঙ্ঘে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মের মোট কথা—অপরোক্ষানুভূতি। আর আমরা সকলেই প্রত্যক্ষই দেখিতেছি, আমরা যতক্ষণ না নিজেরা সত্যকে জানিতেছি, ততক্ষণ কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা যতই তর্ক করি না কেন, আমরা যতই শুনি না কেন, কেবল একটী জিনিষেই আমাদের সন্তোষ হইতে পারে—তাহা এই—আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষানুভূতি আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি সকলের পক্ষেই সম্ভব, কেবল উহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষানুভব করিবার প্রথম সোপান—ত্যাগ। যতদূর পারি, ত্যাগ করিতে হইবে। অন্ধকার ও আলোক, বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ দুই কখন একত্র অবস্থান করিতে পারে না। "তোমরা ঈশ্বর ও শয়তানকে এক সঙ্গে সেবা করিতে পার না।"

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট আমি আর একটী বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়—এই অদ্ভুত সত্য যে, জগতের ধর্ম্মসমূহ পরস্পর বিরোধী নহে। উহারা এক সনাতন ধর্ম্মেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এক অনন্ত ধর্ম্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে আর এই ধর্ম্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব আমাদিগকে সকল ধর্ম্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব, সমুদয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয়, তাহা নহে, পাত্র হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম্ম তীব্র কর্ম্মশীলতারূপে প্রকাশিত, কাহাতেও প্রবলা ভক্তি, কাহাতেও যোগ, কাহাতেও বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। 'তুমি যে পথে যাইতেছ, তাহা ঠিক নহে', একথা বলা ভুল। এইটী করিতেই হইবে—এই মূল রহস্যটী শিখিতে হইবে—সত্য একও বটে, বহুও বটে, বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ না করিয়া আমরা সকলের প্রতি অনন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইব। যতদিন পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে

হইবে, এইটী বুঝিলে অবশ্যই আমাদের পরস্পর পরস্পরের বিভিন্নতা সহ্য করিতে সমর্থ হইব। যেমন প্রকৃতি বলিতে বহুত্বে একত্ব বুঝায়, ব্যবহারিক জগতে অনন্ত ভেদ, কিন্তু এই সমুদয় ভেদের পশ্চাতে অনন্ত, অপরিণামী, নিরপেক্ষ একত্ব রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর ব্যষ্টি সমষ্টির ক্ষুদ্রাকারে পুনরাবৃত্তিমাত্র। এই সমুদয় ভেদ সত্ত্বেও ইহাদেরই মধ্যে অনন্ত একত্ব বিরাজমান—আর ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব অপেক্ষা এই ভাবটী আজকালকার দিনে আমার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। আমি এমন এক দেশের যেখানে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্ত নাই—সেখানে দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক বা সৌভাগ্যবশতঃই হউক, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম লইয়া নাড়াচাড়া করে, সেই একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে চায়—আমি এমন দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সহিত পরিচিত। এমন কি, মর্ম্মনেরা (Mormons)* পর্য্যন্ত ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিল। আসুক সকলে। সেই ত ধর্ম্মপ্রচারের স্থান। অন্যান্য দেশাপেক্ষা সেখানেই ধর্ম্মভাব অধিক বদ্ধমূল হয়। তোমরা আসিয়া হিন্দুদিগকে যদি রাজনীতি শিখাইতে চাও, তাহারা বুঝিবে না, কিন্তু যদি তুমি আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার কর উহা যতই অদ্ভুত হউক না কেন, অল্পকালের মধ্যেই সহস্র সহস্র লোক তোমার অনুসরণ করিবে আর তোমার জীবদ্দশায় তোমার সাক্ষাৎ ভগবান্ রূপে পূজিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহাতে আমি আনন্দই বোধ করি, কারণ, ইহাতে স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছে যে, ভারতে আমরা এই এক বস্তুই চাহিয়া থাকি। হিন্দুদের মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সংখ্যাও অনেক, আবার তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে আপাততঃ এত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যে, উহাদের মিলিবার যেন কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি তাহারা সকলেই বলিবে, উহারা ধর্ম্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

"যেমন বিভিন্ন নদীসমূহ বিভিন্ন পর্ব্বতসমূহে উৎপন্ন হইয়া, ঋজু কুটিল নানা

---

* ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জোসেফ স্মিথ নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। ইঁহারা বাইবেলের মধ্যে একটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইঁহারা অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন এবং পাশ্চাত্য সমাজের রীতিবিরুদ্ধ এক পত্নী সত্ত্বেও বহুবিবাহ-প্রথার পক্ষপাতী।

পথে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদয়ই সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায়, তদ্রূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাব বিভিন্ন হইলেও সকলেই অবশেষে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।" ইহা শুধু একটা মতবাদ নহে, ইহা কার্য্যে স্বীকার করিতে হইবে—তবে আমরা সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া অপর ধর্ম্মে কিছু সত্য আছে বলেন, সেরূপ ভাবে নহে। "হাঁ, হাঁ, এতে কতকগুলি বড় ভাল জিনিষ আছে বটে।" (আবার কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য ধর্ম্ম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ক্রমবিকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু "আমাদের ধর্ম্মে উহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে)। একজন বলিতেছে, আমার ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেননা উহা সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্ম, আবার অপর একজন তাহার ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়াও সেই একই দাবী করিতেছে। আমাদের বুঝিতে হইবে ও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মুক্তি দিবার শক্তি সমান আছে। মন্দিরে বা চার্চ্চে উহাদের প্রভেদ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কুসংস্কার মাত্র। সেই একই ঈশ্বর সকলের ডাকে সাড়া দেন আর তুমি, আমি বা অপর কতকগুলি লোক একজন অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মার রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যও দায়ী নহে, সেই এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সকলের জন্য দায়ী। আমি বুঝিতে পারি না, লোকে কিরূপে একদিকে আপনাদিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করে, আবার ইহাও ভাবে যে, ঈশ্বর একটী ক্ষুদ্র লোকসমাজের ভিতর সমুদয় সত্য দিয়াছেন আর তাঁহারাই অবশিষ্ট মানবসমাজের রক্ষকস্বরূপ। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। যদি পার, তাহাকে কিছু ভাল জিনিষ দাও। যদি পার, তবে মানুষ যেখানে অবস্থিত আছে, তথা হইতে তাহাকে একটু উপরে ঠেলিয়া দাও। ইহাই কর, কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য নামের যোগ্য, যিনি আপনাকে এক মুহূর্ত্তে যেন সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য, যিনি অনায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজ আত্মা শিষ্যের আত্মায় সংক্রামিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচার্য্যই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। যাঁহারা কেবল অপরের ভাব ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই কোন উপকার করিতে পারেন না।

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট থাকিয়া আমি বুঝিয়াছি, মানুষ এই দেহেই

সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারে। তদীয় মুখ হইতে কাহারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই, এমন কি, তিনি কাহারও সমালোচনা পর্য্যন্ত করিতেন না। তদীয় নয়ন জগতে কিছু মন্দ দেখিবার শক্তি হারাইয়াছিল—তাঁহার মনও কোনরূপ কুচিন্তায় অসমর্থ হইয়াছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না। সেই মহা পবিত্রতা, মহা ত্যাগই ধর্ম্মলাভের একমাত্র গুহ্য উপায়। বেদ বলেন—

ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।

—ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার অনুসরণ কর।"

সব বড় বড় আচার্য্য ও মহাপুরুষগণও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং জীবনে উহা পরিণত করিয়াছেন। এই ত্যাগ ব্যতীত আধ্যাত্মিকতা আসিবার সম্ভাবনা কোথায়? যেখানেই হউক না, সকল ধর্ম্মভাবের পশ্চাতেই ত্যাগ রহিয়াছে আর যতই ত্যাগের ভাব কমিয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ততই ধর্ম্মের ভিতর ঢুকিতে থাকে আর ধর্ম্মভাবও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। এই ব্যক্তি ত্যাগের সাকার মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। আমাদের দেশে যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহাদিগকে সমুদয় ধন ঐশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে হয় আর মদীয় আচার্য্যদেব এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এমন অনেকে ছিল, যাহাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিলে তাহারা কৃতার্থ বোধ করিত, যাহারা আনন্দের সহিত তাঁহাকে সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রদানে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু যদিও তাঁহার উদার হৃদয় সকলকে আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত ছিল, তথাপি তিনি এই সব লোকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন। কামকাঞ্চন সম্পূর্ণ জয়ের তিনি এক জীবন্ত উদাহরণ। এই দুই ভাব তাঁহার ভিতর কিছুমাত্র ছিল না আর এই শতাব্দীর জন্য এইরূপ লোকসকলের অতিশয় প্রয়োজন। এখনকার কালে লোকে যাহাকে আপনাদের 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য' বলে, তাহা ব্যতীত একমাসও বাঁচিতে পারিবে না—মনে করে, আর এই প্রয়োজন তাহারা অতিরিক্তরূপে বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—এই আজকালকার দিনে এই ত্যাগের প্রয়োজন। এইরূপ কালে এমন একজন লোকের প্রয়োজন—যিনি জগতের অবিশ্বাসীদের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন যে, এখনও এমন লোক আছে, যে সংসারের সমুদয় ধনরত্ন ও মানযশের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নহে। এখনও এরূপ অনেক লোক আছেন।

মদীয় আচার্য্যদেবের জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম্ম উপার্জ্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। দলে দলে লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত আর তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন আর এরূপ ঘটনা দুই এক দিনের জন্য ঘটিত, তাহা নহে, মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল, অবশেষে এইরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার মানবজাতির প্রতি এরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে, যাহারা তাঁহার কৃপালাভার্থ আসিত, এরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। ক্রমে গলায় একটা ঘা হইল, তথাপি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও কথা বন্ধ করা গেল না। যখনই তিনি শুনিতেন, লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার কাছে আসিতে দিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেন এবং তাহারা আসিলে তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আপনি ত একজন মস্ত যোগী—আপনি আপনার দেহের উপর একটু মন রাখিয়া ব্যারামটা সারাইয়া ফেলুন না।" প্রথমে তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন না, অবশেষে যখন তিনি আবার ঐ কথা তুলিলেন, তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, "তোমাকে আমি একজন জ্ঞানী মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি অপর সংসারী লোকদের মত কথা বলিতেছ। এই মন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হইয়াছে—তুমি কি বল, ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া আত্মার খাঁচাস্বরূপ দেহে দিব?"

এইরূপে তিনি লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন—আর চারিদিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল যে, ইঁহার শীঘ্র দেহ যাইবে—তাই পূর্ব্বাপেক্ষা আরো দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তোমরা কল্পনা করিতে পার না, ভারতের বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যদের কাছে কিরূপে লোক আসিয়া তাঁহার চারিদিকে ভিড় করে এবং জীবদ্দশায়ই তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কেবল তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিবার জন্য অপেক্ষা করে। অপরের ভিতর এইরূপ আধ্যাত্মিকতার আদর হইতেই লোকের ভিতর আধ্যাত্মিকতা আসিয়া থাকে। মানুষ যাহা চায় ও আদর করে, মানুষ তাহাই পাইয়া থাকে—জাতি সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি ভারতে গিয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা দাও, যত বড় বক্তৃতাই হউক না কেন, তুমি শ্রোতা পাইবে না; কিন্তু ধর্ম্ম শিক্ষা দাও দেখি—তবে শুধু বচনে হইবে না, নিজে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা

হইলে শত শত ব্যক্তি তোমার নিকট কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার পদধূলি লইবার জন্য আসিবে। যখন লোকে শুনিল যে, এই মহাপুরুষ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাহাদের মধ্য হইতে সরিয়া যাইবেন, তখন তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে লাগিল আর মদীয় আচার্য্যদেব নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে বারণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতাম না। অনেক লোক দূর দূর হইতে আসিত আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "যতক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিব।" আর তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন। একদিন তিনি আমাদিগকে সেই দিন দেহত্যাগ করিবেন, ইঙ্গিতে জানাইলেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র ওঁ উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন।

তাঁহার ভাব ও উপদেশাবলি প্রচার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি তখন অতি অল্পই ছিল। অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার কতকগুলি যুবক শিষ্য ছিল তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছিল এবং তাঁহার কার্য্য পরিচালনা করিতে প্রস্তুত ছিল। তাহাদিগকে দাবাইয়া দিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে তাহারা যে মহান্ জীবনাদর্শ দেখিয়াছিল, তাহার শক্তিতে তাহারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বর্ষ বর্ষ ধরিয়া এই ধন্য জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা দৃঢ়চিত্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। এই যুবকগণ সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করিতে লাগিল, আর যদিও ইহাদের মধ্যে অনেকেই সদ্বংশজাত, তথাপি তাহারা যে সহরে জন্মিয়াছিল, তাহার রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাহাদিগকে প্রবল বাধা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া রহিল আর দিনের পর দিন ভারতের সর্ব্বত্র এই মহাপুরুষের উপদেশ প্রচার করিতে লাগিল—অবশেষে সমগ্র দেশ তাঁহার প্রচারিত ভাবসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। বঙ্গদেশে সুদূর পল্লীগ্রামে জন্মিয়া এই অশিক্ষিত বালক কেবল নিজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে প্রদান করিয়া গেল—আর উহা জীবিত রাখিবার জন্য কেবল কতকগুলি যুবককে রাখিয়া গেল।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে,

আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্য্যদেবের—ভুলগুলি কেবল আমার।

এইরূপ ব্যক্তির এক্ষণে প্রয়োজন—এই যুগে এইরূপ লোকের আবশ্যক। হে আমেরিকাবাসী নরনারীগণ, তোমাদের মধ্যে যদি এরূপ পবিত্র, অনাঘ্রাত পুষ্প থাকে, উহা ভগবানের পাদপদ্মে প্রদান করা উচিত। যদি তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকেন, যাঁহাদের সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা নাই, যাঁহাদের বেশী বয়স হয় নাই, তাঁহারা ত্যাগ করুন। ধর্ম্মলাভের ইহাই রহস্য—ত্যাগ কর। প্রত্যেক রমণীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর, আর কাঞ্চন পরিত্যাগ কর। কি ভয়? যেখানেই থাক না কেন, প্রভু তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্রভু নিজ সন্তানগণের ভারগ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহস করিয়া ত্যাগ কর দেখি। এইরূপ প্রবল ত্যাগের প্রয়োজন। তোমরা কি দেখিতেছ না, পাশ্চাত্যদেশে জড়বাদ ও মৃত্যুর কি প্রবল স্রোত বহিতেছে? কতদিন আর চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া থাকিবে? তোমরা কি দেখিতেছ না, কি কাম ও অপবিত্রতা সমাজের অস্থিমজ্জা শোষণ করিয়া লইতেছে? তোমরা কেবল বচনের দ্বারা অথবা সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা ইহা বন্ধ করিতে পারিবে না—ত্যাগের দ্বারাই এবং এই ক্ষয় ও বিনাশের মধ্যে ধর্ম্মাচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলেই এই সকল ভাব বন্ধ হইবে। বাক্যব্যয় করিও না, কিন্তু তোমার দেহের প্রত্যেক লোমকূপ হইতে পবিত্রতার শক্তি, ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি, ত্যাগের শক্তি বাহির হউক। যাহারা দিবারাত্র কাঞ্চনের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে ঐ শক্তি গিয়া লাগুক—তাহারা কাঞ্চনত্যাগী তোমাকে এই কাঞ্চনের জন্য বিজাতীয় আগ্রহের মধ্যে দেখিবামাত্র আশ্চর্য্য হউক। আর কামও ত্যাগ কর। এই কাম-কাঞ্চনত্যাগী হও, নিজেকে যেন বলিস্বরূপ প্রদান কর—আর কে ইহা সাধন করিবে? যাহারা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ—সমাজ যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা নহে, কিন্তু পৃথিবীর যাহারা সর্ব্বোত্তম ও নবীনতম, বলবান্, সুন্দর যুবাপুরুষেরাই ইহার অধিকারী। তাহাদিগকেই ভগবানের বেদীতে সমর্পণ করিতে হইবে—আর এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা জগৎকে উদ্ধার কর। জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা সমগ্র মানবজাতির সেবক হউক—সমগ্র মানবজাতির নিকট ধর্ম্ম প্রচার করুক। ইহাকেই ত ত্যাগ বলে—শুধু বচনে ইহা হয় না। উঠিয়া দাঁড়াও ও লাগিয়া যাও। তোমাদিগকে দেখিবামাত্র সংসারী লোকের মনে—কাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে। বচনে কখন কোন কায হয় না—কত কত

প্রচার হইয়াছে—কোন ফল হয় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই অর্থপিপাসায় রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় না, কারণ, উহাদের পশ্চাতে কেবল ভুয়া। ঐ সকল গ্রন্থের ভিতর কোন শক্তি নাই। এস, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। যদি কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পার, তোমায় বাক্যব্যয় করিতে হইবে না, তোমার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে, তোমার ভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইবে। যে ব্যক্তি তোমার নিকট আসিবে, তাহারই ভিতর তোমার ধর্ম্মভাব গিয়া লাগিবে।

আধুনিক জগতের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা এই—"মতামত, সম্প্রদায়, চার্চ্চ বা মন্দিরের অপেক্ষা করিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সারবস্তু রহিয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্ম, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার ততই জগতের কল্যাণ করিবার শক্ত হইয়া থাকে। প্রথমে এই ধর্ম্মধন উপার্জ্জন কর, কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ, সকল মতে, সকল পথেই কিছু না কিছু ভাল আছে। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, ধর্ম্ম অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, কিন্তু উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। কেবল যাহারা নিজেরা ধর্ম্মলাভ করিয়াছে, তাহারাই অপরের ভিতর ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিতে পারে, তাহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইতে পারে। তাহারাই কেবল জগতে জ্ঞানজ্যোতিরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে।"

কোন দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে, ততই সেই দেশ উন্নত হইবে। আর যে দেশে এরূপ লোক একেবারে নাই, সে দেশের পতন অনিবার্য্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। অতএব মানবজাতির নিকট মদীয় আচার্য্যদেবের উপদেশ এই—"প্রথমে নিজে ধার্ম্মিক হও ও সত্য উপলব্ধি কর।" তিনি চান—তোমরা তোমাদের ভাইস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর; তিনি চান—মুখে কেবল আমার ভ্রাতৃবর্গকে ভালবাসি না বলিয়া তোমার কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কাযে লাগিয়া যাও। ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে, তবেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে, দেখিতে পাইবে। দেখিবে—বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই আর তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে। মদীয় আচার্য্যদেবের জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল, সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে মূলে ঐক্য

রহিয়াছে. তাহা ঘোষণা করা। অন্যান্য আচার্য্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান্ আচার্য্য নিজের জন্য কোন দাবী করেন নাই। তিনি কোন ধর্ম্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ, তিনি প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করিয়া ছিলেন যে, সেগুলি এক সনাতন ধর্ম্মেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

বেদ ও বেদ্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মন্।

ভূতত্ত্ববিদেরাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। ভূগর্ভ পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন, ভূতল খনন করিলে অদ্যাপিও উষ্ণ সলিলের সমাচার পাওয়া যায়। কেবল ইহাই নহে, ভূমণ্ডলের বর্ত্তমান কঠিনাবস্থা যে ক্রমশঃ স্তরবিন্যস্তভাবে হইয়াছে, তাঁহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূগর্ভ খননে প্রত্যক্ষীভূত বিবিধ স্তরের পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, আদিমযুগে সর্ব্বত্র সলিলময়ী নারায়ণী মেদিনী এতই উষ্ণ ছিলেন যে, তদবস্থায় ইঁহার গর্ভে কোনরূপ জীবের বাস একেবারে অসম্ভব। তাঁহার মতে ভূগর্ভে জীবাবির্ভাব ভূমণ্ডলের মধ্যযুগে কোন দুর্নিরূপণীয় সময়ে হইয়াছে। প্রাণীমাত্রশূন্য জড়রাজ্যে কিরূপে প্রথম জীবের অভিব্যক্তি হইল, পণ্ডিত স্পেন্সার সে প্রশ্নের কোন মীমাংসার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু হ্যাক্যাল্ (Hackel), ডারবিন (Darwin), ব্যাষ্টিয়ান (Bastian) প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদেরা জড় হইতে জীবাবির্ভাব-প্রশ্নের যথাশক্তি আলোচনা করিয়াছেন। ডারবিন অনুমান করেন, সম্ভবতঃ জড় হইতেই জীবের অর্থাৎ প্রাণপঙ্করূপ সপ্রাণ পদার্থের জন্ম হইয়াছে। হ্যাক্যাল্ Hackel), ব্যাষ্টিয়ান (Bastian) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জড় জগতের ন্যায় সমগ্র জৈব জগতও ক্রমপরিণামপ্রসূত। ইঁহারা বলেন, পরমাণুসমূহের অবিরাম-সন্নিবেশসংস্থানভেদ-নিবন্ধনই যে বস্তুর রূপ ও প্রকৃতির বিভেদ ঘটিয়া থাকে, তাহা বিজ্ঞানসিদ্ধ। দেখনা কেন, একই বস্তুর অন্তর্ভূত পরমাণুসমূহের একবিধ সন্নিবেশসংস্থানকে আমরা তদ্বস্তুর বায়বীয় অবস্থা বলিয়া থাকি, তরলাবস্থায় সেই বায়বীয় পদার্থের উপাদানভূত পরমাণুর অন্যবিধ সন্নিবেশসংস্থান হইয়া

থাকে, এবং কঠিনাবস্থাতে তাহাদেরই আবার সন্নিবেশসংস্থানভেদ সংঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপাদানভূত পরমাণুপুঞ্জের সন্নিবেশসংস্থানভেদ-নিবন্ধনই একই বস্তুর বায়বীয়, তরল ও কঠিনাদি অবস্থান্তর হইয়া থাকে। অত্যুষ্ণ তরল অবস্থা হইতে শীতলতা প্রাপ্তির সহিত মেদিনী স্তরবিন্যস্তভাবে ক্রমশঃই কাঠিন্য প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহাও যে আবার উপাদানভূত অণুপরমাণুসমূহের উপর্য্যুপরি সন্নিবেশসংস্থানভেদক্রমে হইতেছিল—ইহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐরূপ স্তরবিন্যস্তভাবে কঠিনতাপ্রাপ্তিকালে, কোন দুনিরূপণীয় সময়ে, নিরন্তর অবস্থান্তরশীল পরমাণুপুঞ্জ বিচিত্র ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া এমন এক অবস্থান্তর-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহাকে আমরা সপ্রাণ পদার্থ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। ব্যাষ্টিয়ান বলিয়াছেন, ঐ সপ্রাণ পদার্থ কর্ম্মনিরপেক্ষ জড় রেণুসমূহের এইরূপ কোন রাসায়নিক সংযোগসন্নিবেশ হইতে সমুৎপন্ন। জীবতত্ত্ববিদেরা এইরূপে সমুৎপন্ন সপ্রাণ পদার্থকে—'প্রাণপঙ্ক' (protoplasm), এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যক্ষপর ক্রমবিকাশবাদিগণ জড়পরিণামপ্রসূত এই প্রাণপঙ্ককে জীবরাজ্যের আদিপর্ব্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। জীবতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন, প্রাণপঙ্কই নিখিল সপ্রাণ শরীরের উপাদান। এই প্রাণপঙ্ক হইতে তৃণ, তরু, লতা, কীট, পতঙ্গ—এমন কি জীবশ্রেষ্ঠ মানবেরও জন্ম হইয়া থাকে। প্রাণপঙ্কের স্বরূপ নির্ণয়ে পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ইহার উপাদানভূত কণিকা বা রেণুসমূহ সর্ব্বত্রই সমান-বর্ণ ও সমান-ধর্ম্মাত্মক। এই কণিকা বা রেণুসমূহকেই বীজাঙ্কুর বলে। বীজাঙ্কুরের আশ্রয়ীভূত উক্ত প্রাণপঙ্ক নামক সপ্রাণ দ্রব্য নিরন্তর আকুঞ্চন-প্রসারণশীল ও পক্ষিডিম্বান্তর্গত লালাবৎ অর্দ্ধ-তরল পদার্থ।

প্রাণপঙ্কের স্বরূপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত উক্ত মতবাদসমূহের সুবিস্তার আলোচনার স্থান বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নাই। প্রত্যক্ষপর ক্রমবিকাশবাদিগণের দৃগ্‌ভূমি হইতে জড়প্রকৃতির বিকাশপদ্ধতি আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। অধুনা সপ্রাণ জৈব প্রকৃতির বিকাশপদ্ধতি আমাদের অনুসন্ধেয়।

প্রত্যক্ষপর জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন, অপ্রাণ জড়প্রকৃতির ন্যায় সপ্রাণ জৈব প্রকৃতির ক্রমবিকাশও নৈহারীক সিদ্ধান্তের সদৃশ দৃষ্ট হয়। বিশ্বের ক্রমবিকাশে প্রথমে অপ্রাণ জড়জগতের এবং পরে সপ্রাণ জৈব জগতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। জৈব জগৎ আবার স্থাবর-জঙ্গম-ভেদে দ্বিধা বিভক্ত। দর্শন, পরীক্ষা ও

অনুমানসহায়ে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিশ্বকার্য্যের আদিতে অপ্রাণ জড়-রাজ্যের, মধ্যে সপ্রাণ স্থাবরের—উদ্ভিদের এবং অন্তে জঙ্গম বা জীব-জগতের যথাক্রমে পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা জৈব প্রকৃতির ক্রমবিকাশ যে নৈহারীক সিদ্ধান্তের অনুরূপ হইবে, তৎপ্রমাণাবসরে পণ্ডিতেরা প্রাণপঙ্কের স্বরূপাবলোকন করিতে বলেন। প্রাণপঙ্কই তাঁহাদের মতে জৈব রাজ্যের মূল প্রসূতি। উহা হইতেই স্থাবরজঙ্গমাদি বিবিধ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। ক্রমবিকাশবাদীরা অনুমান করেন, সমস্তাৎ-ব্যাপ্ত সর্ব্বত্র সমানধর্ম্মাত্মক প্রাণপঙ্কই, বিশ্বপ্রাণের মূলীভূত নীহারসংঘাতস্বরূপ।

পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, প্রাণপঙ্কনামক সপ্রাণ পদার্থ কর্ম্ম-নিরপেক্ষ জড়-রেণুসমূহের রাসায়নিক সংযোগসন্নিবেশে সঞ্জাত। কোন এক বিশেষ বিচিত্র ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া জড়রেণুসমূহ পক্ষিডিম্বান্তর্গত লালাবৎ অর্দ্ধতরল প্রাণ-পঙ্কাখ্য সপ্রাণ পদার্থ সমুৎপন্ন করে। এখন অপ্রাণ জড়রেণুসম্মিলনে উৎপন্ন যথোক্ত প্রাণপঙ্ককে সপ্রাণ বলিবার হেতু কি? অপি চ 'সপ্রাণ' কাহাকে বলে? পণ্ডিতেরা বলেন, যাহাতে প্রাণশক্তি বিদ্যমান, তাহাকেই সপ্রাণ বলে। অপ্রাণ জড়রেণু হইতে সমুৎপন্ন প্রাণপঙ্ককে সপ্রাণ বলিবার কারণ এই যে, এতৎপদার্থে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব অনুভব হয়। শক্তির তাত্ত্বিক স্বরূপজ্ঞান পরোক্ষপ্রমাণ-সাপেক্ষ। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন, স্থূল দৃষ্টিতে শক্তি যথাযথভাবে প্রত্যক্ষীভূত করা যায় না—ক্রিয়া দ্বারাই তাহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়। ক্রিয়াই শক্তির পরিচায়ক। প্রাণশক্তি প্রাণন-ক্রিয়ার দ্বারাই স্বীয় অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। প্রাণপঙ্কের স্বরূপাবলোকনে বেশ বুঝা যায় যে, ইহাতে প্রাণনক্রিয়া আছে। প্রাণপঙ্কে প্রত্যক্ষীভূত প্রাণস্পন্দনরূপ ব্যাপারই এতৎ-পদার্থে প্রাণশক্তির বিদ্যমানতার পরিচায়ক।

প্রাণনক্রিয়া কাহাকে বলে, সপ্রাণ পদার্থের লক্ষণ কি?

শারীরকার্য্যতত্ত্ববিদেরা সপ্রাণ পদার্থের লক্ষণ নির্দ্দেশকালে বলিয়াছেন,—The essential feature of living matter is its instability; it is the seat of chemical changes collectively termed *metabolism.* These changes are divisible into (1) constructive, integrative or synthetic process in the course of which non-living matter is annexed or assimilated by living matter; (2) destructive, dis-intigrative, katabolic

or analytic process in the course of which living matter or storage substances are expended. (Vide Introduction to Human Phisiology by A D. Walter M. D. p 1)—অর্থাৎ সপ্রাণ পদার্থ নিয়তই অস্থির বা পরিবর্ত্তনশীল, ইহা প্রাণনক্রিয়া (metabolism) নামান্তর্গত বিবিধ রাসায়নিক পরিণামের আশ্রয়স্বরূপ। ঐ পরিণামসমূহ স্থূলতঃ, আহরণ ও বিসর্জ্জন ভেদে দ্বিবিধ। আহরণপ্রক্রিয়া আবার সংবিধানাত্মিকা, সংপূরণাত্মিকা বা সংশ্লেষণাত্মিকা সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে এবং বিসর্জ্জন-ব্যাপার বিশ্লেষণাত্মিকা, বিক্ষেপাত্মিকা বা অপক্ষয়াত্মিকা নামে আখ্যাত হয়। আহরণাদি প্রক্রিয়া দ্বারা সপ্রাণ পদার্থ, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অপ্রাণ পদার্থ হইতে প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ সংগ্রহন পূর্ব্বক আপন অভ্যন্তরে পরিপাকান্তর স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লয় এবং বিসর্জ্জনাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা উহা নিজাভ্যন্তরীণ পদার্থসমূহের ত্যজ্যাংশের পরিহার করিয়া সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিবার চেষ্টা করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বীয় সত্তাসংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধনোপায়স্বরূপ আহরণ-বিসর্জ্জনাত্মিকা ক্রিয়া ভেদে দ্বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়াই প্রাণনক্রিয়ার স্বরূপ এবং যে পদার্থে এই প্রাণন-ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, তাহাই সপ্রাণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

জড়প্রকৃতিতে আহরণ-বিসর্জ্জনাত্মিকা প্রাণন-ব্যাপার দৃষ্ট হয় না। অপ্রাণ অণুপরমাণুসংযোগে জড়দেহের কলেবর বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু এ বর্দ্ধন সজীব দেহের ন্যায় নহে। জড়প্রকৃতি ডিম্বান্তর্গত লালার ন্যায় অর্দ্ধতরলাবস্থায় বিদ্যমান থাকে না। ইহা হয় বায়বীয়, না হয় তরল, আর না হয় কঠিনাবস্থায় অবস্থান করে। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অণুপরমাণুসংযোগে ইহার কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও ইহা ভৌতিক রেণুসমূহকে আহরণান্তর নিজাভ্যন্তরে পরিপাক করিয়া স্বীয় দেহের পুষ্টি সাধন করে না, অথবা সজীব দেহের ন্যায় অপ্রয়োজনীয় ত্যজ্যাংশেরও পরিহার করে না। দেহের পুষ্টিসাধন নিমিত্ত আহরণবিসর্জ্জনাত্মক যে পূর্ব্বোক্ত প্রাণন-ব্যাপার, তাহা কেবল জৈব প্রকৃতিতেই দৃষ্ট হয়। কি উদ্ভিদ্-রাজ্যে, কি জীবজগতে—স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বদেহেই এই প্রাণন-ব্যাপার চলিয়া থাকে। এই জন্যই জৈব প্রকৃতি সপ্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দৃষ্টান্তস্থলে মানব-জাতিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মনুষ্য স্বীয় দেহের পুষ্টিসাধন নিমিত্ত চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সামগ্রী হইতে আপনার ভোজ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া পরিপাক করে এবং তদনন্তর আপনার অঙ্গীভূত ত্যজ্যাংশের যথাপ্রয়োজন পরিহার করিয়া থাকে।

সজীব উদ্ভিদ্‌রাজ্যও এতন্নিয়মাধীন। উদ্ভিদ্ মূলদ্বারা তরল পদার্থ ও পত্রদ্বারা বায়বীয় আহার গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং জীবপ্রকৃতি যে সপ্রাণ অর্থাৎ ইহাতে যে প্রাণশক্তি বিদ্যমান, তাহা স্বীকার্য। কিন্তু সকলেই অবগত আছেন যে, শক্তি যন্ত্রীভূত না হইলে কর্ম্মক্ষম হয় না। এই জন্যই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বদেহই বিবিধ বিচিত্র যন্ত্রময় দেখা যায়। বৃক্ষের মূল, শাখা, পত্র ও স্নায়ুবিতান এবং জীবের মস্তিষ্ক, হৃদয়, পাকাশয় ও স্নায়ু-বিতানের প্রত্যেকটিই এক একটি শারীর যন্ত্র। জৈব দেহে ঐ যন্ত্রগুলি আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা জালবৎ গ্রথিত। ঐ সূক্ষ্ম তন্তুসমূহকে ইংরাজীতে টিশু (tissue) বলে। দেহতত্ত্ববিদেরা এই তন্তুসমূহকে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহারা আবার কোষাখ্য (cells) সপ্রাণপদার্থ নির্ম্মিত। কোষনামক পদার্থেও প্রাণনক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। উক্ত কোষনামক পদার্থে নিঃস্রবণ, প্রজনন ও বর্দ্ধনশক্তি বিদ্যমান আছে। জৈব শরীর নির্ম্মাণার্থে কোষ স্বতঃই প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত হয়। পরে ঐ দুই ভাগের প্রত্যেকটিই আবার ঐরূপ বিভাগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রতি কোষের এইরূপ অবিরাম সংবিভাগ হইতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জৈব দেহের সৃষ্টি হয়। কারণ ঐ সংবি-ভক্ত কোষসমূহ যে পরস্পর বিচ্ছিন্নাবস্থায় অবস্থান করে, তাহা নহে; অবিরাম সংবিভাগপ্রাপ্ত কোষসমূহের অংশ সকল কোন 'অজ্ঞেয়' নিয়মানু-সারে পরস্পর মিলিত হইয়া বিচিত্র শারীর যন্ত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। শরীরতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সর্ব্বত্র সমানধর্ম্মাত্মক, অতীব সূক্ষ্মতম কণিকা-সমাকীর্ণ পূর্ব্বোক্ত প্রাণপঙ্কই কোষসমূহের অবয়বের উপাদান। প্রাণপঙ্কান্তর্ভূত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা বা রেণুসমূহ যে বীজাঙ্কুর (Nucleus) নামে শিক্ষিতসমাজে প্রসিদ্ধ ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সর্ব্বত্র সমানধর্ম্মাত্মক অতীব সূক্ষ্ম কণিকা-সমাকীর্ণ যথোক্ত প্রাণপঙ্ক সপ্রাণ পদার্থ। কারণ, উহাতে প্রাণন-ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয়। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জড়পদার্থ হইতে উহা আপনার ভোজ্য আহরণ করিয়া স্বীয় কলেবরের পুষ্টিসাধন করে এবং উহার অনুপযোগী অংশও পরিহার করিয়া থাকে। অতএব অনুমান করিতে হইবে, যখন যন্ত্রীভূত না হইলে কোন শক্তিই স্বীয় ক্ষমতাপ্রকাশে সক্ষম বা কার্য্যকরী হয় না, তখন নিশ্চয়ই প্রাণপঙ্কও প্রাণশক্তির ক্রিয়ার উপযোগী কোন সূক্ষ্ম বিচিত্র যন্ত্রবিশিষ্ট।

[ক্রমশঃ।

শঙ্কর-প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই বাটীটি দ্বিতল, এক্ষণে ইহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া যাউক। পাঁচ খানি ঘরের মধ্যে নীচের তলায় ১ খানি ঠাকুর ঘর, ১ খানি ছাত্রদিগকে পড়াইবার ঘর, এবং এক খানি ধ্যান ও আহ্নিক ক্রিয়ার ঘর আছে। এতদ্ব্যতীত একটী বৃহৎ হল-ঘরও আছে। উপরের দুইটী ঘরের একটীতে স্বামীজি থাকেন ও একটীতে এজেণ্ট থাকেন। উপরেও একটী বৃহৎ হল-গৃহ আছে, তথায় স্বামীজি লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমি একটী গোল লোহার সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া এই ঘরে আসিলাম। দেখিলাম, স্বামীজি একটী কাঠের অল্প উচ্চাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। আসনটী চেয়ার নহে, পিঁড়ি নহে বা ইংরাজী ধরণের কোন কিছু নহে। একটী ২ হাত চৌকা ৬ অঙ্গুল উচ্চ, বেশ বিটকাটা আসন; উহার পশ্চাৎভাগে বসিলে মাথা পর্য্যন্ত উচ্চ, একটী ২ হাত ব্যাসের অর্দ্ধ-গোলাকার তক্তা, কতকটা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশের মত ছোট দুইটি হাতোলের দ্বারা বসিবার স্থানের দুই পার্শ্বে সংলগ্ন করা। মোটের উপর সুদৃশ্য বটে। ঘরের মেজে বিলাতি মাটীর দ্বারা পালিস করা। দেয়ালগুলির প্রান্তদেশে সরল রেখা ও প্রতি কোণে পুষ্পগুচ্ছদ্বারা আজকালকার ধরণে চিত্রিত করা। খিলানের মাথায় নিজ গুরুদেবের ও মহীশূর-রাজের দুইখানি বৃহৎ তৈলচিত্র ব্যতীত আর কোন আস্‌বাব নাই। জানালা দরজা আজকালকার মত সারসী খড়খড়ি দেওয়া। সিঁড়ির ঘরে রঙ্গিন কাচের দ্বারা আটা একটী প্রমাণ জানালা, আধুনিক প্রবৃত্তির চরম চিহ্নের পরিচায়ক। চকিতের মধ্যে এই সব দেখিয়া স্বামীজির সন্নিহিত হইলাম। সেই অদ্বৈতাচার্য্য ব্রহ্মস্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধির নিকট আসিতেছি জানিয়া—সেই চিদানন্দরূপ শিবস্বরূপ শঙ্কর-শক্তি যাঁহাতে বর্ত্তমান, সেই মহাপুরুষের নিকট অগ্রসর হইতেছি ভাবিয়া—কখন মনে প্রশান্ত ও গম্ভীর ভাবের উদয় হইতেছিল, কখনবা আনন্দ ও ভক্তিস্রোতে ভাসিতেছিলাম। যাহা হউক, সন্নিহিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তর উপবেশন করিলাম। তখন আর গৃহের এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টি রহিল না। স্বামীজি সেই শঙ্কর-শক্তি-সম্পন্ন কিনা, মনটা যেন তাহাই দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া তাঁহার আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল। দেখিলাম—স্বামীজির মূর্ত্তিটী প্রিয়-দর্শন। বড় বড় চক্ষু, প্রশস্ত ললাট এবং দীর্ঘ ও উন্নত নাসা, একাগ্রতা

ও সরলতার পরিচায়ক এবং দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম। শরীরে কমনীয়তা ও শুষ্কতা উভয়ে মিশ্রিত হইয়া তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের কথা মনে উদয় করাইয়া দেয়। বাহু দুইটী একটু দীর্ঘাকার। অঙ্গুলিগুলিও দীর্ঘ ও ক্রমে সূক্ষ্ম হওয়াতে কল্পনা-শক্তির আধিক্যের পরিচয় দেয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী মহাপুরুষদিগের অঙ্গলক্ষণে উল্লিখিত তর্জ্জনীর মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়াছে। কররেখাও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর মনে নাই। স্বামীজির শ্যামবর্ণ, মুণ্ডিত মস্তক হইলেও এক মাসের মত কেশ বর্ত্তমান ছিল। বিভূতিলিপ্ত অঙ্গ হইলেও তাহা খুব স্পষ্ট নহে। কাশীর দণ্ডী সন্ন্যাসীর মত বস্ত্র পরিধান ও গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা ছিল, কিন্তু দণ্ড সেখানে ছিল না। স্বামীজির দেহ মধ্যমাকার এবং তিনি তখন স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট। ইত্যবকাশে পার্শ্বে এজেণ্ট মহোদয় উপ-বেশন করিয়া আমার পরিচয় দিলেন। স্বামীজি এজেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিলে উভয়ের সুবিধা হইবে। এজেণ্ট আমাকে ইংরাজিতে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম যে, আমি তাঁহাদের ভাষা বুঝি না, তবে সংস্কৃততে বলিলে বুঝিতে পারিব। স্বামীজি বলিলেন যে, হিন্দি তিনি বুঝিতে পারেন, কিন্তু বলিতে পারেন না। আমার সংস্কৃত বলা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং স্থির হইল—আমি হিন্দীতে প্রশ্ন করিব, এবং স্বামীজি সংস্কৃততে উত্তর দিবেন।

স্বামীজির সঙ্গে আমার প্রায় ২ ঘণ্টা কাল কথাবার্ত্তা হয়, আমি এই সুযোগে আচার্য্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের যত কথা পারিলাম, জানিয়া লইলাম। অদ্বৈত মতবাদে যেখানে যত সন্দেহ ছিল, সবই একে একে পাড়িলাম। এক কথায় সন্দেহের বিষয় কিছুই পরিত্যাগ করি নাই। পাঠকগণের বিদিতার্থ দুই একটী বিষয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রশ্ন। শঙ্কর-সম্প্রদায় কি শৈব?

উত্তরে স্বামীজি একটী শ্লোক বলিলেন, দুঃখের বিষয় শ্লোকটী লিখিয়া লই নাই। এখন বুঝিতেছি, শ্লোকটী লিখিয়া লওয়া উচিত ছিল। ইহার তাৎপর্য্য কিন্তু মনে আছে, তাহা এই—"আমরা শৈব বটে, কিন্তু শৈবগণানুমোদিত শৈব নহি; আমরা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু লোকে যাহারা বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত, তাহাদের মত বৈষ্ণব নহি। এই প্রকার অন্যান্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে।"

প্রশ্ন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লোকে তবে কেন এ সম্প্রদায়কে শৈব বলিয়া বিবেচনা করে?'

উত্তর। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, এই সম্প্রদায়ে অধিকাংশ লোকে জ্ঞান-লাভার্থ বাহ্য অনুষ্ঠানে শিবেরই পূজা অবলম্বন করে। শিব জ্ঞানদানে মুক্তহস্ত ও শীঘ্র সন্তুষ্ট হন বলিয়া, প্রথমাবস্থায় সাধক ইঁহাকেই আশ্রয় করিতে চাহে। বস্তুতঃ আচার্য্য এ সব ভাবের অতীত ছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলা উচিত যে, আচার্য্যের মত এ সবের বিরোধী নহে, অথচ এ সব মত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

অনন্তর আমি আচার্য্যের মতে ব্রহ্ম কিরূপ—এই বিষয়ের আলোচনা মানসে বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বন করিয়া যথাসাধ্য তর্কে প্রবৃত্ত হই। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সার নিষ্কর্ষ এই—ব্রহ্ম অদ্বৈত ও নির্ব্বিশেষ ও একমাত্র সত্য বস্তু। ব্রহ্মাতি-রিক্ত কোন কিছুই নাই। ইহাতে আমি এই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিচিত্র জগতের হেতুত্ব জন্য ব্রহ্মে বিশেষ স্বীকার করাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন যে, মানবের যতক্ষণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না, ততক্ষণ সে উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সহজে পারে না। গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে সমাধি অভ্যাস করিয়া লোক যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সন্দেহ দূর হইতে থাকে। ইহা তর্কের জিনিষ নহে, সাধনার জিনিষ। বুঝিবার জন্য লোকের "দৃষ্টান্ত" আবশ্যক হয় এবং তজ্জন্য ইহার দৃষ্টান্ত "ভ্রম"। ভ্রম যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কোন অভ্রান্ত ব্যক্তির উপদেশে সে ভ্রমটা নষ্ট হইলে, সেই বিষয়টা যেমন ভ্রম-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া লোকে বিবেচনা করে না, ব্রহ্মও তদ্রূপ জগৎ-ভ্রমের হেতুবিশিষ্ট বলিয়া কোন "বিশেষ" স্বীকার করা হয় না, কেবল ব্রহ্মই স্বীকার করা হয়। উক্ত "ভ্রমের" দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিয়া উহার সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গুরূপদেশ-ক্রমে ধ্যানানুষ্ঠান প্রয়োজন। ক্রমে সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ ঘটে। মোট কথা—স্বামীজি সাধনার দিকে বেশি ঝোঁক দিলেন এবং বলিলেন, তর্কের দ্বারা এ মতের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম মাত্র হয়; উপলব্ধি করিলে তবে সন্দেহ সমূলে নষ্ট হয়।

প্রশ্ন। বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত তবে কি ভুল?

উত্তরে স্বামীজি বলিলেন যে, অজ্ঞানীর নিকট বা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, পারমার্থিক দৃষ্টি আপন্ন জ্ঞানীর নিকট কিন্তু ইহা ভুল। এই স্থলে স্বামীজি শ্রুতির "অনন্ত" শব্দটী লইয়া একটু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বলিলেন যে, দেখ, অনন্ত মানে যাহার অন্ত নাই। আর এই অনন্ত যে কেবল ব্যাপ্তিবোধক, তাহা নহে; যত রকমে যত অর্থে অনন্ত শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে, সবই লইতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্য-মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

নানা জীবস্থিতি স্বীকার করা যায় না। সেই ব্যাপক চৈতন্য-মধ্যে যাহা থাকিবে, তাহাই তাহার ব্যাপকতার ব্যাঘাত করিবে, সুতরাং যাহা ব্যাপক, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে একাকার বা তদ্রূপ, তাহার ইতর-বিশেষ স্বীকার করা, আর অনন্তত্বের হানি করা, একই কথা।

এই সব বিষয়ে আমাদের নানা কথা হইয়াছিল, এস্থলে উহার আভাসমাত্র প্রদত্ত হইল। অনন্তর আচার্য্য শঙ্করের জীবনী, সময় ও মঠ সম্বন্ধে নানা কথা আরম্ভ হইল। তাহার সার মর্ম্মের বাহুল্য-ভয়ে জ্ঞাতব্য অংশ মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম—

(১) শঙ্করের আবির্ভাবকাল ১৪ বিক্রমাব্দ—ইহা ইঁহার পরমগুরু মঠের প্রাচীন কাগজপত্র হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। এতদনুসারে সুরেশ্বরের সময়ের সহিত শঙ্করের সময়ের ৮০০ শত বৎসর ব্যবধান হয়। তজ্জন্য সুরেশ্বর ৮০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, বলিতে হয়। এজন্য ইহা যে অভ্রান্ত সত্য, তাহা তিনি বলিতে প্রস্তুত নহেন। প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি "কিছুই পাওয়া যায় না" এই কথা বলিয়াছিলেন, পরে বিশেষ পীড়াপীড়িতে পূর্ব্বোক্ত কথা বলেন।

(২) শঙ্কর-জীবনী,—ইঁহারা মাধব-কৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয়কেই মান্য করেন। আনন্দ গিরি কৃত জীবনী খানি বা অপরাপর গ্রন্থ ইঁহারা সমাদর করেন না। ইনি বলিলেন যে, আনন্দ গিরির গ্রন্থখানি কাঞ্চীমঠের সংসৃষ্ট কোন অপ্রাচীন সন্ন্যাসী কৃত। মাধবাচার্য্য, আচার্য্যের বহু দিন পরে, আচার্য্য সম্বন্ধে নানাবিধ কাল্পনিক কথার উৎপত্তি হইতেছে দেখিয়া, পদ্মপাদ-কৃত প্রাচীন শঙ্কর-বিজয় হইতে ও গুরুপরম্পরায় আগত প্রবাদ হইতে উক্ত দিগ্বিজয় খানি সঙ্কলন করেন। কাঞ্চী মঠ কোন সময়ে শৃঙ্গেরী মঠের প্রভুত্ব খ্যাপন মানসে, মাধবাচার্য্যের অনুকরণে অন্য একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাই আনন্দ গিরি বা অনন্তানন্দ গিরি কৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয়। প্রাচীন শঙ্কর-বিজয় আনন্দ গিরির নহে, উহা পদ্মপাদ-কৃত। উক্ত গ্রন্থ মঠে আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বে ছিল বটে, এখন নাই। উহা অতি বৃহৎ ও শঙ্করের সহিত অপরের নানাবিধ তর্ক-কথায় এবং দৈনন্দিন ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল। মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ হইলে পর উহার আর নকল করান হয় নাই এবং ইঁহার বাল্যকালে যখন ইনি ১০।১২ বৎসরের জন্য মঠ ত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বাহির্গত হইয়াছিলেন, তখন অনেক গ্রন্থ পোকায় কাটিয়া ফেলে এবং ফিরিয়া আসিয়া নষ্ট গ্রন্থ প্রায় ৫।৭ গাড়ি তুঙ্গা নদীর জলে ফেলিয়া দিতে বাধ্য হন। ইঁহার বিশ্বাস, সেই

সময়ে সেই গ্রন্থখানিও গিয়াছে। তবে আমাকে পুরীর গোবর্দ্ধন মঠে অন্বেষণ করিতে বলিলেন। অবশ্য সেখানে যে নাই, তাহা আমিই তাঁহাকে জানাইলাম।

অনন্তর শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করি। উদ্দেশ্য আমার—ইহার ভিতর কোন তান্ত্রিকতা কোনরূপে আছে কি না। স্বামীজির উত্তরে বুঝিলাম, ইঁহারা তান্ত্রিক নহেন। ইঁহাদের পথের নাম দক্ষিণ মার্গ। তান্ত্রিকেরা বামমার্গী, ইঁহারা সে পথের পথিক নহেন। বেদোক্ত বিধানি ইঁহাদের গ্রাহ্য। অবশ্য তাই বলিয়া যে তান্ত্রিকদিগের মত ইঁহাদের কিছু গুপ্ত সাধনা নাই, তাহা নহে। সেগুলি অবশ্য আমি জানিতে পারিলাম না—অনুগত শিষ্য না হইলে তাহা আর জানিবার উপায় নাই।

ইঁহারা সন্ন্যাসী হইলেও গৃহস্থকে মন্ত্র দেন এবং সন্ন্যাসপ্রার্থিগণকেও সন্ন্যাস দিয়া থাকেন। ইঁহারা সরস্বতীসম্প্রদায়-ভুক্ত; সুতরাং ইঁহার শিষ্য হইলে সরস্বতী পদবী পান।

অতঃপর নানা কথার পর আমি বিদায়গ্রহণোদ্যত হইলাম। স্বামীজির ইচ্ছা যে, আমি আরও দুই চারি দিন থাকি, কিন্তু প্লেগে নগরী জনশূন্য বলিয়া আমি থাকিতে অসম্মত হইলাম। স্বামীজীও তাহাতে আর অনুরোধ করিলেন না, এবং এজেণ্টকে বলিয়া দিলেন যে, আমি মঠ সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতে চাহি, সমস্ত যেন আমাকে জানিতে দেওয়া হয়। তাহার পর চাউলে জাফরান ও আবিরের মত লাল একপ্রকার গুঁড়া মাখান কি এক দ্রব্যের দ্বারা আমায় খুব মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আমিও উহা শিরে ধারণ করিয়া পুনরায় প্রণিপাত পূর্ব্বক বিদায় লইয়া এজেণ্টের সহিত তাঁহার কাছারী গৃহে আসিলাম এবং খাতা ও কলম বাহির করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদায় লিপিবদ্ধ করিবার আয়োজন করিলাম।

ক্রমশঃ।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

এম্পিডক্লিস্ (Empedocles)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীউপেন্দ্রনাথ মোদক বি,এ।

দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টায় বহুবিধ মতবাদের উৎপত্তি হয়। ঐগুলি পরস্পর পৃথক্ হইলেও মোটামুটী দুইটী সম্পূর্ণ বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ঐরূপ করিলে শ্রেণীবিভাগের যে কড়া নিয়ম আছে, তাহা যথাযথ পালিত না হইতে পারে; কিন্তু মোটের উপর মতগুলির প্রধান চিন্তাসূত্র বেশ সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং উহাতে সাধারণের বুঝিবার পক্ষেও বেশ একটা সুবিধা হয়। কারণ, যাঁহারা নিজে কোনও বিশেষ মত গড়িয়া তোলেন, পদে পদে শত বাধা আপত্তি অতিক্রম করিবার শ্রম তাঁহাদের না করিলে চলে না, কাজেই তাঁহাদের নিকট নিজ নিজ মতের অতি ক্ষুদ্র অংশ সকলও একটা অনাবশ্যক গুরুত্ব লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু কোনও মতের খুটীনাটীগুলি মতকর্ত্তার যতই প্রিয় হউক না কেন, সাধারণে তাঁহার মীমাংসাটুকু জানিবার জন্তই উৎসুক হয় এবং ঐ মতের মূল চিন্তাধারাটা কিরূপ ইহা জানিয়াই লোকে সন্তুষ্ট থাকে। সেজন্য বিশেষরূপে শ্রেণীবিভাগ করা না থাকিলেও লোকে তাহাদের সহজ বুদ্ধি দ্বারা ক্রমে সে কার্য্য নিজেরাই সারিয়া লয়। তবে কিছুকালের জন্ত লোকে নিজ নিজ প্রকৃতি ও বুদ্ধি অনুসারে প্রধানতঃ দুই বিরোধী শ্রেণীর মতবাদের মধ্যে সকল মতবাদকে স্থান দিয়া আপনাদিগের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করে। আবার কোনও মতই ত আর *সর্ব্বাংশে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ* হইতে পারে না। কারণ, সকল মতই বুদ্ধিপ্রসূত এবং বুদ্ধি যদি কোনও এক ক্ষেত্রে সত্য নির্দ্ধারণে একেবারেই অক্ষম হয়, তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই তাহার উপর ঐরূপ সন্দেহ করিবার কোনও আটক থাকে না এবং সকল মতই তাহা হইলে ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে। সেজন্ত সকল মতেই যে কিছু না কিছু সত্য আছে, তাহা মানিয়া লইতেই হয়। সেইরূপ আবার তাহাতে যে যথেষ্ট ভ্রমপ্রমাদের সংমিশ্রণ আছে, সে বিষয়েও সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু শোধন করিবার জন্ত চিনি পাকে চড়াইলে যেমন ময়লা মাটি-গুলা আপনিই উপরে ভাসিয়া উঠে, সেইরূপে মতবিশেষ যখন সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণাত্মিকা বুদ্ধিসমক্ষে পরীক্ষিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন মিথ্যার আবর্জ্জনারাশি আপনিই পৃথক্ হইয়া পড়ে, উহা আর আপনাকে

ঐ মতবিশেষান্তর্গত সত্যের অঙ্গীভূত করিয়া রাখিতে পারে না। অতএব নিজ সম্প্রদায়ের তাৎকালিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার অন্ধ উত্তেজনায় ভ্রমপ্রমাদ অতর্কিতে সত্যের দলে ভিড়িয়া পড়িলেও সত্য আপনার মহিমাচ্ছটায় সে সমুদয় অপনোদন করিয়া একদিন না একদিন মিথ্যাকে লাঞ্ছিত করিয়াই থাকে। এইরূপে দলপোষণের মোহকে অভিভূত করিয়া সত্যানুরাগ যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তখন আর লোকে বিরোধী শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন একটী মতবিশেষকে অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তখন বিরোধী মত সকলের সত্যাংশটুকু নিষ্কর্ষণ করিয়া নূতন এক মত গড়িবার চেষ্টা করা হয়। এইরূপে বিভিন্ন মত সকলের সত্যাংশসমূহকে একত্র জোড়া দিবার চেষ্টাকে মত-সমন্বয় বলা হয়। এম্পিডক্লিস্ ঐরূপ সমন্বয়বাদী ছিলেন। যখন পাইথাগোরীয়, ইলিয়্যাটিক্ ও হের্যাক্লাইটীয় মতবাদ সকল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা লোকের বুদ্ধিচাঞ্চল্য ঘটাইতেছিল, এম্পিডক্লিস্ তখন আসিয়া মত-সমন্বয়ে মনোযোগী হইলেন।

ইলিয়াটিক্‌গণ বলিয়াছিলেন—অস্তিই আছে, নাস্তি নাই, সেই অস্তি বা সৎপদার্থ অনাদি ও অনন্ত। পরিবর্ত্তন ও বিনাশ সেই সৎপদার্থের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অতএব উহার পরিবর্ত্তন বা বিনাশও নাই। এম্পিডক্লিস এই সত্যগুলি একরূপ মানিয়াই লইয়াছিলেন। পারমেনাইডিস্ ঐ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এম্পিডক্লিস্ সেইগুলি অবিকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজে ত কোনও নূতন প্রমাণই বাহির করেন নাই, পরন্তু পারমেনাইডিসের কথাগুলি পর্য্যন্ত অনেক স্থলে অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। আবার পক্ষান্তরে হেরাক্লাইটাস্‌ও যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, যথা—পরিণাম, পরিবর্ত্তন মিথ্যা নহে—বরং তাহাই কেবলমাত্র সত্য, অতএব জগতের বহুধা বৈচিত্র্যও সত্য—এম্পিডক্লিস্ সে কথাও একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, এই উভয়বিধ ভাবের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে গেলে পারমেনাইডিসের সৎপদার্থের লক্ষণাক্রান্ত বহু সৎপদার্থ মানিতে হয়, শুধু তাহাই নহে, ইন্দ্রিয়গোচর এই জাগতিক পরিণাম পরিবর্ত্তনের মীমাংসার জন্য আবার ঐ বহু সৎপদার্থের দেশগত পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হয়। যদিও আইওনীয় দার্শনিকগণ, কোন এক আদি ভৌতিক সত্তাবিশেষের রূপান্তর ও অবস্থান্তরের দ্বারা জগতের বৈচিত্র্য ও বহুত্ব সম্পাদিত হয় এবং উহাতে সেই আদিভূতের গুণগত পরিবর্ত্তন হয় এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেন, তথাপি এম্পিডক্লিস্, পারমেনাইডিস কৃত সৎপদার্থের লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজ মতভুক্ত বহু সৎপদার্থের

গুণগত পরিবর্ত্তন অসম্ভব স্থির করিলেন। আবার অপর দিকে হেরাক্লাইটাসের সহিত একমত হইয়া জগতে বহুধা বৈচিত্র্যের সত্তা মানিয়া লইয়া, উল্লিখিত সৎ-পদার্থগুলির এরূপ পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলেন, যাহাতে উহাদের প্রকৃত সত্তা বা সারাংশ অবিকৃত ও অপরিবর্ত্তিত রহিয়া যায়। এখন কি প্রকারের পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলে সৎপদার্থ সকল মূলতঃ অবিকৃত থাকিবে? এম্পিডক্লিস্ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কেবলমাত্র দেশগত পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলেই উহা সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে দেখা যায় যে, ইলিয়াটিক্গণের সহিত একমত হইয়া এম্পিডক্লিস্ স্থির করিলেন যে, সৎপদার্থ (মূলতঃ) অপরিবর্ত্তনীয়, আবার হেরাক্লাইটাসের মত অনুসরণ করিয়া ইলিয়াটিক্দিগের মতের বিরুদ্ধে স্বীকার করিলেন যে, নানাত্ব ও পরিণাম মিথ্যা কল্পনা নহে, সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি হেরাক্লাইটাসের মতও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন না। কারণ, হেরাক্লাইটাস্ যেমন পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিত্যের, চঞ্চলের মধ্যে ধ্রুবের অস্তিত্ব আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, তিনি ততদূর অগ্রসর হইতেন না। এম্পিডক্লিস্ যে পরিবর্ত্তনের স্থায়ী আশ্রয়স্বরূপ বহু সৎপদার্থ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা হেরাক্লাইটাসের প্রচারিত মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দার্শনিকগণের মতের সহিত ভাল করিয়া তুলনা করিয়া দেখিলে এম্পিডক্লিসের দর্শনের সার্থকতা প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ঐরূপ আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কিরূপে তিনি প্রচলিত বহু প্রতিদ্বন্দ্বী মতের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আর সে সময়ে পাশ্চাত্য জগতে এই প্রকার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন কেবল এম্পিডক্লিসের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি প্রচলিত দার্শনিক মত সকল এত সুন্দরভাবে জানিতেন যে, সকল সম্প্রদায়ই তাঁহাকে আপনাদিগের দলভুক্ত মনে করিত। তিনি যে পাইথাগোরীয় দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁহার আবির্ভাব-সময় অনেক পরে বলিয়া তাঁহাকে পাইথাগোরাসের শিষ্য বলিয়া ঘোষণা করা না যাইলেও অনেক আধুনিক পণ্ডিতেরা তাঁহাকে একজন পাইথাগোরীয় বলিয়া অভিহিত করেন। অপর পণ্ডিতেরা, তিনি পারমেনাইডিসের শিষ্য ছিলেন বলিয়া যে কিংবদন্তী আছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে ইলিয়াটিক্ বলিয়া বর্ণনা করেন। আবার অ্যারিষ্টটলের মতানুসরণ করিয়া অধিকাংশ পণ্ডিতেরা স্থির করেন যে, তিনি একজন ভৌতিককারণবাদী ছিলেন। তিনি সিসিলি দ্বীপের (Sicily) এক্রাগাস্ (Akragas) নগরে

কোনও এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন (৪৯২-৩২ খ্রীঃ পূঃ)। তাঁহার পিতা স্বদেশে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন (৪৭০ খ্রীঃ পূঃ)। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সিসিলিতে যখন পুরাতন রাজবংশীয়গণ পুনরায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাধারণতন্ত্রের দলভুক্ত হন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই সহায়তায় জনসাধারণের উহাদের উপর আবার জয়লাভ হয়। ঐ বিজয়লাভের পর প্রজাসাধারণ যখন তাঁহাকেই রাজপদে বরণ করিবার উদ্যোগ করে, তখন তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া অতি মহৎ ও নিঃস্বার্থ হৃদয়ের পরিচয় দেন। যিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরূপ ভাবে প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান যুগের ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি স্বদেশপ্রাণ পুরুষপ্রধানগণের পূজার্হ হইয়াছিলেন, তিনি যে, দার্শনিক জগতে প্রত্যেক স্বাধীন চিন্তার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী মত সকলের বিরোধভঞ্জনে যত্নবান হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি একাধারে দার্শনিক, পুরোহিত, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ্ এবং বক্তা ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি অলৌকিক যোগশক্তিরও কথঞ্চিৎ অধিকারী ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। অ্যারিষ্টটল্ বলেন যে, তিনিই ইউরোপে অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণের ভক্তি এরূপ চঞ্চল যে, এই উদারচেতা অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের প্রতি তাহারা অধিক দিন শ্রদ্ধাবান্ রহিল না। তাহারা পূর্ব্ব উপকার বিস্মৃত হইল এবং তাঁহার শত্রুদিগের মন্ত্রণায় তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে বাধ্য করিল। ইহার পর তিনি আমরণ বিদেশেই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে এরূপ পরস্পর বিসম্বাদী ও অদ্ভুত কাহিনী সকল প্রচলিত আছে যে, লোকে তাঁহাকে যে কতদূর শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমরা উহাদের একটী মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। ঐ কিম্বদন্তী বলে যে, তাঁহার যশৈষণা ও আত্মম্ভরিতা এত প্রবল ছিল যে, তিনি লোকের অজ্ঞাতসারে জগৎ হইতে অপসৃত হইতে পারিলে জনসাধারণে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিবে—এই আশায় অলক্ষিতভাবে এক আগ্নেযগিরির গহ্বর মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু দেবপদ গ্রহণে একান্ত প্রয়াসী এম্পিডক্লিসের এমনি গ্রহবৈগুণ্য যে, আগ্নেয়গিরি তাঁহাকে জঠর-মধ্যে স্থান দান করিলেও তাঁহার ধাতুনির্ম্মিত পাদুকাকে তন্মধ্যে স্থান দান করিল না। অগ্ন্যুৎপাতকালে তাহা সাধারণের নয়ন-সমক্ষে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং সাহিত্যের

কৃপায় তাঁহার এই অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রতিভাশালী ব্যক্তির অপূর্ব্ব দুরাকাঙ্ক্ষার উপহাসাস্পদ উদাহরণ হইয়া ধরাধামে চিরকালের জন্য পরিচিত রহিল। উক্ত ঘটনার অন্যরূপ ব্যাখ্যা এই যে, তিনি আগ্নেয়গিরি বিষয়ক কয়েকটী তত্ত্ব অনুসন্ধানকালে তাহার গহ্বর-মধ্যে নিপতিত হন এবং ঐরূপ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হন।

এম্পিডক্লিসের মতে উৎপত্তি ও বিনাশ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। যাহা কোন কালে ছিল না, তাহা হইতে পারে না ; যাহা আছে, তাহারও ধ্বংস নাই। আমরা যাহাকে উৎপত্তি ও বিনাশ বলিয়া মনে করি, তাহা কতকগুলি সৎপদার্থের সংযোগ ও বিয়োগে সমুৎপন্ন হয়। এই সৎপদার্থ আবার চারি ভাগে বিভক্ত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ। ইহাদিগকে জাগতিক পদার্থনিচয়ের মূল উপাদান (material "roots") বলা হয়। আমরা জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাই, তৎসমুদয় এই ভূত-চতুষ্টয়ের কণাগুলির সংযোগ ও বিয়োগে উৎপন্ন। কিন্তু ভূতসমূহের সংযোগ-বিয়োগে উৎপন্ন বলিলে ত জগতের একদেশী মীমাংসা হইল মাত্র। জগৎপ্রণালীর সম্যক্‌রূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে শুধু উপাদান-কারণের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। কোন্ নিমিত্ত কারণের শক্তিতে উপাদান কার্য্যরূপে পরিণত হইতেছে, তাহাও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। ভূতকণা সকল কোন্ শক্তিবলে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়, তাহা না বলিলে কার্য্যকারণশৃঙ্খলাটা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না এবং পরিবর্ত্তনপরম্পরাই যখন ব্যাখ্যার বিষয়, তখন বিশেষভাবে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের নিরবচ্ছিন্নতাই ভাল করিয়া দেখান উচিত। এ প্রশ্নের সুমীমাংসা চাই। আইওনীয় দার্শনিকেরা একবার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, আদিভৌতিক সত্তার মধ্যে শক্তি নিহিত আছে ; সেই শক্তি ঐ ভৌতিক সত্তার বিবিধ বিকার ও পরিণাম ঘটাইতেছে। তাহাতেই জগতের উৎপত্তি। কিন্তু পারমেনাইডিসের লক্ষণাক্রান্ত সৎপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এম্পিডক্লিস্ ওরূপ সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। কারণ, পারমেনাইডিসের মত অনুসারে যদি স্বীকার করা যায় যে, সৎপদার্থ অপরিণামী, তাহা হইলে আবার আইওনীয়দিগের মত বলা চলে না যে, অন্তর্নিহিত শক্তির বলে সেই সৎপদার্থ বিপরিণমিত হইতেছে। কিন্তু আবার পরিণাম পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব বাঁচাইয়া না চলিলে যখন এম্পিডক্লিসের দর্শন নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং যখন সৎপদার্থকেও (মূলতঃ) অপরিবর্ত্তনীয় রাখিতেই হইবে, তখন সৎপদার্থগুলির দেশগত ভিন্ন অন্য কোনও রূপ পরিবর্ত্তন মানা চলে না এবং ঐ দেশগত পরিবর্ত্তনের কারণস্বরূপ সৎপদার্থাতিরিক্ত কোনও

বিশেষ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অই এম্পিডক্লিস্ বলেন যে, চারি প্রকার ভূতকণা ছাড়া সংযোগ ও বিয়োগের কারণীভূত 'প্রীতি' ও 'অপ্রীতি' নামক (Love and Hate দুই শক্তি আছে। তাঁহার এই মত আধুনিক রসায়নশাস্ত্র-বর্ণিত আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নামক শক্তিদ্বয়ের আভাস বলিয়া মনে হয়। এইরূপে পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে এম্পিডক্লিস্ই সর্ব্বপ্রথম বস্তু ও শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু এ যুগল শক্তি কল্পনা করিবার কোনও বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। একটীতেই কায চলিতে পারিত। কারণ, অ্যারিষ্টট্ল্ বলিয়াছিলেন—যেহেতু প্রত্যেক নূতন সংযোগ আর কিছুই নহে কেবল পূর্ব্ব সংযোগের বিয়োগ মাত্র, সেজন্য শক্তিকে দুইভাগে ভাগ না করিলেও চলিত।

তাহা হইলে মোটের উপর দাঁড়াইতেছে এই যে, জগৎ রচনার জন্য চার রকম ভূতকণা ও দুই রকম শক্তি আবশ্যক। ঐ চারি প্রকার ভূতকণা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র, এক হইতে অপরের উৎপত্তি হইতে পারে না। সর্ব্ব-প্রথম ঐ ভূতকণাসমষ্টির উপর 'প্রীতি' শক্তির একাধিপত্য ছিল, পরে 'অপ্রীতি' বলবান্ হইয়া 'প্রীতি'কে অভিভূত করিয়া ফেলিল এবং ইহাতেই জগতের সূত্রপাত হইল। 'অপ্রীতি' আবার যখন আপন শক্তিপ্রভাবে ভূতকণা সকলের মধ্যে চরম বিচ্ছেদ ঘটাইল, তখন আবার 'প্রীতি' আসিয়া 'অপ্রীতিকে' পরাভূত করিল এবং ভূত-চতুষ্টয়কে এক অতি নিবিড় মিলনের বন্ধনে বর্ত্তুলাকারে জমাট বাঁধিয়া তুলিল। এইরূপে ঐ শক্তিদ্বয় পর্য্যায়ক্রমে প্রভাবশালী হইয়া জগৎ সৃষ্টি ও লয় করিতেছে। সৃষ্টির প্রথম উদ্যমেই মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। প্রথমে গাছপালা ও তৎপরে জীবজন্তু সৃষ্ট হইয়াছিল। উহাদের বিভিন্ন অংশ সকল ও মনুষ্যের বেলা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রথমে উৎপন্ন হয়, পরে 'প্রীতি' বশে ঐগুলি যথাবিন্যস্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিভিন্ন অংশগুলির ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অযথা বিন্যাসেরও কোন আটক ছিল না, সেজন্য অনেক উদ্ভিদ্ ও প্রাণী বিপরীত আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি আপনাদের প্রতিকৃতি রাখিয়া যাইতে অক্ষম হইয়াছিল বলিয়া এই ধরাধাম হইতে লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু একবার যখন মানুষ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইল, তখন আমাদের পরিচিত উপায়ে প্রজনন-ক্রিয়া চলিতে লাগিল।

মানুষ চারিপ্রকার ভূতকণার সংঘাতে উৎপন্ন। কঠিন ক্ষিতি হইতে তাহার দেহের কঠিন অংশ, তরল জল হইতে তাহার দেহের রসাংশ, মরুৎ হইতে

তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসাদি বায়বীয় অংশ ও তেজ হইতে আত্মা সমুদ্ভূত হয়। কিন্তু বিবিধ অবয়ব জোড়া দিয়া নির্ম্মিত বলিয়া মানুষ জন্মান্তর প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে যে অমরত্বের অধিকারী, তাহা নহে। মানবাত্মা অন্য সকল পদার্থের ন্যায় বিনাশশীল, একথা আমাদের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও তো জন্মান্তরবাদী হইয়াও আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন না।

মানুষের সকল পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে, যেহেতু সকল পদার্থের উপাদানীভূত যে ভূত-চতুষ্টয় তাহা তাহাতেও আছে। মানুষ সকল পদার্থ জানিতে পারে; কারণ, মানুষ সকল পদার্থ নির্ম্মিত। সদৃশ পদার্থের যোগেই জ্ঞান লাভ হয়। সকল ইন্দ্রিয়জ্ঞানই বাহ্যবস্তু সকল হইতে নির্গত ভূতকণা ও আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন, কেবল চাক্ষুষ প্রত্যয়ের সময় আমাদের চক্ষু হইতে একরূপ ভূতকণা নির্গত হইয়া বাহ্যবস্তুর সহিত মিশ্রিত হয়।

এম্পিডক্লিস্ ঈশ্বর মানিতেন, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক মতের মধ্যে সে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই, সে কতকটা ব্যক্তিগত বিশ্বাস মাত্র।

ক্রমশঃ।

মধুর রস ও বৈষ্ণব কবিকুল।

[শ্রীযতীন্দ্রলাল বসু]

[অবতরণিকা।—ভক্তিপথ-প্রদর্শক আচার্য্যপ্রবরেরা বলেন, কোন না কোনরূপ ভাবাবলম্বনে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হইবে। নতুবা সাধ্য বস্তু বহুকল্পেও লাভ হইবে না। "সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে" ইত্যাদি (রামপ্রসাদ)।

যদি জিজ্ঞাসা কর—ভাব কি ও কাহাকে বলে? তদুত্তরে তাঁহারা বলেন—'ভাব' আর কিছুই নয়, 'সম্বন্ধ' বিশেষ। শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে, তবেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। এখন, মানবকে যদি শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে আসিয়া সে অপর সকল মানবের সহিত যে সকল সম্বন্ধে মিলিত হয়, তাহাই তাহার মনে স্বতঃ উদিত হয়। কিন্তু শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, লীলায় জগৎ-রচয়িতা অনাদি অনন্ত শ্রীভগবানে ঐসকল ক্ষুদ্র সম্বন্ধ বা মনোভাব আরোপ করিলে কি চলিবে? আবার ক্ষুদ্র মানব আমরা ঐরূপ করিলেও শ্রীভগবান্ কি ঐসকল সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া আমাদের

সহিত ঐরূপ ভাব বিনিময় করিবেন—আমাদের সহিত আমাদের মত একজন হইয়া মিলিবেন? নারদাদি মহাপুরুষেরা বলেন—নিশ্চয়; ভাবরূপ হীমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগর জমিয়া খণ্ডিত হইবেন, অনন্ত সান্ত হইবেন, অচল সচল হইবেন, অলিঙ্গ লিঙ্গবান্ এবং অরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ-ধারণ করিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। তবে, যে ভাবই অবলম্বন কর না কেন, উহা শুদ্ধ স্বচ্ছ রূপ ধারণ করা চাই; আর—"ভাবের ঘরে চুরি" যেন না থাকে; উহাতে তন্ময় হওয়া চাই।

ভক্তিশাস্ত্রকার সেজন্য যাহাই মানবমনে সু বা কু ভাবের উদয় করিয়া তাহাকে অপরের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া দেয়, তাহার একটিকেও গণনায় বহির্ভূত রাখেন নাই। তাহাদের প্রত্যেকটিকে অবলম্বন করিয়া যাহাতে মানব উন্নতির চরম সীমায় বা ভাবাতীত ভূমিতে উপস্থিত হইয়া ধন্য হইতে পারে, তাহাই আবিষ্কারে তাঁহারা যত্নবান হইয়াছেন। তবে ভাবাতীত ভূমির কথাটায় তাঁহারা তত জোর দেন নাই। কারণ, যখন ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে, মানব তখন তাহা স্বয়ংই উপলব্ধি করিবে। 'শারদোৎফুল্লমল্লিকা'-সংযুতা নিশিতে ব্রজবিপিনে মাধবধ্যানে নিমগ্না ব্রজগোপীকাকুল ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করিয়াছিলেন—শ্রীমদ্ভাগবতে—এ কথার উল্লেখ থাকিলেও উহাই যে জীবনোদ্দেশ্য বা ভাবের চরমোন্নতি, একথা স্পষ্ট বলা নাই।

এইরূপে মানবে মানবে যতপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে, সে সকল তন্ন তন্ন রূপে বিচার করিয়া তাঁহারা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ ভাবে সন্নিবেশিত দেখিয়া উহাদের শ্রীভগবানে আরোপ করিতে বলিয়াছেন। আবার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি গুণ-নিচয় যাহা মানবমনে নিত্য নানা কুভাবের উদয় করিয়া সংসারে ও সমাজে নানা বিপরীত বৈচিত্র আনয়ন করিতেছে, তাহাদিগকেও ত্যাগ না করিয়া তন্মধ্যগত শক্তিকে কৌশলে প্রয়োগ করিয়া বিচিত্র ব্যবহারে আনিতে উপদেশ করিয়াছেন। যদি জিজ্ঞাসা কর, সে কৌশল কি? তবে তাঁহারা বলেন, রিপু বলিয়া পরিচিত ঐ সকল শক্তিকে রূপ রসাদি বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইতে না দিয়া উহাদিগের মোড় ফিরাইয়া শ্রীভগবানের দিকে চালিত কর। তাঁহাকে লাভ করিবার কাম রাখ, এখনও লাভ হইল না বলিয়া ক্রোধ কর; আমি তাঁহার দাস তাঁহার পুত্র বলিয়া অহঙ্কার কর—ইত্যাদি। এই প্রকারে শ্রীভগবানকে অবলম্বন করিয়া, সকল ভাবের পরিপুষ্টি সাধন করাই তাঁহাদের উপদেশ। তাহা হইতে ভাব সকল আর অনর্থ উৎপাদন না করিয়া, মানবকে উন্নতি-পথেই অগ্রসর করিয়া দিবে—ভাবাতীত ভূমিতে আরূঢ় করাইবে।

শান্ত দাস্যাদি প্রধান ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটিকে ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণ 'রস' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং পঞ্চম ভাব বা মধুরভাবে পূর্ব্ব চারি ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিয়া উহাকেই শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন।

—উঃ সং।]

রসিক ভক্তগণ মধুর রসের প্রাধান্য সর্ব্বদা স্বীকার করিয়া থাকেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস তদীয় রাগাত্মিক পদাবলীর একটী পদে লিখিয়াছেন :—

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ?
সব রস সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥
কিশোরা কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন॥"

ভক্তপ্রবর রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রশ্নে কহিয়াছিলেন :—

"গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢে প্রতি রসে।
শান্তদাস্যসখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই গণনে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥" (১)

মাধবেন্দ্রপুরী কহিয়াছেন :—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মাধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্ আদ্য এব পরো রসঃ॥" (২)

রঘুপতি উপাধ্যায়ও মহাপ্রভুর প্রশ্নে এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। (৩)
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন :—

"তটস্থ হইযা মনে বিচার যদি করি।
সর্ব্ব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।" (৪)

---

(১) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—মধ্য—অষ্টম।
(২) পদ্যাবলী-ধৃত।
(৩) চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য—১৯শ।
(৪) চৈতন্যচরিতামৃত—আদি—৪র্থ।

ভক্তমাল-গ্রন্থপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লালদাস বাবাজী লিখিয়াছেন :—

"শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য শৃঙ্গার।
পঞ্চ মুখ্য মধ্যে যে শৃঙ্গার রস সার॥
সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ যে মধুর রস হয়।" (১)

নরোত্তম দাস :—

"বহু রস মধ্যে সপ্ত রস হয় সার।
এই সপ্ত রসে কৃষ্ণ করেন নিত্য বিহার॥
ইহার মধ্যে মূল এক রতি শ্রেষ্ঠ হয়।
রতি গাঢ় হইলে পরে রাগানুগা কয়॥" (২)

মুকুন্দরাম দাস :—

"তার দ্বারে মাধুর্য্য লীলা প্রেমের অকৈতব।
তাহার সাধনে হয় প্রেমের উদ্ভব॥
সেই রাগ উদ্ভব রতি রতি পরকাশ।
আর সব যত আছে তাহার আভাস॥
উজ্জ্বল মধুর রস তাহাতে উদিত॥" (৩)

এইরূপ ভক্তগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সেই মধুর রসের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা এখন আমাদের প্রয়োজন হইতেছে। প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি যে, বৈষ্ণব আচার্য্যগণ একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ রস হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করা সাধারণ জীবের সাধ্যায়ত্ত নয়, উহা এতই জটিল ও কঠিন। সেজন্য এ রসের তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি নিজের কথার বিরল ব্যবহার করিব।

মধুর রসের প্রকৃতি কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সর্ব্ব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর রস করি তার নাম।
স্বীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥

---

(১) শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ—২৩শ মালা।

(২) রাধা রসকারিকা।

(৩) অমৃত রত্নাবলী।

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধিকার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥" (১)

মধুর রসে ভগবান্‌কে পতিভাবে অথবা নায়কভাবে ভাবিতে হয়—প্রথমকে স্বকীয় ও শেষোক্তকে পরকীয় ভাব কহে। স্বকীয়ের সহিত একটু গুরুত্ব ভাব মিশ্রিত আছে। এইজন্য উহাতে সকল প্রকার উচ্চভাবের সমাবেশ থাকিলেও একটু প্রীতির সঙ্কোচ হয়, একটু ভয় আসিয়া দেখা দেয়—সেইজন্য মহিষীগণের প্রেম ও 'কেবলা'র ভিতর আসে না ; তাঁহাদের রতিও ঐশ্বর্য্যমিশ্রা। মহাপ্রভু উদাহরণ দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছিলেন। যথা—

"কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥" (২)

ব্রজের ভাব ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ ; এমন উল্লাস এমন উত্তেজনা আর কাহারও ভক্তির ভিতর পাওয়া যায় না। ব্রজগোপীগণ কেবল প্রেম দিতে চায়, ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদির উপেক্ষা করিয়া কেবল তাঁহার প্রেমময় প্রকৃতির আরাধনা করে। মহাপ্রভু কহিয়াছেন :—

"কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥" (৩)

পরকীয়ায় ভগবদাকর্ষণ অত্যন্ত বলবৎ ও স্বাদ অত্যন্ত অধিক, তাই মহাপ্রভু সনাতনকে কহিয়াছিলেন :— •

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নম্॥" (৪)

এবং তাই ব্রজগোপীগণ ভগবৎ-নিষেধও বুঝি মানিতে চাহে না? তাহারা তাঁহাকে চায়, তাঁহাকে হৃদয়েশ্বর করিয়া সমগ্র হৃদয় ঢালিয়া দিয়া ভালবাসিতে চায় ; সংসার তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, সংসারের সকল সম্পর্কের মূলোচ্ছেদ করিয়া

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদি—চতুর্থ।
(২) ঐ, মধ্য—১৯শ।
(৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য—১৯শ। (৪) চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য—১ম।

ভগবান্‌কে ভালবাসিতে চায়। তাই অহেতুক প্রেমাশে তাহারা ভগবানের নিষেধ তুচ্ছ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল :—

"যৎ পত্যপত্য সুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্ ॥
অস্ত্বেব মে তদুপদেশ পাদ ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥
কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্য প্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্ ॥
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যাঃ
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥
চিত্তং ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্য কৃত্যে ॥
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিম্বা ॥" (১)

এই গোপীগণের সমস্ত বৃত্তিনিচয় ভগবদর্পিত—সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত। তাহাদের মনে কৃষ্ণচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা আসে না, তাহাদের দেহ কৃষ্ণসেবা ভিন্ন অন্য কার্য্য করিতে চাহে না। এই যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিরহিত অবিমিশ্র অনন্ত প্রেম, ইহাতেই ভগবানের প্রীতি, ইহাতেই ভগবানের তৃপ্তি। তাই ভগবান্ গোপীদিগের সম্বন্ধে কহিয়াছেন :—

"ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব!
ন চ লক্ষ্মী র্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম ॥
ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে।
কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিকঃ প্রিয়তমো মম ॥
ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ!
ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদন্তি মাম্ ॥
ন তপোভি র্ন বেদৈশ্চ নাচারৈ র্ন চ বিদ্যয়া।
বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্না প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ ॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ! নান্যে জানন্তি মর্ম্মণি ॥

(১) শ্রীমদ্ভাগবতম্—দশম স্কন্ধঃ—২৯ অধ্যায়।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যঃ মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্‌॥ (১)

তাই পরমভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামী কহিয়াছেন :—

"ন চিত্রং প্রেমমাধুর্য্য-মাসাং বাঞ্ছেদ্‌ যদুদ্ধবঃ।
পাদরেণুক্ষিতম যেন তৃণজন্মাপি যাচ্যতে॥" (২)

ভগবান্‌কে এমন আপন করিবার উপায় আর কিছুই নাই, যেমন তাঁহাকে নায়ক ভাবে ভাবিলে হইতে পারে। এইজন্য গোপীভাবে ভজনা—ভক্ত বৈষ্ণবগণের কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এই প্রেমের আদর্শ স্থাপন জন্যই ভগবান্‌ বৃন্দাবনে মহারাসলীলা করিয়াছিলেন: এবং এই ভাবেই বৈষ্ণব কবি শ্রীকৃষ্ণলীলার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই প্রেমের *লক্ষণ—সর্ব্বস্বার্পণ, ভগবানে মন প্রাণ ও দেহের সম্পূর্ণ সমর্পণ, নিজের বলিবার যাহা কিছু আছে, তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন পূর্ব্বক সমগ্র দেহ মন দিয়া* ভগবানের প্রীতি সাধন—এরূপ ভক্তের আর কিছুই আপনার নাই। প্রসিদ্ধ লেখক চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "ভক্তের সবই ভগবানের, মনও ভগবানের, দেহও ভগবানের। তাই ভক্তের মনও ভগবানের পাদপদ্মে লুটায়, দেহও পাদপদ্মে লুটায়। ভক্ত ভগবান্‌কে বই আর কাহাকেও জানেন না। তাই তাঁহার যা কিছু আছে, সবই তিনি ভগবান্‌কে উৎসর্গ করেন।" (৩)

বৈষ্ণবদিগের সাধন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ "বিবর্ত্ত বিলাসে" লিখিত আছে :—

"মনে মনে রাজা হলে কেবা তারে জানে।
তৈছে মনে সেবা কৈলে কৃষ্ণ নাহি মানে॥
অতএব সাধু পাছে আছে এ বিধান।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা কভু নাহি আন॥" (৪)

তাই গোপিকারন্দ নায়কভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিযা তাঁহার কাছে সকল দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিল—এ দেহ সমপণ ইন্দ্রিয়তাড়নায় দেহ সমর্পণ নহে, অথবা এ রতিও প্রাকৃত রতি নহে; এ কামও প্রাকৃত কাম নহে। গোপীদিগের কৃষ্ণ-সম্ভোগ, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ—ভক্তের ভগবৎ-সম্ভোগ। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ভক্তি-

(১) লঘুভাগবতামৃত ধৃত আদিপুরাণবচনম্‌।

(২) লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতম্‌।

(৩) ত্রিধারা—ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা।

(৪) বিবর্ত্ত-বিলাস—৪র্থ বিলাস

যোগে লিখিয়াছেন :—ভক্তের প্রাণ এই ভাবকুসুমের সৌরভে পরিপূর্ণ হইলে উর্দ্ধে, অতি উর্দ্ধে, অত্যন্ত উর্দ্ধে, কাম-কুক্কুরের দৃষ্টির কোটী যোজন দূরে, যেখানে রজনী নাই, যেখানে পবিত্রতার বিমল বিভায় সমস্ত দিক্ আলোকিত, পাপপিশাচ যে স্থলের মোহিনী মাধুরী কল্পনাও করিতে পারে না, দিব্য ধামের সেই প্রমোদকুঞ্জে, অতি নিভৃতে, হৃদয়নাথ তাঁহার ভক্তকে

"রাতিদিন চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে,
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায়, সোয়াস্ত নাহিক পায়,
কত বা আরতি হিয়া মাঝে ॥" (১)

* * * * *

গোপীর এই প্রেম বড় পবিত্র, ইহাতে কামের গন্ধ মাত্র নাই। এই প্রেম বুঝাইতে ভাগবতাদি শাস্ত্রে 'কাম' কথা ব্যবহৃত দেখিয়া অনেকে মনে করেন, গোপীপ্রেমের গান কামের গান, কিন্তু সেটা তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রম। মহাপ্রভুও ভগবদনুরাগ সম্বন্ধে অনেকস্থলে 'কাম' এই কথার ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি প্রথম জগন্নাথ দর্শনে মধুর রসে বিভোর হইয়া বলিয়াছিলেন :—

"সোই পরাণনাথে পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ ॥" (২)

ইহাতেই এ কামের তাৎপর্য্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। তাই শ্রীল রামানন্দ রায় কহিয়াছেন :—

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপী নাম বর্জ্জ্য ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীর ক্রীড়া কামান্ধার ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণ নহে, প্রেমিকার

(১) বলরাম দাস।
(২) চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য—১৩শ

আত্মসমর্পণ। তাই গোপীর প্রেম কাম নহে, যথার্থ প্রেম। কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন :—

"কাম-গন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যৈছে দগ্ধ হেম॥" (১)

গোপীর মনের ভাব এই :—

"এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তার ধন তার এই সম্ভোগ কারণ॥" (২)

এমন উচ্চ ভাব যখন ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন আর ভক্তের মনে সংসারের চিন্তা থাকে না, কাজেই কামও থাকে না। কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন :—

কাম প্রেম দোহাঁকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আব কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীত ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীত ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয়ে প্রেম প্রবল॥
বেদধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম লোকধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্য পথ আর নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
নির্ম্মল বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥ (৩)

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত—আদি—৪র্থ।
(২) ঐ ঐ
(৩) ঐ ঐ

ইহাই ব্রজগোপীগণের প্রেম, এই প্রেমেই মধুর রসের সংস্থান। এই গোপীগণের ভিতর শ্রীরাধিকা সর্ব্বোত্তমা, যথা—

"সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥" (১)

আমরা এতক্ষণে বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তঃস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, কারণ, মধুর রসের সজীব প্রতিমূর্ত্তি—রাধা ও কৃষ্ণ। জগতে ভক্তি দুইবার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন—একবার বৃন্দাবনে তাঁহার নাম শ্রীরাধিকা, আর একবার সেই ভক্তির সজীব প্রতিমূর্ত্তির ক্রিয়াকলাপ বুঝাইবার জন্য সৌভাগ্যময় বঙ্গদেশে ভক্তি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তাঁহার নাম শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীভগবান্ ভক্তের সহিত যে লীলা প্রকটিত করিবার জন্য বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার মূলস্থিতি শ্রীরাধিকায়। "মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সহিত অভিন্না হইয়াও বৃন্দাবন লীলায় পৃথক্ মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা।" (২) তিনি কৃষ্ণ-শক্তির বিকাশ, জগৎকে ভক্তিতত্ত্ব শিখাইবার জন্য মূর্ত্তিগ্রাহিণী। তিনি ভক্ত মাত্র নহেন, তিনি স্বয়ং বিগ্রহবতী ভক্তি; ভগবানের আনন্দদায়িনী শক্তি, হ্লাদিনী, তিনি মহাভাবের সজীব মূর্ত্তি। তাঁহার প্রেম বুঝি মনুষ্যলোকের আর অধীন নহে, তাই ভক্তগণ শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমলীলা কীর্ত্তন করিয়া পবিত্র হন, সেই প্রেম অনুভব করিবার জন্য অশেষ সাধনা করেন ও তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার মহাভাবের কণামাত্র হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিয়া প্রেমানন্দে আত্মহারা হয়েন। স্বয়ং ভগবান্ও বুঝি রাধা-বিরহিত হইয়া শ্রীহীন হইয়া পড়েন; যথা ভগবদ্বাক্য :—

"কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতম পরম্॥" (৩)

প্রেমের যত অঙ্গ, যত বিকার, যত ভাব থাকিতে পারে, তত শ্রীরাধার প্রেমে বর্ত্তমান, তাহার উপরে ভক্তির যে সকল অত্যুচ্চ বিকাশ, তাহাও কেবল তাঁহাতেই আছে। এ সকল ভাব ভক্তির দ্বিতীয় অবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবনে আর

১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি—৪র্থ।

২ জগদীশ্বর গুপ্ত—চৈতন্যচরিতামৃতের উপক্রমণিকা।

৩ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৫শ অধ্যায়।

একবার দেখা দিয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। এখন আমাদের রাধা-তত্ত্ব আরও একটু বিস্তৃত ভাবে বুঝিবার আবশ্যক আছে. কারণ, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-গীতি কেবল এই তত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বোধ হয় বলা অনাবশ্যক যে, গোপীপ্রেম সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, গোপীপ্রধানা শ্রীরাধার প্রেম সম্বন্ধে সে সকলই খাটিবে। এখন যাহা কিছু বলিব, তাহা তদতিরিক্ত মাত্র। বৈষ্ণব কবির গান বুঝিতে হইলে রাধাতত্ত্বের সম্যক্ ধারণা অত্যাবশ্যক জ্ঞানে আমি বহুবিস্তৃতি-ভয় সত্ত্বেও এই তত্ত্বের সবিস্তার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব। সেই তত্ত্ব শ্রীশ্রী রায় রামানন্দ বিস্তার করিয়া বুঝাইয়াছেন, আমি তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

সচ্চিৎ আনন্দ ময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণেরে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিবার হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ॥ (১)

রাধার সকলি কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের প্রেম তাঁহার বেশ ভূষা, তাঁহার কলেবর :—

কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥ (২)

(১) চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম
(২) ঐ ঐ

তাঁহার কার্য্যঃ —

কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপানে।
নিরন্তর পূর্ণ করেন কৃষ্ণের সর্ব্বকামে॥ (১)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাধাপ্রেমেই মধুররসের পূর্ণতম বিকাশ। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়কশিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী"॥ (২)

শ্রীরাধার মহাভাব আয়ত্ত করা ভক্তগণের সাধ্যাতীত, তিনি স্বয়ং ভক্তি। তাই ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য চিন্তা করেন, উপভোগ করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা গান করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন এবং সেই অনন্ত গুণময়ী শ্রীরাধিকার চরণসেবার জন্য লালায়িত হয়েন। ইহারই নাম সখীভাব অথবা গোপীভাব। গোপীভাবে বা সখীভাবেই কৃষ্ণরাধার লীলা বুঝিবার উপায় আছে, অন্য কোনও রসে বা ভাবে নাই। ভক্তপ্রবর রায় রামানন্দ কহিয়াছেন :—

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদিভাবে না হয় গোচর॥
সবে একা সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥" (৩)

সখীর স্বভাব নিঃস্বার্থ, তাহা রায় রামানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ সুখ হৈতে তাতে কোটী সুখ পায়॥" (৪)

(১) চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম
(২) ঐ ঐ ২৩শ
(৩) ঐ ঐ ৮ম
(৪) ঐ ঐ ঐ

সখীর স্বরূপ :—

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা ॥ (১)

সখীর কাজ :—

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥
নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায।
আত্ম কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটী সুখ পায় ॥ (২)

সখী প্রেমের ফল :—

অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥ (৩)

তাই ভক্তগণ এই সখীভাবের পক্ষপাতী :—

"অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধ দেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥" (৪)

ইহাই মধুর রসের বিবরণ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ইহার আলম্বন, সখীগণ ইহার পোষক। এই তিন চরিত্র লইয়াই বৈষ্ণবকবির মধুর রসের চিত্রাবলী গঠিত। তাই সেই সকল গীত বড় পবিত্র। ভক্তপ্রবর রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রশ্নে উত্তর করিয়াছিলেন যে, রাধা-কৃষ্ণ-গীতই গীত, আর কোনও গীত গীত নহে। যথা :—

গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম।
রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কেলি যেই গীতের মর্ম্ম ॥ (৫)

মধুর রসের অন্তঃপ্রকৃতি নির্ণয় হইল। এইবার তাহার বাহ্যস্ফূর্ত্তির ক্রম নির্ণয় করা প্রয়োজন হইবে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে :—

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম।
(২) ঐ ঐ
(৩) ঐ ঐ
(৪) ঐ ঐ
(৫) ঐ ঐ

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়কশিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥

অতএব ইহা বলা অনাবশ্যক যে, প্রেমের যে সকল বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমেও প্রকাশ পায়। যে যে স্থলে ইহার বৈলক্ষণ্য আছে তাহা, যথা-স্থানে বলিব। ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধে প্রাকৃত প্রেমের সকল ভাবাদিই ব্যক্ত হয় এবং তদতিরিক্ত আরও অনেক গভীর ভাবও ব্যক্ত হয়। কিন্তু ইহাও আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে :—

* * কৃষ্ণের নাম দেহবিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥ (১)

এইটুকু মনে রাখিয়া আমরা মধুর রসের বাহ্য প্রকৃতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। মধুর রসের দুইটী বিভাগ আছে—রূঢ়, যথা মহিষীগণের ও অধিরূঢ, যথা গোপীগণের। রূঢ় ভাবের সহিত আমাদিগের আপাততঃ কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ, বৈষ্ণব কবিদিগের গানে রূঢ় ভাবের চিত্র নাই, কেবল অধিরূঢ় ভাবের চিত্র আছে। রূঢ় অপেক্ষা অধিরূঢ় ভাবে মাধুর্য্য ও প্রগাঢ়তা অত্যন্ত অধিক। রূঢ় ভাবে রসাস্বাদনের অল্পতা আছে, অধিরূঢ় ভাবে ভগবৎ-রসাস্বাদনের বিরাম নাই। এই জন্যই বৈষ্ণব রসিক ভক্তগণ অধিরূঢ় ভাবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই অধিরূঢ় ভাবের নামই মহাভাব। সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার কালে মহাপ্রভু কহিয়াছেন :—

"অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম আর॥
মাদনের চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র জল্প মোহনে দুই ভেদ॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমর গীতার দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
উদ্‌ঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান॥

(১) চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৭শ।

সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেম বৈচিত্ত্য আখ্যান॥ (১)

এই সকল কথা বৈষ্ণবকবির পদাবলী সমালোচনায় বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কারণ, এই সকলই বৈষ্ণবকবির যথার্থ উপাদান, কেবল কাব্য নহে। যে সকল অবস্থাদি মহাপ্রভু উপদেশ স্বরূপে প্রকটিত করিয়াছেন, সে সকল অবস্থাই তাঁহার জীবনে উদাহৃত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন যথার্থ বলিয়াছেন :—"কিন্তু গৌরহরি শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণব-গীতিসমূহের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন, এই বিরাট্ শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান। এই শাস্ত্রের শোভা স্বরূপ পূর্ব্বরাগ বিরহ সম্ভোগ মিলন ইত্যাদি যে সব লীলারসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, আস্বাদ-যোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে, সমুদ্র ঢেউ যমুনা লহরী হইয়াছে, চটক পর্ব্বত গোবর্দ্ধন হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধা সুন্দরী সৃষ্ট। তিনি আয়েসা বা কুন্দ-নন্দিনী নহেন, তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্টে বহন করিতে পারে, তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এমন নারীচরিত্র পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই।" (২)

প্রেমধর্ম্মী বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রাকৃত প্রেমের অনুরূপ অবস্থা সকলও যে থাকিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি ও তাহা যে ভক্তাবতারের জীবনে স্ফুরিত হইবে, তাহাতেই বা বিচিত্রতা কি?

অতঃপর আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রেমে যে সকল হাবভাবাদি সঞ্জাত হয়, ভক্তের হৃদয়েও সেই সকল হাবভাবাদির উদ্ভব হয়। এই সকল ভাবাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রে বিবেচিত ও বর্ণিত হইয়াছে, ও বৈষ্ণব কবিদিগের সঙ্গীতেও স্থান পাইয়াছে। এই সকল ভাবাদি শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন। যথা :—

ভাবো হাবশ্চ হেলা চ প্রোক্তস্তত্র ত্রয়োঙ্গজাঃ।
শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্ভতা॥
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যুরযত্নজাঃ।
লীলাবিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতম্॥

(১) চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৩শ

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২৪৪ পৃষ্ঠা

মোট্টায়িতম্ কুট্টমিতম্ বিব্বোকো ললিতং তথা।
বিকৃতং চেতি বিজ্ঞেয়া দশ তাসাং স্বভাবজাঃ॥ (১)

উল্লিখিত ভাব সকলের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীল রূপগোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে দিয়াছেন, যাঁহারা বিশেষ জিজ্ঞাসু, তাঁহারা সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন। ঐ সকলের মধ্যে যেটির যেখানে যতটুকু সবিস্তার উল্লেখ আমাদিগের প্রবন্ধে আবশ্যক হইবে, ততটুকুই আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

এতক্ষণে আমরা মধুর রসের যথার্থ প্রকৃতি বুঝিবার অবসর পাইলাম। মধুর রসের মুখ্য অবলম্বন, ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পরের প্রেমাকর্ষণে ও রূপাকর্ষণে কিরূপে বশীভূত হন, তাহাই বর্ণনা করা।—ভক্তমালকর্ত্তা কৃষ্ণদাস বাবাজি লিখিয়াছেন:—

দোঁহার রূপেতে দোঁহার নয়ন
ভুলিয়া সদাই ঝুরয়ে।
দোঁহার গুণেতে দোঁহার হৃদয়
সদা আকর্ষণ করয়ে॥
দোঁহার মাধুরী দোঁহে পান করি
ভুলিয়াছে লোক রীত॥
দোঁহার মরম দোঁহে সে জানায়ে
অন্যে নাহি কেহ বুঝে॥
দোঁহার তুলনা দোঁহো বিনু আর
নাহিক ভুবন মাঝে॥
কিশোর কিশোরী রসের মাধুরী
তুলনা দিবার নাই।
কোটী কোটী সুধা নিছনি যাউক
কৃষ্ণদাস গুণ গাই॥ (২)

রাধাকৃষ্ণের এই নিত্য সম্বন্ধ। ভক্ত-হৃদয়-রূপ ব্রজধামে সর্ব্বদাই তাঁহারা এই প্রেমলীলা প্রকাশ করিতেছেন। তাই ভক্তগণের কাছে রাধাকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণেই কর্ণের একমাত্র সফলতা, সেই অপূর্ব্ব মাধুরী দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা, তাঁহাদের গুণগানই জিহ্বার একমাত্র কার্য্য, তাঁহাদের সেবা করাই সকল ইন্দ্রিয়ের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা ও তাঁহাদের প্রেমের আস্বাদ গ্রহণই হৃদয়ের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা। ভক্ত বৈষ্ণব কবিদের কাছে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনেই কবিত্বের চরম স্ফূর্ত্তি, কবিত্বগীতির ইহা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আর হইতে

(১) উজ্জ্বল নীলমণি, অনুভাব-বিবৃতি-প্রকরণম্।
(২) ভক্তমালগ্রন্থ, ২৩শ মালা।

পারে না। ইহাই বৈষ্ণব কবির আধ্যাত্মিকতা এবং এই ভাবে বৈষ্ণব কবিকে বুঝিতে চেষ্টা না করিলে বৈষ্ণব কবির যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার অন্য উপায় নাই। আগেই বলিয়াছি যে, প্রাকৃত প্রেমের প্রথানুবর্ত্তী বলিয়া ভগবানের ও ভক্তের প্রেমও প্রাকৃত প্রেমের আকার ধরিয়া বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রকাশিত এবং সেই প্রেমের যথাযথ বর্ণনাতেই বৈষ্ণব কবির কবিত্ব। তাই তাঁহাদের কবিতার গুণাগুণ-বিচার-স্থলে তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য বা বৈষ্ণব-পদাবলীর ভিত্তি ভুলিলে চলিবে না।

বৈষ্ণবশাস্ত্র ভালবাসার শাস্ত্র, বৈষ্ণব-পদাবলী ভালবাসার গান। স্ত্রী-পুরুষের মনে ভালবাসার দ্বারা যতরূপ বিকার ও ভাবান্তর, যতরকম আকাঙ্ক্ষা ও কামনা জাগিতে পারে, তৎসমুদয়ই বৈষ্ণবশাস্ত্রে সূত্ররূপে লিখিত হইয়াছে ও সেই এক একটী সূত্র ধরিয়া বৈষ্ণব কবি এক একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সকল চিত্র দেখাইবার সম্ভাবনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মধ্যে নাই। মুখ্য চিত্রাবলী প্রদর্শনই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, কারণ, তাহা হইতেই আমরা বৈষ্ণব কবিকে বেশ বুঝিতে পারিব। বৈষ্ণবশাস্ত্র বাঙ্গালিকে বুঝাইয়াছেন বৈষ্ণব কবিগণ; এবং উভয়কেই বুঝাইয়াছেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু। তাই বৈষ্ণব কবিকে বুঝিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদিগকে সেই অমৃতময়ী জীবনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে।

ইদানীন্তন অনেকে বৈষ্ণব কবির আধ্যাত্মিকতায় সন্দিহান হইয়া তাঁহাদিগকে শ্লেষ ও নিন্দা করিয়া থাকেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা নিতান্ত অন্ধ, কারণ, আমার মনে হয় যে, বৈষ্ণব কবির আধ্যাত্মিকতা বাহ্যে যতই প্রচ্ছন্ন হউক না কেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও তাঁহাদের ভক্তিবিগলিত চিত্ত তাঁহাদের গানে কোথাও লুক্কায়িত নাই। যিনিই একটু মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাঁহাদের ভণিতাগুলি পাঠ করিবেন, তাঁহার আর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। ফলতঃ এই খানেই তাঁহাদের নিজত্ব ও এই জন্যই তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতি আধুনিক রচয়িতার গান হইতে এত স্বতন্ত্র। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ব্রজাঙ্গনা কাব্য সম্বন্ধে (১) লিখিয়াছেন :—"যে প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী উদ্গত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনায় অবশ্য তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ......ভক্ত ও প্রেমিক ভিন্ন আর কাহারও রাধাকৃষ্ণ লিখিবার অধিকার নাই। বৈষ্ণব কবিগণ একাধারে ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন, তাই তাঁহাদিগের গীতি মাধুর্য্য ও

(১) মাইকেলের জীবনী ৩৫৪-৫৫।

ভাবের সম্মিলনে মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। মধুসূদন প্রেমিক হইলেও ভক্ত ছিলেন না, সেই জন্য তাঁহার সঙ্গীত কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিলেও মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে না। বৈষ্ণব কবিগণের কবিতা উষার শিশির-সিক্ত কুসুমের ন্যায়; সেই বিকাশোন্মুখ পরিমলোৎসারী সুকোমল সদ্যঃস্নাত ভাব পৃথিবীর অপর কোনও সামগ্রীতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা প্রভাতের কুসুমতুল্য, তাহাতে পরিমল ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু প্রভাতালোকের সংস্পর্শে তাহার শিশিরবিন্দু শুষ্ক হইয়াছিল; সেই জন্য একই সামগ্রী হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক।" ব্রজাঙ্গনা সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা আজকালকার অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়িনী গীতির সম্বন্ধেই খাটে, তাই ঐ সকল গীতির আলোচনা এ প্রবন্ধে আমাদের লক্ষ্যীভূত নহে। বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-সম্বন্ধিনী পদাবলীই আমার এতৎ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। *অতএব এখন সেই পদাবলী-সাহিত্যের মর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।*

আমরা এতদূর যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা যদি নিতান্ত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত না হয় তবে ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বৈষ্ণব কবির গীতি মনুষ্যহৃদয়ের বিরাট মানচিত্র-বিশেষ। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী যথার্থ ই কহিয়াছেন * "ইয়ুরোপীয়েরা পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া স্পর্দ্ধা করেন। বৈষ্ণবেরা মানুষের মনের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এমন দার্শনিক জগতে দুর্লভ।"

সেই বিরাট্ মানচিত্রের উপর আমাদিগকে অতঃপর দৃষ্টি সঞ্চার করিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গে বৈষ্ণব কবির অমর কবিত্বেরও রসাস্বাদনের চেষ্টা করিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

* নব্যভারত সপ্তম খণ্ড ২য় ও ৩য় সংখ্যা। লালসা ও বিরহ।

শান্তি-সুধা।

['ব' লিখিত।]

সপ্তম অধ্যায়।

সাধন ও উপায়।

শিষ্য—

কিরূপে হইবে প্রভো. বৈরাগ্য সঞ্চার,
সাধন কি হয় কভু না ছেড়ে সংসার ?
শাস্ত্র অধ্যয়নে বলে নির্লিপ্ততা হয়,
কিন্তু কোথা ?—নাহি হয় বৈরাগ্য উদয়।

রামকৃষ্ণ—

শাস্ত্র দেখাইয়া দেয় পথটি কেবল,
না চলিলে তাহে কিন্তু সকলি নিষ্ফল।
পাঁজি বলে হবে সনে বিশ আড়া জল,
পাঁজি পিষে এক ফোঁটা পাইবে কি ?—বল।
মানচিত্রে দেখে কাশী দর্শন কি হয় ?
শুধু শাস্ত্রপাঠে সিদ্ধি হ'বে না নিশ্চয়।

বহু বস্ত্র থাকে প'ড়ে রজকের ঘরে,
ধো'য়া হ'লে সবগুলি নিয়া যায় পরে।
অন্যের বিদ্যায় বিদ্যা ঠিক সে প্রকার,
নিজ উপার্জ্জিত বিদ্যা, লোপ নাই তার।

শকুনি উঁচুতে উড়ে, নজর ভাগাড়ে.
কামিনী-কাঞ্চনে দৃষ্টি বহু শাস্ত্র প'ড়ে।

সাধনের মহাবিঘ্ন কামিনী কাঞ্চন,
সাধক এ দুটী সদা করিবে বর্জ্জন।

'নাক তেরে কেটে তাক' মুখে বলা যায়,
তবলে বাজাতে কিন্তু পড়ে ঘোর দায়।

ধর্ম্ম উপদেশ তথা মুখে যায় বলা,
সুকঠিন কিন্তু সেই অনুসারে চলা।

সাগরে মুকুতা আছে ডুবুরি উঠায়,
সংসারে ঈশ্বর আছে সাধনে মিলায়।

দুধেতে মাখন আছে মথিলে পাইবে,
সর্ব্বঘটে আছে ব্রহ্ম, সাধনে মিলিবে।

খাটালে গ্যাসের নল আলো কিবা আসে ?
দরখাস্ত কর আগে কোম্পানীর পাশে।
পরমাত্মা সর্ব্বজীবে আছে বিদ্যমান,
সাধন করিতে হ'বে যদি চাও জ্ঞান।

দূর হ'তে হাটে শব্দ 'হো' 'হো'—বোধ হয়,
হাটে যাও—দেখ—লোকে দর দাম ক'য়।
শাস্ত্র পাঠে তথা শুনা ঈশ্বর কেমন,
জানিতে চাহিলে তাঁরে করিবে সাধন।

দূর হ'তে সমুদ্রের শব্দ মাত্র শুনা যায়,
কাছে গেলে নীল জল, তরঙ্গ দেখিতে পায়।
শাস্ত্রপাঠে গুরুমুখে আছে মাত্র বুঝা যায়,
ঈশ্বর-স্বরূপ শুধু সাধনে দেখিতে পায়।

বড় বাবু সনে যদি বন্ধুতা করিতে পার,
সহজে জানিবে কত টাকা, কড়ি, ঘর তার।
প্রেমের সম্বন্ধ যদি ঈশ্বরের সনে হয়,
তাঁহারি ঐশ্বর্য্য বিশ্ব, জানিতে কি বাকি রয় ?
সাগরে সাঁতার দি'তে অভ্যাসের প্রয়োজন,
চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে সাধনা তেমনি ধন।

'সিদ্ধি' 'সিদ্ধি' বলে যথা নেশা নাহি হয়,
ঘুঁটে খেলে তবে হয় একথা নিশ্চয়।

মুখে বল যোগ সিদ্ধি, সিদ্ধি দূরে র'বে,
সাধনে মিলিবে সিদ্ধি, কথাতে না হ'বে।

কৃপণ ধনের তরে ব্যাকুল যেমন,
যদি চাও ঈশ্বরেরে হইবে তেমন।

যতনে কৃষক ছেঁচে ক্ষেতে জল এনে
দেখিল ইন্দুর-গর্ত্তে সব নেছে টেনে।
মনের ইন্দুর গর্ত্ত বাসনা সকল
সাধকের যত চেষ্টা দেয় রসাতল।
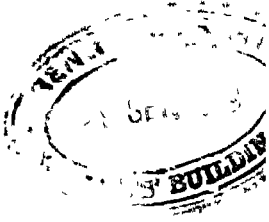
দিন রাত যেবা থাকে মজিয়া সংসারে,
ঈশ্বরে তাহার মন যাইতে কি পারে?
সাধুভক্ত-সঙ্গ করা মাঝে মাঝে আর
নাম গুণ গান করা বড় দরকার।
নিত্য চিন্তা করা চাই বসিয়া নির্জ্জনে
মনঃ স্থির চাও যদি ঈশ্বর-সাধনে।
চারাগাছে চারিদিকে বেড়া দিতে হ'বে,
নতুবা ছাগল গরু নষ্ট ক'রে দিবে।

সরিষা ছড়িয়ে গেলে সবগুলি তোলা দায়,
সংযম দুষ্কর যার নানা কাযে মন ধায়।

ধ্যান কর মনে, কিম্বা কোণে, আর বনে;
কোলাহলে ফল নাহি হইবে সাধনে।
নির্জ্জনেতে থেকো যদি চাহ ভক্তিধন,
নির্জ্জনেতে পাতে দই মাখন কারণ।
নাড়া চাড়া দিলে যথা দই নাহি বসে,
কোলাহলে মন নড়ে ধায় অন্তরসে।

চঞ্চল জলেতে চন্দ্রবিম্ব নাহি দেখা যায়,
উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তথা হরিরূপ ধরা দায়।

সাধন করিতে হ'লে খুব ধৈর্য্য চাই,
দুঃখ বিনা সুখ কভু দেখিতে না পাই।

জল পাইবার তরে কূয়া খুঁড়্‌তে যায়,
একটু খুঁড়িয়া কূয়া অন্যত্র পালায়,
খানিক সেথায় খুঁড়ে আবার পালায়,
এরূপে চঞ্চলমতি ফল নাহি পায়।
যদি কূয়া হ'তে চাও জল সুশীতল,
একস্থানে খোঁড়ো তবে হইবে সফল।
ঈশ্বরে পাইবে যদি এরূপ না কর,
গুরুমুখী বাক্য শুনি তাঁহে ডুবে পড়।

কলিকাতা যেতে লোক বহুপথ পায়,
একটী ধরিয়া তার একজন যায়।
পথে এক লোক বলে এ ত পথ নয়,
সত্য ভাবি তখনি সে অন্য পথ লয়।
সে পথেও বাধা পেয়ে অন্য পথ লয়,
এইরূপে ঘুরে মরে সন্দিগ্ধ-হৃদয়।

ব্রহ্মলাভ ইচ্ছা যদি এক পথে ধাও,
লোকের কথায় কেন ফিরিয়া বেড়াও ?
নূতন বাছুর কত উঠে পড়ে বারবার,
তবে ত দাঁড়াতে পারে, সাধকেরো সে প্রকার।

মনঃ স্থির যদি হয় কিছুতে কখন,
সব কার্য্য বন্ধ হবে ইহাই লক্ষণ।
ঝাঁটা হাতে কোন দাসী ঝাঁট দেয় ঘরে,
শুনিল, 'অমুক নেই, কাল গেছে ম'রে'।
'তাইত গো মারা গেল' মুখে মাত্র বলে,
হাতের ঝাঁটাটী কিন্তু রীতিমত চলে।
মৃত ব্যক্তি হয় যদি আপনার জন,
'অঁ্যা' বলিয়ে স্থির তার হস্ত আর মন।

শাস্ত্রে লেখা আছে বটে জল নারায়ণ,
সব জলে যেবসেবা চলে কি কখন ?

সাধু অসাধুর হৃদে আছে নারায়ণ,
তা ব'লে অসাধু-সঙ্গ ক'রোনা কখন।

যতক্ষণ জ্বাল দাও ফুলে ফোঁস্ করে,
জ্বাল টেনে নিলে দুধ নীচু হ'য়ে পড়ে।
সাধুসঙ্গে মনেরও এই দশা হয়,
দূরে গেলে পাজী মন নীচ কাযে রয়।

যেই গৃহমাঝে হয় হরি-সংকীর্ত্তন,
পাপ তার পাশ দিয়া আসেনা কখন।

হরি দুর্ব্বলের বল তাই বল 'হরি বল,'
ভবসিন্ধু তরিবারে হরি প্রধান সম্বল।

কার্ণিস উপরে কেউ বীজ রেখে গেল,
বহুদিন পরে তাহা ভূমিসাৎ হ'ল।
মাটি পেয়ে গাছ হয়, ফুল ফল ধরে,
এখনি বা পরে নাম ফল দান করে।

নিদ্রিত ব্যক্তিকে যদি জলে ফেলা যায়,
নিশ্চয় তাহার সব দেহ ভিজে তায়।
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যিনি নাম ল'ন,
সে নামের যেই ফল পান সেই জন।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়,—এই তিন থাকৃতে নয়;
বার বার বলিয়াছি মনে যেন রয়।

শিষ্য— কি বয়সে সাধনের হয় প্রয়োজন,
কি ভাবে মানব তাঁর করিবে সাধন?

রামকৃষ্ণ— মাখন প্রাতের তোলা বড় ভাল হয়,
তাইত প্রহ্লাদ, ধ্রুব এত মধুময়।

কাঁচাটি হেলান যায় পাকা বাঁশ নয়,
সহজে সুপথে ধায় শিশুর হৃদয়।

শান্ত, দাস্য, সখ্যভাব, বাৎসল্য, মধুর আর ;
দাস্য ভাব সাধকের সাধে খুব উপকার।

সনকাদি ঋষিগণ শান্তরসে নিমগন,
দাসভাবে হনুমান ভ'জেছিল রাম,
যশোদা সন্তান ভাবে, শ্রীমতী মধুরভাবে,
সখাভাবে ভ'জেছিল শ্রীদাম সুদাম ;
এক ভাব মনে নিয়া ভজ অবিরাম।

অনেক পিটিতে হয় ইস্পাতের ছুরী তরে,
সাধনার তরে নর বহু কষ্ট সহ্য করে।

পক্ষি ও বানরগতি, পিপীলিকা-গতি,
এই তিন ভাবে ধায় সাধকের মতি।
পাখী ঠোকরায় আর ফল প'ড়ে যায়,
লাফ দিয়ে কপি ফল ফেলিছে ধরায় ;
পিপীলিকা অচঞ্চল, ধীরে ধীরে যেয়ে
নিয়ে যায় কিছু ফল, আর যায় খেয়ে।

গুণভেদে সাধকেরা তিনরূপ হয়,
সাধনাও তিন রূপ প্রচারিত রয়।
সত্ত্বগুণী ঘর দ্বারে ফিরে নাহি চায়,
শান্ত, শিষ্ট, অমায়িক, অনিষ্টে না যায়।
রজোগুণী ফিট্ ফাট্, ঘড়ি, ছড়ি তার,
চাকর, পোষাক আদি সব পরিষ্কার।
তমোগুণী নিদ্রা, কাম, ক্রোধের আধার,
মনটি ভরিয়া হিংসা আর অহঙ্কার।
সত্ত্বগুণী করে ধ্যান গোপনে সদাই,
খাইবার পরিবার আড়ম্বর নাই।
তিলক রুদ্রাক্ষ আদি রজোগুণী ধরে,
গরদের ধুতি খানি প'রে পূজা করে।

তমোগুণী নিতে চায় বিশ্বাসের জোরে,
প্রবল ডাকাত প্রায় মুক্তি-ধন কেড়ে।

শিকারী বন্দুক ছাড়ে নীরবে যেমন,
লক্ষ্য স্থির, বাক্যহীন সাধক তেমন।

স্রোতের সলিলরাশি মাঝে মাঝে পাকে পড়ে,
আবার সবেগে ধায় নিজ পথে ক্ষণ পরে।
সাধকের মাঝে মাঝে আসে অবসাদ প্রাণে,
আবার সবেগে ধায় সাধক ঈশ্বর পানে।

সময় না হ'লে কভু নাহি হয় ফল,
সময়ে সাধন তরে পরাণ চঞ্চল।
"তুলে দিও মাগো, মোর যবে হাগা পা'বে,
মা বলে "ভেবনা যাদু, আপনি উঠিবে।

রিপুগুলি ধ্বংশ নাহি হয় কদাচন
ঘুরাইয়া অন্তপথে দিও রিপুগণ।
ঈশ্বর কামনা কর কাম-রিপু-বশে,
এখন না পেনু দেখা ক্রোধ কর কসে।
ও চরণে লোভ আন, রূপে মুগ্ধ হও,
'আমি ঈশ্বরের ছেলে' অহঙ্কারে রও।
এইরূপে ছয় রিপু ঈশ্বর-সেবায়,
মঙ্গল নিশ্চয় তার যে জন খাটায়।

ঘোড়ার দু'চোখে ঠুলি লাগিয়ে চালাও,
রিপুগুলি বশে আন যদি তাঁরে চাও।

সূচীছিদ্রে দিতে সূতা সরু কর্ত্তে হয়,
অহংভাব সরু হলে ঈশ্বর মিলয়।

চাতকের নীচে বাসা উড়িছে আকাশে,
সুবশ হৃদয়ে তথা বিভু-চিন্তা আসে।

নীচু জমী ভাল চাবে, জল তাহে রয়,
ভক্তি জল ধরে তথা বিনীত হৃদয়।

খোসা ফেলে ধান রোপ গাছ না জন্মায়,
জপ তপ ফেলে নর সিদ্ধি নাহি পায়।

ঝিনুকেতে মুক্ত হয় অন্যত্র না পাবে তায়,
জপ তপ তথা শুক্তি, মুক্তি মুক্তাফল যায়।

স্নান ক'রে হাতী পুনঃ ধূলা কাদা মাখে গায়,
পরিষ্কার থাকে যদি ঘরে বেঁধে রাখা যায়।
সাধুসঙ্গে বেঁধে রাখ নির্ম্মল থাকিবে মন,
নতুবা সংসারে পশি অশুদ্ধ হবে কথন।

সাধু-উপদেশ নিয়া ব'সে যাও সাধনায়,
আর না মলিন হবে কাম-কাঞ্চনেরি বায়।
হাততালি দেও যদি গাছের তলায় যেয়ে,
সব পাখী উড়ে যায় সেই গাছ হ'তে ধেয়ে।
হাততালি দিয়ে বল 'হরিবোল হরি হরি',
সব পাপ উড়ে যা'বে মনোবৃক্ষ পরিহরি।

পওহারী বাবা।

(গাজিপুরের বিখ্যাত সাধু।)

[স্বামী বিবেকানন্দ।]

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

তাপিত জগৎকে সাহায্য কর—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; ভগবান্ বুদ্ধ ধর্ম্মের অন্যান্য প্রায় সকল ভাবকেই সেই সময়ের জন্য বাদ দিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবেরই

প্রাধান্ত দিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাকেও স্বার্থপূর্ণ আমিত্বে আসক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র, ইহা উপলব্ধি করিবার জন্ত অনেক বর্ষ ধরিয়া আত্মানুসন্ধানে কাটাইতে হইয়াছিল। আমাদের উচ্চতম কল্পনাশক্তি, ইঁহা অপেক্ষা নিঃস্বার্থ ও অভ্রান্ত কর্ম্মীর ধারণায় অক্ষম, কিন্তু তাঁহাকে সমুদয় বিষয়ের রহস্ত বুঝিতে যেরূপ প্রবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, আর কাহার তদ্রূপ দেখা যায়? এ কথা সকল সময়েই খাটে যে, কার্য্য যে পরিমাণে মহত্তর, সেই পরিমাণে তাহার পশ্চাতে প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি-জনিত শক্তি আছে। পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত একটী সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত অধিক একাগ্র চিন্তাশক্তির প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু প্রবল শক্তিতরঙ্গসমূহ কেবল প্রবল একাগ্র চিন্তার পরিণাম মাত্র। সামান্ত চেষ্টার জন্ত হয়ত মতবাদমাত্রেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যে ক্ষুদ্র বেগের দ্বারা ক্ষুদ্র লহরীর উৎপত্তি হয়, তাহা অবশ্য প্রবল উর্ম্মির জনক তীব্র বেগ হইতে অতিশয় পৃথক্। তাহা হইলেও ঐ ক্ষুদ্র লহরীটী প্রবল-উর্ম্মি-উৎপাদন-কারী শক্তির এক ক্ষুদ্র অংশেরই বিকাশ মাত্র।

মন, নিম্নতর কর্ম্মভূমিতে প্রবল কর্ম্মতরঙ্গ উত্থাপিত করিতে সক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাহাকে তথ্য-সমূহের—আবরণহীন তথ্য-সমূহের—(উহারা বিকটদৃশ্য ও বিভীষিকাপ্রদ হইলেও) নিকট পঁহুছিতে হইবে ; সত্যকে—খাঁটি সত্যকে—(যদিও উহার তীব্র স্পন্দনে হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে) লাভ করিতে হইবে এবং নিঃস্বার্থ ও অকপট অভিসন্ধি (যদিও উহা লাভ করিতে একটীর পর আর একটী করিয়া প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হয়) উপার্জ্জন করিতে হইবে। সূক্ষ্ম বস্তু কালচক্রে প্রবাহিত হইতে হইতে ব্যক্তভাব ধারণ করিবার জন্ত উহার চতুর্দ্দিকে স্থূল বস্তুসমূহ একত্রিত করিতে থাকে ; অদৃশ্য দৃশ্যের ছাঁচ ধারণ করে ; সম্ভব বাস্তবে, কারণ কার্য্যে ও চিন্তা পৈশিক কার্য্যে পরিণত হয়।

সহস্র সহস্র ঘটনায় যে কারণকে এখন কার্য্যরূপে পরিণত হইতে দিতেছে না, তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে কার্য্যরূপে প্রকাশিত হইবে ; এবং এখন যতই শক্তিহীন হউক না কেন, জড়জগতে শক্তিশালী চিন্তার গৌরবের দিন আসিবে। আর যে আদর্শে ইন্দ্রিয় সুখ প্রদানের সামর্থ্য হিসাবে সকল বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে, সে আদর্শও ঠিক নহে।

যে প্রাণী যত নিম্নতর, সে ইন্দ্রিয়ে তত অধিক সুখ অনুভব করে, সে তত

অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বাস করে। সভ্যতা—যথার্থ সভ্যতা—অর্থে বুঝা উচিত—বাহ্য সুখের পরিবর্ত্তে উচ্চতর রাজ্যের দৃশ্য দেখাইয়া ও তথাকার সুখ আস্বাদ করাইয়া পশুভাবাপন্ন মানবকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার শক্তি।

মানব প্রাণে প্রাণে ইহা জানে। সকল অবস্থায় সে ইহা স্পষ্টরূপে নিজেও না বুঝিতে পারে। ধ্যানময় জীবন সম্বন্ধে তাহার হয়ত ভিন্ন মত থাকিতে পারে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাহার প্রাণের এই স্বাভাবিক ভাব লুপ্ত হয় না, উহা সদাই প্রকাশ হইবার চেষ্টা করে—তাহাতেই সে বাজীকর, বৈদ্য, ঐন্দ্রজালিক, পুরোহিত অথবা বিজ্ঞানের অধ্যাপককে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারে না। মানব যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়াইয়া আসিয়া উচ্চ ভূমিতে বাস করিবার শক্তিলাভ করে, তাহার ফুসফুস যে পরিমাণে বিশুদ্ধ চিন্তাবায়ু গ্রহণ করিতে পারে এবং যতটা সময় সে এই উচ্চাবস্থায় থাকিয়া কাটাইতে পারে, তাহাতেই তাহার উন্নতির পরিমাণ হয়।

সংসারে ইহা দেখাও যায় এবং ইহার অবশ্যম্ভাবিতা সহজেই বুঝা যায় যে, উন্নত মানবগণ জীবন ধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু ব্যতীত তথা-কথিত আরামের জন্য সময় ব্যয় করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত, আর যতই তাঁহারা উন্নত হইতে থাকেন, ততই আবশ্যকীয় কার্য্যসমূহ পর্য্যন্ত করিতে তাঁহাদের উৎসাহ কমিয়া আসিতে থাকে।

এমন কি, মানবের ধারণা ও আদর্শ অনুসারে তাহার বিলাসের ধারণা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। মানবের চেষ্টা হয়—সে যে চিন্তা-জগতে বিচরণ করিতেছে, তাহার বিলাসের বস্তুগুলি যথাসম্ভব তদনুযায়ী হয়—আর ইহাই শিল্প।

"যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া-নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, অথচ যত-টুকু ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইতেও উহা অনেক বেশী" *—ঠিক কথা—অনন্তগুণে অধিক। এক কণা—সেই অনন্ত চিত্তের এক কণা—মাত্র আমাদের সুখবিধানের জন্য জড়ের রাজ্যে অবতরণ করিতে পারে—উহার অবশিষ্ট ভাগকে জড়ের ভিতর লইয়া আসিয়া আমাদের স্থূল কঠিন হস্তে এইরূপে নাড়াচাড়া করা যাইতে পারে না। সেই পরম সূক্ষ্ম পদার্থ সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে পলাইতেছে এবং আমাদের উহাকে আমাদের স্তরে আনিবার চেষ্টায় উপহাস করিতেছে। এ ক্ষেত্রে মহম্মদকেই পর্ব্বতের নিকট যাইতে হইবে—'না' বলিবার উপায় নাই।

* কঠোপনিষদ্। ২।২।৯।

মানব যদি সেই উচ্চতর রাজ্যের সৌন্দর্য্যরাশি সম্ভোগ করিতে চায়, যদি সে উহার বিমল আলোকে অবগাহন করিতে চায়, যদি সে আপন প্রাণ সেই জগৎ-কারণ জগৎপ্রাণের সহিত একযোগে নৃত্য করিতেছে, দেখিতে চায়, তবে তাহাকে তথায় উঠিতে হইবে।

জ্ঞানই বিস্ময়-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়, জ্ঞানই পশুকে দেবতা করে. এবং যে জ্ঞান আমাদিগকে সেই বস্তুর নিকট লইয়া যায়, যাঁহাকে জানিলে আর সকলই জানা হয় (যস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি*)—যাহা সকল জ্ঞানের হৃদয়-স্বরূপ, যাহার স্পন্দনে সমুদয় বিজ্ঞানের মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হয়—সেই ধর্ম্মবিজ্ঞানই নিশ্চিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, উহাই কেবল মানবকে সম্পূর্ণ ধ্যানময় জীবন যাপনে সমর্থ করে। ধন্য সেই দেশ, যাহা উহাকে "পরাবিদ্যা" নামে অভিহিত করিয়াছে!

কর্ম্মজীবনে তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তথাপি আদর্শটী কখনও নষ্ট হয় না। একদিকে, আমাদের কর্ত্তব্য এই যে,—আমরা আদর্শের দিকে সুনির্দ্দিষ্ট পদক্ষেপেই অগ্রসর হই বা অতি ধীরে ধীরে অননুভাব্য গতিতে উহার দিকে হামাগুড়ি দিয়াই অগ্রসর হই, আমরা যেন উহাকে কখনও বিস্মৃত না হই। আবার অপর দিকে দেখা যায়, যদিও আমরা আমাদের চক্ষে হস্ত দিয়া উহার জ্যোতিকে ঢাকিয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তথাপি উহা সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে অস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আদর্শই কর্ম্মজীবনের প্রাণ। আমরা দার্শনিক বিচারই করি অথবা প্রাত্যহিক জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যসমূহই সম্পন্ন করিয়া যাই, আদর্শ আমাদের সমগ্র জীবনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। আদর্শের রশ্মি. নানা সরল বা বক্র রেখায় প্রতিবিম্বিত ও পরাবর্ত্তিত (Refracted হইয়া আমাদের জীবনগৃহের প্রতি ছিদ্রপথে আসিতেছে আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক কার্য্যই ইহার আলোকে করিতে হয়, প্রত্যেক বস্তুই ইহার দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও সুরূপ বা কুরূপপ্রাপ্ত ভাবে দেখিতে হয়। আমরা এক্ষণে যাহা, আদর্শই আমাদিগকে তাহা করিয়াছে, আর আদর্শই আমাদিগকে ভবিষ্যতে যাহা হইব, তাহা করিবে। আদর্শের শক্তি আমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, আর আমাদের সুখে দুঃখে, আমাদের বড় বা ছোট কাযে এবং আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মে উহা অনুভূত হইয়া থাকে।

* মুণ্ডকোপনিষদ্।১।১।৩।

যদি কর্ম্মজীবনের উপর আদর্শের এইরূপ প্রভাব হয়, কর্ম্মজীবনও আদর্শগঠনে তদ্রূপ কম শক্তিমান্ নহে। আদর্শের সত্য কর্ম্মজীবনেই প্রমাণিত। আদর্শের পরিণতি কর্ম্মজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভবে। আদর্শ থাকিলেই প্রমাণিত হয় যে, কোন না কোনখানে, কোন না কোনরূপে উহা কর্ম্মজীবনেও পরিণত হইয়াছে। আদর্শ বৃহত্তর হইতে পারে, কিন্তু উহা কর্ম্মজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের বিস্তৃত ভাবমাত্র। আদর্শ অনেকস্থলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম-বিন্দুর সমষ্টি ও সাধারণ ভাবমাত্র।

কর্ম্মজীবনেই আদর্শের শক্তি প্রকাশ। কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়াই উহা আমাদের উপর কার্য্য করিতে পারে। কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়া আদর্শ আমাদের জীবনে গ্রহণোপযোগী আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভূমিতে অবতরণ করে। কর্ম্মজীবনকে সোপান করিয়াই আমরা আদর্শে আরোহণ করি ; উহারই উপর আমাদের আশা ভরসা সব রাখি ; উহাই আমাদিগকে কার্য্যে উৎসাহ দেয়।

যাহাদের বাক্যতূলিকা আদর্শকে অতি সুন্দর বর্ণে অঙ্কিত করিতে পারে অথবা যাহারা সূক্ষ্মতম তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করিতে পারে, এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অপেক্ষা একব্যক্তি, যে নিজ জীবনে উহাকে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে, অধিক শক্তিশালী।

ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত না হইলে এবং অল্পবিস্তর কৃতকার্য্যতার সহিত উহাকে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিতে যত্নবান্ একদল অনুবর্ত্তী না পাইলে, মানবজাতির নিকট দর্শনশাস্ত্রসমূহ নিরর্থক প্রতীয়মান হয়, জোর উহা কেবল মানসিক ব্যায়াম-মাত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে সকল মতে একটা কিছু প্রত্যক্ষ বস্তু পাইবার আশা দেয় না, যখন কতকগুলি লোকে সেইগুলিকে গ্রহণ করিয়া কতকটা কার্য্যে পরিণত করে, উহাদেরও স্থায়িত্বের জন্য জনসঙ্ঘের প্রয়োজন, আর উহার অভাবে প্রত্যক্ষবাদাত্মক অনেক মত লোপ পাইয়াছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই চিন্তাশীলতা বা মননশীলতার সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য রাখিতে পারি না। কতকগুলি মহাত্মা পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয়, গভীরভাবে মনন করিতে যাইলে কার্য্যশক্তি হারাইয়া ফেলি এবং অধিক কার্য্য করিতে গেলে আবার গভীর চিন্তাশক্তি হারাইয়া বসি। এই কারণেই অনেক মহামনস্বিগণকে, তাঁহারা যে সকল উচ্চ উচ্চ আদর্শ জীবনে উপলব্ধি করেন, সেইগুলি জগতে কার্য্যে পরিণত করিবার ভার, কালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া

যাইতে হয়। যতদিন না অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক আসিয়া উঁহাদিগকে কার্য্যে পরিণত ও প্রচার করিতেছেন, ততদিন তাঁহাদেব মননরাশিকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু এই কথা লিখিতে লিখিতেই আমরা যেন দিব্য-চক্ষে সেই পার্থসারথিকে দেখিতেছি, তিনি যেন উভয় বিরোধী সৈন্তদলের মধ্যে রথে দাড়াইয়া বামহস্তে দৃপ্ত অশ্বগণকে সংযত করিতেছেন—বর্ম্মপরিহিত যোদ্ধৃ-বেশ—প্রখর দৃষ্টি দ্বারা সমবেত বৃহৎ সৈন্তরাশিকে দর্শন করিতেছেন এবং যেন স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা উভয়দলের সৈন্তসজ্জার প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত ওজন করিয়া দেখিতেছেন—আবার অপর দিকে, আমরা যেন, ভীতিপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে চমকিত করিয়া তাঁহার মুখ হইতে কর্ম্মের অত্যদ্ভুত রহস্য বাহির হইতেছে, শুনিতেছি—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥"

—ভগবদ্গীতা।

যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম অর্থাৎ বিশ্রাম বা শান্তি এবং অকর্ম্মে অর্থাৎ শান্তির ভিতর কর্ম্ম দেখেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম্ম করিয়াছেন।

ইহাই পূর্ণ আদর্শ। কিন্তু খুব কম লোকে এই আদর্শে পঁহুছিয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগকে যেমনটী আছে, তেমনটীই লইতে হইবে, এবং বিভিন্ন ব্যক্তিতে প্রকাশিত মানবের বিভিন্ন প্রকারের চরিত্রবিকাশগুলিকে লইয়া একত্র গ্রথিত করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতর আমরা তীব্র চিন্তাশীল (জ্ঞানযোগী), অপরের সাহায্যের জন্য প্রবল কর্ম্মানুষ্ঠানকারী (কর্ম্মযোগী.), সাহসের সহিত আত্মসাক্ষাৎকারে অগ্রসর (রাজযোগী) এবং শান্ত ও বিনয়ী ব্যক্তি (ভক্তিযোগী) দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যাঁহাব চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে, তিনি একজন অদ্ভুত বিনয়ী ও উজ্জ্বল আত্মতত্ত্বদ্রষ্টা ছিলেন।

পওহারী বাবা (শেষজীবনে ইনি এই নামে অভিহিত হইতেন) বারাণসী জেলার গুজী নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী একগ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি বাল্যকালেই গাজিপুরে তাঁহার পিতৃব্যের নিকট বাস ও তাঁহার নিকট শিক্ষা করিবার জন্য আসিলেন।

বর্ত্তমানকালে হিন্দু সাধুরা—সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী ও পন্থী প্রধানতঃ এই চার সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরা শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী। যোগীরা যদিও অদ্বৈতবাদী, তথাপি তাঁহারা বিভিন্ন যোগপ্রণালীর সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে পরিগণিত করা হয়। বৈরাগীরা রামানুজ ও অন্যান্য দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের অনুবর্ত্তী। মুসলমান-রাজত্বের সময় যে সকল সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে পন্থী বলে—ইঁহাদের মধ্যে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকার মতাবলম্বীই দেখিতে পাওয়া যায়। পওহারী বাবার পিতৃব্য, রামানুজ বা শ্রী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন—অর্থাৎ তিনি আজীবন অবিবাহিত জীবন যাপন করিবেন, এই ব্রত লইয়াছিলেন। গাজিপুরের দুই মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে তাঁহার এক খণ্ড জমি ছিল, তিনি সেইখানেই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল বলিয়া তিনি পওহারী বাবাকে নিজের বাটীতে রাখিয়াছিলেন আর তাঁহাকেই তাঁহার বিষয় ও পদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন।

পওহারী বাবার এই সময়ের জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছু জানা যায় না। যে সকল বিশেষত্বের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি এরূপ সুপরিচিত হইয়াছিলেন, সে সকলের কোন লক্ষণ তখন তাঁহাতে প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়াও বোধ হয় না। এইটুকুই লোকের স্মরণ আছে যে, তিনি ব্যাকরণ, ন্যায় এবং নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ অতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন—এদিকে খুব চট্‌পটে ও আমুদে ছিলেন। সময়ে সময়ে এই আমোদের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠিত যে, তাঁহার সহপাঠী ছাত্রগণকে তাঁহার এই রঙ্গপ্রিয়তার ফলে বিলক্ষণ ভুগিতে হইত।

এইরূপে প্রাচীন ধরণের ভারতীয় ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন কার্য্যের ভিতর দিয়া ভাবী মহাত্মার বাল্যজীবন কাটিতে লাগিল; আর তাঁহার অধ্যয়নে অসাধারণ অনুরাগ ও ভাষাশিক্ষায় অপূর্ব্ব পটুতা ব্যতীত সেই সরল, সদানন্দময়, ক্রীড়াশীল ছাত্রজীবনে এরূপ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় নাই, যাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সেই প্রবল গাম্ভীর্য্য সূচিত করিবে—যাহার চূড়ান্ত পরিণাম এক অত্যদ্ভুত ও ভয়ানক আত্মাহুতি—যখন সকলের নিকটেই উহা কেবল অতীতের এক কিম্বদন্তী-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই সময়ে এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে এই অধ্যয়নশীল যুবক সম্ভবতঃ এই প্রথম জীবনের গভীর মর্ম্ম প্রাণে প্রাণে বুঝিল; এত দিন তাহার যে দৃষ্টি পুস্তক-নিবদ্ধ ছিল, তখন তাহা উঠাইয়া সে নিজ মনোজগৎ তন্ন তন্ন ভাবে পর্য্যবেক্ষণ

করিতে লাগিল ; ধর্মের মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া যথার্থ সত্য কিছু আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল—তাহার পিতৃব্যের দেহত্যাগ হইল। যে এক মুখের দিকে চাহিয়া সে জীবন ধারণ করিত, যাঁহার উপর এই যুবকহৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা নিবদ্ধ ছিল, তিনি চলিয়া গেলেন ; তখন সেই উদ্দাম যুবক, হৃদয়ের অন্তস্তলে শোকাহত হইয়া ঐ শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য এমন বস্তুর অন্বেষণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল, যাহার কখনও পরিণাম নাই।

ভারতে সকল বিষয়ের জন্যই আমাদের গুরুর প্রয়োজন হয়। আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি, পুস্তক কেবল তত্ত্ববিশেষের ভাসাভাসা বর্ণনা মাত্র। সকল শিল্পের, সকল বিদ্যার, সর্বোপরি ধর্মের জীবন্ত রহস্যসমূহ গুরু হইতে শিষ্যে সঞ্চারিত হওয়া চাই।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে দৃঢ় অনুরাগী ব্যক্তিগণ অন্তর্জীবনের রহস্য নির্বিঘ্নে আলোচনার জন্য সর্বদাই লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অতি নিভৃত স্থান-সমূহে গিয়া বাস করিয়াছেন, আর এখনও এমন একটি বন, পর্বত বা পবিত্র স্থান নাই, কিম্বদন্তী যাহাকে কোন মহাত্মার বাসস্থান বলিয়া উহার অঙ্গে পবিত্রতার মহিমা মাখাইয়া না দেয়।

তার পর এই উক্তিটীও সর্বজনপ্রসিদ্ধ যে,—

"রমতা সাধু, বহতা পানি।
যহ কভু না মৈল লখানি॥"

অর্থাৎ যে জল প্রবাহিত হয়, তাহা যেমন বিশুদ্ধ থাকে, তদ্রূপ যে সাধু ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তিনিও তদ্রূপ পবিত্র থাকেন।

ভারতে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ধর্মজীবন গ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বিচরণ করিয়া বিভিন্নতীর্থ ও দেবমন্দির দর্শন করিয়াই অধিকাংশ জীবন কাটাইয়া থাকেন—কোনও জিনিষ যেমন সর্বদা নাড়াচাড়া করিলে তাহাতে মরিচা ধরে না, তাঁহারা বলেন, এইরূপ ভ্রমণে তাঁহাদের মধ্যেও তদ্রূপ মলিনতা প্রবেশ করিবে না। ইহাতে আর এক উপকার হয় এই যে, তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে ধর্ম বহন করিয়া লইয়া যান। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই ভারতের চারি কোণে অবস্থিত চারিটী প্রধান স্থান (চার ধাম—উত্তরে বদরীকেদার, পূর্বে পুরী, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও পশ্চিমে দ্বারকা) দর্শন করা একরূপ অবশ্যকর্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিষয়গুলিই আমাদেব যুবক ব্রহ্মচারীর ভারতভ্রমণের পক্ষে প্রবল প্ররোচক কারণ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, জ্ঞানতৃষ্ণাই তাঁহার ভ্রমণের সর্ব্বপ্রধান কারণ। আমবা তাঁহার ভ্রমণ সম্বন্ধে খুব অল্পই জানি, তবে তাঁহার সম্প্রদায়েব অধিকাংশ গ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত, সেই দ্রাবিড় ভাষাসমূহে তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া এবং শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার সম্পূর্ণ পবিচয় দেখিয়া আমরা অনুমান করি, দাক্ষিণাত্যে ও বাঙ্গালা দেশে তাঁহার স্থিতি বড অল্পদিন হয় নাই।

কিন্তু তাঁহার একটী স্থানে গমনেব সম্বন্ধে তাঁহার যৌবনকালের বন্ধুগণ বিশেষ-রূপ জোব দিযা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কাঠিযাওয়াড়ে গিরণাব পর্ব্বতের শীর্ষদেশে তিনি প্রথমে যোগসাধনার রহস্যে দীক্ষিত হন।

এই পর্ব্বতই বৌদ্ধদের চক্ষে অতি পবিত্র ছিল। এই পর্ব্বতের পাদদেশে সেই সুবৃহৎ শিলা বিদ্যমান, যাহার উপর সম্রাট্‌কুলের মধ্যে ধার্ম্মিকচূড়ামণি ধর্ম্মাশোকের সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত অনুশাসন খোদিত আছে। উহার নিম্নদেশে শত শত শতাব্দীর বিস্মৃতিব অন্ধকাবগর্ভে লীন হইযা অরণ্যাবৃত বৃহৎকায় স্তূপবাজি ছিল—ঐগুলিকে অনেক দিন ধবিয়াই গিবণার পর্ব্বতশ্রেণীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালা বলিয়া লোকে মনে করিত। এখনও উহাকে সেই ধর্ম্মসম্প্রদায় বড কম পবিত্র মনে করে না—বৌদ্ধধর্ম্ম এক্ষণে যাহাব পুনঃসংশোধিত সংস্কবণ বলিয়া বিবেচিত হয—আর আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহা তাহাব জগজ্জয়ী উত্তরাধিকারী আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়া যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহসপূর্ব্বক স্থাপত্যক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহাযোগী অবধূতগুরু দত্তাত্রেয়ের পবিত্র নিবাসভূমি বলিয়া গিরণার হিন্দুদিগেব মধ্যে বিখ্যাত ; আর কিম্বদন্তী আছে যে, এই পর্ব্বতের চূড়ায় সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ এখনও বড় বড় সিদ্ধ যোগীর সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন।

তার পর আমরা দেখিতে পাই, এই যুবক ব্রহ্মচারী বারাণসীর নিকটে গঙ্গা-তীবে জনৈক যোগসাধক সন্ন্যাসীর শিষ্যরূপে বাস করেন—এই সন্ন্যাসীটী নদীর উচ্চ তটভূমিব উপর খনিত একটী গর্ত্তে বাস করিতেন। আমাদের প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মহাত্মা যে পরজীবনে গাজিপুরের নিকট গঙ্গাতীরে এক ভূখণ্ড খনন করিয়া তন্মধ্যে

এক গভীর বিবর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেন, তাহা যে ইঁহার নিকটেই শিখিয়াছিলেন, এটী বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যোগীরা যোগাভ্যাসের সুবিধার জন্ম সর্ব্বদাই গুহায় অথবা যেথানকার আবহাওয়ার কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই এবং যেথানে কোন শব্দ মনকে বিচলিত করিতে না পারে, এমন স্থানে বাস করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

আমরা আরও জানিতে পারি যে, তিনি প্রায় এই সময়েই বারাণসীতে জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিতেছিলেন।

অনেক বর্ষ ভ্রমণ, অধ্যয়ন ও সাধনার পর এই ব্রহ্মচারী যুবক, যে স্থানে বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তথায় ফিরিয়া আসিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার পিতৃব্য যদি জীবিত থাকিতেন, তবে এই বালকের মুখমণ্ডলে সেই জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেন, যাহা প্রাচীনকালে জনৈক শ্রেষ্ঠতর ঋষি তাঁহার শিষ্যের মুখ দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মবিদিব সোম্য ভাসি' *—হে সৌম্য, আজ তোমার মুখ যে ব্রহ্মজ্যোতিতে দীপ্তি পাইতেছে, দেখিতেছি। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনে স্বাগত অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহারা তাঁহার বাল্যকালের সঙ্গীমাত্র—তাঁহাদের অনেকেই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন—সংসার চিরদিনের জন্ম তাঁহাদিগকে বাঁধিয়াছিল—যে সংসারে চিন্তাশীলতা অল্প, কিন্তু কর্ম্ম অনন্ত।

তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের পঠদ্দশার বন্ধু ও ক্রীড়াসঙ্গীর (যাঁহার ভাব বুঝিতে তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন) সমুদয় চরিত্র ও ব্যবহারে এক পরিবর্ত্তন—রহস্যময় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন—ঐ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ভয়বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। কিন্তু উহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহার মতন হইবার ইচ্ছা, অথবা তাঁহার ন্যায় তত্ত্বান্বেষণস্পৃহা জাগরিত হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, এ এক অদ্ভুত মানব—এই যন্ত্রণা ও জড়বাদপূর্ণ সংসারের বাহিরে একেবারে চলিয়া গিয়াছে—এই পর্য্যন্ত। তাঁহারা স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন, আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না।

ইতিমধ্যেই এই মহাত্মার বিশেষত্বসমূহ দিন দিন অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। বারাণসীর সন্নিকটবাসী তাঁহার গুরুর মত, তিনিও ভূমিতে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে যাইতে লাগিলেন এবং অনেক ঘণ্টা ধরিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তার পর তিনি আহার সম্বন্ধে অতি ভয়ানক কঠোর সংযম আরম্ভ করিলেন। সারা দিন তিনি নিজের ছোট আশ্রমটীতে কার্য্য করিতেন, তদীয় পরম

* ছান্দোগ্য উপনিষদ।

প্রেমাস্পদ প্রভু রামচন্দ্রের পূজা করিতেন, উত্তম খাদ্য রন্ধন করিয়া (কথিত আছে, তিনি রন্ধনবিদ্যায় অসাধারণ পটু ছিলেন) ঠাকুরকে ভোগ দিতেন, তার পর সেই প্রসাদ বন্ধুবান্ধবগণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের সেবা করিতেন। তাহারা সকলে যখন শয়ন করিত, তখন এই যুবক গোপনে সন্তরণ দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া উহার অপর তীরে যাইতেন। তথায় সারা রাত সাধনভজনে কাটাইয়া উষার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে জাগাইতেন এবং পুনর্ব্বার সেই নিত্য কার্য্য আরম্ভ করিতেন, আমরা যাহাকে ভারতে 'অপরের সেবা বা পূজা' বলিয়া থাকি।

ইতিমধ্যে তাঁহার নিজের খাওয়াও কমিয়া আসিতে লাগিল, অবশেষে, আমরা শুনিয়াছি, উহা প্রত্যহ একমুঠা তেঁত নিম পাতা বা কয়েকটা লঙ্কা মাত্রে দাঁড়াইল। তার পর তিনি গঙ্গার অপর পারের জঙ্গলে যে প্রত্যহ রাত্রে সাধনের জন্য যাইতেন, তাহা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল এবং তিনি তাঁহার প্রস্তুত গুহাতে বেশী বেশী বাস করিতে লাগিলেন। আমরা শুনিয়াছি, সেই গুহায় তিনি দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন, তার পর বাহির হইতেন। এই দীর্ঘকাল তিনি কি খাইয়া থাকিতেন, তাহা কেহই জানে না, তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে পও-আহারী অর্থাৎ বায়ুভক্ষণকারী বাবা বলিতে আরম্ভ করিল।

তিনি তাঁহার জীবনে কখন এই স্থান ত্যাগ করেন নাই। একবার তিনি এত অধিকদিন ধরিয়া ঐ গুহার মধ্যে ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু অনেক দিন পরে আবার বাবা বাহির হইয়া বহুসংখ্যক সাধুকে এক ভাণ্ডারা দিলেন।

যখন তিনি ধ্যানে মগ্ন না থাকিতেন, তখন তিনি তাঁহার গুহার মুখের উপরি-ভাগে অবস্থিত একটী গৃহে বাস করিতেন—আর এই সময়ে যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, আর গাজিপুরের অহিফেন-বিভাগের রায় গগন চন্দ্র বাহাদুর—যিনি স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও ধর্ম্মপ্রবণতার জন্য সকলেরই প্রিয় হইয়াছেন—আমাদিগকে এই মহাত্মার সহিত আলাপ করাইয়া দেন।

ভারতের আরও অনেক মহাত্মার ন্যায়, এই জীবনেও কিছু বিশেষরূপ বহির্জ্জগতের ক্রিয়াশীলতা ছিল না। সেই ভারতীয় আদর্শ যে, বাক্যের দ্বারা নয়, জীবনের দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে, আর যাহারা সত্য ধারণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাদেরই জীবনে সত্য প্রতিফলিত হয়—ইঁহার জীবন তাহারই আর

একটী উদাহরণ। এইরূপ ধরণের লোকেরা যাহা তাঁহারা জানেন, তাহা প্রচার করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কারণ, তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, বাক্যের দ্বারা নহে, ভিতরের সাধনা দ্বারাই সত্যলাভ হয়। ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট সামাজিক কর্ত্তব্যের প্ররোচক শক্তিবিশেষ নহে, উহা সত্যের দৃঢ় অনুসন্ধান এবং এই জীবনেই উহার সাক্ষাৎকারস্বরূপ।

তাঁহারা কালের এক মুহূর্ত্ত হইতে অপর মুহূর্ত্তের অধিকতর কিছু শক্তি আছে, একথা অস্বীকার করেন। অতএব অনন্তকালের প্রতি মুহূর্ত্তই অন্যান্য মুহূর্ত্তের সহিত সমান বলিয়া তাঁহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখানেই এবং এখনই ধর্ম্মের সত্যসমূহ সাক্ষাৎ দর্শন করার উপর জোর দিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান লেখক এক সময়ে এই মহাত্মাকে জগতের উপকার করিবার জন্য গুহা হইতে বাহিরে না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমতঃ, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় ও পরিহাস-রসিকতা সহকারে নিম্নলিখিত দৃঢ় উত্তর প্রদান করেন :—

"কোন দুষ্ট লোক কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছিল, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং শাস্তিস্বরূপে তাহার নাক কাটিয়া দেয়। নিজের নাক-কাটা রূপ জগৎকে কিরূপে দেখাইবে, ইহা ভাবিয়া সে অতিশয় লজ্জিত হইল ও নিজের প্রতি নিজে অতিশয় বিরক্ত হইয়া এক জঙ্গলে পলাইয়া গেল। তথায় সে একটি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া বসিয়া থাকিত আর এদিক্ ওদিকে কেহ আসিতেছে মনে হইলে অমনি গভীর ধ্যানের ভান করিত। এইরূপ ব্যবহারে লোকে সরিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, দলে দলে লোকে এই অদ্ভুত সাধুকে দেখিতে এবং পূজা করিতে আসিতে লাগিল। তখন সে দেখিল, এইরূপ অরণ্যবাসে আবার তাহার সহজে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হইল। এইরূপে বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া গেল। অবশেষে সেই স্থানের লোকে এই মৌনব্রতধারী ধ্যানপরায়ণ সাধুর নিকট হইতে কিছু উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইল, বিশেষতঃ জনৈক যুবক সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইল। শেষে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে, আর বিলম্ব করিলে সাধুর প্রতিষ্ঠা একেবারে লোপ হয়। তখন সে একদিন মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া ঐ উৎসাহী যুবককে বলিল, 'আগামী কল্য একখানি ধারাল ক্ষুর লইয়া এখানে আসিও।' যুবকটী তাহার জীবনের এই প্রধান আকাঙ্ক্ষা অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইবে এই আশায় পরম আনন্দিত হইয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে ক্ষুর লইয়া উপস্থিত হইল। নাককাটা সাধু তাহাকে বনের এক অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেল, তার

পর ক্ষুরখানি হাতে লইয়া উহা খুলিল এবং এক আঘাতে তাহার নাক কাটিয়া দিয়া গম্ভীর বচনে বলিল, 'হে যুবক! আমি এইরূপে এই আশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছি। সেই দীক্ষাই আমি তোমাকে দিলাম। এখন তুমিও সুবিধা পাইলেই অপরকে নিরালস্য হইয়া এই দীক্ষা দিতে থাক।' যুবকটা লজ্জায় তাহার এই অদ্ভুত দীক্ষার রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না এবং সে সাধ্যানুসারে তাহার গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিল। এইরূপে এক নাককাটা সাধু-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়া সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিল। তুমি কি আমাকেও এইরূপ আর একটী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দেখিতে চাও?"

ইহার অনেক পরে যখন তিনি অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে ছিলেন, ঐ বিষয়ে আর একবার প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "তুমি কি মনে কর, স্থূলদেহ দ্বারাই কেবল অপরের উপকার সম্ভব? একটী মন শরীরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া অপর মনসমূহকে সাহায্য করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব বিবেচনা কর না?"

অপর কোন সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি এত বড় একজন যোগী, তথাপি তিনি প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য উপদিষ্ট শ্রীরঘুনাথজীর মূর্ত্তিপূজা, হোমাদি কর্ম্ম করেন কেন? তাহাতে এই উত্তর হইল, "সকলেই নিজের কল্যাণের জন্যই কর্ম্ম করে, একথা তুমি ধরিয়া লইতেছ কেন? একজন কি অপরের জন্য কর্ম্ম করিতে পারে না?"

তার পর সকলেই সেই চোরের কথা শুনিয়াছেন—সে তাঁহার আশ্রমে চুরী করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই সে ভীত হইয়া চুরি করা জিনিষের পোটলা ফেলিয়া পলাইল। সাধু সেই পোঁটলা লইয়া চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর জোরে দৌড়িয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, শেষে তাহার পদপ্রান্তে সেই পোঁটলা ফেলিয়া দিয়া করযোড়ে সজল নয়নে তাঁহার নিজকৃত ব্যাঘাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ও অতি কাতরভাবে সেই গুলি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এগুলি আমার নহে, তোমার।"

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরও শুনিয়াছি, একবার তাঁহাকে গোখরো সাপে দংশন করে এবং যদিও কয়েক ঘণ্টার জন্য সকলে তাঁহাকে মৃত বলিয়াই স্থির করিয়াছিল, কিন্তু শেষে তিনি পুনরায় বাঁচিয়া উঠেন, আর তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ও সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে "তিনি বলেন, "ঐ গোখরো সাপটী আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূতস্বরূপে আসিয়াছিল (পাহন দেওতা আয়া)।"

আর আমরা ইহা অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারি, কারণ, আমরা জানি, তাঁহার স্বভাব কিরূপ প্রগাঢ় নম্রতা, বিনয় ও প্রেমে ভূষিত ছিল। সর্ব্বপ্রকার পীড়া তাঁহার নিকট সেই 'প্রেমাস্পদের নিকট হইতে দূতস্বরূপ' (পাহন „দেওতা) ছিল, আর যদিও তিনি ঐ সকল হইতে তীব্র পীড়া পাইতেন, তথাপি অপর লোকে পর্য্যন্ত ঐ পীড়াগুলিকে অন্য নামে অভিহিত করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

এই অনাড়ম্বর প্রেম ও কোমলতা চতুর্দ্দিকস্থ লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল, আর যাঁহারা ইহার চারিদিকের পল্লীগুলিতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই অদ্ভুত ব্যক্তির নীরব শক্তিবিস্তারের সাক্ষ্য দিতে পারেন।

শেষাশেষি তিনি আর লোকজনের সঙ্গে দেখা করিতেন না। যখন মৃত্তিকা-নিম্নবর্ত্তী গুহা হইতে উঠিয়া আসিতেন, তখন লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেন বটে, কিন্তু মধ্যে দ্বার রুদ্ধ থাকিত। তিনি যে গুহা হইতে উঠিয়াছেন, তাহা হোমের ধূম দেখিয়া অথবা পূজার আয়োজনের শব্দে বুঝা যাইত।

তাঁহার একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি কোন সময়ে যে কার্য্য করিতেন, তাহা যতই তুচ্ছ হউক, তাহাতেই সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া যাইতেন। শ্রীরামচন্দ্রজীর পূজায় তিনি যেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দিতেন, একটী তাম্রকুণ্ড মাজিতেও ঠিক তাহাই করিতেন। তিনি যে আমাদিগকে কর্ম্মরহস্য সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন, "যন সাধন তন সিদ্ধি" অর্থাৎ 'সিদ্ধির উপায়কেও এমন ভাবে আদরযত্ন করিতে হইবে, যেন উহাই সিদ্ধিস্বরূপ,' তিনি নিজেই তাহার উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন।

তাঁহার বিনয়ও কোনরূপ কষ্ট যন্ত্রণা বা আত্মগ্লানিময় ছিল না। একবার তিনি আমাদিগের নিকট অতি সুন্দরভাবে নিম্নলিখিত ভাবটী ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—"হে রাজন্, সেই প্রভু ভগবান্, অকিঞ্চনের ধন—হাঁ, তিনি তাহাদেরই, যাহারা কোন বস্তুকে এমন কি, নিজের আত্মাকে পর্য্যন্ত আমার বলিয়া অধিকার করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে"—এই ভাবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াই তাঁহার স্বভাবতঃই এই বিনয় আসিয়াছিল।

তিনি সাক্ষাৎভাবে উপদেশ দিতে পারিতেন না, কারণ, তাহা হইলেই নিজে আচার্য্যের পদ লওয়া হইল এবং নিজেকে অপরাপেক্ষা উচ্চতর আসনে বসান হইল। কিন্তু একবার তাঁহার হৃদয়-প্রস্রবণ খুলিয়া গেলে তাহা হইতে

অনন্ত জ্ঞান-বারি উছলিতে থাকিত, তথাপি উত্তরগুলি সব সাক্ষাৎভাবে না হইয়া পরোক্ষভাবে হইত।

তাঁহার আকার দীর্ঘ ও মাংসল ছিল, তিনি একচক্ষু ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃত বয়সাপেক্ষা তাঁহাকে অল্পবয়স্ক দেখাইত। তাঁহার তুল্য মধুর স্বর আমরা আর কাহারও শুনি নাই। তাঁহার জীবনের শেষ দশ বর্ষ বা ততোধিক কাল তিনি সম্পূর্ণরূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত ছিলেন। তাহার গৃহদ্বারের পশ্চাতে গোটাকতক আলু ও একটু মাখম রাখিয়া দেওয়া হইত, কখন কখন যখন তিনি সমাধিতে না থাকিতেন, তখন রাত্রে উহা লইতেন। গুহার মধ্যে থাকিলে ইহাও তাঁহার প্রয়োজন হইত না।

এইরূপে যোগশাস্ত্রের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ এবং পবিত্রতা, বিনয় ও প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ এই নীরব জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধূম দেখিলেই তিনি সমাধি হইতে উঠিয়াছেন বুঝা যাইত। একদিন উহাতে পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকস্থ লোকে কিছু স্থির করিতে পারিল না। শেষে গন্ধ অসহ্য হইয়া উঠিল আর পুঞ্জীকৃত হইয়া ধূম উঠিতেছে দেখা গেল। শেষে তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল—দেখিল, সেই মহাযোগী আপনাকে তাঁহার হোমাগ্নিতে শেষ আহুতি-স্বরূপ দিয়াছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার দেহ ভস্মাবশিষ্ট হইল।

আমাদিগকে এখানে কালিদাসের সেই বাক্য স্মরণ করিতে হইবে,—

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং।
নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং॥

—কুমারসম্ভব।

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন, কারণ, সেই কার্য্যগুলি অসাধারণ এবং উহাদের কারণও লোকে ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না।

তথাপি আমরা তাঁহাকে জানিতাম বলিয়া আমরা তাঁহার এই কার্য্যের কারণ সম্বন্ধে একটী আনুমানিক সিদ্ধান্ত বলিতে সাহসী হইতেছি। আমাদের বোধ হয়, মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ সময় আসিয়াছে, তখন তিনি এমন কি, মৃত্যুর পরেও যাহাতে কাহাকেও কষ্ট দিতে না হয়, তজ্জন্য সম্পূর্ণ সুস্থশরীরে ও সুস্থমনে আর্য্যোচিত এই শেষ আহুতি দিলেন।

বর্ত্তমান লেখক এই পরলোকগত মহাত্মার নিকট গভীরভাবে ঋণী—তজ্জন্য তদীয় প্রেমাস্পদ ও তৎসেবিত, শ্রেষ্ঠতম আচার্য্যদিগের মধ্যে অন্যতম এই মহাত্মার উদ্দেশে, তাঁহার অযোগ্য হইলেও পূর্ব্বলিখিত কয়েক পংক্তি তৎকর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল।

বেদ ও বেদ্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মন্।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন, সূক্ষ্মতম বিচিত্র-যন্ত্র-বিশিষ্ট প্রাণপঙ্কাখ্য সপ্রাণ পদার্থ হইতে ক্রমবিকাশন্যায়ে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিবিধ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা জগতে যত প্রকার স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীব-শরীর দেখিতে পাই, তাহা এক আদিম জীবের সন্তানসন্ততিগণের শরীরের বিশেষ বিশেষ অবস্থাগত ক্রমপরিণাম মাত্র। ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত ল্যামার্ক (Lamark) সর্ব্বপ্রথমে এইরূপে জীবাবতরণের ক্রম ঘোষণা করেন। পরে ডারুবিন (Darwin), ওয়ালেস (Wallace), স্পেন্সার (Spencer), হ্যাকাল (Hackel) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এতন্মতবাদকে পরিমার্জ্জিত করিয়া পূর্ণভাবে প্রচার করিয়া দেন। ডারুবিন, স্পেন্সার প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন, "কোন অবিজ্ঞেয় নিয়মানুসারে জড় শক্তি হইতে প্রথমে সপ্রাণ পদার্থের আবির্ভাব হয়। পরে জীবনসংগ্রামে স্বীয় সত্তা অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিবার ও স্ববংশ বিস্তার করিবার অনুক্ষণ চেষ্টার ফলে অবনীতলে বিবিধ জীবের অভ্যুদয় হইয়াছে। জীবের বংশবৃদ্ধি জ্যামিতিক অনুপাতে (Geometrical ratio) হইয়া থাকে। জীবের বংশবৃদ্ধির পথ যদি বাধাবিঘ্নশূন্য হয়, ডারুবিন বলেন, তাহা হইলে কেবলমাত্র এক যুগ্ম কপোতের সন্তান-সন্ততির দ্বারা অতি অল্প-কালেই সমগ্র ধরাতল ছাইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না। কারণ, বংশবিস্তারের পথ নিতান্ত কণ্টকবিহীন নহে। বংশবৃদ্ধির সহিত বংশরক্ষার উপযোগী আহার ও আবাসভূমি নিতান্ত প্রয়োজন। পুরাকালোদ্ভূত আদিম জীবের বংশবিস্তার এতই অধিক হইয়াছিল যে, তদ্রক্ষণোপযোগী আহার ও আবাসভূমি বাছিয়া লওয়া তাহার পক্ষে অতি কঠিন সমস্যা হইয়াছিল। কাজেই তদ্বংশগত প্রত্যেক ব্যক্তির স্ব স্ব অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিবার চেষ্টায়

অল্পকাল-মধ্যেই তাহাদের আপনাদিগের মধ্যে সংগ্রাম বাধিল। প্রয়োজনীয় ভোজ্য বস্তুর অভাবে, উপযুক্ত বাসভূমির অনটনে সকলেই যে দুর্ব্বার জীবন সংগ্রামে যোগদান করিবে, ইহা সুখবোধ্য। সংগ্রামে যাহারা বলবান্, প্রকৃতি তাহাদেরই বিজয়মাল্যে বিভূষিত করেন। পণ্ডিতেরা বলেন, সকলকেই প্রকৃতিদেবী স্বীয় অঙ্কে আশ্রয় প্রদান করেন; কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি তিনি বিমুখ; সুতরাং তাহারা যে অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? দুর্ব্বলেরা অকালে কালকবলে পতিত হইলেও জীবন-সংগ্রামের শান্তি নাই, কেননা এদিকে সবলের বংশবিস্তার জ্যামিতিক অঙ্কপাতে অতীব ত্বরিত মাত্রায় চলিতে লাগিল।

প্রকৃতি ক্রম পরিনামিণী। দেশকালাদি নিমিত্ত কারণের পরিবর্ত্তনের সহিত সবলেরা, সমরক্ষেত্রে অবতরণান্তর বহুদর্শিতার ফলে যে সমূহ জ্ঞান ও গুণগ্রাম অর্জ্জন করিয়াছিল, তৎসমুদয় আপনাদিগের নবজাত অপত্যে সংক্রামিত করিল এবং অপত্যগণও আবার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণগ্রামে বলীয়ান্ হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া সোপার্জ্জিত বিবিধ গুণে বিভূষিত হইলেও স্বীয় জীবন নূতনাবস্থার উপযোগী ভাবে চালিত করিয়া জীবন-সংগ্রামে পুনর্বায় বিজয়-মুকুট লাভ করিল। কিন্তু যাহারা ঐরূপ নূতনাবস্থার উপযোগী ভাবে চলিতে পারিল না, দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন তাহারা প্রকৃতি দেবীর আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইল এবং কালে তাহাদের অধোগতি বা এককালে বিনাশ হইল। প্রকৃতি দেবীর এবম্বিধ নিগ্রহানুগ্রহকেই মহামতি ডারবিন, 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই ডারবিনের মতে সর্ব্বপ্রকার জাত্যন্তরপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ।

'ডারুবিনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন'কে পণ্ডিত স্পেন্সার 'জীবন-সংগ্রাম ও যোগ্যতমের পরিত্রাণ' এই নাম প্রদান করিয়াছেন। অনেকেই ডারুবিনের 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' স্পেন্সার-ব্যাখ্যাত 'জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন' হইতে বিভিন্ন সামগ্রী রূপে অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু উহা ভ্রম। উভয়ই এক ও সমান পদার্থ। মহামতি ডারুবিনও নিজ লেখনী-মুখে একথা স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত স্পেন্সারও বলিয়াছেন, জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতম হইবার চেষ্টাই জাত্যন্তরপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ।

জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী হইবার চেষ্টাতেই জীব জাত্যন্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাষ আমরা উপরে প্রদান করিয়াছি। ঐ চেষ্টার মধ্যে আমরা দুইটি জিনিষ অবলোকন করিয়া থাকি। তন্মধ্যে একটী সন্ততি-প্রবণতা

(Principle of Heridity) এবং অপরটি সঙ্গতি-প্রবণতা (Principle of Adaptation)। সন্ততি-প্রবণতার সাহায্যে পিতার ধর্ম্ম ও গুণগ্রাম পুত্রে সংক্রামিত হয় এবং সঙ্গতি-প্রবণতায় জীব আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশকালাগত অবস্থার উপযোগী করিতে সক্ষম হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতি নিত্য পরিণামিনী। ক্রম-পরিণাম-প্রাপ্তিই প্রকৃতির ধর্ম্ম। দেশাদি নিমিত্ত কারণের পরিবর্ত্তন সহিত জীবের পরিপার্শ্বস্থ অবস্থার নিশ্চয়ই বিভেদ ঘটিয়া থাকে। সঙ্গতি-প্রবণতা-সাহায্যে জীব আপনাকে পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া লয় এবং তৎফলে তাহার শরীরও যথা-প্রয়োজন পরিবর্ত্তিত হইয়া দুর্ব্বার জীবন-সংগ্রামে বিজয়লাভ করে ও বংশবিস্তারে সক্ষম হইয়া থাকে। সন্ততি-প্রবণতা-সাহায্যে জীব পৈত্রিক ধর্ম্ম ও গুণগ্রাম উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সঙ্গতি-প্রবণতার সাহায্যে তাহার শরীর, নব নব অবস্থানুরূপ রূপান্তরিত হইয়া থাকে। অতএব জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতম হইবার চেষ্টার মুখে আধুনিক জীব যে প্রথমোৎপন্ন জীব হইতে বিভিন্নরূপবিশিষ্ট হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। ক্রমবিকাশবাদীরা বলিয়া থাকেন, প্রথমোৎপন্ন এক আদি জীব হইতে এইরূপেই বিবিধ জীবশরীরের আবির্ভাব হইয়াছে। এই জন্যই মহামতি ডারুবিন, তাঁহার 'জাত্যন্তরোৎপত্তি' (Origin of Species) নামক পুস্তকের উপসংহারে বলিয়াছেন :—

Thus from the war of nature, from famine and death, the most exalted objects we are capable of conceiving, namely, the production of higher animal follows. There is a grandeur in this view of life with its several powers having been originally breathed by the Creator into a *few forms* of life or into *one* and that whilst this planet has gone cycling on *according to the fixed law of gravity, from so simple a* beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved—*Origin of Species* by Darwin.

ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এ।]

বেলুড়ে, শ্রীযুক্ত নীলাম্বর বাবুর বাগানে স্বামীজি মঠ উঠাইয়া আনিয়াছেন। আলমবাজার হইতে এখানে উঠিয়া আসা হইলেও জিনিস্-পত্র এখনো সব গুছানো হয় নাই; ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। স্বামীজি এই নূতন বাড়ীতে আসিয়া খুব খুসী হইয়াছেন। শিষ্যকে বলিতেছেন, "ছাথ্ কেমন গঙ্গা—কেমন বাড়ী—এমন স্থানে মঠ হ'লে ভাল হয়—না?" শিষ্য স্বামীজিকে বল্‌ছে, "তবে এখানেই কি স্বামী মঠ হবে?"

স্বামীজি—কি জানি ঠাকুরের কি ইচ্ছা! (তখনো মঠের জমি খরিদ হয় নি)।

আজ সন্ধ্যার পর স্বামীজি দোতালার ঘরে শিষ্যের সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন; নানা প্রসঙ্গ হইতেছে। ঘরে আর কেহই নাই। শিষ্য মধ্যে মধ্যে উঠে স্বামীজিকে তামাক সেজে দিতেছে। শিষ্য কথায় কথায় স্বামীজির বাল্যকালের বিষয় জানিতে চাহিতেছে। স্বামীজি বল্‌ছেন, "অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে, নৈলে কি নিঃসম্বলে দুনিয়া ঘুরে আস্‌তে পাত্তুম রে?"

বলিলেন—পাঠ্যাবস্থায় দিনের বেলায় তিনি সমবয়স্কদিগের সহিত কেবল আমোদ প্রমোদ করিয়াই বেড়াইতেন। রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে পড়া শুনা কত্তেন। তিনি যে কখন পড়া শুনা করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না।

ছেলেবেলায় তাঁর রামায়ণ গান শুনিবার বড় ঝোঁক ছিল। পাড়ার নিকটবর্ত্তী যেখানেই রামায়ণ গান হইতেছে, স্বামীজি তথায় নিশ্চয়ই উপস্থিত আছেন। বলিলেন—রামায়ণ শুন্‌তে শুন্‌তে এক এক দিন তন্ময় হ'য়ে বাড়ী ঘর ভুলে যেতেন এবং 'রাত হয়েছে' বা 'বাড়ী যেতে হবে' ইত্যাদি কোন বিষয়ের খেয়াল থাকৃত না। ঐ সময়ে একদিন রামায়ণ গানে শুনিলেন—হনুমান্ কলাবাগানে থাকে। অমনি এমন বিশ্বাস হ'ল যে, সে রাত্রে রামায়ণ গান শুনে ঘরে না ফিরে বাটীর নিকটে কোন এক বাগানে কলা গাছতলায় অনেকক্ষণ হনুমানের দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রামায়ণের মধ্যে হনুমানের প্রতি স্বামীজির অগাধ ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী হইবার পরেও মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথা

খুব মাতোয়ারা হইয়া বলিতেন এবং মঠে মহাবীরের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি রাখিবার সঙ্কল্প করিতেন।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছে—"মশায়, আপনি কখন কোনরূপ Vision দেখিতেন কি?'

স্বামীজি—স্কুলে পড়্‌বার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল। কতক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যান করেছিলাম বল্‌তে পারি না। ধ্যান শেষ হ'ল—তখনও বসে আছি—এমন সময় ঐ ঘরের দক্ষিণ দেয়াল ভেদ ক'রে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি বাহির হ'য়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

শিষ্য—কি রকম মূর্ত্তি?

স্বামীজি—দেখ্‌লুম মুখে অদ্ভুত জ্যোতিঃ অথচ যেন কোন ভাব নাই। মহা শান্ত সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি। মুণ্ডিত মস্তক, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। যেন আমায় কিছু বল্‌বেন, এইরূপ ভাব। আমিও অবাক্ হয়ে তাঁর পানে চেয়েছিলাম। তারপর কেমন একটা মনে ভয় এলো—তাড়াতাড়ি দোর খুলে ঘরের বাহিরে গেলাম। তার পর মনে হ'ল, কেন এমন নির্ব্বোধের মত ভয়ে পালালাম, হয় ত তিনি কিছু বল্‌তেন। আর কিন্তু সে মূর্ত্তির কখন দেখা পাই নাই। কতদিন মনে হয়েছে, যদি তাঁর ফের দেখা পাই ত এবার আর ভয় কর্‌ব না—তাঁর সঙ্গে কথা কহিব। কিন্তু আর দেখা পাই নাই।

শিষ্য—তারপর এ বিষয় কিছু ভেবেছিলেন কি?

স্বামীজি—ভেবেছিলাম ঢের, কিন্তু ভেবে চিন্তে কিছু কুল কিনারা কর্‌তে পারি নাই। এখন বোধ হয়, ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।

শিষ্য অবাক্ হ'য়ে স্বামীজির কথামৃত পান করিতেছে। খানিক বাদে স্বামীজি বল্‌ছেন—"মন শুদ্ধ হ'লে, কামকাঞ্চনে বীতস্পৃহ হলে কত Vision দেখা যায়—অদ্ভুত, অদ্ভুত। তবে ওতে খেয়াল রাখ্‌তে নাই। ঐ সকলে দিন রাত মন থাক্‌লে সাধক আর অগ্রসর হ'তে পারে না। শুনেছিস্ না ঠাকুর বল্‌তেন—'কত মণি প'ড়ে আছে চিন্তামণির নাচ্ দুয়ারে।' আত্মাকে সাক্ষাৎ কর্ত্তে পার্‌লে আর কি ও সব খেয়ালে মন যায় রে?"

শিষ্য শুনিয়াছিল, স্বামীজি ছেলেবেলা হ'তে নিদ্রার পূর্ব্বে এবং স্থিরচিত্তে কোনও বিষয় ভাবিতে যাইলেই ভ্রূযুগ-মধ্যে অদ্ভুত জ্যোতিঃ দেখ্‌তেন। সে কথা এখন জিজ্ঞাসা করায় কোন উত্তর পাইল না। দেখিল, স্বামীজি যেন কোন বিষয় তন্ময় হইয়া ভাবিতেছেন; কতক্ষণ এইরূপে মৌন হইয়া অবস্থান করিলেন। তারপর

বল্লেন—"দেখ্! এমেরিকায় অবস্থানকালে আমার কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। কিন্তু সে শক্তি বেশী দিন ছিল না। লোকের চোক্ দেখে ভেতরটা সব বুঝ্‌তে পাত্তুম—মুহূর্ত্তের মধ্যে। কে কি ভাব্‌ছে—না ভাব্‌ছে, করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হ'য়ে যেত। কারোকে কারোকে বলে দিতুম; যাদের যাদের বল্‌তুম, তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেলা হ'য়ে যেত; আর যারা খারাপ লোক, তারা ঐ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর আমার দিক্‌ও মাড়াত না।"

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন—"যখন চিকাগো প্রভৃতি সহরে বক্তৃতা সুরু কল্লুম, তখন সপ্তাহে ১২।১৪ টা কখনও বা আরো বেশী লেকচার দিতে হ'ত; অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে মহাক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌লুম্। যেন বক্তৃতার বিষয় সব ফুরিয়ে যেতে লাগ্‌লো। ভাব্‌তুম—কি করি, কাল আবার কোথা হ'তে কি নূতন কথা বল্‌বো? ভাব আর ভাষা যেন জুট্‌ত না। একদিন বক্তৃতার পর শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছি, তাইত এখন কি উপায় করা যায়? ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটু তন্দ্রার মত এলো। সেই অবস্থায় শুনতে পেলুম, কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা কচ্ছে; কত নূতন ভাব, নূতন কথা—সে সব যেন ইহজন্মে শুনি নাই, ভাবি নাই। ঘুম থেকে উঠে সেগুলি নোটবুকে নোট্ কল্লুম, আর বক্তৃতায় তাইই বল্লুম। এমন যে কত দিন ঘটেছে, তার সংখ্যা নাই। শুয়ে শুয়ে এমন বক্তৃতা কতদিন শুনেছি। কখনো বা এত জোরে জোরে বক্তৃতা হ'ত যে, অন্য ঘরের লোক আওয়াজ পেত ও পরদিন আমায় বলত, 'স্বামীজি, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে অত জোরে কথা কচ্ছিলেন?' আমি তাদের সে কথা কোনরূপে কাটিয়ে দিতুম। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড।" শিষ্য স্বামীজির কথা শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল। অবশেষে বলিল—"মশায় আপনিই সূক্ষ্মদেহে ঐরূপে বক্তৃতা করিতেন এবং স্থূলদেহে তার প্রতিধ্বনি মাত্র হইত।"

স্বামীজি শিষ্যের ঐ কথায় বলিলেন—"তা হবে।" এমেরিকার কথায় বল্লেন—"সে দেশের পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অধিক শিক্ষিতা। বিজ্ঞান দর্শনে তারা সব মহা পণ্ডিতা; তাই তারা আমার অত খাতির করেছে। পুরুষগুলো দিন রাত খাট্‌ছে, বিশ্রামের সময় নাই; মেয়েরা স্কুলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা ক'রে মহা বিদুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমেরিকার যে দিকে চাইবি, কেবল মেয়েদের রাজত্ব।"

শিষ্য—আচ্ছা মশায়, গোঁড়া ক্রিশ্চানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই?

স্বামীজি—হয়েছিল বৈকি! আবার যখন লোকে আমার বড় খাতির কত্তে

লাগ্‌লো, তখন পাদ্রিরা আমার পেছনে খুব লাগ্‌লো। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ কত্তে বল্‌তো। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য কত্তুম না। আমার বিশ্বাস—চালাকী দ্বারা জগতে কোন মহৎ কার্য্য হয় না; তাই ঐ সকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না ক'রে ধীরে ধীরে আপনার কায করে যেতুম। অবশেষে দেখ্‌তে পেলুম, যারা আমায় অযথা গাল-মন্দ কর্‌তো, তারা অনুতপ্ত হ'য়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে তা' Contradict ক'রে ক্ষমা চাহিত। কখন কখন এমনও হয়েছে—আমায় কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐ সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়ী-ওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ ক'রে কোথায় চ'লে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভাঁ—কেউ নাই! আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জান্‌তে পেরে অনুতপ্ত হ'য়ে আমার চেলা হতে এসেছে। বাবা, জানিস্, সংসারে সবই দুনিয়া-দারী। ঠিক্ সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি তোর এ সব দুনিয়াদারীতে ভোলেরে বাপ্! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক্, আমার কর্ত্তব্যকার্য্য ক'রে চ'লে যাব—এই জান্‌বি বীরের কায। নতুবা এ কি বল্‌ছে, ও কি লিখ্‌ছে, এ সব নিয়ে দিন রাত থাক্‌লে, জগতে কোন মহৎ কার্য্য করা যায় না।' সেই শ্লোক জানিস্ নি:—

> "নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
> লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
> অদ্যৈব মরণমস্তু যুগান্তরে বা
> ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥"

লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক্ বা না হোক্, আজ বা যুগান্তে তোর দেহপাত হোক্, যেন ন্যায়পথ থেকে ভ্রষ্ট হোস্‌নি। কত ঝড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌছান যায়। যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টি পাথরে তার জীবন ঘ'সে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় ব'লে স্বীকার করেছে। যারা ভীরু, কাপুরুষ, তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডুবায়। মহাবীর কি কিছুতে দৃক্‌পাত করে রে বাপ্? যা হবার হোক্ গে, আমার ইষ্টলাভ আগে কর্‌বোই কর্‌বো—এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না থাক্‌লে শত দৈবেও তোর জড়ত্ব দূর কর্ত্তে পারে না।

শিষ্য—তবে দৈবে নির্ভরতা কি দুর্ব্বলতার চিহ্ন?

স্বামীজি—শাস্ত্রে নির্ভরতাকে পঞ্চম পুরুষার্থ ব'লে নির্দ্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যেভাবে দৈব দৈব করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন, মহাকাপুরুষতার পরিণাম, কিম্ভুতকিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা ক'রে তার ঘাড়ে নিজের দোষ চাপানর চেষ্টামাত্র। ঠাকুরের সেই গোহত্যাপাপের গল্প শুনেছিস্ ত? সেই গোহত্যাপাপে শেষে বাগানের মালীককেই মর্‌তে হ'লো।

শিষ্য—মশায়, আজকাল অনেকে বলে কিনা—"যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি।" এই ব'লে পাপ পুণ্য দুইই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নিজে যেন পদ্মপত্রের জল!

স্বামীজি—সর্ব্বদা এ ভাবে থাক্‌তে পার্‌লে ত সে মুক্ত। কিন্তু ভালোর বেলা "আমি" আর মন্দের সময় "তুমি"—বলিহারী তাদের দৈবে নির্ভরতায়! পূর্ণ প্রেম বা জ্ঞান না হ'লে নির্ভরের অবস্থা হ'তেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ ভেদবুদ্ধি থাকে না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের ভিতর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের ভিতর) ইদানীং—নাগ মহাশয়।

বলিতে বলিতে নাগ মহাশয়ের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। তখনো নাগ মহাশয় শরীরে বর্ত্তমান আছেন। তাঁর কথায় স্বামীজি বল্লেন—"ওরে অমন অনুরাগী ভক্ত কি আর দুটী দেখা যায়, আহা তাঁর সঙ্গে কবে দেখা হবে!"

শিষ্য—তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় আপনাকে দর্শন কত্তে আস্‌বেন ব'লে মা ঠাকরুণ (নাগ মহাশয়ের পত্নী) আমায় চিঠি লিখেছেন।

স্বামীজি—ঠাকুর তাঁকে জনক রাজার সাহত তুলনা কত্তেন। অমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষের দর্শন দূরে থাক্, কথা শোনাও যায় না। তাঁর খুব সঙ্গ কর্‌বি। তিনি আমাদেরই একজন অন্তরঙ্গ।

শিষ্য—মশায়, তাঁকে ওদেশে অনেকে পাগল ব'লে ঠাওরায়। আমি কিন্তু প্রথম দিন দেখেই তাঁকে সিদ্ধ মহাপুরুষ মনে করেছিলাম। তিনি আমায় বড় ভালবাসেন ও কৃপা করেন।

স্বামীজি—অমন মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করেছিস, তবে আর ভাবনা কিসের? বহু জন্মের তপস্যা থাক্‌লে তবে ও সব মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়। নাগ মহাশয় বাড়ীতে কিরূপে থাকেন?

শিষ্য—মশায়, কায কর্ম্ম ত দেখি না। কেবল অতিথিসেবা নিয়ে আছেন। পাল বাবুরা যে কটী টাকা দেন, তাই ত গ্রাসাচ্ছাদনের সম্বল। কিন্তু খরচ পত্র একটা বড় লোকের বাড়ীতে যেমন হয়, তেম্নি। তা কিন্তু নিজের ভোগের জন্য

নয়—কেবল পরসেবার্থ। সেবা—সেবা—এই তাঁর জীবনের মহাব্রত ব'লে মনে হয়। যেন ভূতে ভূতে আত্মদর্শন ক'রে তিনি অভিন্ন জ্ঞানে জগতের সেবা করিতে ব্যস্ত আছেন। সেবার জন্ম নিজের শরীরটাকে শরীর ব'লে জ্ঞান করেন না—যেন বেহুঁষ্। বাস্তবিক তাঁর শরীর-জ্ঞান আছে কি না, আমার সন্দেহ হয়। আপনি যাকে Super-conscious অবস্থা বলেন, আমার বোধ হয়, তিনি সর্ব্বদা সেই অবস্থায় অবস্থান করেন।

স্বামীজি—তা না হবে কেন? ঠাকুর তাঁকে কত ভালবাস্তেন! তোদের বাঙ্গাল দেশে এবার ঐ একটী ঠাকুরের সঙ্গী এসেছেন। তাঁর আলোতে পূর্ব্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে।

কথা হ'তে হ'তে রাত্রি অধিক হইল, মঠে মহাপ্রসাদের ঘণ্টা পড়িল। শিষ্য স্বামীজির সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীউপেন্দ্রনাথ মোদক বি, এ।

পরমাণুবাদিগণ (Atomists)।

কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া যদি কখনও সাপ বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে লোকে ইহাই বুঝিয়া থাকে যে, ঘটনাটা খননকারীর অভিপ্রায়ানুযায়ী হয় নাই। কেহ উদ্যোগ করিয়া মৎলব ফাঁদিয়া এরূপ দুর্ঘটনা ঘটাইবার আয়োজন করে না। তবে সংসারে এমন লোকও দেখা যায়, যারা স্বেচ্ছায় ঐরূপ কাযও করে। ইঁহারাই সাধারণের নিকট দার্শনিক বলিয়া খ্যাত। ইঁহারা বলেন—চিন্তাসমুদ্রের তল নাই; যে যত বেশী দূর তলাইতে পারিবে, সে তত বহুমূল্য রত্ন লাভ করিবে। ইঁহারা দূরদর্শী, তাই ইঁহাদের চক্ষে কিছুই ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় না অথবা নিতান্তই যদি কিছু ইঁহাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ইঁহারা নিজ নিজ দৃষ্টি-শক্তিকেই ঐ ব্যাপারের জন্ম দোষী মনে করেন।

জগতে পরিবর্ত্তন-পরম্পরা ও ঘটনা-বৈচিত্র্য ত অনেক দিন ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল। লোকে উহা "ঐরূপই হইয়া থাকে" বলিয়া বহুকাল নিঃসংশয়-চিত্তে চোখ

বৃত্তিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু উহাই প্রথম গ্রীক-দার্শনিকগণের মনে অশান্তি উৎপাদন করিল। এই সর্ব্বজন-পরিচিত জগদ্ব্যাপারকে তাঁহারা এক অদ্ভুত অপরিচিত আকারে দেখিতে লাগিলেন এবং কিরূপে উহার উৎপত্তি হইতে পারে, এই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে অনেক চিন্তার পর স্থির হইল যে, এক আদি উপাদান নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই বর্ত্তমান জগৎরূপ বিচিত্র অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। পাঠক অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা আইওনীয় দার্শনিকগণের কথা বলিতেছি। কিন্তু এক আদি উপাদানের পরিবর্ত্তনে এই জগৎ নির্ম্মিত—এ কথার মর্ম্ম, পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ অনেক ভাবিয়াও সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিবর্ত্তন-ব্যাপারটা সর্ব্বৈব মিথ্যা, অথবা উহাই এক অদ্বিতীয় সত্য, এ বিষয় লইয়া এক ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। দুই বিরোধী দল দুই বিরুদ্ধ মত লইয়া মাথা খাড়া করিলেন এবং গ্রীক্-দর্শনের প্রথম যুগে এই প্রশ্নই একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। ইলিয়্যাটিক্‌গণ বলিলেন—এক, অদ্বিতীয়, নিত্য পদার্থ বর্ত্তমান—তাহাই 'অস্তি' বা সৎবস্তু; পরিণাম পরিবর্ত্তন—অলীক, আকাশকুসুম মাত্র। 'অস্তি'ই যখন অদ্বিতীয়, অন্য-ব্যতিরিক্ত সদ্বস্তু, তখন 'নাস্তি'টা শূন্য বা অবকাশ মিথ্যা; এবং আমরা জগতে যে ভেদ দেখিতে পাই, গতি ও পরিমাণই তাহার মূল। কারণ, পরিমাণে ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, ইহা দেখিয়াই আমরা এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরকে পৃথক্ করি, এবং গতিশক্তিও কোন কোন পদার্থের অবস্থান্তর ঘটাইয়া তাহাকে অন্য পদার্থ হইতে ভিন্ন করিয়া তোলে। কিন্তু অবকাশ (void) না থাকিলে আবার গতি বা পরিমাণ কিছুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কারণ, দেশ বস্তুটি যদি পদার্থের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত থাকে এবং উহা যদি একেবারে অবকাশ, শূন্য বা মিথ্যা হয়. তাহা হইলে কি করিয়া পদার্থ সকলের পরিমাণ কল্পনা করা যাইতে পারে এবং এরূপ অবস্থায় গতিই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি কোন পদার্থ একদেশ পরিত্যাগ করিয়া পদার্থান্তরের দ্বারা অব্যাপ্ত অপর দেশাংশ অধিকার করে, তাহা হইলেই গতি উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয়। কিন্তু যখন দেশ বা অবকাশের একান্ত অভাবই স্বীকৃত হইল, তখন গতির সম্ভাবনা আদৌ নাই—একথাও স্বীকার করিতে হয়। অতএব বলিতে হইবে, সদ্বস্তু যদি এক নিরবচ্ছিন্ন, পূর্ণ নিত্য পদার্থ হয়, * তাহা হইলে অভাবরূপী অবকাশ

* অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, যথাস্থানে উল্লেখ করি নাই বলিয়াই এত বড় আবশ্যকীয় কথাটা একটু বিশদ ভাবে বলা আবশ্যক মনে করিলাম। ইলিয়্যাটিক্‌গণ এক অদ্ভুত যুক্তির আশ্রয়

অসৎ। হেরাক্লাইটাস্ বলিলেন—পরিবর্ত্তনই জগতে একমাত্র সত্য ঘটনা ; নিত্য, সৎ পদার্থের কল্পনা করিয়া আমরা বৃথা প্রতারিত হই। সৎ বা 'অস্তি' বলিয়া কিছুই নাই। নিত্য বস্তু অর্থহীন প্রলাপ বাক্য, যদি কিছু নিত্য থাকে, তবে পরিণতি-ব্যাপারই নিত্য, আর সব মিথ্যা। এই দুই বিরোধী মত সমন্বয় করিতে আসিয়া এম্পিডক্লিস্ বলিলেন যে, নিত্য সৎপদার্থ ও পরিবর্ত্তন-ব্যাপার, কিছুই মিথ্যা নয়, দুইই সত্য। তবে সৎপদার্থ এক নহে, বহু। বহু, নিত্য ভূতকণা-সমূহের সংযোগ ও বিয়োগে জাগতিক পদার্থনিচয়ের উৎপত্তি। এই সংযোগ-বিয়োগের কারণ-স্বরূপ তিনি আবার দুই শক্তি স্বীকার করেন। তাহা হইলে তাঁহার মতে প্রকৃত সৎপদার্থ দুই প্রকার—প্রথম, ভূতকণা সমূহ এবং দ্বিতীয়, পরিবর্ত্তনের মূলীভূত শক্তিযুগল। কিন্তু জগতের বৈচিত্র্য ও ভেদ রচনার জন্য এই দুই প্রকার সদ্বস্তু অঙ্গীকার করাই কি যথেষ্ট? পরমাণুবাদিগণ দেখিলেন—অবকাশের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে পদার্থগত ভেদ ও বহুত্বের মীমাংসা হইতেই পারে না। সেই জন্য পরমাণুবাদিগণ (Atomists) সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভূতকণা অথবা পরমাণু ও অবকাশ বা শূন্য (Void)—দুইই সৎ। এতদ্ভিন্ন পরমাণু-সমূহের সংযোজক ও বিয়োজক শক্তি নিত্যকাল ধরিয়া বিদ্যমান। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, ইলিয়াটিক্‌গণ ও পরমাণুবাদিগণ এক অভিন্ন মূল সত্য স্বীকার করিয়াও দুই বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালী কতকটা এইরূপ ; ইলিয়াটিক্‌গণ বলিলেন :—

করিয়া অবকাশের অসত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। যাহা সৎ, তাহা আছে ; যাহা অসৎ, তাহা নাই। অবকাশ পদার্থটি বস্তুমাত্রের 'অভাব'-বোধক অর্থাৎ 'কিছুই নয়'; অতএব উহাও অসৎ বা নাই। ইহা দেখিয়া বোধ হয় যে, ইলিয়াটিক্‌গণ বেদান্তে যাহাকে 'অসৎ' বলে, ন্যায়দর্শনে যাহাকে 'অভাব' বলে, এই দুইটির মধ্যে যে অর্থের পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ন্যায়দর্শনের মতে অভাবও এক প্রকার 'সৎ' পদার্থ বটে, তবে 'ভাব' পদার্থ নহে। এখানে একটী ঘট রহিয়াছে ঘটটী 'ভাব' পদার্থ। কিন্তু যখন এখানে ঘট নাই, তখন কি এখানে ঘট সম্বন্ধীয় কিছুই নাই? আছে, সেটী—ঘটের 'অভাব'। ঘটের 'অভাব' যখন 'আছে', তখন উহা 'সৎ'। অতএব অবকাশ বা শূন্য (Void) যদি 'অভাব'-বোধক হয়, তাহা হইলেও তাহা নাই, এরূপ বুঝিবার কারণ কি? যদি সত্যসত্যই অবকাশ অসৎ হয়, তাহা হইলেও যে যুক্তি দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, অন্ততঃ সে যুক্তির সাহায্যে ওরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

অবকাশ না থাকিলে গতি থাকিতে পারে না ;
অবকাশ নাই,
অতএব গতিও নাই।

পরমাণুবাদিগণ বলিলেন :—

অবকাশ না থাকিলে গতি থাকিতে পারে না ;
গতি আছে,
অতএব অবকাশও আছে।

এই উভয় যুক্তিপ্রণালী দেখিয়া পাঠক হয়ত বলিবেন—যে যুক্তিবলে দুই সম্প্রদায় এক মূল সৎপদার্থ স্বীকার করিলেন তাহা বুঝা গিয়াছে এবং যে যুক্তি অনুসারে ইলিয়্যাটিক্‌গণ স্থির করিলেন যে, অবকাশ নাই, তাহাও অবগত হইয়াছি ; কিন্তু কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পরমাণুবাদিগণ বলিলেন—'গতি আছে'? তাহার উত্তর এই যে, পরমাণুবাদিগণ—জগতে গতি ও পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা ও উহাই মীমাংসার বিষয়, উহার অপলাপ করিলে চলিবে কেন?

এই আলোচনার ফলে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, জগৎ-উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া জগৎকারণকে প্রথম ভাব-পদার্থরূপে ও পরে অভাব-পদার্থরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। অবশেষে পরমাণুবাদিগণ আসিয়া উহাকে ভাব ও অভাব, উভয়বিধ পদার্থরূপে কল্পনা করিলেন এবং এইরূপে ঐ ধরণের চিন্তাপ্রণালীর চরম উন্নতি সাধিত হইল।

মতপ্রবর্ত্তকগণ।

গ্রীসে থ্রেস্ এবং ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশদ্বয়ের সীমান্তভাগে অ্যাব্‌ডেরা (Abdera) নামক স্থানে আইওনীয়ার অধিবাসীরা এক উপনিবেশ স্থাপন করে। পরমাণুবাদ-প্রতিষ্ঠাতা লুসিপ্পাস্ (Leucippus) ও ডেমক্রাইটাসের (Democritus) নামের সহিত জড়িত হইয়া এই স্থান পুরাকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কারণ, যদিও লুসিপ্পাস্ খুব সম্ভবতঃ মিলেটাস্ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যদিও ইলিয়ানগরে কুশাগ্রবুদ্ধি ইলিয়্যাটিক্ দার্শনিক জেনোর (Zeno) নিকট তাঁহার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়, তথাপি তিনি অ্যাব্‌ডেরা নগরেই নিজ মত প্রচারের জন্য অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্যাপৃত হন এবং তথায়ই দেহ ত্যাগ করেন। ডেমক্রাইটাস্ তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য

ছিলেন। কিন্তু শিষ্য ক্রমে এরূপ প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন যে, গুরুর নাম শিষ্যের মহিমায় একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। একথাও সত্য যে, লুসিপ্পাস্ পরমাণুবাদের সূচনামাত্র করিয়া গিয়াছিলেন—উহার শৃঙ্খলা-বিধান, পুষ্টি ও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্তি ডেমক্রাইটাসের প্রগাঢ় মনস্বিতার দ্বারাই সম্ভাবিত হইয়াছিল। এই জন্যই দেখা যায় যে, পরমাণুবাদ বিষয়ে পুরা-কালে ডেমক্রাইটাসের নাম এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করে যে, লুসিপ্পাসের ঐতিহাসিকতায় এখন অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইরূপ নানা কারণে এই দার্শনিকদ্বয় জ্ঞানভাণ্ডারে যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে উভয়ের অংশ পৃথক্ করিয়া পরীক্ষা ও আলোচনা করা এখন একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা দৃষ্টির বহির্ভূত রাখিয়া আমরা ডেমক্রাইটাসেরই অনুবর্ত্তী হইয়া পরমাণু-বাদের স্থূল মর্ম্ম বিবৃত করিবার চেষ্টা পাইব।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৬০ অব্দে অ্যাব্ডেরা নগরে ডেমক্রাইটাসের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে জ্ঞানলাভের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করেন। কথিত আছে যে, পারস্যরাজ জারক্সিস্ (Xerxes) যখন গ্রীসদেশ জয় করিতে আসেন, তখন আমাদের দার্শনিকের পিতাঠাকুর ঐ বিদেশী রাজের বিশেষরূপে অতিথি-সৎকার করেন। পারস্যরাজ সন্তুষ্ট হইয়া অতিথি-সেবকের পুত্রের শিক্ষার জন্য একজন প্রাচ্য পণ্ডিতকে রাখিয়া যান। তাঁহারই শিক্ষাধীনে নাকি ডেমক্রাইটাসের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, উহা নিতান্তই গল্প কথা, কারণ, জারক্সিস্, ডেমক্রাইটাস্ জন্মাইবার বিশ বৎসর পূর্ব্বে, ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। তবে তিনি জ্ঞানলাভ-মানসে যে বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; যেহেতু তিনি স্বরচিত পুস্তকে একস্থানে দম্ভ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার মত বহুপর্য্যটনজনিত ভূয়োদর্শন কাহারও নাই। কথিত আছে, এইরূপে নানাদেশভ্রমণে তিনি তাঁহার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি সম্পূর্ণ-ভাবে নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন। তিনি মিশরদেশে ভ্রমণ করিয়া পারস্য এবং এমন কি ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত নাকি অগ্রসর হইয়াছিলেন। যাহা হউক, জ্ঞানার্জ্জন মানসে বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও তিনি জ্ঞানলাভের প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মনুষ্য সহবাস হইতে দূরে রহিবার জন্য তিনি জনশূন্য প্রান্তরে বা সমাধিক্ষেত্রে বাস করিতেন

এবং পাছে নানা বাহ্য বিষয়ে তাঁহার মন আকর্ষণ করিয়া তত্ত্ব-চিন্তায় বিঘ্ন উৎপাদন করে, এইজন্য তিনি নাকি স্বেচ্ছায় আপনার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া ফেলেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় না।

ডেমক্রাইটাসের দর্শন।

আদি সত্তা দুই ভাগে বিভাজ্য—ভাবপদার্থরূপী (a-thing) অনন্ত পরমাণুপুঞ্জ ও অভাবরূপী (no-thing) শূন্য বা অবকাশ। এই পরমাণু-পুঞ্জের সংযোগ ও বিয়োগেই জগতের উৎপত্তি ও নানারূপ পরিণতি।

পরমাণুসকল সংখ্যায় অনন্ত এবং তাহারা অবিভাজ্য। পরমাণু এত সূক্ষ্ম যে, উহা প্রত্যক্ষের অগোচর। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা জ্যামিতির বিন্দুর ন্যায় নিরবয়ব নহে। পরমাণু-সমূহের মধ্যে গুণগত কোনও ভেদ নাই। কিন্তু অন্য-রূপে তাহাদিগকে পৃথক্ করা যায়। যথা—তাহাদিগের মধ্যে আকৃতির (shape) ভেদ আছে; যেমন ক, ত হইতে ভিন্ন, অবয়ব-সমাবেশে (order) ও তাহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন; যেমন কত ও তক; এতদ্ভিন্ন অবস্থানের (position) ভিন্নতায়ও তাহাদিগকে পৃথক্ করা যায়, যেমন বর্ণশ্রেণীর মধ্যে ক ও তএর অব-স্থান পৃথক্। এইরূপ ঐক্য ও পার্থক্য-সম্বলিত পরমাণু-পুঞ্জই জগতে সকল বস্তুর হেতু। যেমন কতকগুলি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বর্ণের দ্বারা বহু বিভিন্ন পুস্তক রচিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি গুণবিশিষ্ট পরমাণু-পুঞ্জ দ্বারা জগৎ নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক পরমাণু অপর পরমাণু হইতে অবকাশের দ্বারা বিযুক্ত। তাহা না হইলে তাহারা এক নিরবচ্ছিন্ন ও অবিভাজ্য পিণ্ডরূপে প্রতীয়মান হইত। পরমাণুসকল পরিমাণে ও ওজনে পরস্পর ভিন্ন।

অবকাশ বা শূন্যের অস্তিত্ব সমর্থন করিবার জন্য ডেমক্রাইটাস্ নিম্নলিখিত হেতু কয়টী প্রদর্শন করেন—

(১) অবকাশ বা শূন্য না থাকিলে গতির অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। (পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ডেমক্রাইটাস্ গতির অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন)।

(২) অবকাশের অস্তিত্ব বিনা আকুঞ্চন (Condensation) ও প্রসারণ (rarefaction) অসম্ভব হইত।

(৩) উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহে রন্ধ্র-মধ্য দিয়া খাদ্য ও রস প্রবেশ করে বলিয়া তাহারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়।

(৪) রিক্ত পাত্রে জল ঢালিলে যত জল ধরে, ভস্মপূর্ণ পাত্রে তদপেক্ষা

কম জল ধরিলেও, তাহাতে যে জলের জন্য অণুমাত্রও স্থান সঙ্কুলান হয়, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ভস্মকণা-সমূহের মধ্যে রন্ধ্র্‌।বকাশ ছিল।

এই পরমাণু-পুঞ্জ ও অবকাশ ব্যতিত এক নিত্যশক্তি বিদ্যমান। এই শক্তির দ্বারা পরমাণু-সমূহের মধ্যে সংযোগ ও বিয়োগ উৎপন্ন হয়। তবে এ বিষয়ে আর এক বিবরণও পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরমাণু সকলের মধ্যেও ওজনের তারতম্য আছে। সেইজন্য লঘুভার পরমাণু সমূহ উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয় এবং গুরুভার পরমাণু-সমূহ অধোগতি প্রাপ্ত হয় *। এই পরমাণুপুঞ্জের উত্থান ও পতন-কালে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং এই সংঘর্ষ হইতে নানারূপ পার্শ্বমুখী গতির সৃষ্টি হয়। এইরূপে ক্রমে এক ঘূর্ণ-গতির উৎপত্তি ও তাহা হইতে বহুজগতের সৃষ্টি হয়।

সূক্ষ্ম, মসৃণ ও গোলাকৃতি তৈজস পরমাণু-সমূহ হইতে আত্মার সৃষ্টি হয়। আমরা নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময়ে বায়ু হইতে আত্মার গঠনোপযোগী উক্ত পরমাণু বা আত্ম-পরমাণু-সমূহ আমাদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং নিশ্বাস বর্জ্জন করিবার সময় ঐ জাতীয় পরমাণু আমাদের শরীর হইতে নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়া যতদিন চলিতে থাকে, ততদিনই আমাদের জীবন থাকে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতিই জ্ঞানের একমাত্র উপায়। নিকটবর্ত্তী পদার্থ-সমূহ হইতে তাহাদের এক পরমাণু-গঠিত সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি নির্গত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারে আঘাত করে; তাহা হইতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি উৎপন্ন হয়। ডেমক্রাইটাস্‌ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে ভ্রমজ্ঞান বলিতেন এবং যুক্তি ও বিচার-লব্ধ জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলিতেন। এই শেষোক্ত জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহার মতে পরমাণুর অস্তিত্ব প্রভৃতি মহৎ সত্য সকল জানা যায়।

বর্ত্তমান যুগের পরমাণুবাদ হইতে পাশ্চাত্যে এ পর্য্যন্ত কোনওরূপ আধ্যাত্মিক-শাস্ত্র বা ঈশ্বর-বিষয়ক তত্ত্বের উৎপত্তি হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু ডেমক্রাইটাসের নামে পুরাকালে অনেকগুলি চরিত্র গঠনের সহায়ক নৈতিক উক্তি প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল উক্তির মধ্যে কতকগুলি এমন দেখা যায় যে, ঐ গুলির তৎপ্রচারিত পরমাণুবাদের সহিত সামঞ্জস্য নাই এবং সেইজন্য ডেমক্রাইটাসকে

* এস্থলে বক্তব্য এই যে, বৃহৎ শূন্যমধ্যে পরমাণু-সমূহের গতি উর্দ্ধমুখী বা অধোমুখী—তাহা কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে? আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া উক্ত গ্রহের সহিত তুলনায় উর্দ্ধ ও অধঃ নির্ণয় করিয়া থাকি। কিন্তু পরস্পর বিশ্লিষ্ট পরমাণু-পুঞ্জের পক্ষে উত্থান ও পতন কি অর্থশূন্য নহে?

ঐ উক্তিগুলির রচয়িতা বলিয়া ভাবিতে অনেকে দ্বিধা বোধ করেন। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বিচারলব্ধ মতের সহিত ঠিক থাপ খায় না এবং ডেমক্রাইটাসের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ঘটা একেবারে অসম্ভব নয়। তাঁহার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উক্তিগুলিতে তিনি প্রধানতঃ সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

পরমাণুবাদের সহিত গ্রীক্ দর্শনের প্রথম যুগের অবসান। আমরা দেখিয়াছি যে, জাগতিক পরিবর্ত্তন-পরম্পরা এই যুগের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। জগতে পরিবর্ত্তন-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাৎকালিক লোকের মনে জগতের ও নিজেদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে এই প্রথম নানা সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। এই সন্দেহ হইতেই জিজ্ঞাসার উৎপত্তি এবং এই জিজ্ঞাসার কথন একরূপে নিবৃত্তি ও কথন অন্যরূপে পুনরাবৃত্তি—দর্শনের ইতিহাসে ইহাই আমরা এতদূর হইতে দেখিলাম। এই জিজ্ঞাসার প্রথমাবস্থায় পরিবর্ত্তন-ব্যাপারের মীমাংসা কিরূপে দার্শনিকগণের মনে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে নিত্য ও অনিত্য, ভাব ও অভাব এই দুই বিরোধী ভাব বর্ত্তমান, তাহাদের মধ্যে কখন একটি কখন অপরটি কেমনে দার্শনিকগণের নিকট সমগ্র সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি; এবং এই একদেশদর্শী মতদ্বয়ের যথোচিত সমন্বয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের পরমাণুবাদে কিরূপ শেষ মীমাংসা হইয়াছিল, তাহারও পর্য্যালোচনা করিয়াছি। এবার দেখিতে হইবে, দার্শনিকগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ঐ প্রশ্নের মধ্যে আবার কি নূতন সন্দেহ-সমূহ বাহির করিয়াছিল। কারণ, নূতন নূতন সন্দেহের উদ্ভাবন দ্বারাই নূতন নূতন সিদ্ধান্ত-নিচয় আবিষ্কার করা যায়; অন্যরূপে নহে।

ক্রমশঃ

প্রেমময়! প্রাণময়!

(১)

এ ভব সংসারে নাথ যখন যে দিকে চাই,
বিশ্বরূপে তব ছবি হেরি আমি সর্ব্বঠাঁই।
আকাশ অবনীতল আলোক আঁধার গায়,
তোমারি রূপের জ্যোতি নীরবে প্রকাশ পায়।
মেঘের বিজলি হাসি, বরষার কাদম্বিনী,
বসন্ত-প্রসূনরাজি, কোকিলের কুহুধ্বনি,
শুনি, হেরি প্রাণ মন ভাবাবেশে মেতে রয়,
প্রণমি তোমারে আমি, প্রেমময় প্রাণময়!

(২)

চাঁদের চাঁদনী তুমি, রবির কিরণরাশি,
নিশীথের নীরবতা, উষার কনক-হাসি।
ফুলের সৌরভ তুমি, তুমি পবনের প্রাণ,
জীবনে জীবন তুমি, সবে শান্তি কর দান।
তব নাম জলে স্থলে, বিজন মরভূ গায়,
কানন কান্তার মাঝে, সমভাবে শোভা পায়।
কলনাদে কল্লোলিনী, তোমারি কাহিনী কয়,
প্রণমি তোমারে আমি, প্রেমময় প্রাণময়!

(৩)

কৈশোর যৌবন মাঝে, শিশুর সুবিম্বাধরে,
তরুণীর মৃদুহাসে, প্রেমিকের অশ্রুনীরে,
যোগীর মানস-পথে, ঘাতকের অসি-বুকে,
মঙ্গল ও অমঙ্গল, ভাল মন্দ সুখে দুঃখে,
জনক-জননী-স্নেহে, ভ্রাতা ভগিনীর ভাবে,
সখা সখী বান্ধবের মধুর মিলন-আশে,
তোমারি মাধুরি ভরা মধুর পিরিতি বয়,
প্রণমি তোমারে আমি, প্রেমময় প্রাণময়!

(৪)

নয়নের আলো তুমি, তুমি গো জগৎময়,
তোমাতে জনমি বিশ্ব তোমাতেই পায় লয়।
যা' দেখি যা' শুনি কানে, যাহা করি পরশন,
সে ত সব তুমি দেব, তুমি-ময় ত্রিভুবন।
তুমি বাক্য, তুমি ভাষা, তুমি হে প্রভাতী গান,
তুমি প্রেম, তুমি অশ্রু, তুমি মান অপমান।
আমি কি? তুমিই আমি; দেহও কি তুমি নয়?
প্রণমি তোমারে আমি, প্রেমময় প্রাণময়!

(৫)

দেশ-ভেদে কত নাম, কত রূপ মরি মরি,
কখন কিভাবে থাক কিছুই বুঝিতে নারি।
কেহ ভাবে শিব-শক্তি, কেহ দেখে নারায়ণ,
কেহ ভজে রাধাকান্ত পীতাম্বর-বিভূষণ,
কেহ বলে আল্লা, বুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ কেহ আর,
স্বরূপ কেহবা ভাবে, কেহ ভাবে নিরাকার।
যে ভাবে ভাবি না কেন, দূরে যায় পাপ ভয়,
প্রণমি তোমারে আমি, প্রেমময় প্রাণময়!

(৬)

কখন রাখাল-বেশে অধরে মধুর হাসি,
উন্মাদ, নেহারি গোপী চরণে লুটায় আসি।
কভু কূর্ম্ম, কভু মীন, কভু রাম, নরহরি,
ভূভার হরণতরে কত মূর্ত্তি ওহে হরি!
কখন বিহার বনে পরিহিত-জীর্ণ-চীর,
কখন রাজেন্দ্র তুমি, ত্রিলোক আনত-শীর।
তোমারে তুমিই জান, স্তব্ধমনেন্দ্রিয়চয়,
প্রণমি তোমারে আমি, প্রেমময় প্রাণময়!

(৭)

দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টি হেরে সাঙ্খ্য পাতঞ্জলে,
চিত্রকর হেরে তোমা অবনী-অম্বর-তলে।

কবিকুল মুগ্ধ হেরে প্রকৃতি-তটিনী গায়,
তোমারই সুন্দর ছবি, উঠে ভাসে নেচে ধায়।
দিশেহারা মন মোর, প্রত্যেক সৌন্দর্য্য মাঝে,
তোমারে হেরিতে হরি দিবানিশি ভ্রমে খুঁজে।
শুনি বিশ্বে সমস্বরে উঠিছে মহান্ জয়,
প্রণমি তোমারে আমি, প্রেমময় প্রাণময় !

(৮)

করুণা-নিদান তুমি, তুমি গো মঙ্গলময়,
সদা উত্তোলিত হস্ত দিতে জীবে বরাভয়।
অমঙ্গল হ'তে কর মঙ্গলের সমাবেশ,
নহে তব কত প্রেম, ভাষাতে কি হয় শেষ ?
তুমি যাহা কর হরি সেই ভাল তাই চাই,
জেনেছি এ ত্রিভুবনে তোমা ছাড়া কেহ নাই।
প্রেমে কর মাতোয়ারা, চিত্তে সদা এই হয়,
প্রণমি তোমারে আমি, প্রেমময় প্রাণময় !

(৯)

অন্তরে বাহিরে কবে শ্রীমূরতি হেরি তব,
হোক্ দুঃখ হোক্ সুখ, নীরবে সকলি সব।
তব গুণ গেয়ে কবে দিবা অবসান হবে,
কর্ণ শুনে কথামৃত, কবে সদা ভোর রবে।
দিন যায়—লও পাশে আর কেন বিড়ম্বনা,
কেন মজি রূপ-রসে ?—অনিত্যের উপাসনা ?
দাও দেখা হে প্রাণেশ, তব পদে হই লয়,
এই ভিক্ষা মাঙ্গে দাস, প্রেমময় প্রাণময় !

শ্রীফণীন্দ্র নাথ ঘোষ।

কামাখ্যা ভ্রমণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [স্বামী সত্যকাম।

পৌরাণিক কথা।

পুরাণমুখে শুনা যায়—"দক্ষযজ্ঞে সতী যখন প্রাণত্যাগ করেন, তখন মহাদেব তাঁহার সেই পূত দেহ স্কন্ধে লইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পতিপ্রেমের পূর্ণাদর্শ লোকশিক্ষার জন্ত যে শরীরাবলম্বনে প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছিল, সেই দেহের অবয়ব আভরণাদি স্খলিত হইয়া যে যে স্থানে পড়িতে লাগিল, সেই সেই স্থানই তৎসংস্পর্শে অপূর্ব্ব পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যে ভূষিত হইয়া উঠিল এবং কালে তাহাতে এক এক মহাতীর্থের উদয় হইয়া অদ্যাবধি লোক-কল্যাণ সাধন করিতেছে। সতী-শরীরের অধোদেশ ঐরূপে নীলকূট পর্ব্বতস্থ কুব্জিকা নামক তীর্থে পতিত হইয়া এই স্থানকে তীর্থাগ্রণী করিয়া তুলে এবং ঐ জন্তই উহা অদ্যাবধি কামাখ্যা যোনিপীঠ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রমণী-শরীরের যে অংশ তাহাকে রমণীত্বে ও মাতৃত্বে ভূষিতা করিয়া সংসারের পূজার্হা করিয়া রাখিয়াছে, যাহার আকর্ষণে জড়মতি ইন্দ্রিয়পর পশু মানব আপনা ভুলিয়া কাম হইতে প্রেমে এবং স্বার্থ হইতে নিঃস্বার্থতার রাজ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া থাকে, সেই অংশের পবিত্র মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্তই যেন পুরাণকার এই স্থলে লিখিয়াছেন যে, জগজ্জননী দক্ষতনয়ার মৃত শরীরের অধোভাগ ভূমিতে পতিত হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর যোগনিদ্রাবলম্বনে অচল হইয়া উহা সাদরে মস্তকে ধারণ করিলেন; প্রজাপতি ব্রহ্মা, শ্রীশঙ্করকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়া স্বয়ং ধন্ত হইবার জন্ত তদ্রূপ অচলভাবে তাঁহার আসনে পরিণত হইলেন এবং লোকপালক বিষ্ণুও ঐ কারণে অচলরূপে পরিণত হইয়া তাঁহাদের উভয়কে ধারণ করতঃ পৃথিবীতে শয়ান রহিলেন! কামাখ্যা ভূধর এইরূপে হরিহরব্রহ্মা ত্রিমূর্ত্তির সমষ্টিভূত অচলবিগ্রহ হওয়াতেই যাত্রিগণ শৈলারোহণের পূর্ব্বে তাঁহাদের উদ্দেশ্তে অনুমতিভিক্ষা-সূচক প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ করিয়া তবে উক্ত শৈলে পদার্পণ করে। পুরাণ বলেন, এই পর্ব্বতত্রয় শত শত যোজন উন্নত হইলেও বাহ্যে উচ্চতা অল্পই প্রতীয়মান হয়; কারণ, সতী-অঙ্গের ভারে উহাদের অধিকাংশ ভাগই ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সতীশরীর পতিত হইয়াই প্রস্তর হইয়াছিল এবং ঐ শৈলাংশকে আশ্রয় করিয়া ভগবতী "কামাঙ্গনাশিনীর" মোহবিদূরণী শক্তি অদ্যাবধি প্রকাশিতা থাকিয়া কামাখ্যা নামে পরিচিতা আছেন।

"কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥"

——কালিকাপুরাণ।

অর্থাৎ নীলকূটবাসিনী মহাদেবীর কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী প্রভৃতি অনেক নাম এবং ইনি কামাঙ্গনাশিনী হওয়ায় 'কামাখ্যা' নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

এই শিলা স্পর্শে মানুষ দেবত্ব হয় এবং দেবগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। পীঠরন্ধ্র হইতে যে স্বাভাবিক জলধারা নির্গত হইয়া আসিতেছে, শুনা যায় যে, উহাতে লৌহ প্রদান করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ জীর্ণ হইয়া যায়।

পীঠরন্ধ্রের পরিমাণ দীর্ঘে ২১ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ১ বিতস্তি। ইহা সিন্দূর ও কুঙ্কুমাদিলেপিত। লোকপ্রসিদ্ধি যে, দেবী মহামায়া এই স্থানে প্রত্যহ পঞ্চ কামিনী মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন ; সেই পঞ্চ কামিনীর নাম—কামাখ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, সারদা ও মহোৎসাহা। দেবীর চতুর্দ্দিকে অষ্টযোগিনী অবস্থান করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের নাম যথাক্রমে গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কটীশ্বরী, ধনস্থা, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী ও প্রকটা।"

——কালিকাপুরাণ, ৬১ অঃ।

অন্যান্য নানা দেবদেবীগণ ও তীর্থ-সমূহও এই স্থানে নানারূপে নানাভাবে অবস্থিত আছেন, ইহাও উক্ত পুরাণে দেখা যায়।

দেবীগীতায়ও তীর্থমধ্যে কামাখ্যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আবার উহাতে লিখিত আছে যে, কামাখ্যা দেবী প্রতি মাসে এই স্থানে রজস্বলা হইয়া থাকেন।

কামরূপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচিন রাজা মহীরঙ্গ নামক একজন দানব। ইঁহার পর নরকাসুর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই নরকাসুর সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিম্বদন্তী আছে :—

এক সময় নরকাসুর নিজ আসুরিক দম্ভে উন্মত্ত হইয়া ভগবতী কামাখ্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। তখন ভগবতী কামাখ্যায় মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয় নাই। অতি সামান্যভাবে অরণ্যমধ্যেই পীঠস্থান ছিল মাত্র। নরকের প্রস্তাব শুনিয়া ভগবতী কহিলেন, যদি তিনি এক রাত্রির ভিতর তাঁহার মন্দির, রাস্তা, পুষ্করিণী ইত্যাদি সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন, তবে ভগবতী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। নরক তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া তাঁহার সাহায্যে

রাত্রিশেষের আগেই প্রায় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভগবতী দেখিলেন, মহা বিপদ্, তাঁহাকে অসুরের ভার্য্যা বা হইতে হয়। অগত্যা চিন্তা করিয়া একটী মায়ারূপী কুক্কুট সৃষ্টি করিলেন এবং নরকের কার্য্যশেষের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তৎকর্ত্তৃক প্রাতঃকালীন কুক্কুটধ্বনি করাইতে আরম্ভ করিলেন। কুক্কুটধ্বনি হইলেই ভগবতী নরককে বলিলেন, কার্য্যশেষের আগেই কুক্কুটধ্বনি হইতেছে—রাত্রি প্রভাত হইল। অতএব আর আমি তোমাকে বরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহি। ভগবতীর বাক্যে নরক ক্রোধান্ধ হইয়া সেই কুক্কুটের অনুসরণ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। যে স্থানে নরকাসুর এই কুক্কুটকে বধ করেন, তাহা অদ্যাপ "কুকুরাকটাচকি" নামে প্রসিদ্ধ। নরকাসুর কর্ত্তৃকই প্রথমতঃ ভগবতী কামাখ্যার মন্দির নির্ম্মিত হয়। পুরাণ বলেন, নরকাসুর ত্রেতাযুগের শেষভাগ হইতে প্রায় দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত কামরূপের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তার পর ইঁহার পুত্র ভগদত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্ব্বদিকে চীনদেশ এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত ইনি স্বীয় শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ইনি চীন ও কিরাতসেনা দিয়া দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

কামরূপের কোন কোন প্রাচীন বুরঞ্জীর মতে ভগদত্তের পর ঐ বংশীয় আরও পাঁচজন রাজা হন। তার পর ঐ বংশ লোপ পায়। ইহার পর কামরূপ এক প্রকার অরাজক হইয়া পড়ে এবং নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। কথিত আছে, এই সময়ে এস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম ও মত-সমূহ প্রাধান্য লাভ করে।

এখানকার শাকাব্দার আরম্ভ-সময়ে বৌদ্ধপ্রধান কামরূপে দেবেশ্বর নামে এক ব্যক্তি রাজা হইয়াছিলেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোত প্রতিহত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা বাড়াইতে এবং কামাখ্যাদেবীর পূজার ও মন্দিরের পুনরুদ্ধারে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইনি ধীবর বা কৈবর্ত্তজাতীয় ছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রবাদে অনুমিত হয় যে, ইঁহার রাজত্বকালেই বৌদ্ধপ্রধান কামরূপ আবার হিন্দু-তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হয়।

ইহার কিছুদিন পরে ব্রহ্মপুত্রবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজবংশের উদ্ভব। এই বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি শুনিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে কোন ব্রাহ্মণের এক যুবতী কন্যা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যায়। নদাধিষ্ঠিত দেবতা যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হন এবং তাহাকে দর্শন দিয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ক্রমে উক্ত রমণীর গর্ভে একটী সন্তান জন্মে। এই পুত্রটীই কালে কামরূপের রাজা

হইয়া উক্ত ব্রাহ্মণবংশ প্রবর্ত্তিত করেন। এই রাজার নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না।

প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউএনসিয়াং যে সময়ে কামরূপের রাজধানীতে (গোহাটীতে) উপস্থিত হন, সে সময় সেখানে কুমাররাজ নামে এক রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। উক্ত পরিব্রাজক বলেন, ঐ সময়ে কামরূপে শতাধিক হিন্দু-দেবদেবীর মন্দির ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ মন্দির একটীও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। অধিবাসীরা অধিকাংশই হিন্দু। রাজধানীর পরিধি আড়াই ক্রোশ বা তিন ক্রোশ ও দেশের পরিধি প্রায় ৮৫০ ক্রোশ ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিববংশীয় বিশ্ব সিংহের দৌহিত্র কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ক্রূরকর্ম্মা যবন সেনাপতি কালা-পাহাড় ভগবতীর মন্দির ভগ্ন এবং পীঠস্থানবর্ত্তী সুন্দর সুন্দর অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তি গুলি গদাঘাতে এরূপ বিকৃত করিয়া দেয় যে, ঐ সকল জীর্ণ সংস্কার কোনরূপে সম্পন্ন করিতে বার বৎসর কাল লাগিয়াছিল। কামাখ্যা মন্দিরের বর্ত্তমান 'চলন্তা' (যাহা অচল সতী-অঙ্গের প্রতিনিধি-স্বরূপা এবং পর্ব্বাদিকালে মন্দিরের বাহিরে আনীত হয়) মূর্ত্তি মহারাজ নরনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বর্ত্তমান কামাখ্যা-মন্দিরের বহির্ভাগে মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রস্তর খোদিত প্রতিমূর্ত্তি দুইটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ মহামায়ার একান্ত ভক্ত ছিলেন এবং ভগবতীও উহাদিগকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। তিনি কুচবিহার হইতে শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তিমান্ ও বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া ভগবতীর পূজার ভার অর্পণ করিতেন। কেন্দুকলাই নামক ঐরূপ একজন বিশেষ ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণ এবং মহারাজ নরনারায়ণ ও তদ্ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সম্বন্ধে কামরূপে আজও এইরূপ এক জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে কেন্দুকলাই ভক্তি-গদ্‌গদ-চিত্তে যখন সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া ভগবতীর আরতি করিতেন, তখন ভগবতী তাঁহার আরতিতে মুগ্ধ হইয়া অপরূপ বালিকা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতেন এবং যতক্ষণ আরাত্রিক হইত, ততক্ষণ ঘণ্টা-বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেন। মহারাজ নরনারায়ণ ইহা জানিতে পারিয়া ভগবতীর ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ চৈতন্যময়ী মূর্ত্তি দেখিবার অভিপ্রায়ে কেন্দুকলাই ঠাকুরের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সহিত গোপনে ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজসম্মান এবং ভক্তিমদে স্ফীত হইয়া গরিব ব্রাহ্মণের মস্তক ঘুরিয়া গেল। সে দেবীকে ঐ

বিষয় জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই রাজাকে বলিল যে, সন্ধ্যার সময় যখন আরতিসূচক ঘণ্টা-ধ্বনি শুনা যাইবে, তখন রাজা যেন নাটমন্দিরের রন্ধ্র-মধ্য দিয়া ভিতরে নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলেই ভগবতীর চৈতন্যময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। কথিত আছে, এই পরামর্শ মত মহারাজ সন্ধ্যার সময় নাটমন্দিরের রন্ধ্র-মধ্য দিয়া ভগবতীর ঐরূপ মূর্ত্তি অবলোকন করিতেছেন, এমন সময় দেবী উহা জানিতে পারিয়া কেন্দুকলাই ঠাকুরের শিরচ্ছেদ করেন ("কেন্দুকলাইর মুর ছিগার দরে মুর ছিঙ্গিম"—আসামে সেই সময় হইতে এই একটী দৃষ্টান্তই চলিয়া আসিয়াছে। অর্থ—কেন্দুকলাইর যে রকমে মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল, সেই রকমে তোমারও মস্তক ছিন্ন করিব।) এবং রাজাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কি তাঁহার বংশের কেহ যদি কামাখ্যা পীঠ দর্শন করে তাহা হইলে তাহার মুণ্ডপাত হইবে। এই শাপের ভয়ে আজিও কুচবেহার, বিজনি, করঙ্গ ইত্যাদি শিববংশীয় রাজপরিবারের কেহই কামাখ্যা মন্দিরের দিকেও প্রাণান্তে দৃষ্টিপাত করেন না। যেখান হইতে মন্দির দর্শনের সম্ভাবনা আছে, এমন স্থলে কোন কার্য্য বশতঃ যাইতে হইলে শকটাদি যানের সেই দিকটায় পর্দ্দা খাটাইয়া গমন করিয়া থাকেন!

নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের জীবিতাবস্থায় কালাপাহাড়-বিধ্বস্ত কামাখ্যা-মন্দিরের অধিকাংশ ভাগ পুনর্নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইতে ১২ বৎসর লাগে। জনৈক হিন্দুস্থানী শিল্পীই এইবার উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই মন্দিরের পূর্ব্ব দ্বারের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত কেন্দুকলাই পুরোহিতের প্রস্তর-খোদিত কবন্ধ মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে।

শুক্লধ্বজের পরবর্ত্তি রাজগণ এই স্থানে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, দেবোত্তর সম্পত্তি দান ইত্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ইঁহাদেরও রাজত্বকালে মুসলমান-সেনাপতিগণ কামাখ্যা-মন্দির পুনর্ব্বার বিধ্বস্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের প্রথম আক্রমণ হয়। ব্রহ্মরাজের নির্দ্দেশে বহুসংখ্যক ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য আসিয়া এখন হইতে মধ্যে মধ্যে আসামবাসীদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিত ও তাহাদের ধন প্রাণ হরণ করিত। ব্রহ্মরাজাধিকৃত হইয়া আসামের ভাগ্যে এই প্রকার অত্যাচার বহুকাল ব্যাপিয়া চলিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মবাসীদিগকে দূরীকৃত করিয়া আসাম অধিকার করিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারীতে আসামে ইংরাজাধিকার

প্রবর্ত্তিত হয় এবং ৬০০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া আহম-বংশ সিংহাসনচ্যুত হয়। আহম ('আহম' কথা হইতেই ঐ প্রদেশের 'আসাম' নাম হইয়াছে) জাতির এখন অতীব দৈন্যাবস্থা। তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে আপনাদের ভাষাও পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে হিন্দু হইয়াছে। তাহারা যে সব দেবমন্দির ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, প্রায় তৎসমুদয়ই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সংস্কারাভাবে ঐ সকলের অবস্থা অতি মন্দ। উহাদের অধিকাংশ শিবসাগর জিলায় আছে; তেজপুর ও নওগাঁয়ে থাকিলেও অপেক্ষাকৃত কম। কামরূপ জিলায় ব্রহ্মদেশীয় আহমরাজদিগের স্থাপিত অনেক দেবমন্দির দেখা যায়। কিন্তু কামাখ্যার মন্দির তাঁহাদের নির্ম্মিত নয়। কামরূপ যখন কুচবেহারের অন্তর্গত ছিল, তখন ঐ দেশের রাজা নরনারায়ণই উহা নির্ম্মাণ করান—একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আহমরাজগণ উহার জীর্ণসংস্কার মাত্র করেন। আহমরাজদিগের রাজধানী শিবসাগর জেলায় ছিল, এইজন্য অপর কোন স্থানে তাঁহাদের নির্ম্মিত রাজভবন দেখিতে পাওয়া যায় না।

আহমরাজগণের অধিকার-কালে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই কামরূপে ঘটে নাই। কেবল রাজা গৌরীনাথের সময় রাজ্যমধ্যে একটা খুব বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তিনি উহা দমন করিতে না পারিয়া নিরুপায় হইয়া গোয়ালপাড়ায় রস নামে একজন লবণ-ব্যবসায়ী ইংরাজ সাহেবকে বিশেষরূপে পুরস্কার দিবার আশা দিয়া তাঁহা দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিক্ষা করেন। উক্ত সাহেব প্রথম নিজ কুঠির ১০০ বরকন্দাজ দিলেন। তাহাদের সহিত একটু আধটু যুদ্ধও হইল। পরে যখন উহাতেও বিদ্রোহ থামিল না, তখন রস সাহেব, কলভিন্ বজেট কোম্পানির নামে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে চিঠি দিলেন। এই সময় লর্ড কর্ণ-ওয়ালিস গবর্ণর জেনেরাল। তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ওয়েলসকে সসৈন্যে পাঠাইয়া দিলেন। কাপ্তেন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আসামের প্রধান নগর অবরোধ করিয়া ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের চৈত্র মাসে উক্ত নগরে প্রবেশ করেন। আসামে ইংরাজাধিকার বিষয় ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। সে সব বিষয় এখানে লিখিতে গেলে প্রবন্ধও বাড়িয়া যাইবে। সেজন্য সে সব কথা লিখিলাম না। মোট কথা, এইরূপে ধীরে ধীরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আসাম প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে বৃটিশাধিকারভুক্ত হয়।

কামরূপে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সত্তলোৎ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদেশে বাঙ্গালী কৌলীন্যপ্রথা নাই। মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এদেশে বিশেষ সম্মানের পাত্র। কেওট জাতিই এদেশের আদিম জাতি। কেওট

এক প্রকার কৈবর্ত্ত। ইহা ছাড়া এদেশে কোচ, মেছ, লালুং, নট, নাপিত, পটীয়া কুমার, শুঁড়ি, ধোপা, শালৈ, ডোম প্রভৃতি অনেকানেক ছোট জাতি আছে।

প্রবাদ—প্রথমে এ প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। শঙ্করাচার্য্য যে সময় সমগ্র ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব নষ্ট করেন, তখন কামরূপেও তাঁহার প্রভাব অনুভূত হয়। পূর্ব্বকথিত দেবেশ্বর নামে শূদ্ররাজের হিন্দুধর্ম্মে আস্থা যে ঐ প্রভাবেই উপস্থিত হয়, ইহা যুক্তিযুক্ত। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের অন্য প্রদেশসমূহ হইতে তাড়িত হইলেও এখানে যে অনেককাল জীবিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও এখানে ঐ ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল বলিয়া বেশ অনুমিত হয় এবং এ প্রদেশের হাজোর হয়গ্রীবের মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। যোগিনীতন্ত্রেও এখানকার বুদ্ধমূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের কিছুকাল পরে শঙ্করদেব ও মাধবদেব নামে দুই ব্যক্তি এখানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন।

শঙ্করভূঁয়া শিরোমণি বা শ্রীশঙ্করদেব, বারভূঁয়াগণের অন্যতম চণ্ডীবর শিরোমণির বংশোদ্ভব কুসুম্বর শিরোমণির পুত্র। ইনি বড় হইয়া নানা তীর্থাদি দর্শন করিয়া কন্দলী নামক একজন বৈষ্ণব সংপ্রকাশের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং ভাগবতের পদানুসরণ করিয়া "কীর্ত্তন দশম" নামক পুস্তক সঙ্কলন করেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্যতম শিষ্য; কিন্তু ইহা কতদূর ঠিক, তাহা বলা যায় না। যাহাই হউক, শঙ্করদেব স্বয়ং বৈষ্ণব হইয়া নিজ দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইনি দেশীয় ভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মের নানাবিধ গ্রন্থ ও সঙ্গীতসমূহ রচনা করিয়া উক্ত ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা করিয়া দেন ও স্বীয় ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ইঁহা হইতেই কামরূপে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অভিনয়াদি (যাত্রাদি) প্রচলিত হয়। বাওুকা নামক স্থানের দীর্ঘলগিরির পুত্র মাধব, শঙ্করের শিষ্য হইয়া গুরুকে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

আহমেরা ইঁহারই উপদেশে পরিশেষে বৈষ্ণব হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম প্রচারে বিরক্ত হইয়া শঙ্করদেবের জামাতা হরিকে অতি সামান্য অপরাধে বধ করে এবং মাধবদেবকেও বন্দী করে। শঙ্করও এইরূপ অত্যাচারের ভয়ে আহমদিগের অধিকার ত্যাগ করিয়া পাটবাউসী নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। মাধবও কোন উপায়ে মুক্ত হইয়া ঐ স্থানে তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। শাক্ত ও অনাচারী ব্রাহ্মণেরা কয়েকবার রাজা নরনারায়ণের নিকট ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। দিন দিন দলে দলে লোক

বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে। তৎপরে রাজার আস্থা হওয়ায় কুচবিহারেও এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ১৪৯০ শকে শঙ্করদেব দেহত্যাগ করেন। ইনি কামরূপ অঞ্চলে আজও চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতার বলিয়া পূজিত হন।

শঙ্করের পর মাধবদেব তাঁহার ধর্ম্মকে জাগাইয়া রাখেন। মাধবদেব "মহাপুরুষ গুরু" নামে বিখ্যাত। ইঁহার মতে পূজাদির আবশ্যক নাই, একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তনেই সকল কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। এইজন্য সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তন করিবার জন্য সত্র বা ধর্ম্মালয় আছে। এই সকল সত্রে অধিকারী ও মোহন্তেরা বাস করেন। এই সকল সত্রের মধ্যে মাধবদেব প্রতিষ্ঠিত বড়পেটার সত্রই প্রধান। মোহন্তেরা বাঙ্গলা দেশের গুরু-ব্যবসায়ী গোস্বামিগণের ন্যায় শিষ্যদের দানে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। শিষ্যেরা অর্থ না দিলে সমাজচ্যুত হয়। মাধবের পর কয়েক জন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারা মাধবের ধর্ম্ম হইতে কিছু ভিন্নভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন বলিয়া তাঁহাদের মতকে "বামুনিয়া" ও মাধবের মতকে "মহাপুরুষিয়া" ধর্ম্ম বলে। মহাপুরুষিয়াবমধ্যেও "ঠাকুরিয়া" নামে এক শাখা-সম্প্রদায় আছে। মাধবাদি শঙ্কর-শিষ্যগণ অনেকানেক গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদি রচনা করেন। বৈষ্ণবেরা স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াকলাপের প্রতি ততটা আস্থাবান্ নয়। বৈষ্ণব ব্যতীত এখানে তান্ত্রিক মতও প্রচলিত আছে। অরাতিয়া বা পূর্ণসেবা নামে আজকাল একটা মত এদেশে গোপনে চলিতেছে। এই সম্প্রদায়েরা জাতিভেদ মানে না। ইহারা সকল জাতীয় লোক একত্র মদ্যমাংসাদি পানাহার করে। এই সম্প্রদায়ের উপাসনায় ভক্তি মাতা নামে একটী স্ত্রীর প্রয়োজন হয়। এই স্ত্রীই উপাসনাকালে সকলের পূজ্য। পূর্ণসেবাচারীরা বলে—তাহাদের এই ধর্ম্ম শঙ্করদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের পূর্ণ মত। ইহা তান্ত্রিক বামাচারী ও বৈষ্ণব-মতের মিশ্রণে উৎপন্ন। বৌদ্ধাচারী লোক আর এখন নাই। এতদ্ব্যতীত আজকাল এখানে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক, যথা খৃষ্টানাদিও বিরল নহে।

এখানে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেই বরকে নিজবাটীতে আহ্বান করিয়া কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই সম্প্রদান করিবার নিয়ম আছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে ঐ নিয়ম নাই। শূদ্রাদি জাতি রজঃস্বলা হইবার পর কন্যার বিবাহ দেয়। গন্ধর্ব্ব বিবাহের ন্যায় এক প্রকার বিবাহও এখানে শূদ্রাদিদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

কামাখ্যায় কুমারীপূজা, ভগবতীপূজার একটী অঙ্গবিশেষ বলিয়া পরিগণিত। অনেক ব্রাহ্মণ-কুমারীর এইরূপ পূজা গ্রহণ একটী ব্যবসা-স্বরূপ হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, কামাখ্যায় নাকি ৩০০ কুমারী সর্ব্বদা থাকে।

কামাখ্যাদেবীর পুজাদি নির্ব্বাহের জন্য অহমরাজারা অনেক পাইক (ভৃত্য) নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কর জমি দান করিয়াছেন। অদ্যাপি পাইকেরা বিশেষ বিশেষ পর্ব্বের সময় ভগবতী-সেবায় খাটিয়া ঐ সকল নিষ্কর জমি ভোগ দখল করিতেছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও তাহাদের ঐরূপ নিষ্করস্বত্ব মান্য করিয়া থাকেন। প্রায় সকল দেবালয়েই এইরূপ পাইক ও নিষ্কর জমি বন্দোবস্ত আছে; তন্মধ্যে কামাখ্যা, কেদার ও মাধবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

দর্শন।

কামাখ্যা পর্ব্বতের পাদমূলে পৌছিয়া দেখিলাম, একটী ঘনজঙ্গলাবৃত পর্ব্বত-মধ্য দিয়া একটী বিস্তৃত পথ পর্ব্বতোপরি উঠিয়াছে। সেই পথ বাহিয়া আমরা উঠিতে লাগিলাম। বহুদিন পরে চড়াই করিতে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিলাম। বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত চড়াই করিতে লাগিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একে বৃদ্ধ, তা'তে চড়াই করিতে অনভ্যস্ত, কাজেই তাঁহার কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু দেবী-দর্শনেচ্ছা তাঁহার সমধিক বলবতী, তাই তিনি কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া চলিতে লাগিলেন।

কোথাও পার্ব্বতীয় পুষ্পের সুবাসে আমাদের চতুর্দ্দিক্ ভরপুর আমোদিত হইয়াছে, কোথাও পথপার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত দেবদেবীমূর্ত্তি, কোথাও ক্ষুদ্র ঝরণার জল চিক্ চিক্ করিয়া আমাদের পথ অতিক্রম করিয়া একধার হইতে অপর-ধারে চলিয়াছে, কোথাও বৃক্ষোপরি বসিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব পাখী সকল আমাদের কর্ণে নূতন সুর ধ্বনিত করিতেছে—এই প্রকার নানারূপ আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে আমরা আমাদের উক্ত পথ বাহিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম।

কিছুদুর অগ্রসর হইয়া দুই একজন পাণ্ডার সহিত দেখা হইল। তাহারা আমাদের সাধু দেখিয়া আমাদের গুরুস্থান কোথায় ও পাণ্ডা কে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং আমাদের পাণ্ডা আছে বলাতে নিরস্ত হইল। এইরূপে কিয়দ্দূর যাইয়া একটী বালক পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে আমাদিগকে একেবারে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা বেলুড় মঠের কি না। আমরা স্বীকৃত হওয়াতে সে বলিল যে, আমরাই আপনাদের পাণ্ডা। লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডা

আমার কাকা। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি আমাদের নিকটই ছিলেন। সে অতি খাতির যত্ন করিয়া লইয়া চলিল।

পাহাড়ের শিরোভাগে উঠিয়া দেখি যে, তথায় একটী ক্ষুদ্র সহর। চারিদিকে বাড়ী, মন্দির, গলি ইত্যাদি। কতকগুলি গলি অতিক্রম করিয়া একটী অতি ক্ষুদ্রকায়া গলির ভিতর একটী বাটীতে আসিলাম, ইহাই আমাদের পাণ্ডাদের বাটী। ছেলেটী বাহিরে দাঁড়াইতে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ও অবিলম্বে চাবি লইয়া আসিয়া বৈঠকখানা ঘর খুলিয়া দিল এবং তথায় বসিতে বলিল। ঘরে আসবাবাদির মধ্যে দুই একখানি তক্তপোষ, তদুপরি মাদুর বিছান এবং দুই একটী অতি মলিন তাকিয়া। একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই পাণ্ডা মহাশয় স্বয়ং আসিলেন এবং আসিয়াই আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া চা খাওয়া হয় কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা চা খাইয়া থাকি জানিয়া, তৎক্ষণাৎ ছেলেটীকে তাঁহাদের মাতৃভাষায় দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া, নিজে চা প্রস্তুত করিতে গেলেন। ছেলেটী বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ একটী কুঁড়ে ঘর হইতে ছাগল বাহির করিয়া দুধ দুহিয়া লইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বে অতি সুস্বাদু চা ও তৎসঙ্গে কিছু খাবার আসিল।

বেলা আন্দাজ ৮॥ টার সময় আমরা স্নান করিতে যাইলাম। পাণ্ডাটী সঙ্গে পথ দেখাইয়া চলিলেন। সামান্য কিয়দ্দূর যাইয়া একটী সরোবরে পৌঁছিলাম। এই সরোবরের সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত। জনৈক পরিব্রাজক তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই সরোবরের জল এত ময়লা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার মতে উহাতে একবার স্নান করিলে নিশ্চয় ম্যালেরিয়া এবং সেই ভয়ে তিনি স্নান করা দূরে থাকুক, উহার জল স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই! আমরা কিন্তু জল ময়লা দেখি নাই; অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম। অনেক যাত্রীকেও স্নান করিতে দেখিলাম। স্নানান্তে পাণ্ডামহাশয় পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন ও আমাদিগকে দেবীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, যাত্রীরা ৺ কামাখ্যা দর্শনে যাইলে কুমারীরা ক্রমাগত পয়সা চাহিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে। আমরা কিন্তু সে প্রকার কিছুই দেখিলাম না; কেবলমাত্র একটী কুমারী (সেটী আমাদের পাণ্ডার কন্যা) দুই চারিবার "পুইসা দে, পুইসা দে" বলিয়াছিল।

দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একটী প্রকোষ্ঠে "চলন্তা" মূর্ত্তি প্রথমে

দর্শন করিলাম, উহা ত্রিপুরা মূর্ত্তি। পরে অপর একটী অন্ধকার গৃহে নামিয়া আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত ৺কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিলাম। কনখলে দক্ষযজ্ঞে সতী-তনুত্যাগ, মহাদেবের

"কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার !
সতি, সতি, কোথা সতি !
* * * *
আহা, মোর নিন্দা শুনে,
সতী ম'লো প্রাণে,
আহা অযতনে কতই কেঁদেছে !
ওহো সতী প্রাণ দেছে,
মহেশের মৃত্যু নাই !"

ইত্যাদি বিলাপ ও সতীদেহ লইয়া প্রস্থান, ক্রমে সেই দেহ হইতে অবয়ব-বিশেষ স্থানে স্থানে পতিত হওন এবং পূত তীর্থরাজির উদ্ভব ইত্যাদি পৌরাণিক কথা একটীর পর একটী আসিয়া মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল ও প্রাণ এক অপূর্ব্ব আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, কত সাধু মহাত্মারা পুরাকালে ও আধুনিককালে এইখানে বসবাস করিয়া দেবী অর্চ্চনাদি দ্বারা দেবীর সাক্ষাৎ দর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছেন ও পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। মনে হইতে লাগিল, সেই জীবন ধন্য, যিনি আজীবন কৌমার ব্রত পালন করিয়া মহামায়ার সেবায় জীবন অর্পণ করিতে পারেন। মনে হইতে লাগিল, আমরাও এই তীর্থশ্রেষ্ঠ দেবালয়ে থাকিয়া যাই এবং দেবী ভগবতীর সেবাদি করিয়া জীবন ধন্য ও জনম সার্থক করি। আমাদের ভাগ্যে ইহা কি হইবে না? এই প্রকার নানারূপ চিন্তা যখন মনোমধ্যে একে একে উদয় হইতেছিল, তখন হঠাৎ পাণ্ডা মহাশয় আমাদের পূজা করিতে বলাতে আমরা পূজায় ব্যাপৃত হইলাম। পূজান্তে

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥"

বলিয়া অঞ্জলি দিলাম। তৎপরে কিঞ্চিৎ নির্ম্মাল্য লইয়া মন্দির হইতে বাহির হইলাম। পাণ্ডা কহিলেন, এই যে শিলাখণ্ড—যাহা এইমাত্র পূজা করিলেন, উহাই শ্রীশ্রীমাতৃপীঠ—উহাকে আশ্রয় করিয়াই দেবীর বাস্তব প্রকাশ। আর ঐ যে 'চলন্তা' মূর্ত্তি দেখিলেন, উহা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি—পরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

পাণ্ডা মহাশয়ের সঙ্গে আমরা আরও দুই চারিটী মন্দির দর্শন করিলাম। দরভাঙ্গা মহারাজের একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ হইতেছে, দেখিলাম। তৎপরে পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে উঠিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের শোভা কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। এ এক অপূর্ব্ব শোভা! এ নদের রূপ অপরাপর নদীর মত নহে। এ জল চাঞ্চল্যের পরিবর্ত্তে ধৈর্য্য, স্ত্রী স্বভাবের পরিবর্ত্তে পুরুষ-ভাব, ভোগের পরিবর্ত্তে যোগ, কামনার পরিবর্ত্তে বৈরাগ্য যেন মনে উদয় করিয়া দেয়। অন্যান্য নদীকূলে সচরাচর যে চাপল্য লক্ষিত হয়, ইহাতে তাহা আদৌ নাই—ইহা স্থির, ধীর, গম্ভীর। স্রোত খুব প্রবল—কিন্তু সাড়া নাই, শব্দ নাই—নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ; অথচ সমুদ্রবৎ গভীর। এ দৃশ্য দেখিয়া মনে স্বতঃই একতানতা আসিয়া চিত্ত স্থির হইয়া আসে। নদ-মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই চারিটি শ্যামল দীপ দেখিলেই বোধ হয়, যেন কেহ তীর্থোদকের পূজা করিয়া কতকগুলি পত্র-পুষ্পের তোড়া ভাসাইয়া দিয়াছে। ঐ দ্বীপসকলের একটীতে ৺ কামাখ্যাদেবীর ভৈরব উমানন্দের মন্দির বিরাজমান। একদিকে মহামায়া কামাখ্যাদেবীর আকর্ষণ, অপরদিকে পুণ্যদর্শন ব্রহ্মপুত্র নদ, যাহার তীরে পুরাকাল হইতে কত ঋষি মুনি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন—উভয় আকর্ষণ মিলিয়া দর্শকের হৃদয়ে এখানে এক অভিনব রাজ্যের লোভ দেখাইয়া দেয়,—যথায় শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু এ সব কিছুই নাই; আছে কেবল আনন্দ, আনন্দ, অপার আনন্দ; যে আনন্দ ফুরায় না, ফুরাইবার নহে; যাহার হ্রাস নাই, চিরকাল সমানভাবে বহিতে থাকে!

বেলা আন্দাজ ১০॥ টার সময় বাসায় আসিয়া পৌছিলাম। পাণ্ডা মহাশয় অতি যত্নে নানাবিধ বাঙ্গালা ধরণের ব্যঞ্জন সহিত অতি সুস্বাদু অন্ন আহার করাইলেন। আহারান্তে আমাদের পাণ্ডা মহাশয় ও অপরাপর দুই চারি জন ব্যক্তি আমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন—ইনি এইখানেই পরিবারাদি লইয়া বসবাস করিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত আমাদের নানা কথা হইতে লাগিল। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "বহু পুরাতন কাল হইতে শুনিতে পাওয়া

যায় যে, কেহ এখানে আসিলে এখানকার স্ত্রীলোকেরা মন্ত্রবিদ্যাবলে তাহাকে ভেড়া করিয়া রাখে—ইহার কারণ কি?" উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, "এখানকার স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই খুব সুশ্রী, তাই কদাচ কখন একটা আধটা বোকা লোক কোন স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হইয়া এই পর্ব্বত-অঞ্চলেই থাকিয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, ঐরূপ ঘটনাই ঐ প্রসিদ্ধির কারণ। তবে আমাদের এই কামাখ্যা পর্ব্বতে ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত একটীও দেখি নাই।" আমরা উহাই সম্ভব বুঝিয়া ঐ বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম না।

৺কামাখ্যা দেবীর পাণ্ডাদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। অন্যান্য তীর্থস্থানের পাণ্ডারা যেমন কোন একটী যাত্রী দেখিতে পাইলেই তাহাকে নানারূপে বিরক্ত করিয়া তাহাকে আপনার যাত্রী করিয়া লইতে চাহে, এখানকার পাণ্ডাগণ আদৌ সেরূপ প্রকৃতির নহেন। ইঁহারা অতি নম্রতা সহকারে যাত্রিগণকে কেবলমাত্র 'তাঁহাদের পাণ্ডা কে' জিজ্ঞাসা করিয়া যদি জানিতে পারেন যে, তাঁহাদের অপর পাণ্ডা আছে, তাহা হইলে আর সে যাত্রীকে নিজস্ব করিতে যত্ন করেন না। আর যদি কোন যাত্রীর পাণ্ডা না থাকে, তাহা হইলে সেই যাত্রী যাঁহাকে মনোনীত করেন, তিনিই তাঁহার পাণ্ডা হয়েন। তার পর যাত্রীদিগকে বাসায় লইয়া গিয়া এখানকার পাণ্ডারা বিদায় আদায় টাকাকড়ির জন্য আদৌ বিরক্ত করেন না; পক্ষান্তরে এত খাতির যত্নাদি সহকারে নিজ নিজ যাত্রীদের সকল বিষয়ের অভাব দূর করেন যে, যাত্রিগণ তাহাতে আপ্যায়িত হইয়া স্বতঃই যথাসাধ্য দিয়া যাইতে বাধ্য হয়েন। পূজার খরচাদি সম্বন্ধেও দেখিয়াছি, পাণ্ডারা যাত্রীর অভিপ্রায়ানুযায়ী ঠিক ঠিক কার্য্য করেন। তিলমাত্র এদিক্ ওদিক্ করেন না। এ সব ভদ্রোচিত গুণ এখানকার পাণ্ডাদের মধ্যে দেখিয়া মনে হইল, যদি সকল তীর্থের পাণ্ডারা ইঁহাদের মত হয়েন, তাহা হইলে আর কোন যাত্রীর কোনরূপ কষ্ট থাকে না। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে তীর্থাদি পর্য্যটন করিতে পারেন। আমাদের পাণ্ডা মহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গ আমাদের যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক লিখিয়া জানাইবার নহে। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ আছি।

প্রত্যাবর্ত্তন।

আসিবার দিন বৈকালে পাণ্ডা মহাশয়ের নিকট বিদায় চাহিলাম। তিনি কোনরূপে ছাড়িতে চাহেন না। শেষে আমাদের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া

রাজি হইলেন এবং খানিক দূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিলেন। অবশেষে আমরা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সেই পূর্ব্বপরিচিত পথ দিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিলাম। পর্ব্বতনিম্নে আসিয়া শকটের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম; কারণ, শকট-চালককে পূর্ব্বেই ঐ সময়ে আসিতে বলিয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর শকট আসিল। আমরা সেই পুণ্যপীঠ পর্ব্বতের পাদ-দেশে মহামায়া কামাখ্যা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া উহাতে আরোহণ করিলাম। গৌহাটী পৌঁছিয়াই প্রথমে পূর্ব্বপরিচিত বাবুটীর আফিসে আসি-লাম ও তথা হইতে আসবাবাদি লইয়া একেবারে ষ্টীমারঘাটে চলিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম, রাত্রি ১২টার সময় ষ্টীমার আসিবে ও ১টার সময় ছাড়িবে। অতএব বেলা ৫॥টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আমাদের ঘাটেই বসিয়া থাকিতে হইবে, বুঝিলাম। উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা শকট বিদায় করিয়া দিয়া ঘাটেই বসিয়া রহিলাম। রাত্রি ৮টার সময় কিছু কিনিয়া খাইলাম। মধ্যে দুই চারিটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপও হইল। কিছু সৎচর্চ্চাও হইল। ইঁহাদের মধ্যে একজন মুসলমান—ইনি স্কুল-ইন্স্‌পেক্টার।

ক্রমে রাত্রি ১২টা হইল—ষ্টীমার আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমরা তাড়া-তাড়ি টিকিটঘর হইতে ধুবড়ি হইয়া কলিকাতার টিকিট করিয়া আসবাবাদি লগেজে দিয়া ষ্টীমারে উঠিতেছি, এমন সময় ষ্টীমারমধ্যে একটা ভারি গোল-মাল হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যাত্রীরা সকলেই ষ্টীমারের পিছন দিকে ছুটি-তেছে। আমরা ব্যাপার কি, কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভিড় ঠেলিয়া একটু অগ্রসর হইয়া শুনিলাম যে, গোলমালের কারণ একটী ছেলে জলে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার ভাইও তাহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া জলে পড়িয়াছে। তাই খালাসীরা কেহ জলে নামিয়া, কেহ বয়া (Buoy) ফেলিয়া, কেহ বা বাঁশ ফেলিয়া তাহাদের উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে ষ্টীমার লাগি-য়াছে, সেখানে খুব বেশী জল এবং স্রোতও খুব বলিয়া কেহ কিছু করিতে পারিতেছে না। যাত্রীদের সকলকে জাহাজের পিছু হইতে সরাইয়া দিয়া ষ্টীমার কোম্পানির লোকেরা বালক দুইটীকে উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। অল্পক্ষণেই খালাসীদের মধ্য হইতে শুনা গেল, "ঐ দেখা গিয়াছে, ঐ দেখা গিয়াছে।" পরক্ষণেই আবার "কোথা গেল, কোথা গেল।" শেষ একেবারে দুইজনকে ধরিয়া খালাসীরা জাহাজে উঠাইল। এবার ষ্টীমার কোম্পানির বাধা না মানিয়া সকলেই জাহাজের পিছন দিকে ছুটিল।

সকলেরই আগ্রহ—একবার ছেলে দুইটীকে দেখিবে। দেখিল—উহাদের মধ্যে একজন উঠিয়াই হাসিতেছে। অপরটী অজ্ঞানের মত হইয়া আছে। অল্প ক্ষণ সেবার পর তাহারও ঘোর কাটিয়া গেল এবং সে সুস্থ হইল। তখন সকলে নিজ নিজ স্থানে যাইয়া বসিল।

আমরা তখন উপরতলায় উঠিয়া দেখি, একটুও বসিবার স্থান নাই—এত যাত্রী। নিচে উহাপেক্ষা বেশী। কাযেই পুনরায় উপরে আসিয়া অনেক চেষ্টার পর বয়লারের চিমনির নিকট একটু বসিতে স্থান পাইলাম। জাহাজ চলিতে লাগিল। কোনরূপে রাত্র কাটাইয়া দিলাম। প্রাতে যাত্রী-দের মধ্যে যাহারা রাত্রে শুইয়াছিল, তাহারা উঠাতে একটু স্থান হইল দেখিয়া, আমরা জাহাজের সম্মুখভাগে হাওয়াতে যাইয়া বসিলাম। জাহাজ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বেলা আন্দাজ ১টার সময় ধুবড়ীতে আসিয়া পৌছিল। কলিকাতা যাইবার ট্রেন অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা যৎকিঞ্চিৎ জল খাইয়াই ট্রেনে উঠিলাম এবং তৎপরদিন প্রাতে ১০টার সময় কলিকাতা আসিয়া পৌছিলাম। পথিমধ্যে প্রত্যূষে একবার সারাঘাটে ষ্টীমারযোগে নদী পার হইয়া গাড়ি বদলাইতে হইয়াছিল।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের গত ৮ বৎসরের (১৯০১—১৯০৮) কার্য্য-বিবরণী পাঠে দেখা যায় যে, উক্ত ৮ বৎসরে মোট ৯২০১ ব্যক্তি নানাভাবে আশ্রম হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং মোট ৮৫৬ জন রোগী আশ্রমে থাকিয়া ঔষধ সেবাদির দ্বারা কঠিন কঠিন রোগের হাত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। খালি গত বৎসরের কথা ধরিলেও দেখা যায় যে, ১৯০৭ জুলাই মাস হইতে ১৯০৮ জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩০৩৪ সংখ্যক ব্যক্তি আশ্রমের সেবা গ্রহণ করিয়াছে এবং ১৪৬ জন রোগী আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আর্ত্তদরিদ্রের সেবায় যে বাস্তবিক উক্ত আশ্রম ব্রতী হইয়াছেন, তাহা কার্য্যবিবরণীর ১ম, ২য় ও ৩য় তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায়, কারণ, ভারতের সমস্ত প্রদেশের, সকল

ধর্ম্মের এবং প্রায় সকল জাতির স্ত্রী, পুরুষ অথবা বালক কেহ না কেহ ঐ তালিকায় স্থান পাইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বারাণসীর ম্যাজিষ্ট্রেট ই, সি, র‍্যাডিস্ মহোদয় এই হাঁসপাতাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—"যদিও এখানে অল্পই স্থান সঙ্কুলান হয়, তথাপি এমন অনেক রুগ্ন ব্যক্তি এখানে আশ্রয় পাইয়া থাকে, যাহাদের অন্য কোথাও আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা বা ভরসা নাই।" বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ আরাণ্ডেল সাহেব বলেন—"আর্ত্ত দরিদ্রের সেবাশুশ্রূষা বিষয়ে গৌরব করিবার বিষয় কাশীধামের যাহা কিছু আছে, তন্মধ্যে এই সেবাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।"

নিরাশ্রয় আতুর দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে ৩৮ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী বৃহত্তর হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেবাশ্রম একথা কিছু কাল হইতে সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে সহৃদয় ব্যক্তিগণ এ পর্য্যন্ত যতদূর অর্থসাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে একটি দাতব্য ঔষধালয়, একটী আফিস ঘর, পাঁচটী সাধারণ রুগ্নাগার এবং তিনটী সংক্রামক রুগ্নাগার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এখনও একটী ছোট সাধারণ রুগ্নাগার, একটী রন্ধনশালা, সেবকদের বাসস্থান, চাকরদের শয়নাগার, পাইখানা, স্নানাগার, শব পরীক্ষার গৃহ, ফটক ও দ্বারপথ নির্ম্মাণার্থে ১৪ হাজার টাকা আবশ্যক। এই অর্থের জন্য সেবাশ্রম জনসাধারণের দ্বারস্থ। এরূপ উদার সেবাব্রতের সাহায্যে একটী পয়সা ব্যয় করিলেও সে ব্যয় সার্থক। সেই জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি যে, যিনি যতটুকু পারেন, ততটুকুই এই পুণ্যকর্ম্মের সাহায্যার্থে অবিলম্বে যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া বিধাতার আশীর্ব্বাদভাজন হউন। সেবাশ্রমের সাহায্যকল্পে যাঁহার যাহা কিছু দেয়, অনুগ্রহ করিয়া সহকারী সম্পাদক, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, রামাপুরা, বেনারস্ সিটি এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি।

[১৯০৪ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত]

(প্রেরিত পত্র।)

মহাশয়,

বরিশাল "রামকৃষ্ণ-সমিতির" প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে উক্ত সমিতির ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত গত ৪ বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণী সাধারণের গোচরার্থ নিম্নে নিবেদন করিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক "উদ্বোধনে" ছাপিলে সুখী হইব।

১। যুগাবতার শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের উপদেশ সর্ব্বসাধারণে প্রচার ও পূজ্যপাদ স্বামীজি প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিয়া যথাসাধ্য সবাব্রতানুষ্ঠান, এই সমিতির প্রধানতম উদ্দেশ্য। উক্ত ব্রত উদ্যাপনার্থ সমিতির সভ্যগণ নিজ নিজ বংশ ও পদমর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা এবং কুলিভাবে মোট বহিয়া অর্থ সংগ্রহ করতঃ যতদূর সম্ভব নিরন্নের অন্ন-সংস্থান, নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল রোগীদের সেবাশুশ্রূষা ও ঔষধপথ্যাদি দ্বারা সাহায্যদান মহোৎসাহে সম্পাদন করিতেছেন।

২। এ পর্য্যন্ত কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ১৩০০ নিরন্ন কাঙ্গালীকে চাউল ও পয়সা বিতরণ এবং ১২৭ জন নিরাশ্রয় নিঃসহায় কলেরা রোগীর সেবাশুশ্রূষা ও ঔষধ পথ্য দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। অধিকন্তু গত উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে ভিক্ষা করিয়া ৫৫৲ পঞ্চান্ন টাকা সাহায্য করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশামৃত ও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ী ভাব জন-সাধারণের ভিতর প্রচার এবং যুবকদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে প্রতি শনিবার উক্ত সমিতির অধিবেশন হয়। তাহাতে ঠাকুরের জীবনী, কথামৃত, স্বামীজির গ্রন্থাবলী পাঠ ও নাম সঙ্কীর্ত্তন হয় এবং গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীরূপ ভাষ্য সাহায্যে ব্যাখ্যা করার বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে নিঃসহায় রোগীদের অবস্থান ও সেবনোপযোগী ঔষধাদি রক্ষার জন্য একটী গৃহের আবশ্যকতা বিশেষরূপ উপলব্ধি হওয়ায় সমিতির সভ্য-

গণ ভিক্ষাপাত্র-হস্তে সর্ব্বসাধারণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইতি—

আপনাদের আশীর্ব্বাদপ্রার্থী
সেবক
শ্রীসুরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত।
সম্পাদক, বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি।

সংবাদ।

স্বামী নির্ম্মলানন্দ, বাঙ্গালোরের নূতন রামকৃষ্ণ-মঠের পরিচালনার ভার লইয়া তিন মাসের উপর হইল, তথায় গমন করিয়াছেন। তিনি প্রতি রবিবারে উক্ত মঠে রাজযোগের এবং প্রতি শুক্রবার গীতা ক্লাস করিতেছেন। সম্প্রতি বাঙ্গালোর ক্যাণ্টনমেণ্টেও একটী নূতন ক্লাস খুলিয়াছেন।

ইনি বিগত ২৯ শে মে টিনেভেলির 'সাধু-সম্মিলনে'র ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি হন। সভাপতির অভিভাষণে 'হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভাবসমূহ' সম্বন্ধে এক মনোহর বক্তৃতা করেন। এথানে 'কর্ম্ম ও উপাসনা' এবং 'মানবাত্মা' সম্বন্ধে আরও দুইটী সুন্দর বক্তৃতা হয়। ২রা জুন ঐস্থান হইতে মান্দ্রাজে গমন করিলে তথাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। গত ৫ই জুন হইতে তিনি বাঙ্গালোরের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন।

বিগত ২৫শে জুলাই বাঙ্গালোরের দোদানা হলে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে "ঈশ্বর ও আত্মাসম্বন্ধে বৈদিক ধারণা" বিষয়ে তাঁহার দেড় ঘণ্টার উপর এক অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা হয়।

আমরা গভীর শোকের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মান্দ্রাজনিবাসী, স্বামী বিবেকানন্দের পরম অনুগত শিষ্য এম, সি, আলাসিঙ্গা পেরুমল আয়াঙ্গার বি এ মহাশয় ৪৫ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মান্দ্রাজের পাচায়াপা হাই স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। মান্দ্রাজবাসী যে সকল উৎসাহী যুবক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া স্বামীজিকে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার

প্রেরণ করেন, ইনি তন্মধ্যে অন্যতম। ইনি মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অন্যান্য কয়েকজনেব সহিত মিলিয়া স্বামীজির পরামর্শানুসারে ব্রহ্মবাদিন্ নামক ইংরাজী ধর্ম্মবিষয়ক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কিছুদিন স্বয়ং উহা উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন ও পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

স্বামী পরমানন্দ বোষ্টন ও তন্নিকটবর্ত্তী—ওয়াল্ ঠাম্ নিউটন মিল্টন ও লিন নামক স্থানে বেদান্তের ক্লাস পরিচালনা কবিতেছেন। তাঁহাব বেদান্তপ্রচার-কার্য্যের কৃতকার্য্যতায় আমবা পবম আনন্দলাভ করিলাম।

বহুবাজার ১২ নং সার্পেণ্টাইন লেনস্থ রামকৃষ্ণ-সমিতি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত অনাথভাণ্ডারের ষান্মাসিক বিবরণী পাঠে বুঝা যায় যে, ইহার কার্য্য অতি সুচারু রূপে পরিচালিত হইতেছে। উপস্থিত ৩৪টী নিরন্ন হিন্দু-বিধবা ও সহায়-সম্পত্তি-বিহীন পরিবার এই ভাণ্ডার হইতে নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হই-তেছেন। আর ৩৪টী বালক এই ভাণ্ডারেব আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। এই বালকদিগেব উপযুক্ত শিক্ষাদানে ও ইহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিসাধনে ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অতিশয় যত্নশীল দেখা যায়।

অনাথ ভাণ্ডারের সমস্ত ব্যয় দানশীল সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের মাসিক চাঁদা ও মধ্যে মধ্যে এককালীন দান হইতে সংকুলান হইতেছে। প্রতি রবিবার পল্লীস্থ সদাশয় গৃহস্থগণের নিকট হইতে ভাণ্ডারের পরিচালক নিঃস্বার্থ যুবকগণ কর্ত্তৃক চাউল সংগৃহীত হইয়া সেই ভিক্ষালব্ধ চাউলও অনাথ ভাণ্ডারের পরিপুষ্টিসাধনে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ দুই শত টাকা দান করিয়াছেন, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট হইতেও ৬৫৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে আর আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর এই বৎসরে তাঁহার নিজ তহবিল হইতে এই ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। যাহাতে এই ভাণ্ডারের কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তদ্বিষয়ে সাধারণের মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়।

বিগত জানুয়ারী ১৯০৯ হইতে জুন ১৯০৯ পর্য্যন্ত অনাথভাণ্ডারের আয় ব্যযের হিসাব সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯০৮ সালের জের——৩১৭৯৶১৫

জানুয়ারী হইতে জুনের আয়——

চাউল বিক্রয় হইতে————৫৪৬৶১০

চাঁদা আদায়————— ২৯৬৷৵০

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট—— ২০০৲

ছোটলাট বাহাদুর——— ২০০৲

মিউনিসিপ্যালিটী———— ৬৫৲

এককালীন দান প্রাপ্তি——— ২৬৬৷০

সুদ হিসাবে—— ৯০৸১৫

————১৬৬৪৸৴১৫

মোট আয়——————৪৮৪৪ ৴০

জানুয়ারী হইতে জুনের ব্যয়——

কার্য্য পরিচালনের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয়———৮৩।৶১৫

বিধবাদিগের সাহায্য দান—— ২৫২॥০

অনাথ-আশ্রমের ব্যয়——

পাচকের বেতন ও বালকগণের

খাই খরচ—— ৩০৯৶১০

ঔষধ—— ৫৶১০

বস্ত্রাদি—— ২৭৶১০

বাটীভাড়া—— ১৫৭৸১৫

তৈজসাদি—— ১৸৶০

পুস্তকাদি—— ৯৲১৫

শয্যাদি—— ৩॥৶৫

আলো ও খুচরা খরচ—— ৩৮৸৴৫

————৫৫২৸৴১০

মোট ব্যয়——————৮৭৮৸৫

. মজুত——————————৩৯৬৫।১৫

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত কাশী যোগাশ্রমের কার্য্যকলাপ—প্রতিষ্ঠাতার শরীরত্যাগের পর হইতে এতদিন সাধারণ পাঠকের একপ্রকার অবিদিতই ছিল। সম্প্রতি উহার আবার কার্য্যতৎপরতার পরিচয়স্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তৃতীয় সংস্করণ।

ম্যালেরিয়ার মহৌষধ। ব্রহ্মচর্য্য পালন, গো সেবা, পাণীয় জলের শুদ্ধতা রক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি অবশ্যপালনীয় বিষয় যাহা আজকাল বাঙ্গালার পল্লীগ্রামসমূহে বিশেষ অবজ্ঞাত হইয়া থাকে, তৎসংক্রান্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

নারদ ভক্তিসূত্র। ভক্তিযোগাচার্য্য দেবর্ষি নারদ কৃত সূত্রগুলি দেবনাগরী অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে ও প্রত্যেক সূত্রের পরেই তাহার ইংরাজী অনুবাদ থাকাতে ইংরাজীশিক্ষিত পাঠকের বিশেষ সুবিধার বিষয় হইয়াছে। অনুবাদের ইংরাজীটি আর একটু দেখিয়া শুনিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলে ভাল হইত।

শেষোক্ত পুস্তিকা দুইখানি পরলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে আজকাল বারাণসীর যোগাশ্রম হইতে সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করা হইতেছে।

এইবার শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা উপসংহার করিব। বর্ত্তমান সংস্করণে মূলের প্রত্যেক শ্লোকের পরে অন্বয়বোধিনী, বঙ্গানুবাদ, শাঙ্কর ভাষ্য, শ্রীধরী টীকা ও গীতার্থ-সন্দীপনী অথবা শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর ব্যাখ্যা পর পর সন্নিবেশিত হইয়াছে। সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই পুস্তকখানি যাহাতে নির্ভুল হয়, তদ্বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করেন নাই দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। বাঙ্গালাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর নির্ভুল সংস্করণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা পাণ্ডিত্যপ্রধান বঙ্গভূমির কম লজ্জার বিষয় নহে। গীতার এ সংস্করণখানি সে দোষে দুষ্ট নহে, ইহা প্রকাশক ও সম্পাদকের গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। তদুপরি গ্রন্থারম্ভে প্রত্যেক অধ্যায়ের বিস্তৃত বিষয়সূচী এবং গ্রন্থশেষে বর্ণমালানুযায়ী শ্লোকসূচী ও শব্দাদিসূচী থাকাতে সংস্করণখানি

পাঠকের বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। এই প্রকার বিবিধ সূচীসম্বলিত গীতার আর একখানিও সংস্করণ বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা আমরা নয়নগোচর করি নাই। তবে মুম্বাই প্রদেশস্থ পুণা নগরী হইতে প্রকাশিত আনন্দাশ্রম-গ্রন্থাবলী মধ্যস্থ গীতাসংস্করণের ঐ প্রকার সূচীসমূহই যে এই বঙ্গীয় সংস্করণের পথপ্রদর্শক ও প্রধানতঃ অবলম্বনীয় হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। যাহাই হউক, বঙ্গীয় বর্ণলিপিতে মুদ্রিত এরূপ গীতাসংস্করণ পূর্ব্বে আর যে প্রকাশিত হয় নাই, একথাও সত্য এবং তজ্জন্য প্রকাশক ও সম্পাদক উভয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আর এক কথা, কৃষ্ণানন্দ স্বামী কৃত গীতার প্রথম সংস্করণে আনন্দগিরি কৃত টীকা, রামানুজ-ভাষ্য ও বোধ হয় মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকাও সন্নিবেশিত ছিল। সেগুলি পরিত্যাগ না করিয়া ঐ প্রকারে ভ্রমশূন্য করিয়া ছাপাইতে পারিলে সাধারণ পাঠকের বিশেষ উপকার করা হইত। তবে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ কতকগুলা ভাষ্য টীকা দেওয়া অপেক্ষা নির্ভুল যতগুলি দিতে পারা যায়, তাহাই ভাল। পুস্তকের মূল্য আর কিছু কমাইলেও ভাল ছিল। আশা করি, বর্ত্তমান সংস্করণখানি সকলের আদরের সামগ্রী হইবে।

শ্রীমদ্ দত্তাত্রেয় বিরচিত শ্রীশ্রীঅবধূত গীতা। শ্রীবিধুভূষণ সরকার বি এ কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয় বর্ণলিপিতে মূল, পরে সংক্ষিপ্ত টীকা, পরে বঙ্গানুবাদ ও আবশ্যকীয় ফুট নোট—এই প্রকার ক্রমে প্রত্যেক শ্লোক মুদ্রিত। গ্রন্থখানি মন্দ হয় নাই। সংক্ষিপ্ত টীকাটি বিশেষতঃ সাধারণ পাঠকের উপকারে লাগিবে।

ভগবদবতার মহামুনি দত্তাত্রেয়ের জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটি কথায় গ্রন্থকার বর্ত্তমান পুস্তকের অবতরণিকায় বিশেষ হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। বিদেশী ভাবাপন্ন হওয়াই যে ঐরূপ হঠকারিতার কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থকার যেন ইহা সর্ব্বদা মনে রাখেন যে—

"লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোঽনুবিজ্ঞাতুমর্হতি।"

উত্তররামচরিত।

শ্রীকৃষ্ণ (গোপ এবং রাজভাব) Sri Krishna (The Pastoral and the King-maker)। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মান্দ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিরচিত একখানি ইংরাজী পুস্তক। গ্রন্থকার সরল

ইংরাজীতে ও অল্পের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণজীবনের সমগ্র ছবিটুকু বেশ দিয়াছেন। ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠকের উহা আদরের বিষয় হইবে, সন্দেহ নাই।

The Complete Works of the Swami Vivekananda, Part IV.—হিমালয়স্থ মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগ। শ্রীস্বামীজি লিখিত ইংরাজী কবিতাগুলি এবং বঙ্গভাষায় লিখিত কবিতাগুলির সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ তদুপরি বঙ্গভাষায় লিখিত স্বামিজীর কতকগুলি প্রবন্ধ ও একখানি পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদে এই ভাগ শেষ হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষানভিজ্ঞ পাঠকেরা ইহাতে স্বামীজির দেশীয় মূর্ত্তি অবলোকনে যে বিশেষ আনন্দিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শ্রীস্বামীজির সমগ্র চিন্তার ফল এই সংস্করণে একত্র এক ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভারত ও ভারতেতর সকল দেশেরই বিশেষ সুবিধা হইতেছে, ইহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ অপূর্ব্ব পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে শ্রীবিবেকানন্দ-স্মৃতি-সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

রামকৃষ্ণ—শশিভূষণ দাস গুপ্ত প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শিলং সহরে যে "শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব" হইয়াছিল, বর্ত্তমান ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকাখানি তাহাতেই পঠিত হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। উহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব জীবনলম্বনেই লিখিত—ভাব ও ভাষা মন্দ নহে। পোর্ট কমিশনর আফিস, চট্টগ্রাম, গ্রন্থকারের নিকট পুস্তক প্রাপ্তব্য। মূল্য।• চারি আনা মাত্র।
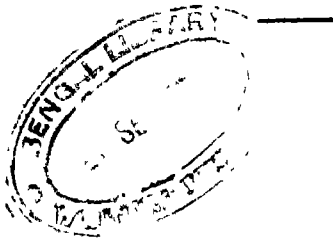
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।

একদিন ভক্তবর মনমোহন মিত্র জনৈক বন্ধুর সহিত মাহেশে জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্ত নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন, তখন বেলা প্রায় আট ঘটিকা। নৌকায় উঠিয়া মনে করিলেন, রাসমণির মন্দিরে নামিয়া রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া যাইবেন। আর তিনি যদি তাঁহাদের সহিত যাইতে চান্?—তা হ'লে তো সে আনন্দ হৃদয়ে ধর্‌বার স্থান হবে না!—কিন্তু তিনি কি আর যাইতে চাহিবেন?—তাঁর কোমল শরীর, বালকের মত ধাত, একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে, তাতে এই নৌকায়, এতটা পথ জলে জলে; আবার আহারাদিরও অনিয়ম হওয়া সম্ভব; সম্ভব কেন, হ'য়েই রয়েছে ধব—যাক্, তাঁর যাওয়ার কথা না ভাবাই ভাল। মনমোহন এই প্রকার তোলাপাড়া করিলেন, বন্ধুকে ঐরূপ ভাবের কথাও বলিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সঙ্গে লইবার বাসনা ক্রমে অধিক বলবতী হইতে লাগিল। ক্রমে মন বলিতে লাগিল, পরমহংসদেব না যাইলে মাহেশে যাইয়া কোন আনন্দই হইবে না।

দক্ষিণে বাতাস ও জোয়ারের জোরে তরী দেখিতে দেখিতে কালীবাড়ীর বাঁধা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কূলে উঠিয়া দুইজনে তাঁহার ঘরে যাইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের দুই জনকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং সাগ্রহে তাঁহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল,' যেন তাঁহার কতকটা মন অন্তর্মুখী হইয়া মনের ভিতরকার কি এক ব্যাপার, দেখিতেছে বা করিতেছে এবং কতকটা মন বাহিরে দেখা শুনা লোক জনের সহিত কথাবার্ত্তাদি কহিতেছে। এইরূপ অর্দ্ধান্তর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থাতে থাকিয়াই তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় যাবে?" মনমোহন কেবল মাত্র কহিলেন, "আজ্ঞে আমরা মাহেশে জগন্নাথ দেখ্‌তে যাব মনে কোরে বেরিয়েছি।"

রামকৃষ্ণদেব অমনি বালকের মত বলিলেন, "তবে আমিও যাব।"

মনমোহনের হৃদয় ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, পাছে তিনি যাইতে অস্বীকার

করেন। কিন্তু যখন তিনি নিজেই "যাইবেন" বলিলেন, তখন মনমোহনের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কহিলেন, "আমাদের নৌকো ঘাটে আছে।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তবে আর দেরী কি?" তৎপরে নিজ ভ্রাতুস্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "অ—রামলাল, তুই যাবি—জগন্নাথ দেখ্‌তে?" রামলাল স্বীকৃত হইল এবং রামকৃষ্ণদেবের সুপারি ও মসলার বেটুয়াটি ও গামছা লইয়া উপস্থিত হইলে, সকলে নৌকায় উঠিলেন। অনুকূল বাতাসে অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই নৌকা মাহেশে পঁহুছিল। সকলে উঠিয়া ৺ জগন্নাথ দেখিতে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৺জগন্নাথ দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ গত হইলে তাঁহার আবার বাহ্যদশা উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনমোহনকে কহিলেন, "চল বল্লভপুরে দ্বাদশ গোপাল দর্শন কোরে আসি।" অমনি সকলে দ্বাদশ গোপাল দর্শন করিতে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তখনও ভাবের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই—কাজেই যেন নেশার ঝোঁকে টলিতে টলিতে চলিতে লাগিলেন ও রামলাল তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। দ্বাদশ গোপাল দর্শনের পর তাঁহার স্মরণ হইল, রাণী রাসমণির জামাতা ৺মথুরানাথের পত্নী কিয়দ্দূরে জাহ্নবীকূলে অন্নপূর্ণা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সেইখানে যাইতে ইচ্ছা হইলে সকলে আবার নৌকায় উঠিলেন। তাঁহারা অন্নপূর্ণার মন্দিরে উপস্থিত হইলে পর তথাকার লোকেরা মহাযত্ন-সহকারে পুরী দর্শনাদি করাইয়া রামকৃষ্ণদেবকে স্বতন্ত্র লইয়া গিয়া ভোজনে বসাইল। তিনি ভোজনে বসিলেন বটে, কিন্তু কোন মতেই অন্নের গ্রাস তাঁহার মুখে উঠিল না। যতবার অন্ন মুখে তুলিবার চেষ্টা করেন, খিল লাগিয়া হাত অসাড় হইয়া আসে, এবং সমস্ত অন্ন পড়িয়া যায়। তদ্দর্শনে মন্দিরের লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল তিনি কহিলেন, "আহা, বাছাদের সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি, আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে নৌকায় ব'সে আছে, স্নান মাত্র কোরে এসেছে। তাই হয়ত অন্ন মুখে উঠ্‌ছে না।" মন্দিরের কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণেরা পরিচিত বলিয়া তাঁহারই খাতির যত্নে ব্যস্ত হইয়াছিল, অপর তিনটী লোকের আতিথ্য-সৎকারের কোন চিন্তাই করে নাই। এই অচিন্তনীয় ব্যাপারে এবং রামকৃষ্ণদেবের কথায় তাহাদের চৈতন্য হইল। অপ্রতিভ হইয়া তাহারা তখন নৌকা হইতে

ভক্তত্রয়কে আনিয়া ভোজনে বসাইল। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব আহার করিতে পারিলেন। আহারান্তে সকলে আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, দেশ-দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া পরমহংস-দেবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইতে লাগিল। সমগ্র বঙ্গসমাজে এই সময়ে ধর্ম্মভাবের যেন একটা বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, সর্ব্বত্র উহার কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ কলিকাতায়—উহা যেন ঐ বন্যার খর বেগ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কোথাও ব্রাহ্মধর্ম্মের চর্চ্চা, কোথাও শাস্ত্র-চর্চ্চা, কোথাও রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে নানা আলোচনায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে কেশব বক্তৃতা দিতেছেন, ওখানে কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেখানে যুবকদলের সহিত মিশনারি ও মুক্তি ফৌজের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ চলিতেছে। আবার কোথাও কেহ বা বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে, পঞ্চ মুদ্রা দক্ষিণা দিলেই তিনি দাতাকে হৃদয়মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার দর্শন করাইয়া দিবেন! তবে এই সকলের ভিতর ব্রাহ্মসমাজের জয়ধ্বনিই সর্ব্বাগ্রে শুনা যাইত—কেশবের গভীর নির্ঘোষই অনেককে আকর্ষণ করিতেছিল। এমন সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি নামে জনৈক বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজধানীর এখানে সেখানে নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। লোকে তাঁহার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা অনেকেই একবাক্যে এই অপূর্ব্ব পণ্ডিতপ্রবরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কোন যশস্বী ও নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতের কথা শুনিলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা করিতেন। এখন শশধর পণ্ডিত মহাশয়ের নাম ও বিবরণ শুনিয়া বালকের ন্যায় জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"মা, যাকে এত লোকে সুখ্যাতি কর্‌চে, তাকে একবার দেখ্‌ব। একবার দেখাবি নি মা? সে ধার্ম্মিক পণ্ডিত নাকি, তাই তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।" ইহার কিছুদিন পরেই একদিন বলিলেন, "আমি শশধর পণ্ডিতকে দেখ্‌তে যাব।"

পণ্ডিত শশধরের বয়ঃক্রম তখন চল্লিশের ভিতর, গৌরবর্ণ; কলিকাতা ঠনঠনিয়াতে শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীর নিকট তিনি বাস করিতে-

ছিলেন। সমস্ত বন্দোবস্ত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটি ভক্তকে সঙ্গে লইয়া ঈশানের বাটীতে যাইয়া উঠিলেন। তিনি তথায় আগমন করিবেন শুনিয়া ভাটপাড়ার জন কয়েক পণ্ডিত তাঁহার দর্শন লাভের মানসে তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঈশান অতি ভক্তিসহকারে রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক সকলকে সাদরে নিজ বৈঠকখানায় বসাইলেন। পণ্ডিতেরা প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর তিনি শশধর পণ্ডিতকে দেখিবার জন্য বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

গলে রুদ্রাক্ষমালা বিলম্বিত পণ্ডিত মহাশয় দ্বারদেশে আসিয়া রামকৃষ্ণ-দেবকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম এবং সকলকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া যাইয়া বসাইলেন। গাড়ী হইতে নামিবাই শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব যেন ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সরল বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতপ্রবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি কি রকম লেকচার দাও ?"

শশধর কহিলেন, "মশাই, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।" ইত্যাদি ধর্ম্মের অনেক গূঢ় কথা শশধর ও উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে কহিলেন। পাঠক ঐ সকল কথা শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ১মভাগে "পণ্ডিত দর্শন" শীর্ষক অধ্যায়ে অনু-সন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন।

কিছুক্ষণ ঐরূপ কথাবার্ত্তার পর তিনি একটু জল খাইতে চাহিলেন। একজন একটী গেলাসে জল আনিয়া ধরিলেন। রামকৃষ্ণদেব জল লইতে হস্ত প্রসারণ করিতে যাইলেন, কিন্তু হস্ত অগ্রসর হইল না। তিনি সে জল গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কাজেই সে জল ফেলিয়া অপর একজনকে জল আনিতে বলা হইল। জল আনা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পান করিয়া পূর্ব্ববৎ ঘোরের অবস্থায় আবার সরল ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন এবং শশধরাদি শ্রোতৃ-বর্গ চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। পরে কথায় কথায় পণ্ডিতজীকে বলিলেন, "তুমি যে বক্তৃতা কর, তা তোমার কথা তারা (শ্রোতারা) লিবেক্ কেন ? তোমার চাপরাস আছে ?"

শশধর বুঝিতে না পারিয়া বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "চাপরাস কি মশাই ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ঐ যে গো চাপরাস—তাঁর হুকুম। কি জান,

লোক শিক্ষা দিতে হ'লে, আগে ভগবান্‌কে দেখা চাই, তাঁর হুকুম পাওয়া চাই। লোক শিক্ষা দেওয়া যে সে লোকের কাজ কি? আগে হুকুম পাওয়া চাই। একবার মার হুকুম পেলে মহাশক্তির উদয় হবে। তখন লোকশিক্ষার অধিকার হবে। কে বিষয়ী, কে ভক্ত, কে জ্ঞানী, কে কর্ম্মী, জান্‌তে পার্‌বে। তা না হ'লে কার কিসে মঙ্গল হবে, কেমন কোরে জান্‌বে? তাই বলি, তুমি তাঁর হুকুম পেয়েছ?"

পণ্ডিতবর অতীব বিনীত ভাবে কহিলেন, "আজ্ঞে না মশাই।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন—"তবে কিছুই হবে না—আগে কিছুদিন নির্জ্জনে সাধন ভজন কর। তাঁর হুকুম নিয়ে তারপর লেক্‌চার বক্তৃতা যা হয় কোরো।"

অনেকক্ষণ এই প্রকার কথোপকথনের পর রামকৃষ্ণদেব বিদায় লইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, শশধর ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আর সকলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত চলিয়া গেলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে তিনি আহ্বান করিলেও 'বিশেষ কার্য্য আছে' বলিয়া তাঁহার সহিত যাইলেন না। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপ আপাতঃ অর্থহীন কার্য্য বা ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে আরও অনেকবার এইরূপে পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছিলেন—ঐ সকলের মধ্যে অতিগূঢ় কারণ নিহিত থাকে। এবারও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম ব্যক্তির আনীত জল না লইতে পারা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির আনীত জল গ্রহণ করিতে পারা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্যই তিনি আরও কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া গেলেন। ঐ বিষয় খোঁজ লইবার তাঁহার সুবিধাও ছিল—কারণ যে ব্যক্তিদ্বয় জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা দুইজনে সহোদর ভ্রাতা; ইঁহাদের ভিতর কনিষ্ঠ ভ্রাতাই শেষে জল আনিয়া দেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহারই হাতের জল গ্রহণ করেন অথচ সোদরের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, যাঁহার হাতের জল তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে দেখিলে বিশেষ শুদ্ধাচারী ভক্ত বলিয়াই লোকের ধারণা হইত; নাসিকায় তিলক, কণ্ঠে তুলসীর মালা, হস্তে হরিনামের ঝুলি, গাত্রে নামাবলী প্রভৃতি বাহ্যিক কিছুরই ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহারই হস্ত হইতে জল লইতে পারিলেন না?—বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! নরেন্দ্রনাথের সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাকে আড়ালে লইয়া যাইয়া তাঁহার অগ্রজের চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর দানে সঙ্কুচিত হইয়া

বলিলেন, "অগ্রজের দোষ, কি করিয়া বলি।" নরেন্দ্রনাথ বুঝিয়া লইলেন এবং পরে সেই বাটীর অপর এক ব্যক্তির নিকট কথায় কথায় উক্ত তিলক-মালাধারী ব্যক্তির বিশেষ ইন্দ্রিয়পরতার কথা জানিয়া বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব কেন তাহার হস্তের জল গ্রহণ করিতে পারেন নাই। নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, "ঠাকুর কি অন্তর্যামী—ঐ ব্যক্তির চরিত্র অন্তর্দৃষ্টি বলে দেখিয়া, জানিয়া শুনিয়া উহার হাতের জল খাইলেন না; অথবা ঠাকুরের অপাপবিদ্ধ-তনু-মন অপবিত্রতার সংস্পর্শে আসিলেই আপনা হইতে সঙ্কুচিত হয় এবং ঐ সঙ্কোচের কারণ তিনি বুঝিতে পারুন বা নাই পারুন, যাহাতে বা যাহা হইতে ঐরূপ সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করেন? এই দুইটির কোন্‌টি ঠিক?" কিন্তু কোনই সিদ্ধান্তে তখন উপনীত হইতে পারিলেন না। কেবল বুঝিলেন, ঠাকুরের ব্যবহার "অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকম্‌" এবং আরো বুঝিলেন—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং!

তিনি যদি কোন দিন কৃপা করিয়া বুঝান, তবেই বুঝিব এবং বুঝিয়া কৃত-কৃতার্থ হইব। এখন কেবল দেখিয়া যাই, এ পাগলা বামুনের অদ্ভুত চরিত্র ও ব্যবহার!"

নিরঞ্জন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বড় প্রিয়পাত্র ছিল। এমন কি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যাহাদের "ঈশ্বরকোটি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, নিরঞ্জন তাহাদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর আর ছয় জন মাত্র ঐ ঈশ্বরকোটি শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইত! ঠাকুর বলিতেন, "ঈশ্বরকোটি ভক্তের পরার্থেই জন্মগ্রহণ।" অর্থাৎ তাহারা সাধারণ জীবের ন্যায় মায়াবদ্ধ নহে, জীবন্মুক্ত, এবং অপরের কল্যাণ করিবার নিমিত্তই তাহাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ।

নিরঞ্জন কোন সময়ে এক নীলকুঠির অধ্যক্ষতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট অনেক দিন আসিতে পারে নাই। তাহার মনটা সেজন্য বড়ই দুঃখিত, আসিবার সুবিধা সর্ব্বদা অন্বেষণ করে। এক দিন সুবিধা পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে রামকৃষ্ণদেব ব্যগ্র হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই কোথা ছিলি এত দিন? কেন আসিস্‌ নি? ব্যাপার কি বল্‌ দেখি?"

নিরঞ্জন উত্তর করিল, "আজ্ঞে একটা চাকরী কর্‌ছি, তাই আস্‌তে সময় পাইনি।

এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেবের মুখচন্দ্র যেন ঈষৎ মেঘাবৃত হইল, একটু আশ্চর্য্যের সহিত কহিলেন, "সে কিরে, চাকরি কর্‌ছিস্—গোলামী?—গোলামী কর্‌ছিস্ কেন?"

নিরঞ্জন সদানন্দ, হাসি মুখে লাগিয়াই আছে এবং দেখিতে বেশ সুশ্রী ছিল। তাহার উপর এমন নির্ভীক বীরভাবব্যঞ্জক শরীরঠাম, ভালবাসা-ময় মুখকান্তি ছিল যে, দেখিলেই মনে হইত, যেন নিঃস্বার্থতা মূর্ত্তিমান্। রামকৃষ্ণ-দেবের ঐ প্রকার ঘৃণাব্যঞ্জক কথা শুনিয়া সে চমকিত হইল—বুঝিল, চাকরীর মত হীন কায জগতে আর দ্বিতীয় নাই। কাতর হইয়া ভাবিল, "হায়, হায়, এ গোলামী আমি কেন স্বীকার করিলাম?" পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কহিল—"মশাই, মার দুটী অন্নের উপায় হবে ব'লেই এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। নইলে মাকে কি ক'রে অন্ন দিই?"

এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব অতি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ওঃ, মার জন্য চাকরী স্বীকার করেছিস্, তবে তোর দোষ নাই। নইলে নিজের জন্যে যদি এই গোলামী কর্‌তিস্ ত তোকে বলতুম ধিক্! আর তোর মুখ দেখ্‌তে পার্‌তুম্ না!" এই কথা বলিয়া তিনি নিরঞ্জনকে যত্ন করিয়া বসাইলেন এবং অন্যান্য সমবেত ভক্তগণের সঙ্গে নানা কথা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের হৃদয়াকাশে এক মহা ঝঞ্ঝাবাত উঠিল, সে বেশ বুঝিল যে, সে নিজে অবি-বাহিত, আপনার জন্য চাকরী করিতেছে না সত্য, তথাপি যতদিন না চাকরী পরি-ত্যাগ করিতে পারিবে, ততদিন তাহার ঐ অশান্তির নিবৃত্তি হইবে না। চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি তাহার মনোমধ্যে যে এক অব্যক্তভাবের অশান্তি দেখা দিয়াছিল, তাহাতে তাহার মন ক্রমাগত যেন তাহাকে অস্ফুট ভাবে ইঙ্গিত করিত, "এ তোমার কাজ নয়, এই কর্‌তে কি জন্মেছ?" আজ সংসারের মধ্যে তাহার একমাত্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে চাকরীর এই প্রকার লাঞ্ছনা শ্রবণে সেই অশান্তি পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল—দৃঢ় ধারণা হইল যে, এ প্রকার কার্য্য তাহার প্রকৃতিরবিরুদ্ধ, অতএব যত শীঘ্র পারে, চাকরী ত্যাগ করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তদের মধ্যে পরস্পরের সহিত আলাপ করিয়া দিতেন, কাহাকে বা কথন অপর কাহারও বাটীতে যাইয়া আলাপ পরিচয়

করিয়া আসিতেও অনুরোধ করিতেন। শরৎ যখন প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতে আরম্ভ করে, তখন তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রশংসা করেন। বলেন—"নরেন্দর যেমন লিখ্‌তে পড়্‌তে, তেমনি বল্‌তে কইতে,তেমনি গাইতে বাজাতে, আবার তেমনি শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্র। ধ্যান করতে বসে—রাত পুইয়ে যায়। বাজিয়ে (পরীক্ষা করে) নাও—টং টং কর্‌চে—একটুও মেকি নয়। অমনটি আর একটিও এল না। এখন যারা সব আসচে, তারা অনেক চেষ্টা চরিত্তির ক'রে বড় জোর দুটো পাশ্‌ করেছে। কেশব (কেশব চন্দ্র সেন) বিজয় (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) সব ব'সে আছে, তার ভিতর নরেন্দরও ব'সে আছে—দেখ্‌ছি, তাদের ভিতর একটা একটা প্রদীপের শিখার মত শিখা জ্বলচে—জ্ঞানের দীপ জ্বল্‌চে; আর নরেন্দরের ভিতর যেন একটা সূর্য্য রয়েছে—জ্ঞান-সূর্য্য; দেখে অবাক্ হ'য়ে রইলুম। কেশব, একটা বক্তৃতাশক্তিতে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে—দেখ্‌লুম নরেন্দরের ভিতর অমন আঠারটা শক্তি রয়েচে।"

শরতের ঐ সব কথা শুনে নরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিবার বিশেষ আগ্রহ হইল—জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই। নরেন্দ্রনাথের বাড়ী কোথায়?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব তদুত্তরে বলিলেন—"সিমলের বিশু (বিশ্বনাথ) দত্তের ছেলে—তার বাপ উকীল।" শরৎ ভাবিল, কলিকাতায় কত বিশ্বনাথ দত্ত আছেন—কেমন করিয়া নরেন্দ্রনাথের বাটীর সন্ধান পাইব—যাহা হউক, চেষ্টা করিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে বাটী ফিরিল ও পরদিন একখানি ডাইরেক্টারী পুস্তক হইতে সিমলার বিশ্বনাথ দত্তের বাটীর ঠিকানা খুঁজিয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে গেল।

প্রথম দিনের আলাপেই নরেন্দ্রের প্রতি শরৎ এতই আকৃষ্ট হইল যে, এখন হইতে নরেন্দ্রের বাটীতে যাওয়া ও চারি পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া তাহার সহিত আলাপ না করিলে থাকিতে পারে না! নরেন্দ্রনাথের মহিমা তাহার মজ্জায় মজ্জায় এতই প্রবেশ করিয়াছিল! দুই চারি দিন দেখা না হইলে শরতের প্রাণ ছটফট করে।

'এফে' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শরৎকে তাহার গুরুজনেরা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে পরামর্শ দিলেন। শরৎ নরেন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শে ঠিক করিল, তাহাই করিবে এবং অল্প দিনের মধ্যে উক্ত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিল। একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম হইতেই কর্ণগোচর হইয়াছিল। কিন্তু উহা তাঁহার আদৌ মনঃপূত হইল না। "তিনি মধ্যে মধ্যে শরৎকে ডাক্তারি

শিক্ষায় নিতান্ত নিরুৎসাহ করেন ; বলেন—"ছিঃ বাবু, তুমি কেন এমন কল্লে—তুমি ডাক্তার হ'য়ে, অপরের পূঁয রক্ত ঘেঁটে যখন টাকা আনবে, তখন তোমার হাতে আর খেতে পারব না।" ইত্যাদি— শরতের মনে ঐ সব কথায় বিষম সমস্যার উদয় হইল। সে দিনের পর দিন ইহাই ভাবিতে লাগিল যে, তবে কি ডাক্তারি শিখিতে যাইয়া সে বাস্তবিকই ভাল করিল না? ইহাতে তাহার ধর্ম্মলাভের পক্ষে কি হানি হইবে? আবার মন বলে—কেন? অত বড় একটা বিদ্যা, যা শিখলে, ইচ্ছা থাকলে কত লোকের উপকার কর্তে পারা যায়, সেটা শেখা তো ধর্ম্মলাভের সহায়ক বৈ হানিকর হইতে পারে না? আবার মন বলে—তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি, তিনি কেন এত ক'রে বারণ কর্‌ছেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সে তাহার প্রিয় সুহৃদ্ নরেন্দ্রের সঙ্গে আবার পরামর্শ করিতে যাইল ও তাঁহাকে বলিল,"ভবিষ্যতের কোন প্রকার জীবনোপায় ত আবশ্যক, তা ডাক্তারি বিদ্যা কি খারাপ?" নরেন্দ্রনাথ তদুত্তরে, "ডাক্তারি একটা মহৎ বিদ্যা" ইত্যাদি নানা প্রশংসা করিয়া বলিল—"আমি হইলে যত দিন না বুঝিতাম যে, ডাক্তারি পড়ায় আমার সত্য সত্যই হানি হইবে,তত দিন কখনই ছাড়িতাম না। শরতের মনে নরেন্দ্রনাথের পরামর্শই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল। সে ভাবিল, যাহা হয় হউক, যখন একবার লাগিয়া গিয়াছি, তখন যতদিন না ঠিক্ ঠিক্ বুঝি যে ডাক্তারি করায় হানি আছে, ততদিন কলেজ ছাড়িব না। আর ঠাকুর তো ডাক্তারি পড়াটা খারাপ বলেন নাই—ঐ বিদ্যার সাহায্যে অর্থোর্জ্জনেরই দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব এখনি পড়া ছাড়িব কেন? কিন্তু যদিই পড়া ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে অপর একটা জীবনোপায় ত চাই, সেটা কি করিব, একটা স্থির করা প্রয়োজন। কিছু একটা স্থির করিতে না পারিয়া সে ভাবিল—এখন হইতে তবে ডাক্তারির সহিত বিএর পড়াটাও পড়িতে থাকি—যদি একটা ছাড়ি তো একটা থাকিবে—তার পর যাহা হয় একটা পরে স্থির হইবে। হায়, ভবিষ্যদন্ধ মানব, তুমি সংসারটাকে ধ্রুব নিশ্চিৎ জানিয়া কতই না আটঘাট বাঁধ—কিন্তু তোমার সব যুক্তি এক অজ্ঞাত শক্তির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় ভাসিয়া যায়, সেটা একবারও ভাব না! অতঃপর শরৎ ডাক্তারি ও বিএ উভয়ই পড়িতে থাকিল।

কাল কলিকাতার উত্তরে পাঁচ ছয় মাইল দূরে পাণিহাটি (পেনেটি) গ্রামে "চিঁড়ার মহোৎসব।" বৈষ্ণব বাবাজি ভিন্ন এ উৎসবের খবর বড় একটা কেউ রাখে না ; আর খবর রাখে যত স্ত্রীলোক—তাও ভদ্রবংশীয়া খুব কম। কলিকাতাবাসী ভদ্রলোক ও স্কুল কলেজের ছাত্র অধিকাংশই উহার সম্বন্ধে একেবারে

অনভিজ্ঞ। কাজেই কি কারণে এখানে এ সমারোহ হয়, তাহাও জানে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ উৎসবে জনসংখ্যা বড় কম হয় না। বিশ পঁচিশ হাজার লোক এবং কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের যত কীর্ত্তন-সম্প্রদায় উহাতে যোগ দান করিয়া শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন ও মালসা মালসা চিঁড়ার ফলার মহাপ্রভুকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ধারণ করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ উৎসবে পূর্ব্বে অনেকবার যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পাণিহাটি ও খড়দহের গোস্বামিবংশীয়েরা তাঁহাকে সেজন্য বিশেষরূপে জানিতেন ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

এ বৎসরের উৎসবের কিছু পূর্ব্ব হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গলায় একটা বেদনা হইয়াছে। সকলে বলিতেছে, গলার পার্শ্বের বীচি (Gland) ঠাণ্ডা লাগিয়া ফুলিয়াছে, তাই ঐরূপ হইয়াছে—"টন্সিল্" হইয়াছে, দুই চারি দিনেই কমিয়া যাইবে। তিনিও উহা গ্রাহ্য করিতেছেন না। একেই তো তাঁহার শরীর-জ্ঞান কম, ভাব-সমাধিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নিঃস্পন্দ হইয়াই দিবসের কতকাল কাটে—কাজেই তাঁহার শরীরের রোগ গ্রাহ্য না করা একটা বিচিত্র কথা নহে। শরীরটার সম্বন্ধে তাঁহার কথাই তো ছিল "হাড় মাসের খাঁচাটা!" চারি পাঁচ দিনেও ব্যথা না কমাতে কলিকাতা হইতে রাখাল ডাক্তারকে রাম আনিয়া দেখাইয়া একটা মলমের ব্যবস্থা করিয়া দিল। তার পর বলরাম, রাম প্রভৃতি ভক্তদের সম্বোধন করিয়া ঠাকুর পেনেটির উৎসব দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলিলেন—"সেখানে হরিনামের হাটবাজার বসে গো! আমার ইচ্ছা, এই সকল 'ইয়ং বেঙ্গল' (তাঁহার যুবক ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া) দের একবার উহা দেখাইয়া লইয়া আসি। উহারা এসব তো কখন দেখে নাই।" অগত্যা তাঁহার গলার ব্যথা থাকিলেও যাওয়া স্থির হইল এবং সকল ভক্তদের সঙ্গে লইয়া তিন চারি খানি নৌকা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তৎপরদিন পাণিহাটির উৎসবে যোগদান করিতে চলিলেন। রামচন্দ্র, সুরেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, ছোট নরেন, রাখাল, শরৎ, শশী, বাবুরাম, লাটু, নিরঞ্জন, ভবনাথ, কেদার, তারক, কবিবর গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, মনমোহন মিত্র, বলরাম বসু, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ছোট বড় ভক্তেরা অনেকে তাঁহার সহিত চলিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যাইতে যাইতে তাঁহাদের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন ও সুরেন্দ্র প্রভৃতিকে বলিলেন, "দেখ, এই ইয়ং বেঙ্গলদের হরিনামের হাটবাজারটা একবার দেখাব ব'লেই আজ যাচ্চি।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐরূপ গুটিকতক ইংরাজি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেই সকল কথাগুলি ঠাটাচ্ছলে ব্যবহার করিতেন; তাহাতে শ্রোতৃবর্গমধ্যে

একটা মধুর হাসির রোল উঠিত। সুরেন্দ্রাদি ভক্তেরা বলিল—"কিন্তু মশাই, আপনার গলায় বেদনা, কীর্ত্তনে যোগ দেওয়া হবে না।" রামকৃষ্ণদেব একটু হাসিলেন মাত্র, কোন উত্তর করিলেন না। নৌকায় উঠিবার পূর্ব্ব হইতেই ভক্তেরা পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন—"ওঁর গলায় বেদনা, ওঁকে কীর্ত্তনে মাতামাতি কর্‌তে দেওয়া হবে না, ভাই। কি জানি, বেদনা যদি বেড়ে যায়!" রামকৃষ্ণদেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এতই কোমল যে, ঘাসের উপর দিয়া খালি পায়ে চলিয়া যাইতে কষ্ট হইত। তাঁহার হস্ত দুইখানি দেখিলে মনে হইত, অতি সামান্য আঘাতেই রক্ত বাহির হইতে পারে, ফলেও একদিন কড়াভাজা লুচির শক্ত ধার লাগিয়া অঙ্গুলি ছড়িয়া যাইয়া রক্ত পড়িয়াছিল। কেহ তাঁহার পা টিপিবার সময় অতি সামান্য জোর দিলেও উহা সহ্য করিতে পারিতেন না—কাজেই ভক্তেরা আবশ্যক হইলে পায়ে ধীরে হাত বুলাইয়া দিত মাত্র। এমন সুকোমল দেহ, কিন্তু যখন কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন ঐ নলিনীলাঞ্ছিত কোমল শরীরে মত্ত মাতঙ্গের অধিক বলের আবির্ভাব দেখা যাইত। কাজেই ভক্তেরা সকলে ব্যাধি বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় তাঁহাকে কীর্ত্তনে যোগ দিতে দিবেন না, কেবলমাত্র উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেব দর্শন করাইয়া ফিরাইয়া আনিবেন, ইহাই সঙ্কল্প করিলেন। বেলা এগারটা আন্দাজ তাঁহারা পাণিহাটীর গোস্বামীদের ভবনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তখনি উৎসব-স্থলে জনতা প্রচুর। গোস্বামীদের বৈঠকখানায় ধূমপান ও একটু বিশ্রাম করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিগ্রহ দর্শনে উঠিলেন—ভক্তেরাও তাঁহার সঙ্গে যাইলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি আপনাকে যথাসম্ভব সামলাইয়া চলেন—কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিয়া ভাবসমাধিতে মগ্ন না হন বা নৃত্যাদি না করেন। কিন্তু ফলে সকলি বিপরীত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিগ্রহ দর্শন করিতেছেন এমন সময় আঙ্গিনায় এক কীর্ত্তন-সম্প্রদায় প্রবেশ করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। এক গোছা ধপ্‌ধপে উপবীত ও তিলকমালাধারী, সর্ব্বাঙ্গে নাম ও চরণাঙ্কিত, তদুপরি ট্যাঁকে এক গোছা পয়সা গোঁজা, জনৈক গোস্বামী প্রভু ঐ দলের সহিত যোগদান করিয়া নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া নাচিতে লাগিলেন। সকলের মনে তাহাতে হাস্যরসেরই উদ্দীপন হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তদ্দর্শনে স্বীয় ভক্তদের জনান্তিকে বলিলেন, "ঢং দেখ!" ঐ কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার নিজের ভাবাবেশ হইল এবং আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না। মিষেযে কীর্ত্তনের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়া একবারে সমাধিস্থ হইলেন এবং একটু

বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেই সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন—তখন কোথায়ই বা রোগ বাড়িবার ভয়, আর কোথায়ই বা ভক্তদের অনুরোধ! ভক্তেরাও কাযেই সে কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন—হরিনাম ও ভগবদানন্দের যেন একটা বন্যা গর্জ্জিয়া উঠিল। সে অপূর্ব্ব ভাব ও দৃশ্যের কথা বর্ণনাতীত!

কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে, তথা হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে নিত্যানন্দ-পূজিত যন্ত্র ও বিগ্রহ দর্শনে সকলে বহির্গত হইলেন। দুই চারি পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই ঠাকুরের আবার ভাব হইতে লাগিল, আব চলিতে পারিলেন না। অমনি যত কীর্ত্তনের দল আসিয়া তাঁহাকে বেড়িয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে শোভিত হইল এবং সেই কুসুমনিন্দিত সুকোমল শরীরের অণুপরমাণু পর্য্যন্ত এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল, সে এক বর্ণনাতীত পরিবর্ত্তন! আবার ঠিক সেই সময়ে মেঘান্তরাল হইতে ঈষৎ সূর্য্য প্রকাশ হওয়াতে সমস্ত মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ তপনের কিরণচ্ছটায় পরিশোভিত হইয়া উঠিল। এইরূপে কখন বাহ্যদশায় দুই চারি পদ গমন এবং কখন সমাধিতে নিশ্চল হইয়া অবস্থান—এইভাবে ভক্তদেব সঙ্গে লইয়া ঠাকুর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভাবাবস্থায পাছে পড়িয়া যান, এই জন্য ভবনাথ তাঁহাকে ধরিয়া গমন করিতে লাগিল। আবার কখন বা ঠাকুর কীর্ত্তনের তালে তালে পা ফেলিযা নৃত্য করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন আর যত কীর্ত্তনের দল তাঁহাকে ঘিরিয়া যেন জমাট্ বাঁধিয়া

"সুরধনীর তীরে হরি ব'লে কেরে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।"
"নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
আমাদের প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
এই আমাদের প্রেমদাতা নিতাই"

ইত্যাদি গান ধরিয়া নাচিতে নাচিতে চলিল! ভক্তেরা আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহার প্রেমের স্রোতে তাঁহারই সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। সত্য সত্যই তাঁহারা সেদিন প্রেমস্বরূপ গৌরাঙ্গসুন্দরের অদ্ভুত ভাবতরঙ্গ দর্শন ও স্পর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন! ঠাকুরের সেদিনকার মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিজনিত

অপূর্ব্ব মুখজ্যোতিঃ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তপটে উহা চিরকালের নিমিত্ত অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে! এই রূপে অগ্রসর হইতে হইতে নিত্যানন্দপূজিত যন্ত্র ও বিগ্রহের নিকট পঁহুছিতে প্রায় বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। সেখানে যাইয়া দর্শনাদির পর যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহজ বাহ্য ভাব আসিল, তখন তাঁহার সেবকমণ্ডলী কোন প্রকারে তাঁহাকে লইয়া নৌকায় উঠিয়া দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন।

দিবাবসানে সকলে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া পুনরায় উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

বিদায় গ্রহণের অনতিপূর্ব্বে ঠাকুর শরৎকে বলিলেন—"কিরে, আজ কেমন দেখ লি? কেমন, হরিনামের 'হাট বাজার' নয়?"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ মহাশয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার যুবক ভক্তদের ভিতর একজনকে লক্ষ্য করিয়া শরৎকে বলিলেন—"দেখিচিস্ ওর কেমন ভাব। এই অল্পদিন আস্‌চে, বলে, এরি মধ্যে ওর কত দর্শন হয়—আবার নিরাকারে মন লীন হ'য়ে যায়!"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ বড় সুন্দর।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তুই এক দিন ওর বাড়ীতে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে আসিস্ না।"

শরৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মহাশয় আমার নরেন্দ্রনাথকেই বেশ ভাল লাগে। আর কাহারও কাছে যেতে ইচ্ছা করে না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, 'একদিন যাস্ না।" শরতের প্রীতি নরেন্দ্রের সহিতই বেশী, তাহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও সঙ্গে মেশামিশি করিতে ইচ্ছা হয় না, ভালও লাগে না। তাহার উপর শরতের বিচারবুদ্ধি প্রবল; কোন কথাই যাচাই ও বিচার না করিয়া বিশ্বাস করিতে চায় না। এদিকে রামকৃষ্ণদেব যাহার বাটী যাইয়া আলাপ করিতে অনুরোধ করিলেন, সে একজন ভক্তিপথের লোক, আর বড়ই সরল বিশ্বাসী,—ঠাকুর দেবতা বিষয়ক সকল কথাই বিশ্বাস করে, অতএব একটু বুদ্ধি কম বলিয়া শরতের তাহার উপর ধারণা—কাযেই তাকে বড় পছন্দ হয় না। সেজন্যই সে তাহার নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল।

রামকৃষ্ণদেব একটু বিরক্তির সহিত কহিলেন, "তুই ছোঁড়া তো ভারী এক-ঘেয়ে! অমুককে ভাল লাগে, অমুককে ভাল লাগে না, ও কি? তাঁর (জগদম্বার) পাঁচ ফুলের ডালি সাজান। সকলেই কি এক রকম হবে? তাই ব'লে তুই সকলের ভাব নিয়ে আনন্দ করতে পার্‌বিনি কেন? এ কি তোর হীনবুদ্ধি? ওর কাছে একদিন যাবি। কেমন যাবি ত?"

"হীনবুদ্ধি একঘেয়ে" এই সকল কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট বড় গালাগাল ছিল। কোন প্রকারের সঙ্কীর্ণ ভাব তাঁহার ভক্তদেব ভিতব তিনি কোনরূপে সহ্য করিতে পারিতেন না এবং দেখিলেই ঐ কথা দুইটি এমন স্বরে উচ্চারণ করিতেন যে, যাহার বা যাহাদের প্রতি ঐ কথাগুলি প্রয়োগ করিতেন, সে বা তাহারা একেবারে মাটি হইয়া যাইত! শরতের ভাগ্যেও এখন তাহাই হইল। সে অপ্রতিভ হইয়া "যে আজ্ঞে, যাব" বলিয়া সেদিন বিদায় গ্রহণ করিল।

দুই এক দিন পরে শরৎ, ইচ্ছা না থাকিলেও, উক্ত ভক্তের বাটী যাইয়া তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল। কথায় কথায় সে লোকটী শরৎকে কহিল, "দেখুন, আমার ভাব কি জানেন? আমি, পরমহংসদেব যা বলেন, তা বিচার না ক'রেই বিশ্বাস করি। কারণ, উনি ত কিছুর প্রত্যাশী নন। অতএব তিনি যা করতে বলেন, তাতে আমার কল্যাণ হবে ব'লেই বলেন। আমার বুদ্ধি ও দৃষ্টি কতটুকু যে, আমি তাই নিয়ে সে কথা বিচার ক'রে দেখ্‌বো? সে জন্য তাঁর কথাগুলি বিচার না ক'রেই করি। এটা তো বুঝি যে, উনি আমার মঙ্গল কামনাই করেন ও ওঁর দৃষ্টি সাধারণ লোকের মত নয়, অনেক দূর যায়, তখন ওঁর কথা বিচার ক'রে আর কি কর্‌ব? সে জন্য আমি ওঁর কথা সব মেনে নি, বিশ্বাস করি।"

এই এক কথায় শরতের হৃদয়াকাশে এক নূতন আলোকের বিকাশ হইল। শরৎ ভাবিল, "বাস্তবিক তো—পরমহংসদেব আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা ছাড়া আর কিসের প্রত্যাশী? এ তো বেশ কথা বলেছে। একে আমার মত হাবড়হাটী ভেবে মর্‌তে হয় না, তাঁর কথায় সরলভাবে বিশ্বাস করে। আর আমি কি কর্‌ছি? আমার মঙ্গলের জন্যই ত তিনি ডাক্তারি শিখ্‌তে মানা কর্‌ছেন, এতদিন ধরে? আর আমি তার কথা গ্রাহ্যই করি নি। যাগ্‌, ডাক্তারি আর পড়্‌ব না, তাতে যাই হোগ্‌ হবে।" শরৎ যাহার নিকট আসিবে না ভাবিয়াছিল, তাহারি একটি কথায় অপূর্ব্ব বল ও বিশ্বাস এইরূপে অর্জ্জন করিয়া বাড়ী ফিরিল এবং "ডাক্তারি পড়িবে কি না"—যাহা লইয়া এতদিন তোলাপাড়া করিয়া অশান্তি ভোগ করিতেছিল, তাহারও এক মুহূর্ত্তে মীমাংসা হইয়া গেল! বাটী ফিরিবার সময় সে তখন এই কথাই ভাবিতে লাগিল—"বাবা! তাঁর (ঠাকুরের) ভক্তদের মধ্যে কার ভিতর কি (গুণ) আছে, তা আমি কিছুই জানি না!"

ইহার কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া শরৎ বলিল, "মশায়, আমি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়েছি।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে বিশেষ আনন্দ

প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, বেশ করেছ। যারা ভগবান্‌কে ডাক্‌বে না, তারা যা হয় করুক্‌গে—তোমাদের ওসব কেন? এক এক ক'রে বাসনা তো সব ছাড়্‌তে হবে।"

কিন্তু উক্ত ভক্তের বাটীতে যাইয়া আলাপ পরিচয়ের কথা ঠাকুর নিজে একবারও তুলিলেন না। শরৎ নিজে সে কথা বলিলেও, তাহার কথাতেই তাহার ডাক্তারি পড়া ছাড়ার মনস্থ হইয়াছে বলিলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া শুনা বা পুনরায় শরৎকে উক্ত ভক্তের নিকট যাইতে বলা—কিছুই করিলেন না!

বাটীতে থাকিতে শরতের বাইবেল পাঠে বড় প্রীতি ছিল। প্রত্যহ তাহার কোন না কোন অংশ রাত্রে পাঠ করিত, ঠাকুর তাহা শুনিয়াছিলেন। একদিন শরৎ তাঁহার নিকট বসিয়া আছে, কথায় কথায় ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাইবেলে যীশুর কি রকম চেহারা লেখা আছে রে?"

শরৎ কহিল, "কৈ মশাই, বাইবেলে ত তা বিশেষ কিছু দেখি নাই। তবে একটু আধটু আভাস আছে মাত্র। যীশুর ছবি যা দেখিচি, তাতে মনে হয় তাঁর খুব গৌর বর্ণ, টিকল নাক, মুখের শ্রীও বেশ। য়াহুদী জাতেরই ঐরূপ শ্রী।"

ঠাকুর কহিলেন, "আমি যীশুকে দেখেছিলাম, খুব ধপ্‌ধোপে রং বটে, কিন্তু দেখ্‌লুম নাকের ডগ্‌টি একটু মোটা—থ্যাবড়া।"

শরৎ রামকৃষ্ণদেবের কথা শ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কিন্তু মশাই, আমি তাঁর যত ছবি দেখিছি, তাতে বেশ টীয়ে পাখীর মত নাক।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঘাড় নাড়িয়া পুনরায় কহিলেন, "কিন্তু আমি যে দেখ্‌লুম, তাঁর নাক একটু খাঁদা, ডগ্‌ একটু মোটা।" শরৎ কাযেই আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া চুপ্‌ করিয়া রহিল, কিন্তু য়াহুদীবংশোদ্ভব যীশুর নাক যে থ্যাবড়া, এ কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ইহার বহুকাল পরে শরৎ একখানি ইংরাজি পুস্তকে যীশুর আকৃতি সম্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ পাঠ করে ও তাহারই একটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামত যীশুর নাক ঈষৎ মোটা বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে, দেখিল। তখন তাহার বিশ্বাস হইল যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যথার্থই যীশুর সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্মবিজ্ঞান।

(সাংখ্য ও বেদান্তমতের সমালোচনা।)

[স্বামী বিবেকানন্দ।]

সূচনা।

আমাদের এই জগৎ—এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ—এই জগৎ যাহার তত্ত্ব আমরা যুক্তি ও বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারি—উহার উভয় দিকেই অনন্ত, উভয় দিকেই অজ্ঞেয়, চির-অজ্ঞাত বিরাজমান। যে জ্ঞানালোক জগতে ধর্ম্ম নামে পরিচিত, তাহার তত্ত্ব এই জগতেই অনুসন্ধান করিতে হয়; যে সকল বিষয়ের আলোচনায় ধর্ম্মলাভ হয়, সেগুলি এই জগতেরই ঘটনা। স্বরূপতঃ কিন্তু ধর্ম্ম অতীন্দ্রিয় ভূমির অধিকার-ভুক্ত, ইন্দ্রিয় রাজ্যের নহে। উহা সর্ব্বপ্রকার যুক্তিরও অতীত, সুতরাং উহা বুদ্ধির রাজ্যেরও অধিকারভুক্ত নহে। উহা দিব্যদর্শন-স্বরূপ, উহা মানবমনে ঈশ্বরীয় অলৌকিক প্রভাবস্বরূপ, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান, উহাতে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষা আমাদের অধিক পরিচিত করিয়া দেয়, কারণ, উহা কখন 'জ্ঞাত' হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস, মানব-সমাজের প্রারম্ভ হইতেই মানব-মনে এই ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান চলিয়াছে। জগতের ইতিহাসে এমন সময় কখনই হয় নাই, যখন মানব-যুক্তি ও মানব-বুদ্ধি এই জগতের পারের বস্তুর জন্য অনু-সন্ধান, উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়াছে।

আমাদের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে—এই মানব-মনে—আমরা দেখিতে পাই, একটী চিন্তার উদয় হইল। কোথা হইতে উহা উদয় হইল, তাহা আমরা জানি না; আর যখন উহা তিরোহিত হইল, তখন উহা যে কোথায় গেল, আমরা তাহাও জানি না। বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ যেন একই রাস্তায় চলিয়াছে, এক প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া উভয়কেই যেন চলিতে হইতেছে, উভয়ই যেন এক সুরে বাজিতেছে।

এই বক্তৃতাসমূহে আমি আপনাদের নিকট হিন্দুদের এই মত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব যে, ধর্ম্ম মানুষের ভিতর হইতেই উৎপন্ন, উহা বাহিরের কিছু হইতে হয় নাই। আমার বিশ্বাস, ধর্ম্মচিন্তা মানবের প্রকৃতিগত; উহা মানুষের স্বভাবের

* স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত The Science and Philosophy of Religion নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ।

সহিত এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, যতদিন না সে নিজ দেহমনকে ত্যাগ করিতে পারে, যতদিন না সে চিন্তা ও জীবন ত্যাগ করিতে পারে, ততদিন তাহার পক্ষে ধর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। যতদিন মানবের চিন্তাশক্তি থাকিবে, ততদিন এই চেষ্টাও চলিবে এবং ততদিন কোন না কোন আকারে তাহার ধর্ম্ম থাকিবেই থাকিবে। এই জন্যই আমরা জগতে নানা প্রকারের ধর্ম্ম দেখিতে পাই। অবশ্য ইহার চর্চ্চা ও আলোচনায় মাথা গুলাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে যেমন মনে করেন, ইহাকে বৃথা কল্পনামাত্র বলিতে পারা যায় না। নানা আপাতবিরোধী বিভিন্ন ধর্ম্মরূপ বিশৃঙ্খলতার ভিতর সামঞ্জস্য আছে, এই সব বেসুরা বেতালার মধ্যেও ঐক্যতান আছে; যিনি উহা শুনিতে প্রস্তুত, তিনিই সেই সুর শুনিতে পাইবেন।

বর্ত্তমান কালে সকল প্রশ্নের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন এই,—মানিলাম—জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের উভয় দিকেই অজ্ঞেয় ও অনন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে—কিন্তু ঐ অনন্ত অজ্ঞাতকে জানিবার চেষ্টা কেন? কেন আমরা জ্ঞাতকে লইয়াই সন্তুষ্ট না হই? কেন আমরা ভোজন, পান ও সমাজের কিছু কল্যাণ করিয়াই সন্তুষ্ট না থাকি? এই ভাবই আজকাল চারিদিকে শুনিতে পাওয়া যায়। খুব বড় বড় বিদ্বান্ অধ্যাপক হইতে অনর্গল বৃথাবাক্যব্যয়কারী শিশুর মুখেও আমরা আজকাল শুনিয়া থাকি—জগতের উপকার কর—ইহাই একমাত্র ধর্ম্ম, জগতের অতীত সত্তার সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করায় কোন ফল নাই। এই ভাবটী এখন এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্যস্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই জগদতীত সত্তার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া থাকিবার আমাদের যো নাই। এই বর্ত্তমান ব্যক্ত জগৎ সেই অব্যক্তের এক অংশমাত্র। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ানুভূত জগৎ যেন সেই অনন্ত আধ্যাত্মিক জগতের একটী ক্ষুদ্র অংশ-স্বরূপ, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ঐ অতীত জগৎকে না জানিলে কিরূপে উহার এই ক্ষুদ্র প্রকাশের ব্যাখ্যা হইতে পারে, উহাকে বুঝা যাইতে পারে? কথিত আছে, সক্রেটিস একদিন এথেন্সে বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সহিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়—ইনি ভারত হইতে গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। সক্রেটিস সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, মানুষকে জানাই মানবজাতির সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য—মানবই মানবের সর্ব্বোচ্চ আলোচনার বস্তু। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিলেন, "ঈশ্বরকে যতক্ষণ না জানিতেছেন, ততক্ষণ মানুষকে কিরূপে জানিবেন?" এই ঈশ্বর, এই অনন্ত

অজ্ঞাত বা নিরপেক্ষ সত্তা বা অনন্ত বা নামাতীত বস্তু—তাঁহাকে যে নাম ইচ্ছা তাহাই বলিয়া ডাকা যায়—এই বর্ত্তমান জীবনের, যাহা কিছু জ্ঞাত ও যাহা কিছু জ্ঞেয় সকলেরই একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ। যে কোন বস্তুর কথা—সম্পূর্ণ জড়বস্তুর কথা—ধরুন। কেবল জড়তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে কোন একটী, যথা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিতজ্যোতিষ বা প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার কথা ধরুন—উহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন, ক্রমশঃ ঐ তত্ত্বানুসন্ধান অগ্রসর হউক,দেখিবেন—স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর পদার্থে লয় হইতেছে—শেষে আপনাকে এমন স্থানে আসিতে হইবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্তু ছাড়িয়া লাফ দিয়া অজড়ে যাইতেই হইবে। সকল বিদ্যায়ই স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে গিয়া পর্য্যবসিত হয়।

এইরূপে মানুষকে বাধ্য হইয়া জগদতীত সত্তার আলোচনায় নামিতে হয়। যদি আমরা উহাকে জানিতে না পারি, তবে জীবন মরুভূমি হইবে, মানবজীবন বৃথা হইবে। একথা বলিতে ভাল যে, বর্ত্তমানে যাহা দেখিতেছ, সে সকল লইয়াই তৃপ্ত থাক; গো, কুক্কুর ও অন্যান্য পশুগণ এইরূপ বর্ত্তমান লইয়াই সন্তুষ্ট আর তাহাতেই তাহাদিগকে পশু করিয়াছে। অতএব যদি মানব বর্ত্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকে এবং জগদতীত সত্তার সমুদয় অনুসন্ধান একেবারে পরিত্যাগ করে, তবে মানবজাতিকে পশুর ভূমিতে পুনরাবৃত্ত হইতে হইবে। ধর্ম্ম—জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই মানুষ ও পশুতে প্রভেদ করিয়া থাকে। এ কথাটী অতি সুন্দর কথা যে, সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই স্বভাবতঃ উপরের দিকে চাহিয়া দেখে; আর সকল জন্তুই স্বভাবতঃ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। এই ঊর্দ্ধদৃষ্টি, ঊর্দ্ধদিকে গমন ও পূর্ণত্বের অনুসন্ধানকেই 'পরিত্রাণ বা 'উদ্ধার' বলে, আর যখনই মানব উচ্চতর দিকে গমন করিতে আরম্ভ করে, তখনই সে এই পরিত্রাণস্বরূপ সত্যের ধারণার দিকে আপনাকে অগ্রসর করে। পরিত্রাণ—অর্থ, বেশভূষা বা গৃহের উপর নির্ভর করে না, উহা মানবের মস্তিষ্কস্থ আধ্যাত্মিক ভাব-রত্নরাজির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। উহাতেই মানবজাতির উন্নতি, উহাই ভৌতিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল; ঐ প্ররোচক শক্তিবলে, ঐ উৎসাহ-বলেই মানবজাতি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম প্রচুর অন্নপানে নাই, অথবা সুরম্য হর্ম্ম্যেও নাই। বারম্বার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আপনারা এই আপত্তি শুনিতে পাইবেন, "ধর্ম্মের দ্বারা কি উপকার হইতে পারে? উহা কি দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করিতে পারে?" মনে করুন,

উহা যেন তাহা পারে না, তাহা হইলেই কি ধর্ম্ম অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল? মনে করুন, আপনি একটী জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন— একটী শিশু দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসিল, "ইহাতে কি মিঠাই পাওয়া যায়?" আপনি উত্তর দিলেন—"না, ইহাতে মিঠাই পাওয়া যায় না।" তখন শিশুটী বলিয়া উঠিল, "তবে ইহা কোন কাযের নয়।" শিশুরা তাহাদের নিজেদের দৃষ্টি হইতে অর্থাৎ কোন্ জিনিষে কত মিঠাই পাওয়া যায়, এই হিসাবে সমগ্র জগতের বিচার করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া শিশুসদৃশ, জগতের সেই সকল শিশুদের বিচারও তদ্রূপ। নিম্ন জিনিষের দৃষ্টিতে উচ্চতর জিনিষের বিচার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক বিষয়ই তাহার নিজ নিজ ওজনে বিচার করিতে হইবে। অনন্তকে অনন্তের ওজনে বিচার করিতে হইবে। ধর্ম্ম মানবজীবনের সর্ব্বাংশ, শুধু বর্ত্তমান নহে,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সর্ব্বাংশ ব্যাপী। অতএব ইহা অনন্ত আত্মা ও অনন্ত ঈশ্বরের ভিতর অনন্ত সম্বন্ধস্বরূপ। অতএব ক্ষণিক মানবজীবনের উপর উহার কার্য্য দেখিয়া উহার মূল্য বিচার করা কি ন্যায়সঙ্গত? কখনই নহে। এ সকল ত গেল, ধর্ম্মের দ্বারা এই এই হয় না,—এই বিচারের কথা।

এখন প্রশ্ন আসিতেছে, ধর্ম্মের দ্বারা কি প্রকৃত পক্ষে কোন ফল হয়? হাঁ, হয়। উহাতে মানব অনন্ত জীবন লাভ করে। মানুষ বর্ত্তমানে যাহা, তাহা এই ধর্ম্মের শক্তিতেই হইয়াছে আর উহাতেই এই মনুষ্য নামক প্রাণীকে দেবতা করিবে। ধর্ম্ম ইহাই করিতে সমর্থ। মানবসমাজ হইতে ধর্ম্মকে বাদ দাও—কি অবশিষ্ট থাকিবে? তাহা হইলে সংসার শ্বাপদসমাকীর্ণ অরণ্য হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়সুখ মানবজীবনের লক্ষ্য নহে, জ্ঞানই সমুদয় প্রাণীর লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, পশুগণ ইন্দ্রিয়সুখে যতদূর প্রীতি অনুভব করে, মানব বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা করিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকে, আর ইহাও আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচালনা হইতেও মানব আধ্যাত্মিক সুখে অধিকতর সুখবোধ করিয়া থাকে। অতএব অধ্যাত্মজ্ঞানকে নিশ্চিতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিতে হইবে। এই জ্ঞানলাভ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসিবে। এই জগতের এই সকল বস্তু সেই প্রকৃত জ্ঞান ও আনন্দের ছায়ামাত্র—উহার তিন চার ধাপ নিম্নের প্রকাশ মাত্র।

আর একটী প্রশ্ন আছে:—আমাদের চরম লক্ষ্য কি? আজকাল ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, মানব অনন্ত উন্নতিপথে চলিয়াছে—সে ক্রমাগত সম্মুখে

অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার লাভ করিবার কোন চরম লক্ষ্য নাই। এই "ক্রমাগত সমীপবর্ত্তী হওয়া অথচ কথনই লাভ না করা" ইহার অর্থ যাহাই হউক আর এ তত্ত্ব যতই অদ্ভুত হউক, ইহা যে অসম্ভব, তাহা অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সরল রেখায় কি কখন কোন প্রকার গতি হইতে পারে? একটী সরল রেখাকে অনন্ত প্রসারিত করিলে উহা একটী বৃত্তরূপে পরিণত হয়; উহা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তথায়ই আবার ফিরিয়া যায়। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি, তথায়ই অবশ্যই শেষ করিতে হইবে; আর যখন ঈশ্বর হইতে আপনাদের গতি আরম্ভ হইয়াছে, তখন ঈশ্বরেই অবশ্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। তবে ইতিমধ্যে আর করিবার কি থাকে? ঐ অবস্থায় পঁহুছিবার উপযোগী বিশেষ বিশেষ খুঁটিনাটি কার্য্যগুলি করিতে হয়—অনন্ত কাল ধরিয়া ইহা করিতে হয়।

আর একটি প্রশ্ন আসিতেছে—আমরা উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইতে কি ধর্ম্মের নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিব না? হাঁও বটে, নাও বটে। প্রথমতঃ, এইটী বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে অধিক আর কিছু জানিবার নাই, সবই জানা হইয়া গিয়াছে। জগতের সকল ধর্ম্মেই আপনারা দেখিবেন, তদ্ধর্ম্মাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন, আমাদের ভিতর একটী একত্ব আছে। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব জ্ঞান হইতে, আর অধিক উন্নতি হইতে পারে না। জ্ঞান অর্থে এই একত্ব আবিষ্কার। আমি আপনাদিগকে নরনারীরূপে পৃথক্ দেখিতেছি—ইহাই বহুত্ব। যখন আমি ঐ দুই ভাবকেই একত্র দৃষ্টি করি এবং আপনাদিগকে কেবল মানবজাতি বলিয়া অভিহিত করি, তখন উহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইল। উদাহরণস্বরূপ রসায়ন শাস্ত্রের কথা ধরুন। রাসায়নিকেরা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাত বস্তুকে তাহাদের মূল ধাতুতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে এক ধাতু হইতে ঐ সকলই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আসিতে পারে, যখন তাঁহারা সকল ধাতুর মূলীভূত এক ধাতু আবিষ্কার করিবেন। যদি ঐ অবস্থায় কখন তাঁহারা উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা তাহার উপরে আর অগ্রসর হইতে পারেন না; তখন রসায়ন বিদ্যা সম্পূর্ণ হইবে। ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি আমরা পূর্ণ একত্বকে আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তাহার উপর আর উন্নতি হইতে পারে না।

তার পরের প্রশ্ন এই, এইরূপ একত্ব লাভ কি সম্ভব? ভারতে অতি

প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম্ম ও দর্শনের বিজ্ঞান আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছে ; কারণ, পাশ্চাত্যদেশে যেমন এইগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে দৃষ্টি করাই প্রচলিত, হিন্দুরা তদ্রূপ ইহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখেন না। আমরা ধর্ম্ম ও দর্শনকে এক বস্তুরই দুইটী বিভিন্নভাব বলিয়া বিবেচনা করি, আর আমাদের ধারণা—উভয়টীই তুল্যভাবে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। পরবর্ত্তী বক্তৃতা-সমূহে আমি প্রথমে ভারতের—শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের—সর্ব্বপ্রাচীন দর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম সাংখ্যদর্শন বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ইহার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা কপিল সমুদয় হিন্দুমনোবিজ্ঞানের জনক আর তিনি যে প্রাচীন দর্শন-প্রণালীর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও আজকালকার ভারতীয় সমুদয় প্রচলিত দর্শনপ্রণালীসমূহের ভিত্তিস্বরূপ। এই সকল দর্শনের অন্যান্য বিষয়ে যত মতভেদ থাকুক না কেন, সকলেই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছেন।

তার পর আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, সাংখ্যের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বেদান্ত কেমন উহারই সিদ্ধান্তগুলিকে লইয়া আরো অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। কপিল কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সৃষ্টি বা ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের সহিত উহা একমত হইলেও বেদান্ত দ্বৈতবাদকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। উহা বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়েরই চরম লক্ষ্যস্বরূপ চরম একত্বের অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয় তাঁহারা কি উপায়ে সাধিত করিয়াছেন, তাহা এই বক্তৃতাবলীর সর্ব্বশেষ বক্তৃতাগুলিতে দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

১

সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব।

দুইটী শব্দ রহিয়াছে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, অন্তর ও বহিঃ। আমরা অনুভূতি দ্বারাই এই উভয় হইতেই সত্য লাভ করিয়া থাকি ; আভ্যন্তর অনুভূতি ও বাহ্য অনুভূতি। আভ্যন্তর অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত সত্যসমূহ মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মনামে পরিচিত আর বাহ্য অনুভূতি হইতে ভৌতিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এক্ষণে কথা এই, যাহা সম্পূর্ণ সত্য,তাহার এই উভয় জগতের অনুভূতির সহিতই সমন্বয় থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সত্যসমূহে

সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তদ্রূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সত্যে সায় দিবে। ভৌতিক সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি অন্তর্জ্জগতে থাকা চাই, আবার অন্তর্জ্জগতের সত্যের প্রমাণও বহির্জ্জগতে পাওয়া চাই। তথাপি আমরা কার্য্যতঃ দেখিতে পাই, এই সকল সত্যের অধিকাংশই সর্ব্বদাই পরস্পর বিরোধী। জগতের ইতিহাসের এক যুগে দেখা যায়, "আভ্যন্তরে"র প্রাধান্ত হইল; অমনি তাঁহারা "বাহ্যে"র সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমানকালে "বাহ্য" অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছেন, আর তাঁহারা মনস্তত্ত্ববিৎ ও দার্শনিকগণের অনেক সিদ্ধান্ত উড়াইয়া দিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে আমি দেখিতে পাই, মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত সারভাগের সহিত আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সারভাগের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

সকল ব্যক্তিরই সকল বিষয়ে বড় হইবার শক্তি প্রকৃতি দেন নাই; এইরূপ তিনি সকল জাতিকেই সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার অনুসন্ধানে সমান শক্তিসম্পন্ন করিয়া গঠন করেন নাই। আধুনিক ইউরোপীয় জাতিরা বাহ্য ভৌতিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে সুদক্ষ, কিন্তু প্রাচীন ইউরোপীয়গণ মানবের আভ্যন্তরভাগের অনুসন্ধানে তত পটু ছিলেন না। অপর দিকে আবার প্রাচ্যেরা বাহ্য ভৌতিক জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে তত দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু অন্তস্তত্ত্বগবেষণায় তাঁহারা খব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, প্রাচ্যজাতির ভৌতিক জগতের তত্ত্বসম্বন্ধীয় মতের সহিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মত মিলে না আবার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান, প্রাচ্যজাতির ঐ তত্ত্বসম্বন্ধীয় উপদেশের সহিত মিলে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচ্য ভূতবিজ্ঞানবাদীদের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহা হইলেও উভয়ই সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আর আমরা যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কোন বিদ্যায়ই হউক না, প্রকৃত সত্যের মধ্যে কখন পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না, আভ্যন্তর সত্যসমূহের সহিত বাহ্য সত্যের সমন্বয় আছে।

আমরা আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্ ও বৈজ্ঞানিকদের মতানুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় মত কি তাহা জানি আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন দলের ধর্ম্মবাদিগণের কিরূপ ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে; যেমন যেমন এক একটী নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, তেমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটী করিয়া বোমা পড়িতেছে আর সেই জন্যই তাঁহারা সকল যুগেই এই

সমস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, আমরা ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ও তদানুষঙ্গিক বিষয়সম্বন্ধে প্রাচ্যজাতির মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে কি ধারণা ছিল, তাহা আলোচনা করিব; তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন যে, কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আধুনিকতম আবিষ্ক্রিয়ার সহিত উঁহাদের সামঞ্জস্য রহিয়াছে আর যদি কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে। ইংরাজীতে আমরা সকলে Nature শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন হিন্দুদার্শনিকগণ উঁহাকে দুইটী বিভিন্ন নামে অভিহিত করিতেন; ১ম, 'প্রকৃতি'—ইংরাজী Nature শব্দের সহিত ইহা প্রায় সমানার্থক, আর ২য়টী অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক নাম—'অব্যক্ত'—যাহা ব্যক্ত বা প্রকাশিত বা ভেদাত্মক নহে—উঁহা হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উঁহা হইতেই অণু পরমাণু সমুদয় আসিয়াছে, উঁহা হইতেই ভূত, শক্তি, মন, বুদ্ধি সমুদয় আসিয়াছে। ইহা অতি বিস্ময়কর যে, ভারতীয় দার্শনিকগণ অনেক যুগ পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন যে, মন সূক্ষ্ম জড়মাত্র। কারণ, আমাদের আধুনিক জড়বাদীরা—দেহ যেমন প্রকৃতি হইতে প্রসূত, মনও তদ্রূপ,—ইহা ব্যতীত আর অধিক কি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন? চিন্তা সম্বন্ধেও তাহাই; আর ক্রমশঃ আমরা দেখিব, বুদ্ধিও সেই একই অব্যক্ত নামধেয় প্রকৃতি হইতে প্রসূত হইযাছে।

প্রাচীন আচার্য্যগণ এই অব্যক্তের লক্ষণ করিয়াছেন—"তিনটী শক্তির সাম্যাবস্থা।" তন্মধ্যে একটীর নাম সত্ত্ব, দ্বিতীয়টী রজঃ ও তৃতীয়টী তমঃ। তমঃ—সর্ব্বনিম্নতম শক্তি আকর্ষণস্বরূপ, রজঃ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর—উঁহা বিকর্ষণস্বরূপ—আর সর্ব্বোচ্চ শক্তি এই উভয়ের সংযমস্বরূপ—উঁহাই সত্ত্ব। অতএব যখনই এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণশক্তিদ্বয় সত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ সংযত হয় বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন আর সৃষ্টি বা বিকার থাকে না, কিন্তু যাই এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তখনই উঁহাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয় আর উঁহাদের মধ্যে একটী শক্তি অপরগুলি হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে। তখনই পরিবর্ত্তন ও গতি আরম্ভ হয় এবং এই সমুদয়ের পরিণাম চলিতে থাকে। এইরূপ ব্যাপার চক্রের গতিতে চলিতেছে। অর্থাৎ এক সময় আসে, যখন সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়, তখন এই বিভিন্ন শক্তি সমুদয় বিভিন্নরূপে সম্মিলিত হইতে থাকে আর তখনই এই ব্রহ্মাণ্ড বাহির হয়। আবার এক সময় আসে, যখন সকল বস্তুরই সেই আদিম সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইবার উপক্রম

হয় আবার এমন সময় আসে, যখন যাহা কিছু ব্যক্তভাবাপন্ন, সমুদয়েরই সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। আবার কিছুকাল পরে এই অবস্থা নষ্ট হইয়া শক্তিগুলি বহির্দ্দিকে প্রসৃত হইবার উপক্রম হয়, আর ব্রহ্মাণ্ড ধীরে ধীরে তরঙ্গাকারে বহির্গত হইতে থাকে। জগতের সকল গতিই তরঙ্গাকারে হয়—একবার উত্থান, আবার পতন।

প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মত এই যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একেবারে কিছুদিনের জন্য লয়প্রাপ্ত হয়; আবার অপর কাহারও কাহারও মত এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষেই এই প্রলয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। অর্থাৎ মনে করুন, আমাদের এই সৌরজগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় গমন করিল, কিন্তু সেই সময়েই অন্যান্য সহস্র সহস্র জগতে তাহার ঠিক বিপরীত কাণ্ড চলিতেছে। আমি এই দ্বিতীয় মতটীর অর্থাৎ প্রলয় যুগপৎ সকল জগতে সংঘটিত হয় না, বিভিন্ন জগতে বিভিন্ন ব্যাপার চলিতে থাকে—এই মতটীরই অধিক পক্ষপাতী। যাহাই হউক, মূল কথাটা উভয়েতেই এক অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, এই সমগ্র প্রকৃতিই ক্রমান্বয়ে উত্থান-পতন-নিয়মে অগ্রসর হইতেছে। এই সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় গমনকে কল্পান্ত বলে। সমগ্র কল্পটী—এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ—ভারতের ঈশ্বরবাদিগণ কর্ত্তৃক ঈশ্বরের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত তুলিত হইয়াছে। ঈশ্বর যেন প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে তাঁহা হইতে জগৎ বাহির হয়, আবার উহা তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। যখন প্রলয় হয়, তখন জগতের কি অবস্থা হয়? উহা তখনও বর্ত্তমান থাকে, তবে সূক্ষ্মতর রূপে বা কারণাবস্থায় থাকে। দেশকাল-নিমিত্ত তথায়ও বর্ত্তমান, তবে উহারা অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। এই অব্যক্তাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনকে ক্রমসঙ্কোচ বা প্রলয় বলে। প্রলয় ও সৃষ্টি বা ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমাভিব্যক্তি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে, অতএব আমরা যখন আদি বা আরম্ভের কথা বলি, তখন আমরা এক কল্পের আরম্ভকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ বাহ্য ভাগকে—আজকাল আমরা যাহাকে স্থূল জড় বলি—প্রাচীন হিন্দুগণ ভূত বলিতেন। তাঁহাদের মতে উহাদের মধ্যে একটী অবশিষ্টগুলির কারণ, যেহেতু অন্যান্য সকল ভূত এই একভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূত আকাশ নামে অভিহিত। আজকাল ইথার বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা কতকটা তৎসদৃশ, যদিও সম্পূর্ণ এক নহে। আকাশই আদিভূত—উহা হইতে সমুদয় স্থূল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। আর উহার সঙ্গে প্রাণ নামে আর একটী

জিনিষ থাকে—আমরা ক্রমশঃ দেখিব, উহা কি। যতদিন সৃষ্টি থাকে, ততদিন এই প্রাণ ও আকাশ থাকে। তাহারা নানারূপে মিলিত হইয়া এই সমুদয় স্থূল প্রপঞ্চ গঠন করিয়াছে, অবশেষে কল্পান্তে ঐগুলি সমুদয় লয়প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও প্রাণের অব্যক্তরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে। জগতের মধ্যে প্রাচীনতম শাস্ত্র ঋগ্বেদে সৃষ্টিবর্ণনাত্মক অপূর্ব্ব কবিত্বময় শ্লোক আছে ; যথা,—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং
কিমাববীবঃ ইত্যাদি।

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯
(নাসদীয়) সূক্ত।

অর্থাৎ যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, তমের দ্বারা তম আবৃত ছিল, তখন কি ছিল ?

আর ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে,

আনীদবাতং ইত্যাদি।

ঐ।

ইনি (সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ) গতিশূন্য বা নিশ্চেষ্ট ভাবে ছিলেন।

প্রাণ ও আকাশ তখন সেই অনন্ত পুরুষে সুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু কোনরূপ ব্যক্ত প্রপঞ্চ ছিল না। এই অবস্থাকে অব্যক্ত বলে—উহার ঠিক শব্দার্থ স্পন্দন-রহিত বা অপ্রকাশিত। ক্রমবিকাশের জন্য একটী নূতন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত হইতে থাকে, আর প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত ঘাতের পর ঘাত দিতে দিতে ক্রমশঃ উহা স্থূল হইতে থাকে, আর ক্রমে আকর্ষণ বিকর্ষণ-শক্তিদ্বয়ের বলে পরমাণু গঠিত হয়। এইগুলি পরে আরও স্থূলতর হইয়া দ্ব্যণুকাদিতে পরিণত হয় এবং সর্ব্বশেষে প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থ যদ্দ্বারা নির্ম্মিত, সেই সকল বিভিন্ন স্থূল ভূতে পরিণত হয়।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, লোকে এই গুলির অতি অদ্ভুত ইংরাজী অনুবাদ করিয়া থাকে। অনুবাদকগণ অনুবাদের জন্য প্রাচীন দার্শনিকগণের ও তাঁহাদের টীকাকারগণের সহায়তা গ্রহণ করেন না আর নিজেদেরও এতদূর বিদ্যা নাই যে, আপনাপনি ঐ গুলি বুঝিতে পারেন। তাঁহারা ভূতগুলিকে বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি রূপে অনুবাদ করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা ভাষ্যকারগণের ভাষ্য আলোচনা করিতেন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহারা ঐ গুলিকে লক্ষ্য

করেন নাই। প্রাণের বারম্বার আঘাতে আকাশ হইতে বায়ু বা আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা উপস্থিত হয় ও উহা হইতেই পরে বাষ্পীয় ভূতের উৎপত্তি হয়। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে থাকিলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। ক্রমশঃ উত্তাপ কমিয়া শীতল হইতে থাকে, তখন ঐ বাষ্পীয় পদার্থ তরল ভাব ধারণ করে, উহাকে অপ্ বলে; অবশেষে উহা কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম পৃথিবী। সর্ব্বপ্রথমে আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা, তার পর উত্তাপ, তার পর উহা তরল হইয়া যাইবে আর যখন আরো অধিক ঘনীভূত হইবে, তখন উহা কঠিন জড়পদার্থের আকার ধারণ করিবে। ঠিক ইহার বিপরীতক্রমে সমুদয় অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কঠিন বস্তু সকল তরলাকারে পরিণত হইবে, তরলাবস্থা গিয়া কেবল উত্তাপরাশিরূপে পরিণত হইবে, তাহা আবার ধীরে ধীরে বাষ্পীয় ভাব ধারণ করিবে, পরে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, ও সর্ব্বশেষে সমুদয় শক্তির সামঞ্জস্য অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন স্পন্দন বন্ধ হয়—এইরূপে কল্পান্ত হয়। আমরা আধুনিক জ্যোতিষ হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের এই পৃথিবী ও সূর্য্যের সেই অবস্থা পরিবর্ত্তন চলিয়াছে, শেষে এই কঠিনাকার পৃথিবী গলিয়া গিয়া তরলাকার এবং অবশেষে বাষ্পাকার ধারণ করিবে।

প্রাণ স্বয়ং আকাশের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না। উহার সম্বন্ধে আমরা কেবল এইটুকু জানি যে, উহা গতি বা স্পন্দন। আমরা যাহা কিছু গতি দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাণের বিকারস্বরূপ আর জড় বা ভূত পদার্থ যাহা কিছু আমরা জানি, যাহা কিছু আকৃতিমান্ বা বাধাত্মক, তাহাই এই আকাশের বিকার। এই প্রাণ স্বয়ং থাকিতে পারে না বা কোন মধ্যবর্ত্তী ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, আর উহার কোন অবস্থায়—উহা কেবল প্রাণরূপেই বর্ত্তমান থাকুক অথবা মাধ্যাকর্ষণ বা কেন্দ্রাতিগাশক্তিরূপ প্রাকৃতিক অন্যান্য শক্তিতেই পরিণত হউক,—উহা কখন আকাশ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। আপনারা কখন ভূত ব্যতীত শক্তি বা শক্তি ব্যতীত ভূত দেখেন নাই। আমরা যাহাদিগকে ভূত ও শক্তি বলি, তাহারা কেবল এই দুইটীর স্থূল প্রকাশ মাত্র আর ইহাদের অতি সূক্ষ্মাবস্থাকেই প্রাচীন দার্শনিকগণ প্রাণ ও আকাশ নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাণকে আপনারা জীবনীশক্তি বলিতে পারেন, কিন্তু উহাকে শুধু মানবের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে অথবা আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবিয়া বুঝিলেও চলিবে

না। অতএব সৃষ্টি—প্রাণ ও আকাশের সংযোগোৎপন্ন আর উহার আদিও নাই, অন্তও নাই; উহার আদি অন্ত কিছুই থাকিতে পারে না, কারণ, অনন্ত কাল ধরিয়া উহা চলিয়াছে।

তার পর আর একটী অতি দুরূহ ও জটিল প্রশ্ন আসিতেছে। কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, 'আমি' আছি বলিয়াই এই জগৎ আছে আর 'আমি' যদি না থাকি, তবে এই জগৎও থাকিবে না। কখন কখন ঐ কথাই এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে, যথা, যদি জগতের সকল লোক মরিয়া যায়, মনুষ্যজাতি আর যদি না থাকে, অনুভূতি ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন কোন প্রাণী যদি না থাকে, তবে এই জগৎপ্রপঞ্চও আর থাকিবে না। একথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে আমরা স্পষ্টই দেখিব যে, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই তত্ত্বটী জানিলেও মনোবিজ্ঞান অনুসারে উহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। তাঁহারা এই তত্ত্বের আভাস মাত্র পাইয়াছেন।

প্রথমতঃ, আমরা এই প্রাচীন মনোবৈজ্ঞানিকগণের আর একটী সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করিব—উহাও একটু অদ্ভুত রকমের—তাহা এই যে, স্থূল ভূতগুলি সূক্ষ্ম ভূত হইতে উৎপন্ন। যাহা কিছু স্থূল, তাহাই কতকগুলি সূক্ষ্ম বস্তুর সমবায়-স্বরূপ, অতএব স্থূলভূতগুলিও কতকগুলি সূক্ষ্মবস্তু-গঠিত—ঐ গুলিকে সংস্কৃত ভাষায় তন্মাত্রা বলে। আমি একটী পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছি, উহার গন্ধ পাইতে গেলে, কিছু অবশ্য আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে। ঐ পুষ্প রহিয়াছে—উহা আমার দিকে চলিয়া আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু যদি কিছু আমার নাসিকার সংস্পর্শে না আসিয়া থাকে, তবে আমি গন্ধ কিরূপে পাইতেছি? ঐ পুষ্প হইতে যাহা আসিয়া আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে, তাহাই তন্মাত্রা, ঐ পুষ্পেরই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু, উহা এত সূক্ষ্ম যে, যদি আমরা সারা দিন সকলে মিলিয়া উহার গন্ধ আঘ্রাণ করি, তথাপি ঐ পুষ্পের পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাস বোধ হইবে না। তাপ, আলোক, এবং অন্যান্য সকল বস্তুসম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এই তন্মাত্রাগুলি আবার পরমাণুরূপে পুনর্বিভক্ত হইতে পারে। এই পরমাণুর পরিমাণ লইয়া বিভিন্ন দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত আছে; কিন্তু আমরা জানি, ঐগুলি মতবাদ মাত্র, সুতরাং আমরা বিচারস্থলে ঐ গুলিকে পরিত্যাগ করিলাম। এইটুকু জানিলেই আমাদের যথেষ্ট যে, যাহা কিছু স্থূল, তাহাই

অতি সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। প্রথম আমরা পাইতেছি স্থূল ভূত—আমরা উহা বাহিরে অনুভব করিতেছি, তার পর সূক্ষ্ম ভূত—এই সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারাই স্থূল ভূত গঠিত, উহারই সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণাদির স্নায়ুর সংযোগ হইতেছে। যে ইথার-তরঙ্গ আমার চক্ষুকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমি জানি, আলোক দেখিতে পাইবার পূর্ব্বে চাক্ষুষ স্নায়ুর সহিত উহার সংযোগ প্রয়োজন। শ্রবণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমাদের কর্ণের সংস্পর্শে যে তন্মাত্রাগুলি আসিতেছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু আমরা জানি, সেগুলি অবশ্যই আছে। এই তন্মাত্রাগুলির আবার কারণ কি? আমাদের মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার এক অতি অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তন্মাত্রাগুলির কারণ 'অহংকার' বা 'অহংতত্ত্ব' বা 'অহংজ্ঞান'। ইহাই এই সমুদয় সূক্ষ্ম ভূতগুলির এবং ইন্দ্রিয়গুলিরও কারণ। ইন্দ্রিয় কোন্‌গুলি? এই চক্ষু রহিয়াছে, কিন্তু চক্ষু দেখে না। যদি চক্ষু দেখিত, তবে মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন ত চক্ষু অবিকৃত থাকে, তবে তাহারা তখনও দেখিতে পাইত। কোনখানে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কোন কিছু মানুষের ভিতর হইতে চলিয়া গিয়াছে, আর সেই কিছু, যাহা প্রকৃত পক্ষে দেখে, চক্ষু যাহার যন্ত্রস্বরূপ মাত্র, তাহাই যথার্থ ইন্দ্রিয়। এইরূপ এই নাসিকাও একটী যন্ত্রমাত্র, উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটী ইন্দ্রিয় আছে। আধুনিক শারীরবিধানশাস্ত্র আপনাদিগকে বলিয়া দিবেন, উহা কি। উহা মস্তিষ্কস্থ একটী স্নায়ুকেন্দ্রমাত্র। চক্ষুকর্ণাদি কেবল বাহ্যযন্ত্রমাত্র। অতএব এই স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণই অনুভূতির যথার্থ স্থান।

নাসিকার জন্য একটী, চক্ষের জন্য একটী, এইরূপ প্রত্যেকের জন্য এক একটী পৃথক স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিবার প্রয়োজন কি? একটীতেই কার্য্য সিদ্ধ হয় না কেন? এইটী স্পষ্ট করিয়া বুঝান যাইতেছে। আমি কথা কহিতেছি, আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, আপনারা আপনাদের চতুর্দ্দিকে কি হইতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ. মন কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়েই সংযুক্ত হইয়াছে, চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়াছে। যদি একটী মাত্র স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে মনকে এক সময়েই দেখিতে, শুনিতে ও আঘ্রাণ করিতে হইত। আর উহার পক্ষে এক সময়েই এই তিনটী কার্য্য না করা অসম্ভব হইত। অতএব প্রত্যেকটীর জন্য পৃথক্

পৃথক্ স্নায়ুকেন্দ্রের প্রয়োজন। আধুনিক শারীরবিধানশাস্ত্রও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। অবশ্য আমাদের পক্ষে এক সময়েই দেখা ও শুনা সম্ভব, কিন্তু তাহার কারণ—মন উভয় কেন্দ্রেই আংশিক ভাবে সংযুক্ত হয়। তবে যন্ত্র কোন্‌গুলি হইল ? আমরা দেখিতেছি, উহারা বাহিরের বস্তু এবং স্থূলভূতে নির্ম্মিত—এই আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসা প্রভৃতি। আর এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি কিসে নির্ম্মিত ? উহারা সূক্ষ্মতর ভূতে নির্ম্মিত আর উহারা যেহেতু অনুভূতির কেন্দ্র-স্বরূপ, সেই জন্য উহারা ভিতরের জিনিষ। যেমন প্রাণকে বিভিন্ন স্থূল শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য এই দেহ স্থূলভূতে গঠিত হইয়াছে, তদ্রূপ এই শরীরের পশ্চাতে যে স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে, তাহারাও প্রাণকে সূক্ষ্ম অনুভূতির শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য সূক্ষ্মতর উপাদানে নির্ম্মিত। এই সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সমষ্টিকে একত্রে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর বলে।

এই সূক্ষ্ম শরীরের প্রকৃত পক্ষে একটী আকার আছে, কারণ, ভৌতিক যাহা কিছু, তাহারই একটী আকার অবশ্যই থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে মন অর্থাৎ বৃত্তিযুক্ত চিত্ত আছে, উহাকে মনের স্পন্দনশীল বা অস্থির অবস্থা বলা যাইতে পারে। যদি একটী স্থির হ্রদে একটী প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে উহাতে স্পন্দন বা কম্পন উপস্থিত হইবে, তার পর উহা হইতে বাধা বা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে। মুহূর্ত্তের জন্য ঐ জল স্পন্দিত হইবে, তার পর উহা ঐ প্রস্তরের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এইরূপ চিত্তের উপর যখনই কোন বাহ্য বিষয়ের আঘাত আসে, তখনই উহা একটু স্পন্দিত হয়। চিত্তের এই অবস্থাকে মন বলে। তার পর উহা হইতে প্রতিক্রিয়া হয়, উহার নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধির পশ্চাতে আর একটী জিনিষ আছে, উহা মনের সকল ক্রিয়ার সহিতই বর্ত্তমান থাকে, উহাকে অহংকার বলে—এই অহংকার অর্থে অহংজ্ঞান, যাহাতে সর্ব্বদা 'আমি আছি' এই জ্ঞান হয়। তাহার পশ্চাতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব—উহা প্রাকৃতিক সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার পশ্চাতে পুরুষ—ইনিই মানবের যথার্থ স্বরূপ, শুদ্ধ, পূর্ণ, ইনিই একমাত্র দ্রষ্টা এবং ইঁহার জন্যই এই সমুদয় পরিণাম। পুরুষ এই সকল পরিণাম পরম্পরা দেখিতেছেন। তিনি স্বয়ং কখনই অশুদ্ধ নহেন, কিন্তু অধ্যাস বা প্রতিবিম্বের দ্বারা তাঁহাকে তদ্রূপ দেখাইতেছে, যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সমক্ষে একটী লাল ফুল রাখিলে স্ফটিকটী লাল দেখাইবে আবার নীল ফুল রাখিলে উহা নীল দেখাইবে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু স্ফটিকটীর কোন বর্ণ নাই। পুরুষ বা

আত্মা অনেক, প্রত্যেকেই শুদ্ধ ও পূর্ণ আর এই স্থূল, সূক্ষ্ম নানা প্রকারে বিভক্ত ভূত তাঁহাদের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে নানাবর্ণের দেখাইতেছে। প্রকৃতি কেন এ সকল করিতেছেন? প্রকৃতির এই সকল পরিণাম পুরুষ বা আত্মার ভোগ ও অপবর্গের জন্য—যাহাতে পুরুষ আপনার মুক্ত স্বভাব জানিতে পারেন। মানবের সমক্ষে এই জগৎপ্রপঞ্চরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহাতে মানব ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিণামে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষরূপে জগতের বাহিরে আসিতে পারেন। আমাকে এখানে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আমাদের অনেক ভাল ভাল মনস্তত্ত্ববিদেরা আপনারা যে ভাবে সগুণ বা ব্যক্তি-ভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তদ্রূপ ভাবে তাঁহাতে বিশ্বাস করেন না। সকল মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের পিতাস্বরূপ কপিল সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহার ধারণা এই যে,—সগুণ ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই; যাহা কিছু ভাল, প্রকৃতিই সমুদয় করিতে সমর্থ। তিনি তথা-কথিত 'কৌশল-বাদ' (Design Theory) খণ্ডন করিয়াছেন। আর এই মতবাদের ন্যায় ছেলেমানুষী মত আর কিছুই জগতে প্রচারিত হয় নাই। তবে তিনি এক বিশেষ প্রকার ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন—আমরা সকলে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি আর এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যখন মানবাত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি যেন কিছু দিনের জন্য প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকিতে পারেন। আগামী কল্পের প্রারম্ভে তিনিই একজন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই কল্পের শাসনকর্ত্তা হইতে পারেন। এই অর্থে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। এই রূপে আপনি, আমি এবং অতি সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত বিভিন্ন কল্পে ঈশ্বর হইতে পারেন। কপিল বলেন, এইরূপ জন্য ঈশ্বর হইতে পারেন, কিন্তু নিত্য ঈশ্বর অর্থাৎ নিত্য, সর্ব্বশক্তিমান, জগতের শাসনকর্ত্তা কখনই হইতে পারেন না। এরূপ ঈশ্বর স্বীকারে এই আপত্তি ঘটে—ঈশ্বরকে হয় বদ্ধ না হয় মুক্ত উভয়ের একতর স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঈশ্বর মুক্ত হন, তবে তিনি সৃষ্টি করিবেন না; কারণ, তাঁহার সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি তিনি বদ্ধ হন, তাহা হইলেও তাঁহাতে সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব; কারণ, বদ্ধ বলিয়া তাঁহার শক্তির অভাব, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। সুতরাং উভয় পক্ষেই দেখা গেল, নিত্য, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। এই হেতু কপিল বলেন, আমাদের শাস্ত্রে—বেদে—যেখানেই ঈশ্বর শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে, যে সকল আত্মা পূর্ণতা ও মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাই-

তেছে। সাংখ্য দর্শন, সকল আত্মার একত্বে বিশ্বাসী নহেন। বেদান্তের মতে সমুদয় জীবাত্মা ব্রহ্মনামধেয় এক বিশ্বাত্মায় অভিন্ন, কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি অবশ্য জগতের বিশ্লেষণ যতদূর করিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত। তিনি হিন্দু পরিণামবাদিগণের জনকস্বরূপ আর পরবর্ত্তী দার্শনিক শাস্ত্রগুলি তাঁহারই চিন্তাপ্রণালীর পরিণামমাত্র।

সাংখ্যদর্শনমতে সকল আত্মাই তাহাদের স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতারূপ স্বাভাবিক অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মাব এই বন্ধন কোথা হইতে আসিল? সাংখ্য বলেন, ইহা অনাদি। কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে, যদি এই বন্ধন অনাদি হয়, তবে উহা অনন্তও হইবে আর তাহা হইলে আমরা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। কপিল ইহার উত্তরে বলেন, এখানে এই 'অনাদি' বলিতে নিত্য অনাদি বুঝিতে হইবে না। প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু আত্মা বা পুরুষ যে অর্থে অনাদি অনন্ত, সে অর্থে নহে; কারণ, প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব নাই। যেমন আমাদের সম্মুখ দিয়া একটী নদী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই উহাতে নূতন নূতন জলরাশি আসিতেছে আব এই সমুদয় জলরাশিব নাম নদী—কিন্তু নদী কোন এক বস্তু হইল না। এইরূপ প্রকৃতির অন্তর্গত যাহা কিছু, তাহার সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু আত্মার কখনই পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব প্রকৃতি যখন সদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আত্মার পক্ষে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব। সাংখ্যদিগের একটী মত অনন্যসাধারণ। তাঁহাদের মতে একটী মনুষ্য বা যে কোন একটী প্রাণী যে নিয়মে গঠিত, সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ডও ঠিক সেই নিয়মে বিরচিত। সুতরাং আমাদের যেমন একটী মন আছে, তদ্রূপ একটী বিশ্ব-মনও আছে। যখন এই বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ হয়, তখন প্রথমে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, পরে অহংকার, পরে তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও শেষে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। কপিলের মতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই এক শরীরস্বরূপ। যাহা কিছু দেখিতেছি, সেগুলি সমুদয় স্থূল শরীর, উহাদের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীরসমূহ এবং তাহাদের পশ্চাতে সমষ্টি অহংতত্ত্ব, তাহারও পশ্চাতে সমষ্টি বুদ্ধি। কিন্তু এই সকলই প্রকৃতির অন্তর্গত, সকলই প্রকৃতির বিকাশ, এগুলির কিছুই উহার বাহিরে নাই। আমাদের মধ্যে সকলেই সেই বিশ্বচৈতন্যের অংশস্বরূপ। সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতে যাহা আমাদের প্রয়োজন, গ্রহণ করিতেছি; এইরূপ

জগতের ভিতরে সমষ্টি মনস্তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতেও আমরা চিরকালই প্রয়োজন মত লইতেছি। কিন্তু দেহের বীজ পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া চাই। ইহাতে বংশানুক্রমিকতা ও পুনর্জ্জন্মবাদ উভয় তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। আত্মাকে দেহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য উপাদান দিতে হয়, কিন্তু সেই উপাদান বংশানুক্রমিক সঞ্চারের দ্বারা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তের আলোচনায় উপস্থিত হইতেছি যে, সাংখ্য-মতানুযায়ী সৃষ্টিবাদে সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশ এবং প্রলয় বা ক্রমসঙ্কোচ—এই উভয়টাই স্বীকৃত হইয়াছে। সমুদয়ই সেই অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশে উৎপন্ন আবার ঐ সমুদয়ই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তাকার ধারণ করে। সাংখ্যমতে এমন কোন জড় বা ভৌতিক বস্তু থাকিতে পারে না, জ্ঞানের কোন অংশবিশেষও যাহার উপাদান নহে। জ্ঞানই সেই উপাদান, যাহা হইতে এই সমুদয় প্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। আগামী বক্তৃতায় ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা যাইবে। তবে এক্ষণে আমি এইটুকু দেখাইব যে, কিরূপে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। আমি এই টেবিলটীর স্বরূপ কি, তাহা জানি না, উহা কেবল আমার উপর একপ্রকার সংস্কার জন্মাইতেছে মাত্র। উহা প্রথমে চক্ষুতে আসে, তার পর দর্শনেন্দ্রিয়ে গমন করে, তার পর উহা মনের নিকট আসে। তখন মন আবার উহার উপর প্রতিক্রিয়া করে, সেই প্রতিক্রিয়াকেই আমরা টেবিল আখ্যা দিয়া থাকি। ইহা ঠিক একটী হ্রদে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপের ন্যায়। ঐ হ্রদ প্রস্তরখণ্ডের অভিমুখে একটী তরঙ্গ নিক্ষেপ করে; আর ঐ তরঙ্গটীকেই আমরা জানিয়া থাকি। মনের তরঙ্গসমূহ যাহারা বহির্দ্দিকে আসিয়া থাকে, তাহাদিগকেই আমরা জানি। এইরূপই এই দেয়ালের আকৃতি আমার মনে রহিয়াছে; বাহিরে যথার্থ কি আছে, তাহা কেহই জানে না। যখন আমি উহাকে জানিতে চেষ্টা করি, তখন আমি উহাতে যে উপাদান প্রদান করি, উহাকে তাহা হইতে হয়। আমি আমার নিজ মনের দ্বারা আমার চক্ষুর উপাদানভূত বস্তু দিয়াছি, আর বাহিরে যাহা আছে, তাহা কেবল উদ্দীপক বা উত্তেজক কারণ মাত্র; সেই উত্তেজক কারণ আসিলে আমি আমার মনকে উহার দিকে প্রক্ষেপ করি এবং উহা আমার দ্রষ্টব্য বস্তুর আকার ধারণ করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, আমরা সকলেই এক বস্তু কিরূপে দেখিয়া থাকি?

ইহার কারণ এই যে, আমাদের সকলের ভিতর এই বিশ্ব-মনের এক এক অংশ আছে। যাহাদের মন আছে, তাহারাই ঐ বস্তু দেখিবে; যাহাদের নাই, তাহারা উহা দেখিবে না। ইহাতেই প্রমাণ হয়, যতদিন ধরিয়া জগৎ আছে, ততদিন মনের অভাব—সেই এক বিশ্ব-মনের অভাব—কখন হয় নাই। প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক প্রাণী—সেই বিশ্ব-মন হইতেই নির্ম্মিত হইতেছে, কারণ, উহা সদাই বর্ত্তমান এবং উহাদের নির্ম্মাণের জন্য উপাদান যোগাইতেছে।　　ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

স্বামীজি আজ ২।৩ দিন হইল, কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শরীর তেমন ভাল নাই। শিষ্য আজ মঠে আসিয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বল্‌ছেন যে, কাশ্মীর হইতে ফিরে আসা অবধি স্বামীজি কারো সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা ক'ন্ না; স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকেন। তুই স্বামীজির কাছে গিয়ে গল্প সল্প ক'রে স্বামীজির মনটা নীচে আন্‌তে চেষ্টা কর্‌বি।

শিষ্য উপরে গিয়া স্বামীজির ঘরে গিয়ে দেখিল—স্বামীজি মুক্ত পদ্মাসনে পূর্ব্বাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন; কি যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। মুখে হাসি নাই; সেই প্রদীপ্ত নয়নের বহির্ম্মুখী দৃষ্টি নাই; যেন ভেতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "এসেছিস্ বাবা, বোস্।" এই পর্য্যন্ত। স্বামীজির বাম নেত্রাভ্যন্তরে রক্তের চিহ্ন দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চখের ভেতর জমাট রক্তের চিহ্ন কেন? বড় ভয় হইতেছে।" স্বামীজি বল্‌ছেন—"ও কিছু না"। যে শিষ্যকে দেখিয়া স্বামিজীর আহ্লাদের সীমা থাকে না, সে সম্মুখে প্রায় ১৫ মিনিট বসিয়াও স্বামীজির কোন কথা না শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইল। অবশেষে শিষ্য অধীর হইয়া স্বামীজির পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, "অমরনাথের গল্প আমায় বলিতেই হইবে।" পাদস্পর্শে স্বামীজির যেন একটু চমক্ ভাঙ্গিল; যেন একটু বহির্দৃষ্টি আসিল। বলিলেন, "ছাখ্, অমরনাথ থেকে নামিবার পর আমার মাথায় শিব বসিয়া আছেন; কিছুতেই নাম্‌ছেন না।" শিষ্য শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল, স্বামীজির কথার মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না। এই মাত্র বলিল,

"মশায়, আমার ত আপনি ছাড়া অন্য কোন শিবে বিশ্বাস নাই।" কথা শুনিয়া স্বামীজির সেই বিশাল নয়নপ্রান্তে একটু হাসির ছটা যেন বাহির হইল।

শিষ্য—মশায়, আপনার চখে কি হইল! অষুদ দিন্। আমার বড় ভয় ও কষ্ট হইতেছে।

স্বামীজি—অমরনাথে গিয়ে ও পরে ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে খুব তপস্যা ক'রে-ছিলাম। তাই বোধ হয় মাথায় রক্ত উঠেছিল। ওসব কিছু নয়। শীগ্‌গীরই সেরে যাবে।

স্বামীজির এই উপেক্ষা দেখিয়া শিষ্য বলিতেছে, "মশায়, কোন দিন ত আপনার এমন উপেক্ষা দেখি নাই; আমাদের ত শরীর রক্ষার জন্য কত উপদেশ দেন। আজ এই চক্ষুরত্নের প্রতি আপনার অবজ্ঞা দেখিয়া মনে বড়ই ভয় হচ্ছে। একটু গোলাপ জল এনে দেবো?"

স্বামীজি—তোর কিছু কত্তে হবে না। যা, তামাক্ সেজে নিয়ে আয়।

শিষ্য প্রফুল্লমনে স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তামাক সেজে দিল। স্বামীজি আস্তে আস্তে ধূম পান কত্তে কত্তে বল্‌ছেন, "অমরনাথে যাবার কালে একটা খাড়া চড়াইয়ের পাহাড় ভেঙ্গে উঠেছিলুম। সে রাস্তায় যাত্রী কেউ যায় না। আমার কেমন রোক্ হ'ল, ঐ পথেই যাব। যাব ত যাবই। সেই পরি-শ্রমে শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কন্‌কনে শীত যে, গায়ে যেন ছুঁচ ফোটে।"

শিষ্য—শুনেছি লেংটো হয়ে নাকি অমরনাথ গুহায় শিব দর্শন কত্তে হয়। আপনি কি করেছিলেন?

স্বামীজি—আমিও লেংটো হয়েই গুহায় গিয়েছিলেম। ভস্ম মেখে। তখন শীত গ্রীষ্ম কিছু জান্তে পারি নাই। মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় যেন জড় হ'য়ে গিয়েছিলাম।

শিষ্য—পায়রা দেখেছিলেন কি?

স্বামীজি—হাঁ, ৩।৪ টা সাদা পায়রা দেখেছিলুম। তারা গুহায় থাকে কি নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে থাকে, তা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

শিষ্য—মশায় শুনেছি, গুহা হ'তে বেরিয়ে যদি সাদা পায়রা দেখে, তবে নাকি সত্য সত্য শিব দর্শন সফল হয়। আপনি কি বলেন?

স্বামীজি সে কথায় কোন উত্তর দিলেন না। বলিলেন, "শুনেছি, পায়রা দেখ্‌লে যা কামনা করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়।"

তার পর স্বামীজি বল্‌লেন, আস্‌বার কালে সকল যাত্রী যে রাস্তায় ফেরে, সেই রাস্তায় শ্রীনগরে এসেছিলেম। বলিলেন, শ্রীনগরে ফিরিয়া ৭ দিন ক্ষীর দিয়ে ক্ষীর ভবানীর পূজা করেছিলেন। প্রতিদিন ১ মণ দুধের ক্ষীর ভোগ দিতেন ও হোম করিতেন। একদিন পূজা কত্তে কত্তে স্বামীজির মনে রামকৃষ্ণ মঠ নির্ম্মাণের কথা উঠেছিল। বলিলেন, তিনি যেন শুনিতে পাইলেন, মা ক্ষীর ভবানী স্বামীজিকে বলিতেছেন, "দেখ্, আমার ইচ্ছায় এই আমার মন্দির জীর্ণ শীর্ণ ভগ্নদশায় অবস্থান করিতেছে। আমি ইচ্ছা কর্‌লে এখনি এখানে সপ্ততল সোণার মন্দির তুল্‌তে পারি।" ঐ দৈববাণী শুনে অবধি আমি আর কোন সংকল্প রাখি না। মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য অবাক্ হ'য়ে শুন্‌ছে—আর ভাব্‌ছে, এ সকল কি সত্যি। ইনিই মা একদিন বলেছিলেন, "যা কিছু দেখিস্ শুনিস্ তা তোর ভেতরের আত্মার প্রতি-ধ্বনিমাত্র। বাইরে কিছু নাই।" তাই শিষ্য জিজ্ঞাসা করছে, "মশায়, এই সকল দৈববাণী ত আমাদের ভেতরের কথার বাহিক প্রতিধ্বনি মাত্র।" স্বামীজি গম্ভীর হ'য়ে বল্‌ছেন, "তা ভেতরেরই হোক্, আর বাইরেরই হোক্, তুই যদি নিজের কাণে আমার এই কথার মত অশরীরী কথা শুনিস্ তাহলে কি মিথ্যা বল্‌তে পারিস্ ? দৈববাণী সত্য সত্যই শোনা যায় ; ঠিক যেমন এই আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছে—এমনি।"

শিষ্য আর দ্বিরুক্তি না ক'রে স্বামীজির বাক্য বেদবাক্যরূপে শিরোধার্য্য করিয়া লইল। স্বামীজির কথায় এমন শক্তি ছিল যে, তাহা না মানিয়া থাকা যাইত না। যুক্তি তর্ক যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত। ধন্য তাহারা, যাহারা তাঁর শ্রীমুখে এই সকল গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শুনিয়া নিজ জীবনে তাহা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

শিষ্য—মশায়, আপনার আর ধ্যান ধারণা কেন ? আমাদের জন্য দেহের প্রতি একটু দৃষ্টি করুন ; যেন এই আপনার পদধূলিতে পৃথিবী আরো অনেক দিন আপনাকে সনাথা জ্ঞান করে।

স্বামীজি কোন উত্তর দিলেন না।

শিষ্য এইবার প্রেতাত্মাদের কথা পাড়িল। বলিল, মহাশয়—এই যে ভূত প্রেত-যোনির কথা শুনা যায়—শাস্ত্রেও যাহার ভূয়োভূয়ঃ সমর্থন দৃষ্ট হয়, তা সত্যি কি ?

স্বামীজি—সত্যি বই কি। তুই যা না দেখিস্, তা কি আর সত্যি হবে না ? তোর দৃষ্টির বাহিরে কত অযুতাযুত ব্রহ্মাণ্ড দূরদূরান্তরে ঘুরছে। তুই দেখ্‌তে

পাস্ না ব'লে তাদের কি আর অস্তিত্ব নাই ? তবে ঐ সব ভূতুড়ে কাণ্ডে মন দিস্‌নে। ভাব্‌বি ভূত প্রেত আছে ত আছে। তোর কার্য্য হচ্ছে—এই শরীর মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাকে প্রত্যক্ষ করা। তিনি প্রত্যক্ষ হলে ভূত প্রেত তোর দাসের দাস হয়ে যাবে।

শিষ্য—মশায়, আপনার কথা ত অবিসংবাদী। কিন্তু মনে হয়, উহাদের দেখ্‌তে পেলে বোধ হয় পুনর্জন্মাদি বিশ্বাস খুব দৃঢ় হয়। আর পরলোকে অবিশ্বাস থাকে না।

স্বামীজি—তোরা ত মহাবীর ; তোরাও কি ভূত প্রেত দেখে বিশ্বাস দৃঢ় কত্তে চাস্ ? এত শাস্ত্র, Science পড়্‌লি—এই বিরাট্ বিশ্বের কত গূঢ়তত্ত্ব জান্‌লি, এতেও কি আত্মজ্ঞান লাভ ভূত প্রেত দিয়ে কত্তে হবে নাকি ? ছিঃ ছিঃ !

শিষ্য কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহে। বলিল, মশায় আর একটি কথা মাত্র বলিয়া আমার কথা শেষ করিব। আপনি বলুন—আপনি ভূত প্রেত নিজে দেখেছেন কি না ?

স্বামীজি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছেন। কোন কথাই বল্‌ছেন না। অবশেষে বলিলেন যে, তাঁর সংসার সম্পর্কীয় কোন প্রেতাত্মা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। কখনো বা দূর দূরের খবর এনে দিত। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তার কথা সব সত্যি হোতো না। কোন এক তীর্থবিশেষে যাইয়া "সে মুক্ত হইয়া যাক্"—এইরূপ প্রার্থনা করে অবধি আর সে প্রেতাত্মার দেখা পাই নাই।

শিষ্য এইবার শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয় কিনা প্রশ্ন করিলে স্বামীজি কহিলেন, ইহা কিছু অসম্ভব নয়। শিষ্য এর যুক্তি চাহিলে স্বামীজি কহিলেন, "তোকে একদিন এপ্রসঙ্গ ভালরূপে বুঝিয়ে দিব। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যে প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয়, এবিষয়ে যুক্তি আছে। আজ্ আমার শরীর ভাল না। অন্য দিন বলিস্—বুঝায়ে দিব।" কিন্তু শিষ্য এ জীবনে স্বামীজির কাছে আর এ প্রশ্ন করিবার অবকাশ পায়নি—বা এ বিষয় জান্‌বার আর তার আগ্রহও হয়নি। স্বামীজি যখন বলিয়াছেন, তখন তাহা অবিতথ সত্য বলিয়াই সিদ্ধান্তিত করিয়াছে।

কথাপ্রসঙ্গে রাত্রি হওয়ায় প্রসাদগ্রহণান্তে শিষ্য সেদিন স্বামীজির ঘরেই ছিল। প্রাতে উঠে স্বামীজি রাখাল মহারাজকে বলেছিলেন যে, শিষ্য তামাম রাত্রি খুব ঘুমিয়েছিল ; কোথায় ও আমার সেবা করিবে, না, আমিই ওর তত্ত্বাবধারণ করিয়াছি। শিষ্য শুনে মহা সঙ্কুচিত হইয়া স্বামিপদে ক্ষমা প্রার্থনা করায় স্বামীজি বলিলেন, "তোর মত সুনিদ্রা আমার একদিন্ হয়ত আমি বেঁচে যাই।"

মধুর রস ও বৈষ্ণব কবিকুল।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।] [শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।]

বৈষ্ণব কবি প্রথমেই রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বরাগের লক্ষণ শ্রীল রূপ গোস্বামী এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন :—

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥ (১)

শ্রবণাদিজ প্রণয় প্রাকৃত জগতে তত সুলভ নহে। ইহার বিকাশ ভক্তি-জগতে প্রচুর পরিমাণে মিলিবে। শ্রবণ বহুবিধ—নাম শ্রবণ, বংশী শ্রবণ, গুণ শ্রবণ। নামশ্রবণজ প্রেমের অপূর্ব্ব চিত্র বাঙ্গালার প্রথম ও প্রধান বৈষ্ণব কবির প্রথম গান :—

"সই কে শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
বল সখি কি করি উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥"

প্রিয়তমের নাম সকল প্রেমিকাই ভালবাসে, কিন্তু তাহা প্রেমোদ্গমের পর। কেবল নাম শুনিয়া ভালবাসা জন্মিয়াছে, এমন কি প্রাকৃত লোকে সম্ভবে?

(১) উজ্জ্বল নীলমণিঃ—বিপ্রলম্ভ প্রকরণম্।

কিন্তু ইহা ভক্তিজগতে বড় সত্য; কারণ, ইহাই ভক্তের প্রথম সাধনা। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।" শ্রীচৈতন্য প্রকাশানন্দকে কহিয়াছিলেন :—

"তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।" (১)

সকল যথার্থ ভক্তেরই এমনি দশা হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সকল লোকের মনেই হ্লাদিনীর অংশ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত, নাম শ্রবণে ও জপে তাহার বিকাশ হয়। এই নাম জপ হইতেই ভক্তের হৃদয়ে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়; তাই ভাগবত কহিয়াছেন :—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ॥
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥" (২)

বৈষ্ণব কবিগণের প্রথম ও প্রধান গায়কের মুখে পদাবলীর যে আধ্যাত্মিকতা উজ্জ্বল রেখায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহা কাহারও হৃদয় হইতে তিরোহিত হইবে না—এইরূপ আশা করা বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় হইবে না।

এই নামগান ও নামশ্রবণ হইতে কৃষ্ণপ্রেমের জন্ম হইলে হৃদয়ে অল্প অল্প করিয়া আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ হয়।

"নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়'

সে আকাঙ্ক্ষা দর্শনের ও স্পর্শের জন্য, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা জন্মিবার উপযুক্ত অবস্থা হওয়া প্রয়োজন, তবেই আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য সম্ভবে। প্রণয়ের উপযুক্ত অবস্থা না হইলে প্রণয়ের স্থায়িত্ব হইতে পারে না—তাই বৈষ্ণব কবি শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিয়াছেন :—

(১) চৈতন্যচরিতামৃত—আদি ৭ম।
(২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—১১শ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়ঃ।

"আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণচপলতা লোচন নেল॥
করু দুহুঁ লোচন দূতীক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করি মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥"

মহাকবি বিদ্যাপতির অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত এই রচনাটী শুধু সাহিত্য-হিসাবেও উচ্চ অঙ্গের রচনা। ইহা বয়ঃসন্ধির একটী সুন্দর চিত্র। এই বয়ঃসন্ধিই প্রণয়বীজবপনের অতি উপযুক্ত সময়। এমনি বয়সে রমণীহৃদয়ে এমন একটা অব্যক্ত ভাব জাগরিত হয়, যাহা অবসরপ্রাপ্ত হইলে ও সুপুরুষ-সন্দর্শনে প্রণয়ে পরিণত হয়। এই সময়ে রমণীর প্রাণে কল্পনা ও অর্দ্ধস্ফুট আকাঙ্ক্ষার সহযোগে এমন একটী মধুর আবেশ উপস্থিত হয় যে, সে তখন নিজের পরিবর্ত্তন নিজে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। বিগতপ্রায় বাল্যের হাসি ও আগতপ্রায় যৌবনের মুকুলিত বাসনার মাঝখানে পড়িয়া সেই স্ফুটোন্মুখযৌবনার চিত্ত দোলায়মান হয়। তাই তাহার এই দ্বিভাবসঞ্জাত চিত্র বড় মনোরম।

বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের মনোরমা-চরিত্র যাঁহারা মনঃ-সংযোগপূর্ব্বক চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা এই বয়ঃসন্ধির মর্ম্ম কতক বুঝিতে পারিবেন।

"ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হয় ভোর॥

বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥"

ভক্তকে আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত সময় আছে, ভগবান্ সেই সুযোগ অন্বেষণ করেন এবং হৃদয়ের এইরূপ পরিণতাবস্থা দেখিলে তাঁহার নানাবিধ আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগে ভক্তকে নিজের অধীন করিয়া লন। তাই কবি সেই উপযুক্ত সময়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিতেছেন :—

"বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান।"

ভগবদ্রস আস্বাদনের উপযুক্ত অবস্থা আসিয়াছে, সংসারের ছেলে-খেলা পশ্চাৎ করিয়া ভগবদনুরাগের দিকে ভক্ত অগ্রসর হইতেছে, ইহাই প্রেম-বীজরোপণেব উপযুক্ত সময়—

"মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ।"

এই যে মাঝামাঝি অবস্থা ইহাই শ্রীরাধাব বয়ঃসন্ধি। এই বয়ঃসন্ধির বর্ণনা ভক্তিকাব্যে যেমন প্রয়োজন, প্রাকৃত কাব্যেও তেমনি প্রয়োজন। বিদ্যাপতির ঐন্দ্রজালিক তুলিকাস্পর্শে চিত্রটী সজীব ও সমুজ্জ্বল। আশা করি "মনমথ পাঠ" শব্দ শুনিয়া কেহ শিহরিবেন না। যে মন্মথ শ্রীকৃষ্ণের অনুবাগে মন মথিত করে, সে মন্মথ ধন্য! এমন মন্মথাকর্ষণ ভিন্ন ভগবানে দৃঢ়ানুবাগ সম্ভব নহে। তাই তো মহাপ্রভু কহিয়াছিলেন—সেই সে পরাণনাথে পাইনু, যার লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু। ইহার পরে চিত্রদর্শন ভক্তবর চণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ ছায়া দর্শনেই ভক্তের মনে প্রেমের প্রথম সঞ্চার হয়—তাই এই চিত্র দর্শন করিয়া শ্রীরাধার আবেগ চণ্ডীদাস এইরূপ বর্ণনা করিযাছেন :—

"হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি হরি এমন কেন বা হ'ল।
বিষম বড়বা অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥

বয়সে কিশোর রূপ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
চরণ যুগল করায় শীতল
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি।
চাই ছাড়াইতে ছাড়া নাহি চিতে
এখন করিব কি?
কহে চণ্ডীদাসে শ্যামনবরসে
ঠেকিলা রাজার ঝি।"

শ্যামনবরস হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিলে ভক্তের মনে এমনই অবস্থা হয়। এই আকুল আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ দেখিলে ভগবান্ ভক্তকে দেখা দেন, কিন্তু দেখা দিয়া আবার তিরোহিত হন। তাই সে চকিত দর্শন একদিকে যেমন উন্মাদ বাসনার সৃষ্টি করিয়া হৃদয়ে তাপের সৃজন করে, অপরদিকে রূপপ্রভায় হৃদয়-কন্দর আলোকিত করিয়া সুখের অমৃতনদী প্রবাহিত করে। সেই চকিত দৃষ্টির প্রভাব বৈষ্ণব কবি বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা কাব্য হিসাবেও অতি মনোরম :—

মহাকবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন :—

"কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তদবধি অবাধী মুগধ হম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় না পারি॥
সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
বড় সে আপন জীউ পরহাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥

গ্রত সব আদর গেও দরশাই।
বিছুরিতে মনে করি বিছুর না যাই ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥"

নায়কের প্রথম দর্শন নায়িকার পক্ষে এমনই উন্মাদকর, তাহা আমরা সাহিত্যজগতের সকল প্রসিদ্ধ নারীচরিত্র হইতে জানিতে পারি। শকুন্তলা ও জুলিয়েটই তাহার যথেষ্ট নিদর্শন। পক্ষান্তরে ভক্তের সহিত ভগবানের এই লীলা-রহস্য বড় উপাদেয়। একবার দেখা দিয়া তিনি ভক্তহৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভক্তের আগ্রহ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। তাই ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য কহিয়াছেন:—

"চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রয় একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে ॥" (১)

কিন্তু যে ভক্তের মনে যথার্থ কৃষ্ণ-প্রেম জাগিয়াছে, তিনি যে আর নিজবশে" নাই, তাঁহার মন তাঁহার প্রাণ তাঁহার ইন্দ্রিয় সকলই সেই রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া সেই বিষামৃতস্বরূপ প্রেমকেই সম্বল করিয়াছে। সেই রূপ কত উন্মাদক, তাহা ভক্ত কবি চণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছেন:—

"জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জনজনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়নচকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি হয় ॥"

"সখি দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী হয়েছে পাগরী
সকল লোকেতে বলে ॥
কিবা সে চাহনি ভুবন ভুলনি
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে ভ্রমরা বুলে
বেড়িয়া তঁহি রসাল ॥

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য, ১৮ শ।

দুইটী মোহন নয়নের বাণ
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায় ধরমে
পরাণ সহিত টানে॥
চণ্ডীদাস কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সে জন ভুলিল
কি তার কুল বিচার॥"

কে কবে ভালবাসিয়া প্রিয়তমের অদর্শন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এমন না হয়? যে কৃষ্ণমূর্ত্তি একবার দেখিয়াছে, যথার্থ দেখার মত দেখিয়াছে, সে কি আর সে রূপ ভুলিতে পারে? কোন্ ভক্ত কবে ভগবদ্দর্শনলালসায় কাঁদিয়া না বেড়ায়? কোন্ ভক্ত ঐ রূপ দেখিতে না পাইলে "বিফল জীবন, বিফল জনম, জীবনের জীবনে না হেরে" বলিয়া না কাঁদিয়া বেড়ায়? না কাঁদিলে কি ভগবান্‌কে দেখা যায়? তদ্গতচিত্ত হইয়া সংসার ভুলিয়া সেই পরম মনোহর রূপ অবিরত চিন্তা না করিলে সেই 'শতঘরিয়া'র দেখা পাওয়া যায় না। তাই শ্রীরাধার ভাব এই চকিত দর্শনের পর কি অলৌকিক! সেই অবর্ণনীয় ভাবও ভক্ত কবির তুলিকায় কি সুন্দর-রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে!

"রাধার কি হৈল অন্তরেতে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেন যোগিনীর পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখায় খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি চাহে দুহাত তুলি॥

এক দিঠি করি ময়ূরা ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥"

এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়াও কে, বৈষ্ণবকবিতার আধ্যাত্মিকতায় সন্দিহান থাকিবেন? রাধার হৃদয় কৃষ্ণময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর চারিদিকে তাঁহার কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি, কৃষ্ণানুভব হইতে আরম্ভ হইয়াছে—কি মধুর চিত্র!

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।"

ভক্তের হৃদয়ে মেঘ দর্শনে কৃষ্ণ ভ্রম হয়—ভক্তবর শ্রীবৃন্দাবন দাস কহিয়াছেনঃ—

"মাধব পুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন॥ (১)

এই তন্ময়তা হইতে হৃদয়োন্মাদিনী লালসার উদ্ভব হয়। যে চিদানন্দ-স্বরূপ হৃদয়ে ফুটিয়াছে, সেই মদন-মনোহর মূর্ত্তি পুনর্ব্বার দর্শন, স্পর্শন ও আলিঙ্গনের জন্য হৃদয়ে উন্মাদিনী বাসনা জাগিয়া উঠে। প্রাকৃত নায়িকার পক্ষেও যে এ কথা খাটে, সে কথা না বলিলেও চলে।

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বারে
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হ'ল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়ে পড়ে॥

(১) শ্রীচৈতন্যভাগবত—অন্ত্য, ৪র্থ।

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাড়ায় লালসে
না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিত্তে
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥"

এ ফাঁদ, বড় শক্ত ফাঁদ। এ ফাঁদ, বড় মধুর ফাঁদ। এ ফাঁদে যে একবার পড়িয়াছে, সে তাহাতে পড়িয়া ছটফট করে—কাঁদিয়া মরে—তবু বন্ধন ছাড়াইতে চাহে না। কৃষ্ণপ্রেমের এই রীতি, ইহার বাহিরে জ্বালা, ভিতরে অতুল আনন্দ, তাই এ ফাঁদে পড়িলে আনন্দ আর যন্ত্রণায় হৃদয় চঞ্চল হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কহিয়াছেন :—

"বাহিরে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমা আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যাজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে.
বিষামৃতে একত্র মিলন॥ (১)

এ প্রেমের কত আকর্ষণ তাহা মহাপ্রভু কহিয়াছেন :—

"কৃষ্ণরূপ শব্দ স্পর্শ সৌরভ অধর রস
মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চ জন এক অশ্ব মোর মন
চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিগে ধায়॥
সখিহে শুন মোর দুঃখের কারণ
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহালম্পট দস্যুগণ
সবে কহে হর পরধন॥

(১) চৈতন্যচরিতামৃত,—মধ্য, ২য়।

এক অশ্ব একক্ষণে   পাঁচ পাঁচ দিকে টানে
এক মন কোন্ দিকে ধায়।
এক কালে সবে টানে   গেল ঘোড়ার পরাণে
এই দুঃখ সহন না যায়॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ   ইহা সবার কাঁহা দোষ
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে   গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন॥
কৃষ্ণ রূপামৃত সিন্ধু   তাহার তরঙ্গ বিন্দু
এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী   তার চিত্ত উচ্চগিরি
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥" (১)

তাই বৈষ্ণব কবি কহিয়াছেন :—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে,
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।
সই কি আর বলিব।
যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বলকি বলিতে পার কত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা'।
দরশ পরশ লাগি আলুইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহ লহ হাসে পিয়া পিরীতির সার॥"

এ প্রেম এ আনন্দ ঢাকা যায় না,—

"গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরায় তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥

(১ চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য, ১৫শ।

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥"

জাগতিক প্রেমেও যে এই পদ্ধতি তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাই আধুনিক কবি কহিয়াছেনঃ—

"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন॥"

ফলতঃ এই লালসা ও এই আকাঙ্ক্ষাই প্রেমের পুষ্টি বিধান করে। যদি যথার্থ ভালবাসা হৃদয়ে জাগে, তবে প্রিয়তমের দর্শন আকাঙ্ক্ষা ও প্রিয়তমকে হৃদয়ে রাখিবার লালসাও তাহার সঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। প্রাকৃত প্রেমের এই পদ্ধতি সকল কবিগণ স্বীকার করিয়াছেন। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা, মালতী ও মাধব, রোমিও ও জুলিয়েট, ওথেলো ও ডেস্‌ডিমোনা, এই সকল মহাকবি চিত্রিত চরিত্রাবলী এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা নামের আকর্ষণে প্রেমের উৎপত্তি এতক্ষণ বর্ণনা করিয়াছি ; এবার মুরলী শ্রবণে প্রেমের উৎপত্তির বিষয় কিছু বলিবার ইচ্ছা করি। সুস্বর শ্রবণে মন মোহিত হয় না, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। যাহার হয় না তাহার প্রতি কবিকুল চিরদিন বিরক্ত। মহাকবি সেক্ষপীয়রের তীব্র কটাক্ষ স্মরণ করুন :--

"The man that hath no music in himself
Nor is not moved with concord of sweet songs
Is fit for treasons, stratagms and spoils
The motions of his spirit are dull as night
And his affections dark as Erebus
Let no such man be trusted" —(১)

তাই শ্যামের বাঁশী কাব্য জগতে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে ও করিবে। শ্যামের বাঁশী সকলেরই প্রিয়, কি পুরাতন কি আধুনিক সকল কবিই শ্যামের বাঁশরীর প্রতি আসক্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুরলী বৈষ্ণব কবির কাছে এক অপূর্ব্ব পদার্থ। কারণ, এ মুরলীর বিষামৃত যখন ভক্তের কানে প্রবেশ করে, তখন ভক্ত শুধু মোহিত হয় না, পাগল হয়। গোপী হৃদয়ে উন্মাদ প্রেম সৃষ্টি করিবার জন্য

(১) Merchant of Venice Act v Scene 1

দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর বৃন্দাবনবিপিনে এই মুরলী ধ্বনি কি ভাবে করিয়াছিলেন, আর সেই মুরলী রব শুনিয়া গোপীগণ কিরূপ পাগল হইয়া সেই অনিন্দ্য মূর্ত্তি দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়াছিল, তাহা বৈষ্ণব কবি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা দীর্ঘ হইলেও এখানে উদ্ধৃত করিব। বলা উচিত এ চিত্র ভাগবত হইতে গৃহীত। (১)

"রমণী মোহন বিলিসিতে মন
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজধনী॥
মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান॥
অমিয় নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী গীত।
অবিচলকুল রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া রহিল পশিয়া
বেকাত বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি॥
আনন্দে অবশ পুলক মানস
সুকুমারী ধনি রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে॥
বাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন কিবা বাজে তান
কেমন করিছে প্রাণী॥

(১) শ্রীমদ্ভাগবত—দশম স্কন্ধ।

সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে॥

কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস রঙ্গ॥

কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান
ঐছন সে গেল চলি॥

কেহ শিশু ল'য়ে কোলেতে করিযে
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীব গান॥

কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিদ।
যেমন চোরাই হরণ করিল
মানসে কাটিল সিঁদ॥

কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে
তেমনি চলিয়া গেল।
কুঙ্কুমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥

সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে॥

ব্রজনারীগণে দেখিয়া তখন
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন করল রচন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়॥"

বাঁশীর গান শুনিয়া যে এমন পাগল হইয়াছে সেই ধন্য! চিরদিন শ্যামের বাঁশী জগৎকে আহ্বান করিতেছে—

আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি।

সে বাঁশীর রব যাহার কর্ণে প্রবেশ করে, সেই ধন্য। যে সেই বংশীরবরূপ মহাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সংসার ফেলিযা, আপনা ভুলিয়া গোপীদের মত পাগল হইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিতে পাবে, তাহারই জীবন সার্থক। যে গোপীগণ—

কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥

তাহাবা প্রেমেব আদর্শ-স্থল। তাই বৈষ্ণবগণেব নিকট গোপীভাব অমৃতস্বরূপ।

তাই বলিতেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী ভক্তের কাছে অপূর্ব্ব পদার্থ। এ বাঁশরী ভক্তের নিয়তি বাঁশবী, এ বাঁশী শ্রীভগবানের অমৃতময়ী আকর্ষণী-শক্তি। তাই এই বাঁশীর গান যাহার কানে গিয়াছে, তাহার সেই কালোরূপ ভিন্ন আর সবই মন হইতে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাব সুখ গিয়াছে, দুঃখ গিয়াছে, মন গিয়াছে, বুঝি প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে বসিয়াছে। যাহাতে বড় সুখ, তাহার ভিতর একটা দুঃখের আবেশ আছে—সেই দুঃখের অস্তিত্বেই সুখেব মাত্রা বাড়িয়া যায়। তাই যখন বাঁশীর গান শ্রীরাধার কর্ণে প্রথম প্রবেশ লাভ করিল, তখন একদিকে শ্রীকৃষ্ণের মহতী আকর্ষণী-শক্তি ও অপর দিকে সংসারেব চিরাভ্যস্ত আকর্ষণ— এই দুইয়ের মাঝখানে পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে এক অপরূপ সুখ-দুঃখ-সমন্বিত ভাবের তরঙ্গ খেলা করিতে লাগিল।

"কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজে॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥

গুরুজন সমুখই ভাব তরঙ্গ।
যতনহিঁ বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ॥"

এই বিপুল পুলক আর সংসারের বিপুল বাধা এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সম্মিলনে বংশীগান প্রথম প্রথম ভক্তের কানে বিষামৃত মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়:—

"রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।"

এই বিষামৃত বুঝি সংসারের সর্ব্বত্রই চিরদিন সংশ্লিষ্ট—কারণ যেখানে সুখ সেখানে দুঃখ আছে, প্রাণভরা হাসির ভিতর একটা দুঃখের আস্বাদ মিশ্রিত আছে, বড় দুঃখের গানেই যেন সুখের পূর্ণ আবেশ আছে। তাই মহাকবি শেলী (Shelley) কহিয়াছেন:—

"Our sincerest laughter
With some pain is fraught
Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought" (১)

এবং মহাকবি কালিদাস কহিয়াছেন:—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকীভবতিযৎ সুখিতোপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বম্—
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥" (২)

হৃদয়ের উপর স্বরলহরীর অপূর্ব্ব প্রতাপ জগতের সকল কবি বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রীক্ কবি অরফিউসের গানে অচেতন জগৎকে সচেতন করাইয়াছেন, বৈষ্ণব কবিও লিখিয়াছেন:—

(১) Lyrics.
(২) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—৫ম অঙ্ক।

"কি রজলীলা মিলায় শিলা
শুনিলে সে ধ্বনি কানে।
যমুনা পবন স্থগিত গমন
ভুবন মোহিত গানে॥" (১)

এই বাঁশীর গানে লালসার স্ফূর্ত্তি—

"আনন্দ উদয় শুধু সুধাময়
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা জীয়ে কি অবলা
হানায় মদন বাণে॥
কুলবতী কুল করে নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে রাখিও মরমে
কি মোহিনী কালা জানে॥" (১)

প্রথমে লালসার সঞ্চার, পরে উহার পুষ্টি, শেষে সর্ব্বত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণমুখী করা বাঁশীর এই চরিত্র। তাই বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বংশীকে উদ্দীপনান্তর্গত করিয়াছেন। যথা চৈতন্যবাক্য :—

"দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশী স্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন॥" (২)

তাই বংশীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের চিরসম্বন্ধ। নরোত্তম কহিয়াছেন—

"কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজে সরলা বংশী বিরাজে
যার ধ্বনি ভুবন মাতায়।
শ্রবণের পথ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ হঞা
প্রাণ আদি আকর্ষি আনয়॥" (৩)

বৈষ্ণব কবি গুণজ প্রণয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি যে, শ্রবণাত্মক প্রেম তিন প্রকার—নামশ্রবণাত্মক, বংশীশ্রবণাত্মক ও গুণশ্রবণাত্মক। নাম শ্রবণ ও বংশীশ্রবণজ প্রেমের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছি ; এখন গুণজ প্রণয়ের কথা কহিব। বিদ্যাপতি কহিয়াছেন—

(১) চণ্ডীদাস।
(২) চৈতন্য চরিতামৃত—মধ্য, ২৩শ।
(৩) প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা।

"এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্‌ভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সুত॥
সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিলবাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥"

রাধা, কৃষ্ণের রূপে ও গুণে ভোর—"কিবা গুণে কিবা রূপে, মোর মন বান্ধে।"(১) ভগবানের গুণ স্মরণ করিয়া মুগ্ধ কে না হয়? সকল ভক্তই ভগবানের গুণে মুগ্ধ, তাই রাধাও কৃষ্ণের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার প্রেম বন্ধনে বদ্ধ হইবার জন্য সখীর প্ররোচনা। সখী-চরিত্র আমরা যাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সখীর ইহাই সাধনা, ইহাতেই তাহার সুখ। এইখানে বৈষ্ণবকবিচিত্রিত সখী-চরিত্রের সমালোচনা করিলে অন্যায় হইবে না। এতাবৎ যাহা দেখাইয়াছি, তাহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব কাব্যে সখী-চরিত্র কত আবশ্যক। সখী রাধার ভাবান্তর উপলব্ধি করিতেছে, তাঁহার মনের কথা বুঝিতেছে। তাঁহার মনোবেদনা, তাঁহার আনন্দ, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার লালসা—সকলেরই অংশী হইতেছে। সখীর ভালবাসা নিঃস্বার্থ। সখীর হৃদয় রাধাময়—রাধাকৃষ্ণের মিলনচিন্তাই তাহার একমাত্র চিন্তা। রাধার দুঃখে তাহার দুঃখ, রাধার সুখে তাহার সুখ। পূর্ব্বরাগে, মিলনে, বিরহে, সম্ভোগে সর্ব্বত্রই সখী-চরিত্র উজ্জ্বল ভাবে বিকশিত। কাব্যজগতেও সখী-চরিত্র চির-প্রফুল্ল। প্রিয়ম্বদা অনসূয়া (২) বাসন্তী (৩) চিত্রলেখা (৪) প্রভৃতি সখী-চরিত্র

(১) চণ্ডীদাস।
(২) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।
(৩) উত্তররাম চরিতম্।
(৪) চিত্রলেখা।

কাহার না মন হরণ করিয়াছে? পাশ্চাত্য কাব্যজগতেও সখী-চরিত্র আদৃত হইযাছে—নেবিসা (১) এমিলিয়া (২) প্রভৃতি সখীগণ সেখানেও বেশ শোভা পাইয়াছে। কিন্তু ভারত-কাব্যজগতে সখী-চরিত্রের বিকাশ উজ্জ্বলতর মনোমুগ্ধকর। লজ্জালুলিতা কোমলস্বভাবা ভারত-ললনার নির্ভরশীলতা জগতের আর কোনও রমণী-চরিত্রে পাওয়া যায় না—তাই তাহার "সুখেও সখীর আবশ্যক, দুঃখেও সখীর আবশ্যক।"(৩) পূর্ব্বরাগে সখীর যেমন আবশ্যক, মিলনেও তাহার তেমনি আবশ্যক। বুঝি সখী ভিন্ন এ মিলন সাধন হয় না। নিজের মনের কথা যে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না, যার বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না, সে নিজে কেমন করিয়া প্রিয়তমেব সহিত মিলন সাধন কবিবে? তাই সে সময়ে তাহার সখীর বড় প্রয়োজন। সখীই নানা কৌশলে, নানা উপায়ে, নানা প্ররোচনায় রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন কবাইয়া দেয়। ভক্ত বৈষ্ণব সখী-চরিত্রের নিতান্ত পক্ষপাতী—তাহা বলিয়াছি। তাঁহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই সখীভাব প্রাপ্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবা করা। নরোত্তমদাস কহিয়াছেন :—

"সখীগণ গণনাতে আমারে গণিবে তাতে
তবহুঁ পূরব অভিলায॥" (৪)

তাই ভক্তকবির পূর্ব্বরাগের চিত্রের মধ্যে সখী-চরিত্র অতি সুন্দর এবং আমরা পরে দেখিব যে, মিলনের চিত্রে, সম্ভোগেব চিত্রে, বিরহের চিত্রে, সর্ব্বত্রই সখী-চরিত্র উপাদেয়। ভগবান্ ও ভক্তির লীলা-খেলা উপভোগ করিবাব জন্য সখী-চরিত্রের সৃষ্টি। সখী বুঝে যে ভক্তের অর্থাৎ ভক্তিরূপিণী শ্রীরাধার ভগবানের সহিত মিলন হওয়াই স্বাভাবিক—তাই তাহার হৃদয়ের একমাত্র বাসনা—সেই অপূর্ব্ব যুগল-মিলন সন্দর্শন। সখীচরিত্রেব ভিত্তি প্রেমে, তাহার পরিপুষ্টি নিঃস্বার্থতায়। এমন মধুর সখী-চরিত্র যদি ভক্তের আদর্শ না হইবে, তবে আর কি তাঁহার আদর্শ হইবে? তাই আগেই বুঝাইয়াছি যে,'সখী ভিন্ন মধুব রসের বিস্তার হয় না, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেব লীলারস সম্পূর্ণ হয় না এবং তাই ভক্তপ্রবর রায় রামানন্দ কহিয়াছেন :—

(১) Merchant of venice.

(২) Othello

(৩) নব্যভারত—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১২৯৬।

ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

(৪) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

"রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥"

সখী রাধাগতপ্রাণা—তাই রাধার দুঃখ দেখিলে সখী অস্থির হয়, ভগবানের উপর রাগ করে, গালি দেয়, জোর করিয়া ধরিয়া আনে। রাধার বিরহ দেখিলে সখী ব্যথায় এত কাতর হয় যে, দুঃখিনী রাধাকে তাহাদের সান্ত্বনা করিতে হয়, রাধার ব্যথা জানিবার জন্য, রাধার আবদার সহিবার জন্য, সখীর কত আগ্রহ। আমরা এই সব কথা ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিব।

এখন আমরা দেখিলাম যে, শ্রীরাধার প্রণয় নামশ্রবণে, বংশীশ্রবণে, রূপ-দর্শনে ও গুণশ্রবণে সঞ্জাত। ফলে, যত কারণে প্রেমের উৎপত্তি হইতে পারে, শ্রীরাধার প্রেমে সে সকল কারণই বর্ত্তমান। অতএব তাঁহার আগ্রহাতিশয্য ও লালসার প্রাচুর্য্য বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। তাঁহার এই লালসার ভিতর শুধু দৈহিক লালসা যাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ, তাঁহার লালসার যথার্থ হেতু হৃদয়ের টান। কিন্তু হৃদয়ের টানের সহিত যে দৈহিক মিলনাকাঙ্ক্ষার নিত্য সম্বন্ধ, তাহা বৈষ্ণবকবি বুঝিতেন, তাই দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা কোথাও ঢাকা দেন নাই। তাঁহাদের কাব্যের সত্যতা ইহাতেই বুঝা যায়। পক্ষান্তরে ইহাও বক্তব্য যে, ভগবান্‌কে সম্পূর্ণরূপ আলিঙ্গন করিবার জন্য ভক্তের হৃদয়ে যে প্রবল বাসনা সৃষ্ট হয়, তাহার সম্যক্ পরিচয় দিবার জন্যই ভক্ত বৈষ্ণবকবি শ্রীরাধার দৈহিকমিলনাকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ লালসা না জন্মিলে ভগবৎ-সম্ভোগ অসাধ্য এবং ঐ লালসা যত বেশী হইবে, ভগবৎ-রসাস্বাদও তত বেশী হইবে। লালসার আধিক্য ও সম্ভোগের সুখাধিক্য না হইলে বিরহের যন্ত্রণাও বেশী হয় না। তাই বৈষ্ণবকবি লালসা ও সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীরাধার লালসার এককণা পাইবার জন্য বৈষ্ণব ভক্ত চিরদিন লালায়িত। ক্ষীরোদ বাবু যথার্থ বলিয়াছেন, "ভগবানের সহিত রতিরস সম্ভোগ করিতে এমন লালসা কয় জনের হইয়াছে?" (১)

মানুষ যখন এইরূপ পাগল হইয়া ভালবাসে, তখন উহাই ঈশ্বরকে টানিয়া আনে। যাঁহারা ভালবাসা কি পদার্থ যথার্থ চিনিয়াছিলেন, তাঁহারা সে কথা বলিয়া গিয়াছেন। মহাকবি Byron বলিয়াছেন :—

"Devotion wafts the mind above
But God Himself descends in love."

(১) নব্য ভারত—১২৯৬ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, "লালসা ও বিরহ"।

অপূর্ব্ব উক্তি!—বুঝি ক্ষণেকের জন্ত এই পাশ্চাত্য মহাকবির প্রাণে বৈষ্ণব কবির একটা অজ্ঞাত ছায়া লম্বিত হইয়াছিল। প্রেমের মহিমা প্রেমিক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আর একটি পাশ্চাত্য চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন; ইয়োরোপের প্রধান দার্শনিক মহাকবি গেটির মার্গারেট (Margaret) (১) চরিত্র কি উজ্জ্বল! প্রেমের মহিমা জ্ঞাপন করিবার জন্ত তিনি দুইটি চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, একজন মেফিষ্টফেলিস্ (Mephistophelis) চালিত ফাউষ্ট (Faust) আর একটা ফাউষ্ট প্রেমমুগ্ধা মার্গারেট। ইন্দ্রিয়-লোলুপ ফাউষ্ট মেফিষ্টফেলিসরূপী সয়তানের কবলিত হইল আর প্রেমমুগ্ধা অথচ বিপথগামিনী মার্গারেটের জন্ত স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল। কাব্যজগতে প্রেমের মহিমা এইরূপে চিরদিন শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভক্তিরাজ্যের যে কোন একটী জীবন্ত চিত্রের বিচার করুন, দেখিবেন, যথার্থ মানুষপ্রেমেও ভগবান্‌কে টানিয়া আনা যায়। বিল্বমঙ্গল গণিকা চিন্তামণিতে আসক্ত, গণিকাকে কিন্তু তিনি প্রাণ ভরিয়া নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসেন। গভীর রাত্রে তাঁহার প্রাণ চিন্তামণির জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হৃদয়ে চিন্তামণিকে দর্শনের অদম্য লালসা জাগিয়া উঠিল। তিনি প্রবল নদীবেগ তুচ্ছ করিয়া, শবালিঙ্গন করিয়া, সর্প অবলম্বন করিয়া চিন্তামণির গৃহে উপস্থিত। এই গভীর লালসায় ভগবানের মন টলিল, সেই ভয়ঙ্কর রজনীই তাঁহার পক্ষে অমৃতস্বরূপা হইল। ভগবান্ বেশ্যার মুখ দিয়া বলাইলেন:—

"এ হেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ এক ভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যদি হৈত তোমার।
তবে কি না হইত চতুর্বর্গ সেবা যার॥" (২)

বিল্বমঙ্গলের চক্ষু খুলিল। তিনি তাঁহার হৃদয়ের অসীম লালসা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমর্পণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিলেন—

"হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥" (৩)

(১) Goethes Faust Part I.
(২) ভক্তমাল গ্রন্থ—বিল্বমঙ্গল চরিত।
(৩) বিল্বমঙ্গল—কৃষ্ণকর্ণামৃত।

ক্রমশঃ।

ভারতেতর দেশে বেদান্ত প্রচার।

আমেরিকায় এক্ষণে রামকৃষ্ণ মিশনের ৬ জন সন্ন্যাসী বেদান্তপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কালিফোর্ণিয়ার সানফ্রান্সিস্কোতে স্বামী ত্রিগুণাতীত ও প্রকাশানন্দ এবং লস এঞ্জেলিসে সচ্চিদানন্দ। সানফ্রান্সিস্কো হইতে Voice of Freedom নামক একখানি বেদান্তবিষয়ক মাসিক পত্র কয়েক মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্ক বেদান্ত-সমিতির অধ্যক্ষ। তিনি কয়েক মাস নিউইয়র্কে এবং কয়েক মাস ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত স্বামী বোধানন্দ পিটস্‌বর্গে ও স্বামী পরমানন্দ বোষ্টনে কার্য্য করিতেছেন। নিউ-ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি হইতে 'বেদান্ত ম্যাগাজিন' নামক ইংরাজী বেদান্ত বিষয়ক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। উহার জুলাই, আগষ্ট সংখ্যা এবং Voice of Freedom এর মে সংখ্যা হইতে আমরা 'ভারতেতর দেশে বেদান্ত প্রচার' সম্বন্ধীয় কয়েকটি সংবাদ সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

বিগত মার্চ্চ মাসে স্বামী অভেদানন্দ লণ্ডনে যাইয়া তথাকার বেদান্ত-সমিতিতে কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি কিছুদিন ধরিয়া প্রতি সপ্তাহে দুইবার 'একাগ্রতা ও প্রাণায়াম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া পারিসে একটী বেদান্ত সমিতি স্থাপনার্থ গমন করেন। তথায় কিছুদিন কার্য্য করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হন। বিগত ২৬শে জুন তিনি নিউইয়র্কে পঁহুছিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে ১৬ই মে তারিখে লণ্ডন উইক্‌লি ডেস্প্যাচ পত্রে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে :—

"শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মনের দ্বারা যে দেহ মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারা যায়, এখানকার লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট তাহা অতি বিস্ময়কর বোধ হইবে। স্বামী অভেদানন্দ—যিনি পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্য স্বাস্থ্য-রহস্য শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন—এই দাবী করিয়া থাকেন। উইক্‌লি ডেসপ্যাচের জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার নিকট তিনি—যে বেদান্ত সম্বন্ধে পরলোকগত শ্রেষ্ঠ শব্দতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ম্যাক্‌সমূলার এক সময়ে এই ভাবে বর্ণনা করেন যে, "উহা সর্ব্ব দর্শনের মধ্যে উন্নত দর্শন ও সকল ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তিদায়ক ধর্ম্ম"—সেই বেদান্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। স্বামী

অভেদানন্দ ধীর ভাবে আমাদের প্রতিনিধির নিকট শ্বাসবিজ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

যে শ্বাসবিজ্ঞান আজকালকার শারীরিক উন্নতির জন্য সার্ব্বজনীন উৎসাহের দিকে লোকের প্রবল অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে, স্বামী অভেদানন্দ ধীরভাবে উক্ত প্রতিনিধির নিকট তাহার মূলতত্ত্ব সমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

স্বামী বলিলেন, "পৃথিবী যত দিনের পুরাতন, বেদান্তও ততদিনের পুরাতন, আর পাশ্চাত্য জগতের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বেই বেদান্তের অস্তিত্ব ছিল। সহস্র সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে ইহা বিদ্যমান ছিল এবং মানবজাতি যত প্রকার মতের সহিত পরিচিত আছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। বিপদের সময় ইহা মানবের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু, দুঃখে ইহা অতিশয় সান্ত্বনাপ্রদ; আর উহা সাংসারিক অকৃতকার্য্যতায় যে সকল দুশ্চিন্তা, কষ্ট বা অবসাদ আসে, সমুদয় দূর করিয়া দেয়। অপর কোন ধর্ম্মই সংযম, শান্তি ও আনন্দ লাভের এরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা দেয় না।"

অভেদানন্দ স্বামী, তাঁহার ক্লাসে যে সকল নরনারী আসিয়া থাকে ও ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হয়, তাহাদিগকে এই বৈজ্ঞানিক শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর এইরূপ দাবী করা হয় যে, উহা দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত আনন্দময় অবস্থা লাভ করা যায়। উইক্‌লি ডেস্‌প্যাচের প্রতিনিধির সহিত বেদান্ত-সমিতি-গৃহে কয়েকজন ছাত্রের আলাপ হইল—তাহারা বলিলেন, তাঁহারা স্বামীর প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেক উপকার পাইয়াছেন। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে প্রাণায়াম দ্বারা যে সকল উপকার লাভের আশা দেন, তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হয়, তিনি স্বয়ং সেগুলি পাইয়াছেন। তিনি জনৈক ভারতীয় বৈদান্তিক যোগীর কয়েকটী অদ্ভুত গল্প বলিলেন। তিনি প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা তাঁহার ফুস্‌ফুস্‌কে পূর্ণ করিয়া ফেলেন। ক্রমশঃ তাঁহার দেহ একটা বায়ুপূর্ণ রবার নলের (Pneumatic tyre) মত হইয়া যায়। তার পর তাঁহার উপর দিয়া পঞ্চাশ জন করিয়া লোকে পূর্ণ ২ খানি গাড়ি চালান হয়। স্বামী ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন যে, একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হয় আর বৈজ্ঞানিক শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রণালী দ্বারাই এইরূপ ইচ্ছাশক্তি লাভ হয়।

স্বামী বলিলেন,—

"নিয়মিত প্রাণায়ামের দ্বারা মানুষ ইচ্ছাশক্তিকে এতদূর বাড়াইতে পারে যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রতিরোধ করিতে পারে। কেবল ইচ্ছা দ্বারাই তখন সে

চেয়ার হইতে শূন্যে উঠিতে পারে ; অথবা একখানি কেদারায় ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে নিজের সূক্ষ্ম দেহকে পৃথক্ করিতে পারে ও প্রকৃতপক্ষে দেহের বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া দেহটা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পারে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য হৃদয় ও ধমনীর কার্য্য বন্ধ করা প্রাণায়ামকারী ব্যক্তির পক্ষে অতি সহজ কার্য্য। অতঃপর স্বামী বলিলেন, আমি খ্রীষ্টিয় বিজ্ঞানের * মূল তত্ত্বসমূহই শিক্ষা দিয়া থাকি—ভারতে ইহা শত শত যুগ ধরিয়া প্রচারিত হইয়াছে। প্রভেদ এই যে, তাঁহারা বিশ্বাসকেই উপায় স্বরূপে বর্ণন করেন, আমি উহার পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকি। বেদান্ত শব্দের অর্থ জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। (যাহা মানবকে জ্ঞানের শেষ সীমায় লইয়া যাইবার দাবী রাখে) তৎসহায়ে অতি সহজেই আপনাকে আপনি রোগ মুক্ত করা যায় (ইহা বলা বাহুল্য)। মনে কর কোন ব্যক্তির দাঁতের গোড়া কন্ কন্ করিতেছে, অথবা স্নায়বীয় বা অন্য কোনরূপ তীব্র বেদনা হইতেছে। ঠিক ঠিক প্রাণায়ামের দ্বারা যে স্থানে তাহার বেদনা, সেই স্থান হইতে মন সম্পূর্ণ সরাইয়া আনিলে ঐ বেদনা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে।—যেন ক্লোরোফরমাদি দ্রব্য,—যাহা শরীরের যন্ত্রণা-স্থানে লাগাইলে তথায় অসাড়তা উৎপাদিত করিয়া যন্ত্রণার উপশম করে, সেই সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তত্ত্বনির্ণায়ক-সমিতি সকল (Bychical Societies) এমন কিছুই আবিষ্কার করেন নাই, যাহা আমার উপদিষ্ট প্রাণায়াম সাধনের দ্বারা না হইতে পারে। ছাত্রকে প্রতিদিন দুইবার আধ ঘণ্টা করিয়া সাধন করিতে হইবে—তাহাতে দেহ ও মনের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হইবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বলিতে আমি সেই সাধন-প্রণালীকে লক্ষ্য করিতেছি, যাহা দ্বারা ফুসফুস ও স্নায়ুকেন্দ্র সমূহের স্পন্দন-ক্রিয়ার উপর ক্ষমতা লাভ হয় এবং ক্রমে জীবনীশক্তির উপরও ক্ষমতা লাভ করা যাইতে পারে। যোগী বলেন, এই বৈজ্ঞানিক শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সর্ব্বপ্রকার ফললাভ হইতে পারে।"

স্বামী অভেদানন্দ, প্রাণায়ামকারীর আহার পানে অত্যন্ত কঠোর নিয়মাদি রক্ষার উপর বড় বেশী ঝোঁক দেন না, আর ধূমপান সম্বন্ধেও বলেন, বিশেষ ক্ষতি নাই। তিনি বলেন, ইচ্ছাশক্তিকে উত্তমরূপে নিয়মিত করিলে আর প্রাণায়ামে দক্ষতা থাকিলে আহারপানাদি অপর সকল বিষয় দেহ ও মনের সর্ব্ববিধ কল্যাণের সহায়ক করিয়া লওয়া যায়।

* Christian Science—আমেরিকার মিসেস এডি উদ্ভাবিত বহুল প্রতিষ্ঠিত মত বিশেষ। ইঁহারা মনঃ শক্তিদ্বারা। খৃষ্টের ন্যায় রোগসমূহ আরোগ্য করিবার দাবী করিয়া থাকেন।

পারিসে বেদান্ত-সভা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

স্বামী অভেদানন্দ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পারিস গমন করেন—তাঁহার তথায় গমনের উদ্দেশ্য—একটি বেদান্তসমিতির প্রতিষ্ঠা করা। ১৪ই এপ্রিল তারিখে মিসেস ব্রান্সকোম উডের গৃহে তিনি তদুদ্দেশ্যে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে একটী মনোহারিণী বক্তৃতা করেন। অনেক গণ্য মান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ সমিতির উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত দর্শনের কয়েকটী মূল তত্ত্ব এবং সাধনের বিভিন্ন উপায়-সমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, বেদান্ত পাঁচ সহস্র বর্ষ ধরিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং এত কাল ধরিয়া উহার সত্যসমূহ বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইযাছে। উহাই ভবিষ্যতের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইবে। উহা সমুদয় মত ও সম্প্রদায়কেই যে কেবল নিজ ক্রোড়ে স্থান দেয়, তাহা নহে, কিন্তু উহা স্তায় ও বিজ্ঞানশাস্ত্র-সঙ্গত; আর এতৎসহায়ে যখন যথার্থ বিজ্ঞান ও যথার্থ ধর্ম্ম এক বস্তু বলিয়া মানব দেখিতে পাইবে তখন উভয়ের সম্মিলনে এক সমন্বয়পূর্ণ অভ্রান্ত মতের উৎপত্তি হইবে, আর পরিণামে উহাই জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর যোগ-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়া তিনি শ্বাস-বিজ্ঞানের সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্বন্ধ খানিকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইলেন। এই বিষয়টীতে শ্রোতৃবৃন্দের মন এতদূর আকৃষ্ট হইল যে, বক্তৃতান্তে একটী প্রাণায়াম শিক্ষার ক্লাস গঠিত হইল এবং যতদিন না তিনি পুনরায় লণ্ডন যাত্রা করিলেন, ততদিম ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহের সহিত উহা চলিতে লাগিল।

স্বামী অভেদানন্দ পারিসে এবার কার্য্য করিতে বিশেষরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন। এখানে অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইয়াছে; আর যাঁহারা তাঁহার সঙ্গলাভ ও তাঁহার নিকট শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই উপর তিনি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও প্রাখর্য্যে এবং তাঁহার অসাধারণ চরিত্রে অনেক গণ্য মান্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বেদান্তে বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতার পর সপ্তাহে মিসেস সিলভার্স তাঁহার সুন্দর বৈটকখানায় স্বামী অভেদানন্দের সম্মানার্থ অভ্যর্থনা সভা করিয়া তাঁহার বন্ধুগণকে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ দান করেন। মিসেস ভ্যান উইকও তাঁহার হোটেলে বেদান্তের ছাত্রগণকে চা-পান-সভায় নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহাতে আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে

বিস্তারিত ভাবে বলেন—তাহা সকলের অতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। অতঃপর মিঃ ও মিসেস এথার্টন কার্টিস স্বামী অভেদানন্দকে তাঁহাদের গৃহে একটী বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। তিনি তথায় অবহিত ও ভাবগ্রাহী শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতা করেন।

এখানে বেদান্তে অনুরাগী ব্যক্তিগণ অনেকে মিলিয়া প্রতি সপ্তাহে বেদান্ত পাঠ ও চর্চ্চা করিতেছেন। আর দিন দিন বেদান্ত চর্চ্চায় লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে এই শরৎকালে বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হইবার খুব সম্ভাবনা। অভেদানন্দ স্বামীও ঐ সময়ে খুব সম্ভবতঃ আসিতে পারেন।

(আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন।)

স্বামী অভেদানন্দ চারিমাস ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যাপন করিয়া বিগত ২৬শে জুন নিউইয়র্কে উপস্থিত হইলে তাঁহার বহু ছাত্র ও বন্ধুগণ সমবেত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। এই অভ্যর্থনাসভায় স্বামী অভেদানন্দ বলেন, সমগ্র জগতে নিঃস্বার্থভাবে বেদান্ত-প্রচারকার্য্যের জন্য বহুসংখ্যক নরনারীর প্রয়োজন। ছাত্রগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বামী ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে একটী ক্লাস করেন। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী অভেদানন্দ ওয়েষ্ট কর্ণওয়ালের বেদান্তআশ্রমে বাস করিয়া তথায় ক্লাস করিবেন।

(পিট্‌স্‌বর্গের কার্য্য।)

স্বামী বোধানন্দ পিট্‌স্‌বর্গ বেদান্ত-সমিতিতে নিয়মিত ভাবে কার্য্য করিতেছেন। প্রতি সপ্তাহে তিনটী করিয়া ক্লাস ও প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে সাধারণের জন্য একটী করিয়া বক্তৃতা হয়। এখানে বেদান্তের উপর লোকের আগ্রহ দিন দিন বাড়িতেছে এবং কার্য্যের ভবিষ্যৎ খুব আশাজনক।

(বোষ্টন কার্য্য।)

স্বামী পরমানন্দ বোষ্টনে বেশ কার্য্য করিতেছেন—ও শীঘ্র তথায় একটী সমিতি স্থাপনের আশা করিতেছেন।

(অষ্ট্রেলিয়া।)

সিষ্টার অভাবমিয়া নাম্নী জনৈক মহিলা ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাস হইতে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি প্রভৃতি সহরে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন এবং অনেকগুলি বেদান্ত ক্লব প্রতিষ্ঠিত করিতেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

(সানফ্রান্সিস্কো।)

প্রতি রবিবার সাধারণের জন্য সানফ্রান্সিস্কোর নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মন্দিরের সভাগৃহে ৩টী করিয়া বক্তৃতা হইয়া থাকে। বেদান্ত-সমিতির নিয়মিত সভ্যগণকে প্রত্যহ প্রাতে ধ্যান শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সোম ও বৃহস্পতিবার গীতা ও বেদ ব্যাখ্যা এবং প্রশ্নোত্তরাদি হইয়া থাকে। সভ্যগণের যে কেহ ইচ্ছা করিলে মাসের মধ্যে তাঁহাদের সুবিধামত একদিন স্বামিগণের সহিত আলাহিদা সাক্ষাৎ করিয়া কোন বিষয়ে উপদেশ লইতে পারেন। অধিকারিবিশেষে প্রাণায়াম এবং সাধনের উচ্চাঙ্গসমূহও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আর সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন, তাঁহাদিগকে সহর হইতে বহুদূরবর্ত্তী নির্জ্জন শান্তিআশ্রমে যাইয়া উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে যোগশিক্ষা দেওয়া হয়। সভ্য ভিন্ন অন্য ব্যক্তিও স্বামিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন, কিন্তু তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিতে হয়। মাসে এক দিন করিয়া সর্ব্ব সাধারণের জন্য প্রশ্নোত্তর ক্লাস হইয়া থাকে।

(লস এঞ্জেলিস।)

স্বামী সচ্চিদানন্দ লস এঞ্জেলিস বেদান্ত-বিদ্যালয় নিম্নলিখিত ভাবে পরিচালনা করিতেছেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে উপাসনা এবং মাসে দুই রবিবার উপদেশ—এই দুইটীতে সর্ব্ব সাধারণ যোগ দিতে পারেন। মাসের মধ্যে অবশিষ্ট দুই রবিবার কেবল দীক্ষিত শিষ্যগণের জন্য উপাসনা ভজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত সাধনা বিষয়ে উপদেশ লইতে হইলে স্বামী সচ্চিদানন্দের সহিত বিশেষ বিশেষ দিনে স্বতন্ত্র সাক্ষাৎকার করিতে হয়।

ঘাঁটাল অঞ্চলে ভীষণ বন্যা।

নিবেদন।

সংবাদপত্র-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, এবার নানাস্থানে ভীষণ বন্যা হইয়া অনেক গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেক লোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকের শস্যাদি ভাসিয়া যাওয়ার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

সংবাদপত্রে এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া রামকৃষ্ণ-মিশন তাঁহাদের দুইজন ব্রহ্মচারীকে অবস্থা দেখিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা প্রথমে খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন গুপ্তের বাটী সাহানপুরে গমন করেন এবং উক্ত সমাজের অনেক সেবকের সাহায্যে উক্ত সমাজের অধিকারভুক্ত সাহানপুর, আনা ডিগ্রি, অযোধ্যা, কোটরা, রাধানাথ, লতিবপুর, রাজহাটী, ময়কপুর উবিদপুর প্রভৃতি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া ৪৬টী অসহায় ও উপায়হীন (অধিকাংশই গৃহহীন) পরিবারকে সাময়িক অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য ৩০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করেন। এই সকল স্থানে নিম্নশ্রেণী, যথা—ডোম, বাগ্‌দি, হাড়ি, জেলে, দুলে, মুসলমান প্রভৃতি জাতীয় লোক, যাহারা দৈনিক মজুরি করিয়া খাইত, তাহাদের বিশেষ কষ্ট, কারণ,তাহাদের কোনরূপ কর্ম্ম জুটিতেছে না। আর অন্ধ, আতুর, উপার্জ্জনাক্ষম, বৃদ্ধ বিধবা প্রভৃতির উপবাস ভিন্ন গতি নাই। অনেক স্থানেই শস্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঘাঁটালের অবস্থা অতি শোচনীয় জানিতে পারিয়া আমাদের ব্রহ্মচারীরা বিগত ২৭ শে সেপ্টেম্বর ঘাঁটালে গিয়াছেন। তাঁহাদের পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে এখানে মাঠে ঘাটে অনেক বেশী জল আছে। পথে আসিবার সময় গ্রামের অবস্থা অতি শোচনীয় দেখিলাম। অনেকেরই বাড়ীঘর দুয়ারের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। শস্য সমস্ত নষ্ট হইয়াছে। গতকল্য এখানে যে সভা হয়, তাহাতে সকলে এই অনুমান করেন যে, ঘাঁটাল মহকুমায় ১৮ লক্ষ টাকার শস্য নষ্ট হইয়াছে। এ অঞ্চলে বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন। অন্নকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, শীঘ্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রথমতঃ অন্নসাহায্য, তারপর একেবারে গৃহশূন্য লোকদের কোনমতে মাথা রাখিবার জন্য কুটীর নির্ম্মাণের উপায় করিতে হইবে। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, ইহাদিগকে যথার্থ সাহায্য করিতে হইলে দুচার টাকায় কিছুই হইবে না। সহস্র সহস্র টাকার প্রয়োজন। আরও আমাদের যাতায়াতে ও গ্রাম প্রবিদর্শনে অতিরিক্ত খরচ হইতেছে। কারণ, সর্ব্বত্রই জল, নৌকা ব্যতীত এক পাও চলিবার যো নাই। অনেক স্থানে দুক্রোশ পথ চলিতে ১০।১২ ঘণ্টা সময় লাগে। আমরা স্থানীয় সম্পন্ন লোকের নিকট কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাইতেছি বটে, কিন্তু তাহা অতি অল্প। অতএব সাধারণের অর্থসাহায্য ব্যতীত উপায় নাই। শীঘ্র ২০০৲ টাকা পাঠাইবেন।"

বিগত উড়িষ্যা ও মুর্শিদাবাদ দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্যের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে যে অর্থ আসে, কার্য্য শেষ হইলে তাহার কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। তাহা লইয়াই এবার কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারিগণের নিকট ২০০৲ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ বৃহৎস্থানব্যাপী অভাব, তাহাতে সাধারণের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য চলিতে পারে না। রামকৃষ্ণ মিশন প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদের দরিদ্র ও দুঃস্থ সেবাব্রতে সহৃদয় সাধারণের সহায়তা লাভ করিয়াছেন। এবারও সেই ভরসায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আশা করি, দেশবাসী দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানাদ্বয়ের যে কোন ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে এই সেবাব্রতে সহায়তা করিবেন এবং দরিদ্র 'নারায়ণ'গণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

স্বামীব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন।

মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া)।

অথবা—

কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন। ১২, ১৩, গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,

বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

মঠ, বেলুড়, (হাওড়া)। ১লা অক্টোবর, ০৯

ইতি।

বশম্বদ

সারদানন্দ

সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন।

রামকৃষ্ণ মিশন বন্যা-কার্য্যে প্রাপ্তিস্বীকার।

শ্রীযুত প্রসন্নকুমার শেঠ, লতিফপুর—	৩৲
" অধরচন্দ্র দাস মোহন্ত, পিপরাখোল—	২৲
" বিজয়গোপাল বসু, লতিবপুর—	৩৲
" পঞ্চানন বসু, ঐ —	২৲
" আঙ্গিরস আঢ্য, রাজহাটী—	১৲
" মিহিরলাল নস্কর, রঘুনাথপুর—	॥০
	১১॥০

বিগত ২১শে ভাদ্র, জন্মাষ্টমী দিবসে কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মহোৎসব উপলক্ষে পূজা, কীর্ত্তন, ভক্ত-সম্মিলন, প্রসাদ বিতরণাদি যথারীতি হইয়াছিল। এবার অন্যান্য বার অপেক্ষা ভক্ত সমাগম কিছু অধিক হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব লোকে দিন দিন বুঝিয়া তাহার নামে আকৃষ্ট হইতেছে।

শান্তি-সুধা।

['ব' লিখিত।]

অষ্টম অধ্যায়।

সাধক, প্রেম ও ব্যাকুলতা।

কামিনী কাঞ্চন হ'তে 'সাধু সাবধান,'
বিশালাক্ষী 'দ'র মত, পড়. যাবে প্রাণ।

ঝড়ে মাঝি হাল ধরে অতি সাবধানে,
ঝড় গেলে সুখে ব'সে সে তামাক টানে।
কামিনী কাঞ্চন ঝড় হ'লে অবসান
শান্তির হিল্লোলে মৃদু উথলিবে প্রাণ।

এক দৃষ্টে যদি দেখ প্রদীপশিখায়
চৌদিকে প্রদীপময় তবে দেখা যায়।
রাত দিন কর যদি ঈশ্বর চিন্তন
চারি দিকে তাঁর মূর্ত্তি হবে দরশন।
ঘরের ভিতরে বদ্ধ সিন্ধুকে যেমন,
কথায় মিলে না বস্তু, চাই সে সাধন।

পড়া চেয়ে শুনা ভাল, ধরা যায় সার,
গুরু-মুখবাণী তাই এত চমৎকার।
শুনা চেয়ে দেখা ভাল রাখিও স্মরণ,
গুরুপদে মতি রেখে করিও সাধন।

চিঠি খানি হাতে পেয়ে অতি যত্ন ক'রে,
খুলিয়া দেখিল লেখা কি আছে ভিতরে,
"একখানা বস্ত্র আর সন্দেশ দু'সের।
পাঠাইবে ইতি," প'ড়ে ফেলে দিল ফের।
তেমতি শাস্ত্রের মর্ম্ম করিয়া গ্রহণ
ফেলে দাও শাস্ত্র, আর নাহি প্রয়োজন।

কচি বাঁশ নোওয়াইতে লাগে কতক্ষণ ?
পাকা বাঁশ নোওয়াইলে ভাঙ্গিবে তখন।

কাঁচা মাটি দিয়ে হাঁড়ি কলসী গড়ায়,
পোড়া মাটি দিয়ে তাহা কে করে কোথায় ?

চিনি বালি বেছে চিনি পিপীলিকা নেয়,
সদসৎ বেছে সাধু সতে মন দেয়।

রত্নাকরে রত্ন এক ডুবে নাহি পায়,
ধৈর্য্য চাই যদি চাহ বস্তু সাধনায়।

শিষ্য—সাধনের অবস্থায় প্রভো, আপনার
কিরূপ দর্শন হ'ত, শুনিব এবার।

রামকৃষ্ণ—কভু নিত্য থেকে মন নামিত লীলায়,
নিশি দিন সীতারাম ভজিতাম তায় ;
করিতাম রাধাকৃষ্ণ-রূপ দরশন,
পুরুষ-প্রকৃতি-রূপী গৌরাঙ্গ কখন।
আবার ছাড়িয়া লীলা নিত্যেতে যখন
সজনে তুলসী এক বোধ সেইক্ষণ।
ঈশ্বরীয রূপ ভাল নাহি লাগে তবে
'মিলন বিচ্ছেদ আছে তাহে' মন ভাবে।
ছবি পট যত কিছু তুলিয়া তখন
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ করিনু চিন্তন।

সেই অবস্থায় হ'ত অদ্ভুত দর্শন,
প্রত্যক্ষ ভিতরে দেখি আত্মার রমণ।
সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত আর
বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাপদ্ম আর সহস্রার
একে একে সব পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়
দেখি ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে তারা সবে রয়।

ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ সুগভীর ধ্যানে
রূপ রস শব্দ স্পর্শে মন নাহি টানে।
বাহির বাড়ীতে পড়ে কপাট তখন
অন্দরে অন্তরে শুধু আনন্দ মিলন।

ধ্যান করি ব'সে, দেখি সম্মুখে আমার
টাকা, শাল, সন্দেশ ও মেয়ে দুটি কা'র।
জিজ্ঞাসিনু, "মন, এর কিবা চাস্ তুই ?"
মন বলে, "বিভু বিনা না চাহি কিছুই।"
কাচ মধ্য দিয়া যেন দেখি বস্তুগুলি।
স্ত্রীশরীরে রক্ত মাংস নাড়ি ভুড়ি খালি।

বট তলে ব'সে যবে করিতেছি ধ্যান,
দীর্ঘশ্মশ্রু মুসলমানে হেরি বিদ্যমান।
সান্‌কেতে নিয়ে ভাত এল মোর কাছে
নিজে খেয়ে দুটি মোরে দিয়ে যায় পাছে।
মা দেখালেন, 'এক বই দুই নাই আর,'
সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দ করিছে বিহার।

বিল্বমূলে ব'সে যবে করিতেছি ধ্যান,
পাপ পুরুষেরে দেখি কাছে বিদ্যমান।
আরক্ত নয়ন ঘোর দরশন ধ'রে,
টাকা, মান, শক্তি, মেয়ে দিতে চায় মোরে।
আকুল পরাণে করি মায়েরে আহ্বান,
দূরে গেল শেটা হেরি মাতা আগুয়ান।

আহা কিবা মার রূপ—ভুবন মোহন,
বঙ্কিম অপাঙ্গে যেন নড়িছে ভুবন।
আর কত কি যে তবে নয়নে নেহারি,
ভাবিলেই বাক্যরোধ, বলিতে না পারি।

শিষ্য— অনুরাগ, প্রেম, আর কেমন লক্ষণ ?
কি হইলে হয় প্রভো ঈশ্বর দর্শন ?

রামকৃষ্ণ—বিবেক, বৈরাগ্য আর দয়া জীব প্রতি,
সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, ভগবানে প্রীতি,
সত্যকথা, ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন,
জানিবে এ অষ্ট অনুরাগের লক্ষণ।

ব্যাকুল প্রার্থনা কর অনুরাগ তরে।
কৃপা করি বিভু উহা দিবেন তোমারে।
বিদিত ত্রিবিধ প্রেম, সমর্থা উত্তম,
সমঞ্জসা, সাধারণী, মধ্যম, অধম।
"হয় হোক্ দুঃখ মোর, তব সুখ চাই,"
ইহাই উত্তম প্রেম, সমর্থা তাহাই।
সমঞ্জসা 'উভয়েতে সুখে রব' চায়,
সাধারণী নিজ সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়।

প্রেমের লক্ষণ দুটী, প্রথম বিস্মৃতি,
জগৎ ভুলিয়া যায় হ'লে বিষ্ণু প্রীতি।
বন দেখে মনে হয় সেই বৃন্দাবন,
সলিল দেখিয়া হয় যমুনা স্মরণ।
দ্বিতীয় লক্ষণটীর এই পরিচয়—
নিজ দেহ প্রতি আর মমতা না রয়।

বিষয়ীর বিষয়েতে যেইরূপ টান,
সন্তানের তরে যথা জননীর প্রাণ,
সতীর যেমন টান পতির উপর,
তিনটান এক হ'লে মিলিবে ঈশ্বর।

বিড়ালের ছানা প'ড়ে 'মিউ মিউ' করে,
শুনে ছুটে মা আসিয়া মুখে মাই ধরে।
যে ভক্তের প্রাণে উঠে আকুল আহ্বান,
তার কাছে উপস্থিত হন ভগবান্।

ঈশ্বর-চুম্বক যারে যবে দেয় টান,
কামিনী কাঞ্চন ছেড়ে ধায় তার প্রাণ,
কাঁকড়াবিছেতে যদি দংশন করিবে,
ঘুটের ভাবরা দিবে, মন্ত্রে না সারিবে।
অনুরাগ চাই, শুধু নামে নাহি হয়
কামিনী কাঞ্চনে যদি মন প'ড়ে রয়।
বাবু আসিবেন আজ খান্‌সামার বাড়ী,
শুনিযাই পরিষ্কার করে তাড়াতাড়ি।
নিজ বাড়ী হ'তে বাবু পাঠায় সকল,
গালিচা তাকিয়া আর গুড়গুড়ি, নল।
ঈশ্বরের আগমন হইবার আগে,
অনুরাগ বৈরাগ্যাদি হৃদে উঠে জেগে।

পুড়িয়ে ব্যাঙের মুণ্ড যে কাজল হয়
চোখে দিলে চারি দিক্ দেখে সর্পময়।
অনুরাগাঞ্জন হেন সদা চোখে মেখে,
কৃষ্ণময় চারিদিক শ্রীরাধিকা দেখে।

শ্রীমতী এগিয়ে যান কৃষ্ণ দেহ গন্ধ পান,
যত কাছে যান, তত ভাব জেগে উঠে প্রাণে,
সাগরের কাছে যত তটিনী উছলে তত
দেখা যায় সে আবেগ জোয়ার ভাটার টানে।

স্বামী বিবেকানন্দের অসম্পূর্ণ রচনাবলী।

[সম্পাদকের নিবেদন—পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামীজির কাগজ পত্র গুছাইতে যাইয়া তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতার অসম্পূর্ণ অংশ পাওয়া গিয়াছে। তাহারই মধ্যগত "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের" এই অপ্রকাশিত অংশটুকু এবং "নীলাকাশে ভাসে মেঘ-কুল"শীর্ষক অসম্পূর্ণ কবিতাটি অদ্য আমরা পূজার উপহার স্বরূপ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলাম। 'পরিব্রাজকের' কিয়দংশ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বারান্তরে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—উ সং]।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

ক্রুশ্চানী ও ইসলামী ধর্ম্ম এবং তদুভয়ের মানব জাতির উন্নতির সাধকত্ব ও বাধকত্বের তুলনা।

ইয়ুরোপীরা যার এত বড়াই করে সে "সভ্যতার উন্নতির" (Progress of Civilisation) মানে কি? তার মানে এই যে—সিদ্ধি, অনুচিতকে উচিত করে। চুরি, মিথ্যা, অথবা Stanley দ্বারা সমভিব্যাহারী ক্ষুধার্ত্ত মুসলমান রক্ষীদের একগ্রাস অন্ন চুরি করার দরুণ চাবকান এবং ফাঁসী, এ সকলের ঔচিত্য বিধান করে, "দূর হও, আমি ওথায় আস্‌তে চাই" এ বিখ্যাত ইউরোপী নীতি—যাহার দৃষ্টান্ত, যেথায় ইয়ুরোপীয় আগমন, সেথায়ই আদিম জাতির বিনাশ—সেই নীতির ঔচিত্য বিধান করে। এই সভ্যতার অগ্রসরণ লণ্ডন নগরীতে ব্যভিচারকে, এবং পারিসে স্ত্রীপুত্রাদিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পলায়ন এবং আত্মহত্যা করাকে "সামান্য ধৃষ্টতা" জ্ঞান করে—ইত্যাদি।

এখন ইস্‌লামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী ক্ষিপ্র সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম তিন শতাব্দীর তুলনা কর। খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎসমক্ষে আপনাকে পরিচিত কর্ত্তেও সমর্থ হয় নি, এবং যখন Constantine এর তলওয়ার ইহাকে রাজ্যমধ্যে স্থান দিলে, সে দিন থেকে কোন্‌কালে ক্রুশ্চানী ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতা বিস্তারের কোন্ সাহায্য করেছে? যে ইয়ুরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সচলা, ক্রুশ্চানধর্ম্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল? কোন্ বৈজ্ঞানিক কোন্ কালে ক্রুশ্চানী ধর্ম্মের অনুমোদিত? ক্রুশ্চানী সঙ্ঘের সাহিত্য কি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিজ্ঞানের, শিল্প ও পণ্যকৌশলের অভাব পূরণ করতে পারে? আজ পর্য্যন্ত "চর্চ্চ" প্রোফেন (ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ালম্বনে লিখিত) সাহিত্য

প্রচারে অনুমতি দেন না। আজ যে মনুষ্যের বিদ্যা এবং বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে তার কি অকপট কৃশ্চান হওয়া সম্ভব? New Testament এ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নাই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই, যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরাণ বা হদিশের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়। ইয়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান মনীষিগণ ইউরোপের ভলটেয়ার ডারউইন বুকনার ফ্লামারিয়ণ ভিক্টর হুগো-কুল বর্ত্তমানকালে কৃশ্চানী দ্বারা কটূ ভাষিত এবং অভিশপ্ত; অপর দিকে এই সকল পুরুষকে ইস্‌লাম বিবেচনা করেন যে, এই সকল পুরুষ আস্তিক, কেবল ইহাদের পয়গম্বর বিশ্বাসের অভাব। ধর্ম্ম সকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়ত্ব বিশেষরূপে পরীক্ষিত হউক, দেখা যাবে, ইস্‌লাম যেথায় গিয়াছে, সেথায়ই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে সব জাত সেথায় বর্ত্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্ত্তমান।

খৃষ্ট ধর্ম্ম কোথায় এমন কায দেখাতে পারে? স্পেনের আরাব অষ্ট্রেলীয়ার এবং আমেরিকার আদিমনিবাসীরা কোথায়? কৃশ্চানরা ইয়ুরোপী য়াহুদীদের কি দশা এখন করছে? এক দান সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী ছাড়া ইয়ুরোপের আর কোনও কার্য্য পদ্ধতি, গস্‌পেলের অনুমোদিত নয়। গস্‌পেলের বিরুদ্ধে সমুত্থিত, ইয়ুরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই খ্রীষ্টধর্ম্মের বিপক্ষে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইয়ুরোপে কৃশ্চানীর শক্তি থাকৃত, তাহলে পাস্তের এবং ককের ন্যায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত; এবং ডারউইনকল্পদের শূলে দিত। বর্ত্তমান ইয়ুরোপে কৃশ্চানী আর সভ্যতা আলাদা জিনিষ। সভ্যতা, এখন তাহার প্রাচীন শত্রু, কৃশ্চানীর বিনাশের জন্য, পাদ্রিকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয় সকল কেড়ে নিতে কটিবদ্ধ হয়েছে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকৃত, তাহলে কৃশ্চানী ইহার বর্ত্তমান ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হত না এবং সমূলে উৎপাটিত হত, কারণ, নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই কৃশ্চানি ধর্ম্মের প্রকাশ্য শত্রু! ইহার সহিত ইস্‌লামের তুলনা কর। মুসলমান দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইস্‌লাম ধর্ম্মের উপরে সংস্থাপিত এবং ইস্‌লামের ধর্ম্ম শিক্ষকরা, সমস্ত রাজকর্ম্মচারীদের বহু পূজিত এবং অন্য ধর্ম্মের শিক্ষকরাও সম্মানিত।

পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্মী সরস্বতীর এখন কৃপা একত্রে। শুধু ভোগের

জিনিষ সংযোগ হলেই এরা ক্ষান্ত নয়, কিন্তু সকল কাজেই একটু সুচ্ছবি চায়। খাওয়া দাওয়া, ঘর দোর, সমস্ত একটু সুচ্ছবি দেখ্‌তে চায়। আমাদের দেশেও ঐ ভাব একদিন ছিল, যখন ধন ছিল। এখন একে দারিদ্র্য, তার উপর আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হয়ে যাচ্ছি। জাতীয় যে গুণগুলি ছিল তা যাচ্ছে—পাশ্চাত্য দেশেরও কিছুই পাচ্ছিনি। চলা বসা কথাবার্ত্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারও সামর্থ্য নাই। পূজা পাঠ প্রভৃতি যা কিছু ছিল তা ত তোমরা বাণের জলে দিচ্ছ,—অথচ কালের উপযোগী একটা নূতন রকমের কিছু এখনও হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। আমরা এই মধ্যরেখার দুর্দ্দশায় এখন পড়ে। ভবিষ্যৎ বাঙ্গালদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায়নি। বিশেষ দুর্দ্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোরে আলপোনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র কর্‌ত। বাহার করে কলাপাতা কাট্‌ত, খাওয়া দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত, সে সব গেছে চুলোয় বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র !! নতুন অবশ্য শিখ্‌তে হবে, কর্ত্তে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরাণগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি? নতুন ত শিখেছ কচুপোড়া খালি বাক্যিচচ্চড়ি !! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরোণ কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসগে। কল্‌কেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্য্যন্ত গড়্‌তে পারে না। দোর কি আগড় বোঝ্‌বার যো নাই !!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতি যন্ত্র কেনা !! এই অবস্থা সর্ব্ববিষয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের যা ছিল তা ত সব যাচ্ছে, অথচ বিদেশী শেখ্‌বার মধ্যে বাক্যি যন্ত্রণামাত্র !! খালি পুঁথি পড়্‌ছ, আর পুঁথি পড়্‌ছ !! আমাদের বাঙ্গালি আর বিলেতে আইরিস এ দুটো এক ধাতের জাত্। খালি বকাবকি কর্‌ছে। বক্তৃতায় এ দুজাত বেজায় পটু। কাজের—এক পয়সাও নয়—বাড়ার ভাগ দিন রাত পরস্পরে খেয়োখেয়ি করে মর্‌ছে !!!

পরিষ্কার সাজান গোজান এ দেশের এমন অভ্যাস যে অতি গরীব পর্য্যন্তরও ও বিষয়ে নজর। আর নজর কাজেই হ'তে হয়—পরিষ্কার কাপড় চোপড় না হ'লে তাকে যে কেউ কাজ কর্ম্মই দেবে না। চাকর চাকরাণী রাঁধুনি সব ধপ্‌ধপে কাপড়—দিবারাত্র। ঘরদোর ঝেড়েঝুড়ে, ঘসে মেজে, ফিট্‌ফাট্। এদের প্রধান সায়েস্তা এই যে, যেখানে সেখানে যা তা কখনও ফেল্‌বে না। রান্নাঘর ঝক্‌ঝকে—কুট্‌নো কুট্‌নো যা ফেল্‌বার,—

তা একটা পাত্রে ফেল্‌ছে, তার পর সেখান হতে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে। উঠানেও ফেলে না, রাস্তায়ও ফেলে না।

*যাদের ধন আছে তাদের বাড়ী ঘর ত দেখ্‌বার জিনিষ—দিন রাত সব ঝক্‌ঝক্!—তার উপর নানাপ্রকার দেশবিদেশের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেছে। আমাদের এখন ওদের মত শিল্পসংগ্রহে কাজ নাই; কিন্তু যেগুলো উৎসন্ন যাচ্ছে, সেগুলোকে একটু যত্ন কর্ত্তে হবে না—না? ওদের মত চিত্র বা ভাস্কর্য্য বিদ্যা হতে আমাদের এখনও ঢের দেরী। ওদুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুর দেবতা সব দেখ না, জগন্নাথেই মালুম!! বড্ড জোব ওদের (ইয়ুরোপীদের) নকল করে একটা আধটা রবি বর্ম্মা দাঁড়ায়!! তাদেব চেয়ে দিশি চাল চিত্রি করা পটো ভাল—তাদের কাম্মে তবু রঙ্গ ঝক্‌মক্ আছে। ওসব রবিবর্ম্মা ফর্ম্মা চিত্রি দেখ্‌লে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!! বরং জয়পুবে সোণালি চিত্রি, আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল। ইয়ুরোপী ভাস্কর্য্য চিত্র প্রভৃতির কথা বারান্তরে উদাহরণ সহিত বল্‌বার রইল। সে এক প্রকাণ্ড বিষয়। এখন পাশ্চাত্য রান্নাবান্নার কথা শোন।

নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল।

নীলাকাশে ভাসে মেঘকুল
শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বরণ
তাহে তারতম্য তারল্যের
পীত ভানু মাঙ্গিছে বিদায়
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।

বহে বায়ু আপনার মনে
প্রভঞ্জন করিছে গঠন
ক্ষণে গড়ে ভাঙ্গে আর ক্ষণে
কত মত সত্য অসম্ভব
জড় জীব বর্ণ রূপ ভাব।

ঐ আসে তুলারাশি সম
পরক্ষণে হের মহানাগ
দেখ সিংহ বিকাশে বিক্রম
আর দেখ প্রণয়ী যুগল
শেষে সব আকাশে মিলায়।

নীচে সিন্ধু গায় নানা তান
মহীয়ান্ সে নহে ভারত!
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার
রূপ রাগ হয়ে জলময়
গায় হেথা না করে গর্জ্জন।

ধর্ম্মবিজ্ঞান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রকৃতি ও পুরুষ।

আমরা যে তত্ত্বগুলি লইয়া বিচার করিতেছিলাম, এক্ষণে সেইগুলির প্রত্যেকটীকে লইয়া বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সাংখ্য মতাবলম্বিগণ উহাকে অব্যক্ত বা অবিভক্ত বলিয়াছেন এবং উহার অন্তর্গত উপাদান সকলের সাম্যাবস্থারূপে উহার লক্ষণ করিয়াছেন। আর ইহাতে স্বভাবতঃই ইহা পড়িয়া যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা সামঞ্জস্যে কোনরূপ গতি থাকিতে পারে না। আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি, সমুদয়ই জড় ভূত ও গতির সমবায়মাত্র। এই প্রপঞ্চ বিকাশের পূর্ব্বে আদিম অবস্থায় যখন কোন রূপ গতি ছিল না, যখন সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা ছিল, তখন এই প্রকৃতি অবিনাশী ছিল, কারণ, সীমাবদ্ধ হইলেই তাহার বিশ্লেষণ বা বিয়োজন হইতে পারে। আবার সাংখ্যমতে পরমাণু জগতের আদিম অবস্থা নহে। এই জগৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে উৎপন্ন হয়

নাই, উহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা হইতে পারে। আদি ভূতই পরমাণু-রূপে পরিণত হয়, তাহা আবার তদপেক্ষা স্থূলতর পদার্থে পরিণত হয়, আর আজকালকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যতদূর চলিয়াছে, তাহাতে উহারও গতি ঐ দিকে বলিয়াই বোধ হয়। উদাহরণস্বরূপ—ইথার সম্বন্ধীয় আধুনিক মতের কথা ধরুন। যদি বলেন, ইথারও পরমাণুপুঞ্জের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহা হইলে তাহাতে কিছুতেই সমস্যার মীমাংসা হইবে না। আরও স্পষ্ট করিয়া এই বিষয় বুঝান যাইতেছে। বায়ু অবশ্য পরমাণুপুঞ্জে গঠিত। আর আমরা জানি, ইথার সর্ব্বত্র বিদ্যমান উহা সকলের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান ও সর্ব্বব্যাপী। বায়ু এবং অন্যান্য সকল বস্তুর পরমাণুও যেন ঐ ইথারেই ভাসিতেছে। যদি আবার ইথার পরমাণুসমূহের সংযোগে গঠিত হয়, তাহা হইলে দুইটী ইথারের পরমাণুর মধ্যেও কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিবে। ঐ অবকাশ কিসের দ্বারা পূর্ণ? আর যাহা কিছু ঐ অবকাশ ব্যাপিয়া থাকিবে, তাহার পরমাণুগণের মধ্যেও ঐরূপ অবকাশ থাকিবে। যদি বলেন, ঐ অবকাশের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতর ইথার বর্ত্তমান, তাহা হইলে সেই ইথার পরমাণুর মধ্যেও আবার অবকাশ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ইথার কল্পনা করিতে করিতে শেষ সিদ্ধান্ত কিছুই পাওয়া যাইবে না—ইহাকে অনবস্থা দোষ বলে। অতএব পরমাণুবাদ চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপী উহা এক সর্ব্বব্যাপী জড়রাশিস্বরূপ, তাহাতে—এই জগতে যাহা কিছু আছে—সমুদয়ের কারণ রহিয়াছে। কারণ বলিতে কি বুঝায়? কারণ বলিতে ব্যক্ত অবস্থার সূক্ষ্মতর অবস্থাকে বুঝায়। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই অব্যক্ত অবস্থা। বিনাশ বলিতে কি বুঝায়? বিনাশ অর্থে কারণে লয়. কারণাবস্থা প্রাপ্তি, যে সকল উপাদান হইতে কোন বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহারা তাহাদের আদিম অবস্থায় চলিয়া যায়। বিনাশ শব্দের এই অর্থ ব্যতীত সম্পূর্ণ অভাব অর্থ যে অসম্ভব, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কপিল অনেক যুগ পূর্ব্বে বিনাশের যে কারণ-লয় অর্থ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক উহাতে যে তাহাই বুঝায়, তাহা আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানানুসারে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 'সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন,' ব্যতীত বিনাশের আর কোন অর্থ নাই। আপনারা জানেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কিরূপে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ভূত অবিনশ্বর। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা রসায়ন বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই

জানেন যে, যদি একটী কাচনলের ভিতর একটী বাতি ও কাষ্টকির পেন্‌সিল রাখা যায় এবং বাতিটী সমুদয় পুড়াইয়া ফেলা হয়, তবে ঐ কাষ্টকির পেন্সিলটী বাহির করিয়া ওজন করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পেন্সিলটীর ওজন এক্ষণে উহার পূর্ব্ব ওজনের সহিত বাতিটীর ওজন যোগ করিলে যাহা হয়, ঠিক তত হইয়াছে। ঐ বাতিটীই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া কাষ্টকিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমাদের আজকালকার জ্ঞানোন্নতির অবস্থায় যদি কেহ বলে যে, কোন জিনিষ সম্পূর্ণ অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সে নিজেই কেবল উপহাসাস্পদ হইবে। কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তিই একপ কথা বলিবে, আর আশ্চর্য্যের বিষয়—সেই প্রাচীন দার্শনিকগণের উপদেশ আধুনিক জ্ঞানের সহিত মিলিতেছে। প্রাচীনেরা মনকে ভিত্তিস্বরূপ লইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন; তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মানসিক ভাগটীর বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আর আধুনিক বিজ্ঞান উহার ভৌতিক ভাগ বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। উভয়প্রকার বিশ্লেষণই একই সত্যে উপনীত হইয়াছে।

আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, এই জগতে প্রকৃতির প্রথম বিকাশকে সাংখ্যবাদিগণ মহৎ বলিয়া থাকেন। আমরা উহাকে সমষ্টি বুদ্ধি বলিতে পারি—উহার ঠিক শব্দার্থ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। প্রকৃতির প্রথম বিকাশ এই বুদ্ধি। উহাকে অহংজ্ঞান বলা যায় না, বলিলে ভুল হইবে। অহংজ্ঞান এই বুদ্ধিতত্ত্বের অংশবিশেষ মাত্র—বুদ্ধিতত্ত্ব কিন্তু সার্ব্বজনীন তত্ত্ব। অহং-জ্ঞান, অব্যক্ত জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা—এই সকলগুলিই উহার অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপ—প্রকৃতিতে কতকগুলি পরিবর্ত্তন আপনাদের চক্ষের সমক্ষে ঘটিতেছে, আপনারা সেগুলি দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন কিন্তু আবার কতক-গুলি পরিবর্ত্তন আছে, সে গুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন মানবীয় বোধশক্তিরই উহারা আয়ত্ত নহে। এই উভয় প্রকার পরিবর্ত্তন একই কারণ হইতে হইতেছে, সেই একই মহৎ ঐ উভয় প্রকার পরিবর্ত্তনই সাধন করিতেছে। আবার কতকগুলি পরিবর্ত্তন আছে, যেগুলি আমাদের মন বা বিচার শক্তির অতীত। এই সকল পরিবর্ত্তনগুলিই এই মহতের মধ্যে। ব্যষ্টি লইয়া যখন আমি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন এ কথা আপনারা আরো ভাল করিয়া বুঝিবেন। এই মহৎ হইতে সমষ্টি অহংতত্ত্বের উৎপত্তি আর এই উভয়টীই

ভৌতিক। ভূত ও মনে পরিমাণগত ভেদ ব্যতীত অন্য কোনরূপ ভেদ নাই একই বস্তুর সূক্ষ্ম ও স্থূলাবস্থা, একটী আর একটীতে পরিণত হইতেছে। ইহার সহিত আধুনিক শারীরবিধানশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের ঐক্য আছে আর মস্তিষ্ক হইতে পৃথক্ একটী মন আছে, ইহা এবং এতদ্বিধ সমুদয় অসম্ভব বিষয়ে বিশ্বাস করিলে যেরূপ বিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত বিরোধ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহা হইতে এই বিশ্বাসে ঐ বিরোধ হইতে রক্ষা পাইবেন। মহৎ নামক এই পদার্থ অহংতত্ত্ব নামক, জড় পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থাবিশেষে পরিণত হয় এবং সেই অহংতত্ত্বের আবার দুই প্রকার পরিণাম হয়। তন্মধ্যে এক প্রকার পরিণাম— ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় বলিতে এই পরিদৃশ্যমান চক্ষুকর্ণাদি বুঝাইতেছে না, ইন্দ্রিয় এইগুলি হইতে সূক্ষ্মতর— যাহাকে আপনারা মস্তিষ্ককেন্দ্র ও স্নায়ুকেন্দ্র বলেন। এই অহংতত্ত্ব পরিণাম প্রাপ্ত হয় আর এই অহংতত্ত্বরূপ উপাদান হইতে এই কেন্দ্র ও স্নায়ু সকল উৎপন্ন হয়। অহংতত্ত্বরূপ সেই একই উপাদান হইতে আর এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থের উৎপত্তি হয়—তন্মাত্রা অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভৌতিক পরমাণু। যাহা আপনাদের নাসিকার সংস্পর্শে আসিয়া আপনাদিগকে ঘ্রাণে সমর্থ করে, তাহাই তন্মাত্রার একটী দৃষ্টান্ত। আপনারা এই সূক্ষ্ম তন্মাত্রাগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না; আপনারা কেবল তাহারা যে আছে, ইহা অবগত হইতে পারেন। অহংতত্ত্ব হইতে এই তন্মাত্রাগুলির উৎপত্তি হয়, আর ঐ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম ভূত হইতে স্থূল ভূতের অর্থাৎ বায়ু, জল, পৃথিবী এবং অন্যান্য যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা অনুভব করি, তাহাদের উৎপত্তি হয়। আমি এই বিষয়টী আপনাদের মনে দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। এটী ধারণা করা বড় কঠিন, কারণ, পাশ্চাত্য দেশে মন ও ভূত সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। মস্তিষ্ক হইতে ঐ সকল সংস্কার দূর করা বড়ই কঠিন। বাল্যকালে পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত হওয়ায় আমাকেও এই তত্ত্ব বুঝিতে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

এই সমুদয়গুলিই জগতের অন্তর্গত। ভাবিয়া দেখুন, প্রথমাবস্থায় এক, সর্ব্বব্যাপী, অখণ্ড, অবিভক্ত জড়রাশি রহিয়াছে। যেমন দুগ্ধ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া দধি হয়, তদ্রূপ উহা মহৎ নামক অন্য এক পদার্থে পরিণত হয়—ঐ মহৎ হইয়া এক অবস্থায়* বুদ্ধিতত্ত্বরূপে অবস্থান করে, অন্য অবস্থায় উহা অহংতত্ত্ব

* প্রকৃতিপক্ষে বুদ্ধিতত্ত্ব মহত্তের অবস্থাবিশেষ নহে, যাহাকে মহৎ বলা যায়,তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব।

রূপে পরিণত হয়। উহা সেই একই বস্তু, কেবল অপেক্ষাকৃত স্থূলতর আকারে পরিণত হইয়া অহংতত্ত্ব নাম ধারণ করিয়াছে। এইরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন স্তরে স্তরে বিরচিত। প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি, উহা সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বে বা মহত্তে পরিণত হয়, তাহা আবার সর্ব্বব্যাপী অহংতত্ত্ব বা অহংকারে এবং তাহা পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতে† পরিণত হয়। সেই ভূত, সমষ্টি ইন্দ্রিয় বা কেন্দ্রসমূহে এবং সমষ্টি সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহে পরিণত হয়। পরে এইগুলি মিলিত হইয়া এই স্থূল জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি। সাংখ্যমতে ইহাই সৃষ্টির ক্রম আর বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাহা আছে, তাহা সমষ্টি বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও অবশ্য থাকিবে।

ব্যষ্টিস্বরূপ একটী মানুষের কথা ধরুন। প্রথমতঃ, তাঁহার ভিতর সেই সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির অংশ রহিয়াছে। সেই জড়স্বরূপ প্রকৃতি তাঁহার ভিতর মহৎরূপে পরিণত হইয়াছে—সেই মহৎ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের এক অংশ তাঁহার ভিতর রহিয়াছে। আর সেই সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের ক্ষুদ্র অংশটী তাঁহার ভিতর অহংতত্ত্বে বা অহংকারে পরিণত হইয়াছে—উহা সেই সর্ব্বব্যাপী অহংতত্ত্বেরই ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই অহঙ্কার আবার ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রায় পরিণত হইযাছে। তন্মাত্রাগুলি আবার পরস্পর মিলিত করিয়া তিনি নিজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—দেহ—বিরচন করিযাছেন। এই বিষয়টী আমি সুস্পষ্টরূপে আপনাদিগকে বুঝাইতে চাই, কারণ, ইহা বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে প্রথম সোপানস্বরূপ, আর ইহা আপনাদের জানা অত্যাবশ্যক, কারণ, ইহাই সমগ্র জগতের বিভিন্নপ্রকার দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। জগতে এমন কোন দর্শনশাস্ত্র নাই, যাহা এই সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নিকট ঋণী নহে। পিথাগোরাস ভারতে আসিয়া এই দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গ্রীকদের নিকট ইহার কতকগুলি তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিলেন।

---

† পূর্ব্বে সাংখ্যমতানুযায়ী যে সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্থানে স্বামীজির কিঞ্চিৎ বিরোধ আপাততঃ বোধ হইতে পারে। পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে, অহংতত্ত্ব হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। এখানে আবার উহাদের মধ্যে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতের' কথা বলিতেছেন। এটী কি কোন নূতন তত্ত্ব? আমার বোধ হয়, অহংতত্ত্ব একটী অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া তাহা হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার উৎপত্তি সহজে বুঝাইবার জন্য স্বামীজি এইরূপ 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতের' কল্পনা করিয়াছেন।

পরে উহা আলেক্জান্দ্রিয়ার দার্শনিক সম্প্রদায়ের * ভিত্তিস্বরূপ হয় এবং আরও পরবর্ত্তীকালে উহা নষ্টিক দর্শনেরা† (Gnostic Philosophy) ভিত্তি হয়। এইরূপে উহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একভাগ ইউরোপ ও আলেক্জান্দ্রিয়ায় গেল, ও অপর ভাগটী ভারতেই রহিল এবং সর্ব্বপ্রকার হিন্দুদর্শনের ভিত্তিস্বরূপ হইল, কারণ, ব্যাসের বেদান্ত দর্শন ইহারই পরিণতিস্বরূপ। এই কাপিল দর্শনই জগতের মধ্যে যুক্তি-বিচার দ্বারা জগত্তত্ত্বব্যাখ্যার সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। জগতের সকল দার্শনিকেরই উচিত—তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা। আমি আপনাদের মনে এইটী বিশেষ করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই যে, দর্শন শাস্ত্রের জনক বলিয়া আমরা তাঁহার উপদেশ শুনিতে বাধ্য এবং তিনি যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। এমন কি, বেদেও এই অদ্ভুত ব্যক্তির, এই সর্ব্বপ্রাচীন দার্শনিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অনুভূতি সমুদয় কি অপূর্ব্ব! যদি যোগিগণের অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ শক্তির কোন প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক হয়, তবে বলিতে হয়, এইরূপ ব্যক্তিগণই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা কিরূপে এই সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন? তাঁহাদের ত আর অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ছিল না। তাঁহাদের অনুভবশক্তি কি সূক্ষ্ম ছিল, তাঁহাদের বিশ্লেষণ কেমন নির্দ্দোষ ও কি অদ্ভুত!

যাহা হউক, এক্ষণে পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাউক। আমরা ক্ষুদ্র

---

* Alexandrian School—নিও প্লেটনিক সম্প্রদায়কেই এই আলেক্জান্দ্রিয় দার্শনিক সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কিছু পরেই ইহার অভ্যুদয় হয় এবং অনেক দিন ধরিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্লোটিনোসের মতে যুক্তি-বিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অসম্ভব, উহা সমাধি লভ্য। তিনি স্বয়ং জীবনে ৩ বার সমাধি লাভ করিয়াছিলেন।

† Gnostic (নষ্টিক)—খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথমাবস্থা হইতেই এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ইহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম জানেন বলিয়া দাবী করিতেন। এই মত প্রাচ্য ও গ্রীকদর্শন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের মিশ্রণস্বরূপ। ইহাদের প্রধান মত এই যে, মনবুদ্ধির অগোচর পরমেশ্বর হইতে জগৎ ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে। এক একটি বিকাশকে ইয়ন (Aeon) বলে। আরও ইহাদের মতে ঈশ্বর 'কিছু না' হইতে জগৎ সৃজন করেন নাই। 'হাইল' (Hyle) নামধেয় আদিভূত হইতে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন।

ব্রহ্মাণ্ড মানবের তত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছি, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মে নির্ম্মিত, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ। প্রথমে অবিভক্ত বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি। তার পর উহা বৈষম্য প্রাপ্ত হইলে কার্য্য আরম্ভ হয়, আর এই কার্য্যের ফলে যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহা মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি। এক্ষণে আপনারা দেখিতেছেন, মানুষের মধ্যে যে এই বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তের ক্ষুদ্র অংশস্বরূপ। উহা হইতে অহং জ্ঞানের উদ্ভব, তাহা হইতে অনুভবাত্মক ও গত্যাত্মক স্নায়ুসকল, এবং সূক্ষ্ম পরমাণু বা তন্মাত্রা। ঐ তন্মাত্রা হইতেই স্থূল দেহ বিরচিত হয়। আমি এখানে বলিতে চাই, শোপেনহাওয়ারের দর্শন ও বেদান্তে একটী প্রভেদ আছে। শোপেনহাওয়ার বলেন, বাসনা বা ইচ্ছা সমুদায়ের কারণ। আমাদের এই ব্যক্ত ভাবাপন্ন হইবার কারণ, প্রাণ ধারণের ইচ্ছা, কিন্তু অদ্বৈত-বাদীরা ইহা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, মহত্তত্ত্বই ইহার কারণ। এমন একটীও ইচ্ছা হইতে পারে না, যাহা প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নহে। ইচ্ছার অতীত অনেক বস্তু রহিয়াছে। উহা অহং হইতে গঠিত একটী জিনিষ, অহং আবার তদপেক্ষা উচ্চতর বস্তু অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন এবং তাহা আবার অব্যক্ত প্রকৃতির বিকার স্বরূপ।

মানুষের মধ্যে এই যে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ উত্তম-রূপে বুঝা বিশেষ প্রযোজন। এই মহত্তত্ত্বই আমরা যাহাকে অহং বলি, তাহাতে পরিণত হয় আর এই মহত্তত্ত্বই সেই সমুদয় পরিবর্ত্তনের কারণ, যাহাদের ফলে এই শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। মহত্তত্ত্বের ভিতর জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানের অবস্থা ও জ্ঞানাতীত অবস্থা, এই সমুদয় গুলিই রহিয়াছে। এই তিনটী অবস্থা কি? জ্ঞানের নিম্নভূমি আমরা পশুগণে দেখিয়া থাকি এবং উহাকে সহজাত জ্ঞান (Instinct) বলিয়া থাকি। ইহা প্রায় অভ্রান্ত, তবে উহা দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সীমা বড় অল্প। সহজাত জ্ঞানে প্রায় কথনই ভুল হয় না। একটী পশু ঐ সহজাত জ্ঞান প্রভাবে কোন শস্যটী আহার্য্য, কোন্‌টী বা বিষাক্ত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু ঐ সহজাত জ্ঞান দুএকটী সামান্য বিষয়ে সীমাবদ্ধমাত্র, উহা যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। তার পর আমাদের সাধারণ জ্ঞান—উহা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থা। এই আমা-দের সাধারণ জ্ঞান ভ্রান্তিময়, উহা পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়, কিন্তু উহার গতি এরূপ মৃদু হইলেও উহার পরিসর অনেকদূর ইহাকেই আপনারা যুক্তি বা বিচারশক্তি বলিয়া

থাকেন। সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা উহার প্রসার অধিক দূর বটে, কিন্তু সহজাতজ্ঞান অপেক্ষা যুক্তিবিচারে অধিক ভ্রমের আশঙ্কা। ইহা অপেক্ষা মনের আর এক উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে, জ্ঞানাতীত অবস্থা—ঐ অবস্থায় কেবল যোগীদেরই অধিকার—অর্থাৎ যাঁহারা চেষ্টা করিয়া ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। উহা সহজাত জ্ঞানের ন্যায় অভ্রান্ত, আবার যুক্তি বিচার হইতেও উহার অধিক প্রসার। উহা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। আমাদের ইহা স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, যেমন মানবের ভিতর মহৎই জ্ঞানের নিম্নভূমি,সাধারণ জ্ঞানভূমি ও জ্ঞানাতীত ভূমি,অর্থাৎ জ্ঞান যে তিন অবস্থায় অবস্থান করে, এই সমুদয়ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও এই সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহৎ—এইরূপ সহজাত জ্ঞান, যুক্তিবিচারাজনিত জ্ঞানও বিচারাতীত জ্ঞান, এই ত্রিবিধ ভাবে অবস্থিত।

এক্ষণে একটী সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে, আর এই প্রশ্ন সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে এখানে অপূর্ণতা কেন? আমরা যতটুকু দেখিতেছি, ততটুকুকেই ব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ বলি—আর উহা আমাদের সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার বাহিরে আমরা আর কিছুই দেখিতে পাই না। এই প্রশ্নটাই যে একটী অসম্ভব প্রশ্ন। যদি আমি একটী বৃহৎ বস্তুরাশি হইতে ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ গ্রহণ করি ও উহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, স্বভাবতঃই উহা অসম্পূর্ণ বোধ হইবে। এই জগৎ অসম্পূর্ণ বোধ হয়, কারণ, আমরাই উহাকে অসম্পূর্ণ করিয়াছি। কিরূপে আমরা ইহা করিলাম? প্রথমে বুঝিয়া দেখা যাক্—যুক্তিবিচার কাহাকে বলে, জ্ঞান কাহাকে বলে। জ্ঞান অর্থে সদৃশ বস্তুর সহিত মিলন। আপনারা রাস্তায় গিয়া একটী মানুষকে দেখিলেন, দেখিয়া জানিলেন—তিনি মানুষ। আপনারা অনেক মানুষ দেখিয়াছেন, প্রত্যেকেই আপনাদের মনে একটা সংস্কার উৎপাদন করিয়াছে। একটী নূতন মানুষকে দেখিবামাত্র আপনারা উহাকে আপনাদের সংস্কারের ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া দেখিলেন—তথায় মানুষের অনেক ছবি রহিয়াছে। তখন এই নূতন ছবিটী অবশিষ্টগুলির সহিত উহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট খোপে রাখিলেন—তখন আপনারা তৃপ্ত হইলেন। কোন নূতন সংস্কার আসিলে যদি আপনাদের মনে উহার সদৃশ সংস্কার সকল পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে, তবেই আপনারা তৃপ্ত হন, আর এই মিলন বা সহযোগকেই জ্ঞান বলে। অতএব জ্ঞান অর্থে পূর্ব্ব হইতেই আমাদের যে অনুভূতি-সমষ্টি রহিয়াছে,

তাহাদের সহিত আর একটী অনুভূতিকে এক খোপে পোরা। আর আপনাদের পূর্ব্ব হইতেই একটী জ্ঞানভাণ্ডার না থাকিলে যে নূতন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, ইহাই তাহার অন্যতম প্রবল প্রমাণ। যদি আপনাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা কিছু না থাকে, অথবা কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকের যেমন মত মন যদি 'অনুৎকীর্ণ ফলক' (Tabula Rasa) স্বরূপ হয়, তবে উহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব; কারণ, জ্ঞান অর্থেই পূর্ব্ব হইতে যে সংস্কারসমষ্টি অবস্থিত, তাহার সহিত তুলনা করিয়া নূতনের গ্রহণমাত্র। জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকা চাই, যাহার সহিত এই নূতন সংস্কারটীকে মিলাইবেন। মনে করুন, একটী শিশু এই জগতে জন্মগ্রহণ করিল, যাহার এই জ্ঞানভাণ্ডার নাই; তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোনপ্রকার জ্ঞান লাভ করা একেবারে অসম্ভব। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঐ শিশুর অবশ্যই ঐরূপ একটী জ্ঞানভাণ্ডার ছিল, আর এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞান লাভ হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত এড়াইবার কোন মতে যো নাই। ইহা গণিতের ন্যায় ধ্রুব সিদ্ধান্ত। ইহা অনেকটা স্পেন্সার ও অন্যান্য কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তের সদৃশ। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন যে, অতীত জ্ঞানের ভাণ্ডার না থাকিলে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ অসম্ভব, অতএব শিশু পূর্ব্বজ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা এই সত্য বুঝিয়াছেন যে, কারণ কার্য্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, উহা সূক্ষ্মাকারে আসিয়া পরে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। তবে এই দার্শনিকেরা বলেন যে, শিশু যে সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা তাহার নিজের অতীত অবস্থার জ্ঞান হইতে লব্ধ নহে, উহা তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত সংস্কার; বংশানুক্রমিক সঞ্চরণের দ্বারা উহা সেই শিশুর ভিতর আসিয়াছে। অতি শীঘ্রই ইঁহারা বুঝিবেন যে, এই মতবাদ প্রমাণসহ নহে, আর ইতিমধ্যেই অনেকে এই বংশানুক্রমিক সঞ্চরণ মতের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই মত অসত্য নহে, কিন্তু অসম্পূর্ণ। উহা কেবল মানবের জড়ের ভাগটাকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। যদি বলেন—এই মতানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়? তাহাতে ইঁহারা বলিয়া থাকেন, অনেক কারণ মিলিয়া একটী কার্য্য হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদের মধ্যে একটী। অপরদিকে হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, আমরা নিজেরাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার গঠন কর্ত্তা; কারণ, আমরা অতীত অবস্থায় যেরূপ ছিলাম, বর্ত্তমানেও

তাহাই হইবে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমরা অতীত কালে যেরূপ ছিলাম, এখানে এখনও ঠিক সেই অবস্থাপন্ন হইয়া থাকি।

এক্ষণে আপনারা বুঝিলেন, জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়। জ্ঞান আর কিছুই নহে, পুরাতন সংস্কার গুলির সহিত একটী নূতন সংস্কারকে গ্রথিত করা—এক খোপে পোরা—নূতন সংস্কারটীকে চিনিয়া লওয়া। চিনিয়া লওয়া বা প্রত্যভিজ্ঞার অর্থ কি? আমাদের পূর্ব্ব হইতেই যে সদৃশ সংস্কারগুলি আছে, তাহাদের সহিত উহার মিলন আবিষ্কার জ্ঞান বলিতে ইহা ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। তাহাই যদি হইল, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই জ্ঞানলাভপ্রণালীতে যতগুলি সদৃশ বিষয় আছে, সমুদয়গুলিকে দেখিতে হইবে। তাই নয় কি? মনে করুন, আপনাকে একটা প্রস্তরখণ্ডকে জানিতে হইবে, তাহা হইলে উহার সহিত মিল খাওয়াইবার জন্য আপনাকে উহার সদৃশ সমুদয় প্রস্তরখণ্ড-গুলিকে দেখিতে হইবে। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে আমরা তাহা করিতে পারি না, কারণ, আমাদের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা আমরা উহার এক প্রকার অনুভবমাত্র পাইয়া থাকি—উহার এদিক্ ওদিকে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাতে উহার সদৃশ বস্তুর সহিত উহাকে মিলাইতে পারি। সেই জন্য জগৎ আমাদের নিকট অবোধ্য বোধ হয়, কারণ, জ্ঞান ও বিচার সর্ব্বদাই সদৃশ বস্তুর সহিত মিলনসাধনেই নিযুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশটী—যাহা আমাদের জ্ঞানাবচ্ছিন্ন, তাহা আমাদের নিকট একটী বিস্ময়কর নূতন পদার্থ বলিযা বোধ হয়, আমরা উহার সহিত মিল খাইবে, এমন কোন উহার সদৃশ বস্তু পাই না। এই জন্য উহাকে লইয়া এত হাঙ্গাম—আমরা ভাবি, জগৎ অতি ভয়ানক ও মন্দ; কখন কখন আমরা উহাকে ভাল বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে অসম্পূর্ণ ভাবিয়া থাকি। জগৎকে তখনই জানা যাইবে, যখন আমরা ইহার সহিত মিল খায়, এমন সদৃশ বস্তু বাহির করিতে পারিব। আমরা তখনই সেইগুলিকে জানিতে পারিব, যখন, আমরা এই জগতের—আমাদের এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানের—বাহিরে যাইব—তখনই কেবল জগৎ আমাদের নিকট জ্ঞাত হইবে। যতদিন না আমরা তাহা করিতেছি, ততদিন আমাদের সমুদয় নিষ্ফল চেষ্টার দ্বারা কখনই উহার ব্যাখ্যা হইবে না, কারণ, জ্ঞান অর্থে সদৃশ বিষয়ের আবিষ্কার, আর আমাদের এই সাধারণ জ্ঞানভূমি আমাদিগকে কেবল জগতের একটী আংশিক ভাব দিতেছে মাত্র। এই সমষ্টি মহৎ অথবা আমরা আমা-দের সাধারণ প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য ভাষায় যাঁহাকে ঈশ্বর বলি, তাঁহার ধারণা সম্বন্ধেও

তদ্রূপ। আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা যতটুকু আছে, তাহা তাঁহার এক বিশেষপ্রকার জ্ঞানমাত্র, তাঁহার আংশিক ধারণা মাত্র—তাঁহার অন্যান্য সমুদয়ভাব আমাদের মানবীয় অসম্পূর্ণতার দ্বারা আবৃত।

সর্ব্বব্যাপী আমি এত বৃহৎ যে, এই জগৎ পর্য্যন্ত আমার অংশমাত্র।*

এই কারণেই আমরা ঈশ্বরকে অসম্পূর্ণ দেখিয়া থাকি, আর আমরা তাঁহার ভাব কখনই বুঝিতে পারি না, কারণ, উহা অসম্ভব। তাঁহাকে বুঝিবার একমাত্র উপায়, যুক্তি বিচারের অতীত প্রদেশে যাওয়া, অহংজ্ঞানের বাহিরে যাওয়া।

যখন শ্রুত ও শ্রবণ, চিন্তিত ও চিন্তা, এই সমুদয়ের বাহিরে যাইবে, তখনই কেবল সত্য লাভ করিবে। †

শাস্ত্রের পারে চলিয়া যাও, কারণ, উহারা প্রকৃতির তত্ত্ব পর্য্যন্ত, উহা যে তিনটী গুণে নির্ম্মিত সেই পর্য্যন্ত—(যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে) শিক্ষা দিয়া থাকে। ‡

আমরা ইহাদের বাহিরে যাইলেই সামঞ্জস্য ও মিলন দেখিতে পাই, তাহার পূর্ব্বে নহে।

এ পর্য্যন্ত এটী স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একই নিয়মে নির্ম্মিত, আর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আমরা একটী খুব সামান্য অংশই জানি। আমরা জ্ঞানের নিম্নভূমিও জানি না, জ্ঞানাতীত ভূমিও জানি না। আমরা কেবল সাধারণ জ্ঞানভূমিই জানি। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি পাপী—সে নির্ব্বোধমাত্র, কারণ, সে নিজেকে জানে না। সে নিজের সম্বন্ধে অজ্ঞতম। সে নিজের এক অংশকে মাত্র জানে, কারণ, জ্ঞান তাহার মানসভূমির একাংশ-ব্যাপীমাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও তাহাই। যুক্তিবিচার দ্বারা উহার একাংশমাত্র জানাই সম্ভব, কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চ বলিতে জ্ঞানের নিম্নভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি, জ্ঞানাতীত ভূমি, ব্যষ্টিমহৎ, সমষ্টিমহৎ এবং তাহাদের পরবর্ত্তী সমুদয় বিকার—এই সকলগুলিকেই বুঝাইয়া থাকে আর এইগুলি সাধারণ জ্ঞানের অতীত।

---

* বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
ভগবদ্গীতা—১০ম, ৪২ শ্লোক।

† তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।
ভগবদ্গীতা—২য়, ৫২ শ্লোক।

‡ ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
ভগবদ্গীতা—২য়, ৪৫ শ্লোক।

কিসে প্রকৃতিকে পরিণাম প্রাপ্ত করায়? আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, প্রাকৃতিক সকল বস্তু, এমন কি, প্রকৃতি স্বয়ংও জড় বা অচেতন। উহারা নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে—সমুদয়ই বিভিন্ন দ্রব্যের মিশ্রণস্বরূপ এবং অচেতন। মন,মহত্তত্ত্ব, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি—এ সবই অচেতন। কিন্তু তাহারা সকলেই এমন এক পুরুষের চিৎ বা চৈতন্যের প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, যিনি এই সকল গুলিরই অতীত, আর সাংখ্যমতাবলম্বিগণ ইঁহাকেই পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই পুরুষ জগতের মধ্যে—প্রকৃতির মধ্যে—এই যে সকল পরিণাম হইতেছে, তাহাদের সাক্ষিস্বরূপ কারণ-·অর্থাৎ এই পুরুষকে যদি সার্ব্বজনীন অর্থে ধরা যায়, তবে তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর *। ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণ দৈনিক ব্যবহার্য্য বাক্য হিসাবে ইহা অতি সুন্দর বাক্য হইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা ইহার আর অধিক মূল্য নাই। ইচ্ছা কিরূপে সৃষ্টির কারণ হইতে পারে? ইচ্ছা—প্রকৃতির তৃতীয় বা চতুর্থ বিকার। অনেক বস্তু উহার পূর্ব্বেই হইয়াছে। সেগুলিকে কে সৃষ্টি করিল? ইচ্ছা একটী যৌগিক পদার্থ মাত্র, আর যাহা কিছু যৌগিক, সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইচ্ছা স্বয়ং কখন প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিতে পারে না। উহা একটী অমিশ্র বস্তু নহে। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। মানুষের ভিতর ইচ্ছা আমাদের অহংজ্ঞানের অল্পাংশমাত্রব্যাপী। কেহ কেহ বলেন, উহা আমাদের মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করে। যদি তাহাই করিত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই মস্তিষ্কের কার্য্য বন্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা ত আপনারা পারেন না। সুতরাং ইচ্ছা মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করিতেছে না। হৃদয়কে গতিশীল করিতেছে কে? ইচ্ছা কখনই নহে; কারণ, যদি তাহাই হইত, তবে ইচ্ছা করিলেই হৃদয়ের গতিরোধ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা আপনাদের দেহকেও পরিচালিত করিতেছে না, ব্রহ্মাণ্ডকেও নিয়মিত করিতেছে না। অপর কোন বস্তু উহাদের নিয়ামক—ইচ্ছা যাহার একটী বিকাশ মাত্র। এই দেহকে এমন একটী শক্তি পরিচালিত করিতেছে, ইচ্ছা যাহার বিকাশ মাত্র। সমগ্র জগৎ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না, সেই জন্যই ইচ্ছা বলিলে ইহার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। মনে করুন, আমি মানিয়া

*ইতিপূর্ব্বে মহত্তত্ত্বকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, এখানে আবার পুরুষের সার্ব্বজনীন ভাবকে ঈশ্বর বলা হইল। এই দুইটী কথা আপাত বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। এখানে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পুরুষ মহত্তত্ত্ব রূপ উপাধি পরিগ্রহ করিলেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়।

লইলাম, ইচ্ছাই আমাদের দেহকে চালাইতেছে, তার পর এই দেহ ইচ্ছানুসারে আমি পরিচালিত করিতে পারিতেছি না বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা ত আমারই দোষ, কারণ, ইচ্ছাই আমাদের দেহপরিচালনকর্ত্তা, ইহা মানিয়া লইবার আমার কোন অধিকার ছিল না। এইরূপই—যদি আমরা মানিয়া লই যে, ইচ্ছাই জগৎ পরিচালন করিতেছে আর তার পর দেখি, প্রকৃত ঘটনার সহিত ইহা মিলিতেছে না, তবে ইহা আমারই দোষ। এই পুরুষ ইচ্ছা নহেন, বা বুদ্ধি নহেন, কারণ, বুদ্ধি একটী যৌগিক পদার্থ মাত্র। কোনরূপ জড় পদার্থ না থাকিলে কোনরূপ বুদ্ধিও থাকিতে পারে না। মানুষে এই জড় মস্তিষ্কাকার ধারণ করিয়াছে। যেখানেই বুদ্ধি আছে, সেখানেই কোন না কোন আকারে জড় পদার্থ থাকিবেই থাকিবে। অতএব বুদ্ধি যখন যৌগিক পদার্থ হইল, তখন পুরুষ কি? উহা মহত্তত্ত্বও নহে, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিও নহে, কিন্তু উহা-দের উভয়েরই কারণ। তাঁহার সান্নিধ্যই উহাদের সকল গুলিকেই ক্রিয়াশীল করে ও পরস্পরে মিলিত করায়। পুরুষকে সেই সকল বস্তুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যাহাদের শুধু সান্নিধ্যেই রাসায়নিক কার্য্য ত্বরিত করে, যেমন সোণা গালাইতে গেলে তাহাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড (Pottassium Cyanide) মিশাইতে হয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃথক্ থাকিয়া যায়, উহার উপর কোন রাসায়নিক কার্য্য হয় না, কিন্তু সোণা গালানরূপ কার্য্য সফল হইবার জন্য উহার সান্নিধ্য প্রয়োজন। পুরুষ সম্বন্ধেও এই কথা। উহা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হয় না, উহা বুদ্ধি বা মহৎ বা উহার কোনরূপ বিকার নহে, উহা শুদ্ধ পূর্ণ আত্মা।

আমি সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত থাকাতে প্রকৃতি চেতন ও অচেতন সমুদয় সৃজন করিতেছে।*

প্রকৃতিতে তাহা হইলে এই চেতনত্ব কোথা হইতে আসল? পুরুষেই এই চেতনত্বের ভিত্তি, আর ঐ চেতনত্বই পুরুষের স্বরূপ। উহা এমন এক বস্তু, যাহা বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না, বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায় না, কিন্তু আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহার উপাদানস্বরূপ। এই পুরুষ আমাদের এই সাধারণ জ্ঞান নহে, কারণ, জ্ঞান একটী যৌগিক পদার্থ, তবে ঐ জ্ঞানের ভিতর যাহা কিছু উজ্জ্বল ও উত্তম, তাহা ঐ পুরুষেরই। পুরুষে চৈতন্য আছে, কিন্তু পুরুষকে বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা এমন বস্তু, যিনি থাকাতেই জ্ঞান সম্ভব হয়। পুরুষের মধ্যে যে চিৎ, তাহা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া আমাদের

*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং। গীতা—৯ম, ১০ শ্লোক।

নিকট বুদ্ধি বা জ্ঞান নামে পরিচিত হয়। জগতে যে কিছু সুখ, আনন্দ, শান্তি আছে, সমুদয়ই পুরুষের, কিন্তু উহারা মিশ্র ; কেন না, উহাতে পুরুষ ও প্রকৃতির মিশ্রণ আছে।

যেখানে কোনপ্রকার সুখ, যেখানে কোনরূপ আনন্দ, তথায়ই সেই অমৃত-স্বরূপ পুরুষের এক কণা আছে, বুঝিতে হইবে।*

এই পুরুষই সমগ্র জগতের মহা আকর্ষণস্বরূপ, তিনি যদিও উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট ও উহার সহিত অসংসৃষ্ট, তথাপি তিনি সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করিতেছেন। মানুষে যে কাঞ্চনের অন্বেষণে ধাবমান দেখিতে পান,তাহার কারণ সে না জানিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কাঞ্চনের মধ্যে পুরুষের এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। যখন মানুষ সন্তান প্রার্থনা করে, অথবা স্ত্রীলোক যখন স্বামীর আকাঙ্ক্ষা করে, তখন কোন্ শক্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করে? সেই সন্তান ও সেই স্বামীর ভিতর যে সেই পুরুষের অংশ আছে, তাহাই সেই আকর্ষণী শক্তি। তিনি সকলেরই পশ্চাতে রহিয়াছেন, কেবল উহাতে জড়ের আবরণ পড়িয়াছে। আর কিছুই কাহাকেও আকর্ষণ করিতে পারে না। এই অচেতনাত্মক জগতের মধ্যে সেই পুরুষই একমাত্র চেতন। ইনিই সাংখ্যের পুরুষ। অতএব ইহা হইতে নিশ্চিত বুঝা যাইতেছে যে, এই পুরুষ অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী, কারণ, যাহা সর্ব্বব্যাপী নহে, তাহা অবশ্যই সসীম। সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাবই কোন কারণের কার্য্যস্বরূপ, আর যাহা কার্য্যস্বরূপ, তাহার অবশ্য আদি অন্ত থাকিবে। যদি পুরুষ সীমাবদ্ধ হন, তবে তিনি অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি তাহা হইলে আর চরম তত্ত্ব হইলেন না, তিনি মুক্তস্বরূপ হইলেন না, তিনি কোন কারণের কার্য্যস্বরূপ—উৎপন্ন পদার্থ হইলেন। অতএব যদি তিনি সীমাবদ্ধ না হন, তবে তিনি সর্ব্বব্যাপী। কপিলের মতে পুরুষের সংখ্যা এক নহে, বহু। অনন্তসংখ্যক পুরুষ রহিয়াছেন, আপনিও একজন পুরুষ, আমি একজন পুরুষ, প্রত্যেকেই এক এক জন পুরুষ—উহারা যেন অনন্তসংখ্যক বৃত্তস্বরূপ। তাহার প্রত্যেকটী আবার অনন্ত। পুরুষ জন্মানও না, মরেনও না। তিনি মনও নহেন, ভূতও নহেন ; আর আমরা যাহা কিছু জানি, সকলই তাঁহার প্রতিবিম্বস্বরূপ। আমরা নিশ্চিত জানি যে, যদি তিনি সর্ব্বব্যাপী হন, তবে তাঁহার জন্মমৃত্যু কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতি তাঁহার উপর নিজ ছায়া—জন্ম ও মৃত্যুর ছায়া প্রক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু

* এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ—৪র্থ অধ্যায়, ৩য় ব্রাহ্মণ, ৩২ শ্লোক।

তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম, কপিলের মত অতি অপূর্ব্ব।

এইবার আমরা এই সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিবার আছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব। যতদূর পর্য্যন্ত দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম—এই বিশ্লেষণ নির্দ্দোষ—ইহার মনোবিজ্ঞান অখণ্ডনীয়—উহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আমরা কপিলকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করিল? আর তাহার উত্তর এই পাইলাম যে, উহা সৃষ্ট নহে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, পুরুষও অসৃষ্ট ও সর্ব্বব্যাপী, আর এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। আমাদিগকে সাংখ্যের এই শেষ সিদ্ধান্তটীর প্রতিবাদ করিয়া উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং তাহা করিলেই আমরা বেদান্তের অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমরা প্রথমেই এই আশঙ্কা উত্থাপন করিব যে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটী অনন্ত কি করিয়া থাকিতে পারে। তার পর আমরা এই ভাবে তর্ক করিব যে, উহা সম্পূর্ণ সামাণ্যীকরণ * (Generalisation) নহে, অতএব আমরা সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। তার পর আমরা দেখিব, বেদান্তীরা কিরূপে এই সকল আপত্তি ও আশঙ্কা কাটাইয়া সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গৌরব সবই কপিলেরই প্রাপ্য। প্রায়-সম্পূর্ণ অট্টালিকাকে সম্পূর্ণ করা অতি সহজ কায।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাংখ্য ও অদ্বৈত।

আমি প্রথমে আপনাদের নিকট যে, সাংখ্য দর্শনের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহার মোট কথা গুলি সংক্ষেপে বলিব। কারণ, এই বক্তৃতায় আমরা ইহার অসম্পূর্ণতা কোন্‌গুলি, তাহা বাহির করিতে এবং বেদান্ত আসিয়া কিরূপে ঐ অসম্পূর্ণতাগুলি সম্পূর্ণ করিয়া দেন, তাহা বুঝিতে চাই। আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতি হইতেই চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার, রাগ, দ্বেষ, স্পর্শ, রস—এক কথায় সমুদয় বিকাশ হইতেছে। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ

---

*কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করাকে Generalisation বা সামান্যীকরণ বলে।

ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে গঠিত। এগুলি গুণ নহে, জগতের উপাদান-কারণ—এইগুলি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে আর যুগপ্রারম্ভে এগুলি সামঞ্জস্যভাবে বা সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টি আরম্ভ হইলেই এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয় তখন এই দ্রব্যগুলি পরস্পর নানারূপে মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। ইহাদের প্রথম বিকাশকে সাংখ্যেরা মহৎ (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধি) বলেন। আর তাহা হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অহংজ্ঞান হইতে মন অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপী মনস্তত্ত্বের উদ্ভব। ঐ অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার হইতেই জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রস প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অহংকার হইতেই সমুদয় সূক্ষ্ম পরমাণুর উদ্ভব আর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ হইতেই স্থূল পরিমাণুসমূহের উৎপত্তি হয়, যাহাকে আমরা জড় বলি। তন্মাত্রার (অর্থাৎ যে সকল পরমাণু দেখা যায় না বা যাহাদের পরিমাণ করা যায় না,) পর স্থূল পরমাণু সকলের উৎপত্তি—যাহাদিগকে আমরা অনুভব ও ইন্দ্রিয় গোচর করিতে পারি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই ত্রিবিধ কার্য্যসমন্বিত চিত্ত, প্রাণ-নামক শক্তিসমূহকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। এই প্রাণের সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, আপনাদের ঐ ধারণা এখনই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী শক্তির একটী কার্য্য মাত্র। কিন্তু এখানে 'প্রাণ সমূহ' অর্থে সেই স্নায়বীয় শক্তি সমূহ বুঝায়, যাহারা সমুদয় দেহটীকে চালাইতেছে এবং চিন্তা ও দেহের নানাবিধ ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি এই প্রাণ সমূহের প্রধান ও প্রত্যক্ষতম প্রকাশ। যদি বায়ু দ্বারাই এই শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য হইত, তবে মৃত ব্যক্তিও শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য করিত। প্রাণই বায়ুর উপর কার্য্য করিতেছে, বায়ু প্রাণের উপর করিতেছে না। এই প্রাণসমূহ জীবনশক্তিস্বরূপ সমুদয় শরীরের উপর কার্য্য করিতেছে, উহারা আবার মন এবং ইন্দ্রিয়গণ (অর্থাৎ দুই প্রকার কেন্দ্র) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত বেশ কথা। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার আর ভাবিয়া দেখুন কত যুগ পূর্ব্বে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহা জগতের মধ্যে প্রাচীনতম যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী। যেখানেই কোনরূপ দর্শন বা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কপিলের নিকট কিছু না কিছু ঋণী। যেখানেই মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের কিছু না কিছু চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই এই চিন্তাপ্রণালীর জনক, এই কপিলনামধেয় ব্যক্তির নিকট তাহা ঋণী—দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম যে, এই মনোবিজ্ঞান বড়ই অপূর্ব্ব, কিন্তু আমরা যত অগ্রসর হইব, তত দেখিব, কোন কোন বিষয়ে ইহার সহিত আমাদিগের বিভিন্ন মত অবলম্বন করিতে হইবে। কপিলের প্রধান মত—পরিণাম। তিনি বলেন, এক বস্তু অপর বস্তুর পরিণাম বা বিকার স্বরূপ, কারণ, তাঁহার মতে কার্য্যকারণভাবের লক্ষণ এই যে,—কার্য্য অন্যরূপে পরিণত কারণ মাত্র।*

আর যেহেতু আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সমগ্র জগৎই ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চিত কোন উপাদান হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা উহার কারণ হইতে স্বরূপতঃ কখন বিভিন্ন হইতে পারে না, কেবল যখন উহা বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, তখন উহা সীমাবিশিষ্ট হয়, কিন্তু ঐ উপাদানটী স্বয়ং নিরাকার। কিন্তু কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বৈষম্যপ্রাপ্তির শেষ সোপান পর্য্যন্ত কোনটীই পুরুষ অর্থাৎ ভোক্তা বা প্রকাশকের সহিত সমান নহে। একটা কাদার তাল যেমন, মনসমষ্টিও তদ্রূপ, সমগ্র জগৎও সেইরূপ। স্বরূপতঃ উহাদের চৈতন্য নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে আমরা বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দেখিতে পাই, অতএব উহাদের পশ্চাতে—সমগ্র প্রকৃতির পশ্চাতে নিশ্চিত এমন কোন সত্তা আছে, যাহার আলোক উহার উপর পড়িয়া, মহৎ, অহংজ্ঞান ও এই সব নানাবস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। আর এই সত্তাকেই কপিল পুরুষ বা আত্মা বলেন, বেদান্তীরাও উহাকে আত্মা বলিয়া থাকেন। কপিলের মতে পুরুষ অমিশ্র পদার্থ—উহা যৌগিক পদার্থ নহে। উহাই এক মাত্র অজড় পদার্থ, আর সমুদয় প্রপঞ্চ বিকারই জড়। পুরুষই একমাত্র জ্ঞাতা। মনে করুন, আমি একটা বোর্ড দেখিতেছি। প্রথমে বাহিরের যন্ত্রগুলি মস্তিষ্ক কেন্দ্রে (কপিলের মতে ইন্দ্রিয়ে) ঐ বিষয়টীকে লইয়া আসিবে, উহা আবার ঐ কেন্দ্র হইতে মনে যাইয়া তাহার উপর আঘাত করিবে—মন উহাকে আবার অহংজ্ঞানরূপ অপর একটী পদার্থে আবৃত করিয়া মহৎ বা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিবে। কিন্তু মহতের স্বয়ং

---

* কারণভাবাচ্চ।

—সাংখ্যসূত্র ।১।১১৮।

কার্য্যের শক্তি নাই—উহার পশ্চাতে যে পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তা। এই গুলি সবই তাঁহার ভৃত্যস্বরূপে বিষয়ের আঘাত তাঁহার নিকট আনিয়া দেয়, তিনি তখন আদেশ দিলে মহৎ প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া করে। পুরুষই ভোক্তা, বোদ্ধা, যথার্থ সত্তা, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা, মানবের আত্মা আর তিনি অজড়। যেহেতু তিনি অজড়, সেহেতু তিনি অবশ্যই অনন্ত, তাঁহার কোনরূপ সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ পুরুষগণের প্রত্যেকেই সর্ব্বব্যাপী, তবে কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় পদার্থের মধ্যে দিয়া কার্য্য করিতে পারেন। মন, অহংজ্ঞান, মস্তিষ্ক-কেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ এই কয়েকটী লইয়া সূক্ষ্ম শরীর অথবা খ্রীষ্টীয় দর্শনে যাহাকে মানবের 'আধ্যাত্মিক দেহ' বলে, তাহা গঠিত। এই দেহেরই পুরস্কার বা দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়া থাকে, ইহারই বারবার জন্ম হয়। কারণ, আমরা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিয়াছি, পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আসা যাওয়া অসম্ভব। গতি অর্থে যাওয়া আসা, আর যাহা এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে, তাহা কখন সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম শরীরই আসে যায়। এই পর্য্যন্ত আমরা কপিলের দর্শন হইতে দেখিলাম যে, আত্মা অনন্ত, আর একমাত্র উহাই প্রকৃতির পরিণাম নহে। একমাত্র উহাই প্রকৃতির বাহিরে, কিন্তু উহা প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে বেড়িয়া আছে, সেই জন্য পুরুষ আপনাকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। পুরুষ ভাবিতেছেন,'আমি লিঙ্গশরীর''আমি স্থূল শরীর', আর সেই জন্যই তিনি সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখদুঃখ আত্মার নহে" উহারা লিঙ্গ শরীরের এবং স্থূল শরীরের। যখন কতক-গুলি স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আমরা কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। আমরা উহা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকি। যদি আমার অঙ্গুলির স্নায়ুগুলি নষ্ট হয়, তবে আমরা অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেও উহা বোধ করিব না। অতএব সুখ দুঃখ স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের। মনে করুন, আমার দর্শনেন্দ্রিয় নষ্ট হইল, তাহা হইলে আমার চক্ষুযন্ত্র থাকিলেও আমি রূপ হইতে কোন সুখদুঃখ অনুভব করিব না। অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সুখদুঃখ আত্মার নহে; উহারা মন ও দেহের।

আত্মার সুখদুঃখ কিছুই নাই, উহা সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ,

যাহা কিছু হইতেছে, তাহারই নিত্য সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু উহা কোন কর্ম্মের কোনরূপ ফল গ্রহণ করে না।

সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষের দৃষ্টির কারণ হইলেও স্বয়ং কোন চক্ষের দোষে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তদ্রূপ। *

"যেমন একখণ্ড স্ফটিকের সম্মুখে লাল ফুল রাখিলে উহা লাল দেখায়, এইরূপ পুরুষকেও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব দ্বারা সুখ দুঃখে লিপ্ত বোধ হয়, কিন্তু উহা সদাই অপরিণামী।"†

উহার অবস্থা যতটা সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, ধ্যানকালে আমরা যে ভাব অনুভব করি, উহা প্রায় তদ্রূপ। এই ধ্যানাবস্থায়ই আপনারা পুরুষের খুব সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অতএব আমরা দেখিতেছি, যোগীরা এই ধ্যানাবস্থাকে কেন সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া থাকেন; কারণ, পুরুষের সহিত আপনার এই একত্ববোধ—জড়াবস্থা বা ক্রিয়াশীল অবস্থা নহে, উহা ধ্যানাবস্থা। ইহাই সাংখ্যদর্শন।

তার পর সাংখ্যেরা আরো বলেন যে, প্রকৃতির এই সকল বিকার আত্মার জন্য, উহার বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলনাদি সমস্তই উহা হইতে স্বতন্ত্র অপর কাহারও জন্য। সুতরাং এই যে নানাবিধ মিশ্রণকে আমরা প্রকৃতি বা জগৎপ্রপঞ্চ বলি—এই যে আমাদের ভিতরে এবং চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত পরিবর্ত্তনপরম্পরা হইতেছে, তাহা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির জন্য। আত্মা সর্ব্বনিম্ন অবস্থা হইতে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা পর্য্যন্ত স্বয়ং ভোগ করিয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন, আর যখন আত্মা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি কোন কালেই প্রকৃতিতে বদ্ধ ছিলেন না, তিনি সর্ব্বদাই উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন—তখন তিনি আরো দেখিতে পান যে, তিনি অবিনাশী, তাঁহার আসা যাওয়া কিছুই নাই, স্বর্গে যাওয়া আবার এখানে আসিয়া জন্মান—সমুদয়ই প্রকৃতির—তাঁহার নিজের—নহে। তখনই আত্মা মুক্ত হইয়া যান। এইরূপে সমুদয় প্রকৃতি আত্মার ভোগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কার্য্য করিয়া যাইতেছে আর আত্মা, সেই চরম লক্ষ্যে যাইবার জন্য

* কঠোপনিষদ্—২য়বল্লী, ২য় অধ্যায়, ২২ শ্লোক দেখ।

† কুসুমবচ্চ মণিঃ।

—সাংখ্যসূত্র।২।৩৫।

এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। আর মুক্তিই এই চরম লক্ষ্য। সাংখ্য-দর্শনের মতে এই আত্মার সংখ্যা বহু। অনন্তসংখ্যক আত্মা রহিয়াছেন। উহার আব একটী সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর নাই, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই যখন এই সকল বিভিন্নরূপ সৃজন করিতে সমর্থ, তখন ঈশ্বর স্বীকার কবিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে আমাদিগকে সাংখ্যদিগেব এই তিনটী মত খণ্ডন করিতে হইবে। প্রথমটী এই যে, জ্ঞান বা ঐরূপ যাহা কিছু, তাহা আত্মাব নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মা নিগুর্ণ ও অরূপ। সাংখ্যের দ্বিতীয় মত যাহা আমবা খণ্ডন কবিব, তাহা এই যে, ঈশ্বর নাই—বেদান্ত দেখাইবেন, ঈশ্বব স্বীকার না কবিলে জগতের কোনপ্রকাব ব্যাখ্যাই হইতে পায না। তৃতীযতঃ আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, বহু আত্মা থাকিতে পাবে না, আত্মা অনন্তসংখ্যক হইতে পাবে না, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে এক আত্মা আছেন মাত্র—আর সেই একই বহুরূপে প্রতীত হইতেছে।

প্রথমে আমরা সাংখ্যের ঐ প্রথম সিদ্ধান্তটী লইযা আলোচনা করিব যে, জ্ঞানচৈতন্য সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিব অধিকাবে, আত্মার জ্ঞানচৈতন্য নাই। বেদান্ত বলেন, আত্মাব স্বরূপ অসীম অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সত্তা জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তবে আমাদেব সাংখ্যেব সহিত এই বিষযে একমত যে, তাঁহারা যাহাকে জ্ঞান বলেন, তাহা একটী যৌগিক পদার্থ মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের বিষযানুভূতি কিরূপে হয, সেই ব্যাপাবটী আলোচনা করা যাউক। আমাদের স্মবণ আছে যে, চিত্তই বাহিবেব বিভিন্ন বস্তুকে লই-তেছে, উহাবই উপর বহির্বিষযের আঘাত আসিযাছে এবং উহা হইতেই প্রতিক্রিয়া হইতেছে। মনে করুন, বাহিবে কোন বস্তু রহিয়াছে। আমি একটী বোর্ড দেখিতেছি। উহার জ্ঞান কিরূপে হইতেছে? বোর্ডটীর স্বরূপ অজ্ঞাত, আমব৷ কখনই উহাকে জানিতে পারি না। জর্ম্মান দার্শনিকেরা উহাকেই 'বস্তুর স্বরূপ' (Thing in itself) বলিযা থাকেন। সেই বোড স্বরূপতঃ যাহা, সেই অজ্ঞেয সত্তা 'ক' আমাব চিত্তের উপর কার্য্য করিতেছে আর চিত্ত প্রতিক্রিয়া করিতেছে। চিত্ত একটী হ্রদের মত। যদি হ্রদের উপর আপনি একটী প্রস্তব নিক্ষেপ করেন, যখনই প্রস্তর ঐ হ্রদের উপর আঘাত করে, তখনই প্রস্তরের দিকে হ্রদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে একটী তরঙ্গ আসিবে। আপনারা বিষযানুভূতিকালে বাস্তবিক এই তরঙ্গটীকেই দেখিয়া

থাকেন। আর ঐ তরঙ্গটী আদতেই সেই প্রস্তরটীর মত নয়—উহা একটী তরঙ্গ। অতএব সেই যথার্থ বোর্ড 'ক'ই প্রস্তররূপে মনের উপর আঘাত করিতেছে, আর মন সেই আঘাতকারী পদার্থের দিকে একটী তরঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছে। উহার দিকে এই যে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাকেই আমরা বোর্ড নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমি আপনাকে দেখিতেছি। আপনি স্বরূপতঃ যাহা, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আপনি সেই অজ্ঞাত সত্তা 'ক' স্বরূপ, আপনি আমার মনের উপর কার্য্য করিতেছেন, আর মন যে দিক্ হইতে ঐ কার্য্য হইযাছিল, তাহার দিকে একটী তরঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর সেই তরঙ্গকেই আমরা অমুক নর বা অমুক নারী বলিয়া থাকি।

এই জ্ঞানক্রিয়ার দুইটী উপাদান—তন্মধ্যে একটী ভিতর হইতে ও অপরটী বাহির হইতে আসিতেছে, আর এই দুইটীর মিশ্রণ (ক+মন) আমাদের বাহ্য জগৎ। সমুদয় জ্ঞান প্রতিক্রিয়ার ফল। তিমি মৎস্য সম্বন্ধে গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, উহার লেজে আঘাত করিবার কত ক্ষণ পরে উহার মন ঐ লেজের উপব প্রতিক্রিয়া করে ও ঐ লেজে কষ্ট অনুভব হয়। শুক্তির কথা ধরুন, একটী বালুকণা * ঐ শুক্তির খোলার ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে—তখন ঐ শুক্তি ঐ বালুকণার চতুর্দ্দিকে নিজ রস প্রক্ষেপ করে—তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। দুটী জিনিষে মুক্তা প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমতঃ, শুক্তিব শরীর-নিঃসৃত রস, আর দ্বিতীয়তঃ, বহির্দ্দেশ হইতে প্রদত্ত আঘাত। আমার এই টেবিলটীর জ্ঞানও তদ্রূপ—'ক'+মন। ঐ বস্তুকে জানিবার চেষ্টাটা তখনই করিবে, সুতরাং মন উহাকে বুঝিবার জন্য নিজের সত্তা কতকটা উহাতে প্রদান করিবে, আর যখনই আমরা উহা জানিলাম, তখনই উহা একটী যৌগিক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল 'ক'+মন। আভ্যন্তরিক অনুভূতি সম্বন্ধে অর্থাৎ যখন আমরা নিজেকে জানিতে ইচ্ছা করি, তখনও ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। যথার্থ আত্মা বা আমি, যাহা আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, তাহাও অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। উহাকে 'খ' বলা যাক্। যখন আমি আমাকে

* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বালুকাকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি—এই লোক-প্রচলিত বিশ্বাসটীর কোন ভিত্তি নাই। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র কীটাণুবিশেষ (Parasite) হইতে মুক্তার উৎপত্তি।

অমুক ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া জানিতে চাই, তখন ঐ 'খ', 'খ'+মন এইরূপে প্রতীত হয়। যখন আমি আমাকে জানিতে চাই, তখন ঐ 'খ' মনের উপর একটী আঘাত করে, মনও আবার ঐ 'খ' এর উপর আঘাত করিয়া থাকে। অতএব আমাদের সমগ্র জগতের জ্ঞানকে 'ক'+মন (বাহ্য জগৎ) এবং 'খ'+মন (অন্তর্জ্জগত) রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা পরে দেখিব, অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্ত কিরূপে গণিতের ন্যায় প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

'ক' ও 'খ' কেবল বীজগণিতের অজ্ঞাত সংখ্যামাত্র। আমরা দেখিয়াছি, সকল জ্ঞানই যৌগিক—বাহ্য জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানও যৌগিক এবং বুদ্ধি বা অহংজ্ঞানও তদ্রূপ একটী যৌগিক ব্যাপার। যদি উহা ভিতরের জ্ঞান বা মানসিক অনুভূতি হয়, তবে উহা 'খ'+মন, আর যদি উহা বাহিরের জ্ঞান বা বিষয়ানুভূতি হয়, তবে উহা 'ক'+মন। সমুদয় ভিতরের জ্ঞান 'খ' এর সহিত মনের সংযোগলব্ধ এবং বাহিরের জড় পদার্থের সমুদয় জ্ঞান 'ক' এর সহিত মনের সংযোগের ফল। প্রথমে ভিতরের ব্যাপারটী গ্রহণ করিলাম। আমরা প্রকৃতিতে যে জ্ঞান দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক হইতে পারে না, কারণ, জ্ঞান—'খ' ও মনের সংযোগলব্ধ আর ঐ 'খ' আত্মা হইতে আসিতেছে। অতএব আমরা যে জ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাহা আত্মচৈতন্যের শক্তির সহিত প্রকৃতির সংযোগের ফল। এইরূপ আমরা বাহিরের সত্তা যাহা জানিতেছি, তাহাও অবশ্য মনের সহিত 'ক' এর সংযোগোৎপন্ন। অতএব আমরা দেখিতেছি, আমি আছি, আমি জানিতেছি, ও আমি সুখী (অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাদের যে ভাব আসে যে, আমার কোন অভাব নাই) এই তিনটী তত্ত্বে আমাদের জীবনের কেন্দ্রগত ভাব, আমাদের জীবনের মহান্ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, আর ঐ কেন্দ্র বা ভিত্তি সীমাবিশিষ্ট হইয়া অপরবস্তুসংযোগে যৌগিক ভাব ধারণ করিলে আমরা উহাকে সুখ বা দুঃখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এই তিনটী তত্ত্বই ব্যবহারিক সত্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক আনন্দ বা প্রেমরূপে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেককেই জানিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই আনন্দের জন্য হইয়াছে। ইহা অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই। সমগ্র জগতেই এইরূপ। পশুগণ ও উদ্ভিদ্গণ,অতি নিম্নতম হইতে অতি উচ্চতম সত্তা পর্য্যন্ত সকলেই ভালবাসিয়া

থাকে। আপনারা উহাকে ভালবাসা না বলিতে পারেন, কিন্তু তাহারা অবশ্যই সকলে জগতে থাকিবে, সকলকেই জানিতে হইবে, সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। অতএব এই যে সত্তা আমবা জানিতেছি, তাহা পূর্ব্বোক্ত 'ক' ও মনের সংযোগফল আর আমাদের জ্ঞানও সেই ভিতরের 'খ' ও মনের সংযোগফল আব প্রেমও ঐ 'খ' ও মনেব সংযোগফল। অতএব এই যে তিনটী বস্তু বা তত্ত্ব ভিতর হইতে আসিয়া বাহিরেব বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যবহাবিক সত্তা, ব্যবহাবিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রেমের সৃষ্টি কবিতেছে, তাহাদিগকেই বৈদান্তিকেবা নিরপেক্ষ বা পারমার্থিক সত্তা, পরমার্থিক জ্ঞান ও পাবমার্থিক আনন্দ বলিযা থাকেন।

সেই পাবমার্থিক সত্তা, যাহা অসীম, অমিশ্র, অযৌগিক, যাহাব কোন পবিণাম নাই, তাহাই সেই মুক্ত আত্মা, আব যখন সেই প্রকৃত সত্তা প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইযা যেন মলিন হইযা যায, তাহাকেই আমরা মানব নামে অভিহিত কবি। উহা সীমাবদ্ধ হইযা উদ্ভিদ্‌জীবন, পশুজীবন, মানবজীবন রূপে প্রকাশিত হয, যেমন অনন্ত দেশ এই গৃহের দেযাল বা অন্য কোনরূপ বেষ্টনেব দ্বাবা আপাততঃ সীমাবদ্ধ বোধ হয। সেই পারমার্থিক জ্ঞান বলিতে যে জ্ঞানের বিষয় আমবা জানি, তাহাকে বুঝায় না— বুদ্ধি বা বিচাবশক্তি বা সহজাত জ্ঞান কিছুই বুঝায় না, উহা সেই বস্তুকে বুঝায়, যাহা বিভিন্নাকাবে প্রকাশিত হইলে আমবা এই সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যখন সেই নিবপেক্ষ বা পূর্ণজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয, তখন আমরা উহাকে দিব্য বা প্রাতিভ জ্ঞান বলি, যখন আবো অধিক সীমাবদ্ধ হয়, তখন উহাকে যুক্তিবিচার, সহজাত জ্ঞান ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। সেই নিরপেক্ষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। উহাকে সর্ব্বজ্ঞতা বলিলেও উহার ভাব অনেকটা প্রকাশ হইতে পারে। উহা কোন প্রকার যৌগিক পদার্থ নহে। উহা আত্মার স্বভাব। যখন সেই নিরপেক্ষ প্রেম সীমাবদ্ধ ভাব ধারণ করে, তখনই উহাকে আমরা প্রেম বলি—যাহা স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর বা ভাবসমূহের প্রতি আকর্ষণস্বরূপ। এইগুলি সেই আনন্দের বিকৃত প্রকাশ মাত্র আর ঐ আনন্দ আত্মার গুণবিশেষ নহে, উহা আত্মার স্বরূপ— উহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতি। নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দ আত্মার গুণ নহে, উহাবা আত্মার স্বরূপ, উহাদের সহিত আত্মার কোন প্রভেদ নাই। আর ঐ তিনটী একই জিনিষ, আমরা এক বস্তুকে

তিন বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকি মাত্র। উহারা সমুদয় সাধারণ জ্ঞানের অতীত, আর তাহাদের প্রতিবিম্বেই প্রকৃতিকে চৈতন্যবান্ বলিয়া বোধ হয়।

আত্মার সেই নিত্য নিরপেক্ষ জ্ঞানই মানবমনের মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদের বিচারযুক্তি বুদ্ধি হইয়াছে। যে উপাধি বা মধ্যবর্ত্তীর মধ্য দিয়া উহা প্রকাশ পায়, তাহার বিভিন্নতা অনুসারে উহার বিভিন্নতা হয়। আত্মা হিসাবে আমাতে এবং অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণীতে কোন প্রভেদ নাই, কেবল তাহার মস্তিষ্ক জ্ঞানপ্রকাশের অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী যন্ত্র, এই জন্য তাহার জ্ঞানকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলিয়া থাকি। মানবের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর ও জ্ঞান প্রকাশের উপযোগী, সেই জন্য তাহার নিকট জ্ঞানের প্রকাশ স্পষ্টতর, আর উচ্চতম মানবে উহা একখণ্ড কাচের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অস্তিত্ব বা সত্তা সম্বন্ধেও তদ্রূপ; আমরা যে অস্তিত্বটাকে জানি, এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র অস্তিত্বটা সেই নিরপেক্ষ সত্তার প্রতিবিম্ব মাত্র, আর উহা আত্মার স্বরূপ। আনন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ, যাহাকে আমরা প্রেম বা আকর্ষণ বলি, তাহা সেই আত্মার নিত্য আনন্দের প্রতিবিম্বস্বরূপ, কারণ, যেমন ব্যক্তভাব বা প্রকাশ হইতে থাকে, অমনি সসীমতা আসিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার সেই অব্যক্ত, স্বাভাবিক, স্বরূপগত সত্তা অসীম ও অনন্ত, সেই আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মানবীয় প্রেমে সীমা আছে। আমি আজ আপনাকে ভালবাসিলাম, তার পর দিনই আমি আপনাকে আর ভালবাসিতে না পারি। একদিন আমার ভালবাসা বাড়িয়া উঠিল, তার পর দিন আবার কমিয়া গেল, কারণ, উহা একটী সীমাবদ্ধ প্রকাশমাত্র। অতএব কপিলের মতের বিরুদ্ধে এই প্রথম কথা পাইলাম যে, তিনি আত্মাকে নিশুর্ণ, অরূপ, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন যে, উহা সমুদয় সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সারস্বরূপ, আমরা যতপ্রকার জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি তাহা হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠতর, আমরা মানবীয় প্রেম বা আনন্দের যতদূর পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে অধিক আনন্দময়, আর তিনি অনন্ত সত্তাবান্। আত্মার কখন মৃত্যু হয় না। আত্মার সম্বন্ধে জন্মমরণের কথা ভাবিতেই পারা যায় না, কারণ, তিনি অনন্ত সত্তাস্বরূপ।

কপিলের সহিত আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে বিবাদ—তাঁহার ঈশ্বরবিষয়কে

ধারণা লইয়া। যেমন ব্যষ্টি বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যষ্টি শরীর পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতিক সান্ত প্রকাশশ্রেণীর পশ্চাতে উহার নিয়ন্তা ও শাস্তা স্বরূপ আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন, সমষ্টিতেও বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডেও—সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি মন, সমষ্টি সূক্ষ্ম ও স্থূল জড়ের পশ্চাতে তাহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপে কে আছেন, আমরা তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই সমষ্টি বুদ্ধ্যাদি শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়ন্তা ও শাস্তাস্বরূপ একজন সর্ব্বব্যাপী আত্মা স্বীকার না করিলে ঐ শ্রেণী সম্পূর্ণ হইবে কিরূপে? যদি আমরা সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন শাস্তা আছেন, এ কথা অস্বীকার করি, তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর পশ্চাতেও যে একজন আত্মা আছেন, ইহাও অস্বীকার করিতে হইবে; কারণ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একই নির্ম্মাণপ্রণালীর পৌনঃপুনিকতা মাত্র। আমরা একতাল মাটিকে জানিতে পারিলে সকল মৃত্তিকার স্বরূপ জানিতে পারিব। যদি আমরা একটী মানবকে বিশ্লেষণ করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎকে বিশ্লেষণ করা হইল; কারণ, উহারা একই নিয়মে নির্ম্মিত। অতএব যদি ইহা সত্য হয় যে, এই ব্যষ্টি শ্রেণীব পশ্চাতে এমন একজন আছেন, যিনি সমুদয় প্রকৃতির অতীত, যিনি কোনরূপ উপাদানে নির্ম্মিত নহেন অর্থাৎ পুরুষ—তাহা হইলে ঐ একই যুক্তি, সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের উপরও খাটিবে এবং উহার পশ্চাতেও একটী চৈতন্য স্বীকারের প্রয়োজন হইবে। যে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য প্রকৃতির সমুদয় বিকারের পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছে, তাহাকে বেদান্ত সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর বলেন।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দুইটী বিষয় হইতে গুরুতর বিষয় লইয়া সাংখ্যের সহিত আমাদিগকে বিবাদ করিতে হইবে। বেদান্তের মত এই যে, আত্মা একটীমাত্রই থাকিতে পারেন। আমরা বিবাদের প্রারম্ভেই সাংখ্যেরই মত লইয়া—যেহেতু আত্মা অপর কোন বস্তু হইতে গঠিত নহে, সেই হেতু প্রত্যেক আত্মা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে, ইহা প্রমাণ করিয়া উঁহা-দিগকে বেশ ধাক্কা দিতে পারি। যে কোন বস্তু সীমাবদ্ধ, তাহা অপর কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই টেবিলটী রহিয়াছে—ইহার অস্তিত্ব অনেক বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর সীমাবদ্ধ বস্তু বলিলেই পূর্ব্ব হইতে এমন একটী বস্তুর কল্পনা করিতে হয়, যাহা উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। যদি আমরা 'দেশ' সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাই, তবে আমাদিগকে উহাকে একটী ক্ষুদ্র বৃত্তের মত চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু তাহারও বহির্দ্দেশে আরও 'দেশ'

রহিয়াছে। আমরা অন্য কোন উপায়ে সীমাবদ্ধ 'দেশের' বিষয় কল্পনা করিতে পারি না। উহাতে কেবল অনন্তের মধ্য দিয়াই বুঝা ও অনুভব করা যাইতে পারে। সসীমকে অনুভব করিতে হইলে সর্ব্বস্থলেই আমাদিগকে অসীমের উপলব্ধি করিতে হয়। হয় দুইটাই স্বীকার করিতে হয়, নতুবা কোনটীকেই স্বীকার করা চলে না। যখন আপনারা কাল সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন আপনাদিগকে নির্দ্দিষ্ট একটা কালের অতীত কাল সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হয়। উহাদের একটী সীমাবদ্ধ কাল, আর বৃহত্তরটী অসীম কাল। যখনই আপনারা সসীমকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিবেন, তখনই দেখিবেন, উহাকে অসীম হইতে পৃথক্ করা অসম্ভব। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা তাহা হইতেই প্রমাণ করিব যে, এই আত্মা অসীম ও সর্ব্বব্যাপী। এখন একটী গভীর সমস্যা আসিতেছে। সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত পদার্থ কি দুইটী হইতে পারে? মনে করুন, অসীম বস্তু দুইটী হইল—তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একটী অপরটীকে সীমাবদ্ধ করিবে। মনে করুন, 'ক' ও 'খ' দুইটী অনন্ত বস্তু রহিয়াছে। তাহা হইলে অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ'কে সীমাবদ্ধ করিবে। কারণ, আপনি ইহা বলিতে পারেন যে, অনন্ত 'ক' অনন্ত 'খ' নহে, আবার অনন্ত 'খ'এর সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, উহা অনন্ত' 'ক' নহে। অতএব অনন্ত একটীই থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অনন্তের ভাগ হইতে পারে না। অনন্তকে যত ভাগ করা যাক্ না কেন, তথাপি উহা অনন্তই হইবে; কারণ, উহাকে নিজ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে না। মনে করুন, এক অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, উহা হইতে কি আপনি এক ফোঁটাও জল লইতে পারেন? যদি পারিতেন, তাহা হইলে সমুদ্র আর অনন্ত থাকিত না, ঐ এক ফোঁটা জলই উহাকে সীমাবদ্ধ করিত। অনন্তকে কোন উপায়ে ভাগ করা যাইতে পারে না।

কিন্তু আত্মা যে এক, তাহার ইহা হইতেও প্রবলতর প্রমাণ আছে। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড সত্তা—ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। আর একবার আমরা পূর্ব্বকথিত 'ক' 'খ' নামক অজ্ঞাতবস্তুসূচক চিহ্নের সাহায্য গ্রহণ করিব। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, যাহাকে আমরা বহির্জ্জগৎ বলি, তাহা 'ক'+মন, আর অন্তর্জ্জগৎ—'খ'+মন। 'ক' ও 'খ' এই দুইটাই—অজ্ঞাতসংখ্যাবাচক—উভয়টাই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এক্ষণে

মন কি, দেখা যাক্। মন দেশকালনিমিত্ত ছাড়া আর কিছুই নহে—উহারাই মনের স্বরূপ। আপনারা কাল ব্যতীত কখন চিন্তা করিতে পারেন না, দেশ ব্যতীত কোন বস্তুর ধারণা করিতে পারেন না, এবং নিমিত্ত বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া কোন বস্তুর কল্পনা করিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত 'ক' ও 'খ', এই তিনটী ছাঁচে পড়িয়া মন দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেছে। ঐগুলি ব্যতীত মনের স্বরূপ আর কিছুই নহে। এখন ঐ তিনটী ছাঁচ, যাহাদের স্বয়ং কোন অস্তিত্ব নাই, তাহাদিগকে তুলিয়া লউন। কি অবশিষ্ট থাকে? তখন সবই এক হইয়া যায়। 'ক' ও 'খ' এক বলিয়া বোধ হয়। কেবল এই মন, এই ছাঁচই উহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল এবং উহাদিগকে অন্তর্জ্জগৎ ও বাহ্যজগৎ এই দুইরূপে ভিন্ন করিয়াছিল। 'ক' ও 'খ' উভয়ই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমরা উহাদিগের উপর কোন গুণের আরোপ করিতে পারি না। সুতরাং গুণ বা বিশেষণরহিত বলিয়া ঐ উভয়ই এক। যাহা গুণরহিত ও নিরপেক্ষ পূর্ণ, তাহা অবশ্যই এক হইবে। নিরপেক্ষ পূর্ণ বস্তু দুইটী হইতে পারে না। যেখানে কোন গুণ নাই, সেখানে কেবল এক বস্তুই থাকিতে পারে। 'ক' ও 'খ' উভয়ই নির্গুণ, কারণ, উহারা কেবল মন হইতেই গুণ পাইতেছে। অতএব এই 'ক' ও 'খ' এক।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তামাত্র। জগতে কেবল এক আত্মা এক সত্তা আছে আর সেই এক সত্তা, যখন দেশকালনিমিত্তের ছাঁচের মধ্যে পড়ে, তখনই তাহাকে বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, সূক্ষ্ম ভূত, স্থূল ভূত আদি আখ্যা দেওয়া হয়। সমুদয় ভৌতিক ও মানসিক আকার বা রূপ, যাহা কিছু এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা সেই এক বস্তু—কেবল বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। যখন উহার—একটু এই দেশকালনিমিত্তের জালে পড়ে, তখন উহা আকারগ্রহণ করে বলিয়া বোধ হয়—ঐ জাল সরাইয়া দেখুন—সবই এক। এই সমগ্র জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ, আর উহাকেই অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম বলে। ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্দেশে আছেন বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন তিনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীত হন, তখন তাঁহাকে আত্মা বলে। অতএব এই আত্মাই মানবের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর। একটীমাত্র পুরুষ আছেন—তাঁহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন ঈশ্বর ও মানব উভয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ

করা হয়, তখন উভয়ই এক বলিয়া জানা যায়। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনিই স্বয়ং, অবিভক্ত আপনি। আপনি এই সমগ্র জগতের মধ্যে রহিয়াছেন। সকল হস্তে আপনি কার্য্য করিতেছেন, সকল মুখে আপনি খাইতেছেন, "সকল নাসিকায়—আপনি শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেছেন, সকল মনে আপনি চিন্তা করিতেছেন।"* সমগ্র জগৎই আপনি। এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার শরীর। আপনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ উভয়ই; আপনিই জগতের আত্মা আবার আপনিই উহার শরীরও বটেন। আপনিই ঈশ্বর, আপনিই দেবতা, আপনিই মানুষ, আপনিই পশু, আপনিই উদ্ভিদ্, আপনিই খনিজ, আপনিই সব—সমুদয় ব্যক্ত জগৎই আপনি। যাহা কিছু আছে, সবই আপনি, যথার্থ 'আপনি' যাহা—সেই এক অবিভক্ত আত্মা—যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ব্যক্তিবিশেষকে আপনি 'আপনি' বলিয়া মনে করেন, তাহা নহে।

এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতেছে, আপনি অনন্ত পুরুষ হইয়া কিরূপে এইরূপ খণ্ড খণ্ড হইলেন, অমুক রাম শ্যাম হরি, পশুপক্ষী ও অন্যান্য বস্তু হইলেন। ইহার উত্তর এই, এই সমুদয় বিভাগ আপাতপ্রতীয়মানমাত্র। আমরা জানি, অনন্তের কখন বিভাগ হইতে পারে না। অতএব আপনি একটা অংশমাত্র, একথা মিথ্যা, উহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আর আপনি যে অমুক রাম শ্যাম হরি, এ কথাও কোন কালে সত্য নহে, উহা কেবল স্বপ্নমাত্র। এইটী জানিয়া মুক্ত হউন। ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত।

"আমি মনও নহি, দেহও নহি, ইন্দ্রিয়ও নহি—আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমিই সেই, আমিই সেই।" †

ইহাই জ্ঞান এবং ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান। যাহা কিছু সমুদয়ই অজ্ঞান, অজ্ঞানের ফলস্বরূপ। আমি আবার কি জ্ঞান লাভ করিব? আমি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। আমি আবার জীবন কি লাভ করিব?

* গীতা—১৩শ অধ্যায় দেখ।

† মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমী ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
——নির্ব্বাণ-ষট্‌ক।১।

আমি স্বয়ং প্রাণস্বরূপ। জীবন আমার স্বরূপের গৌণ বিকাশমাত্র। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি জীবিত, তাহার কারণ, আমিই জীবন-স্বরূপ, সেই এক পুরুষ। এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা আমার মধ্য দিয়া প্রকাশিত নহে, যাহা আমাতে নাই এবং যাহা মৎস্বরূপে অবস্থিত নহে। আমিই ভূতসমূহরূপে প্রকাশিত হইয়াছি। কিন্তু আমি এক, মুক্তস্বরূপ। কে মুক্তি চায়? কেহই মুক্তি চায় না। যদি আপনি আপনাকে বদ্ধ বলিয়া ভাবেন ত বদ্ধই থাকিবেন, আপনি নিজেই নিজের বন্ধনের কারণ হইবেন। আর যদি আপনি উপলব্ধি করেন যে, আপনি মুক্ত, তবে এই মুহূর্ত্তেই আপনি মুক্ত। ইহাই জ্ঞান—মুক্তিপ্রদজ্ঞান এবং সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্যই মুক্তি।

মধুর রস ও বৈষ্ণব কবিকুল।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।] [শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

তারপর সেই মধুর রূপ তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল, তিনি দেখিলেন ও বুঝিলেন :—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো
মধুরম্ মধুরম্ মধুরম্ মধুরম্॥" (১)

অমনি যে বিল্বমঙ্গল দুদিন আগে গণিকার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বারবার "খাতি সুন্দর" (২) বলিয়া পাগল হইয়াছিল, সেই আজ পরম চিন্তামণির রূপ হৃদয়ে ধরিয়া ভক্তাগ্রগণ্য বিল্বমঙ্গল ঠাকুর হইয়া দাঁড়াইল। ভাগবতী লালসায় ভগবান্‌কে ধরিতে পারিবার এমন উজ্জ্বল উদাহরণ বুঝি আর জগতে নাই।

তাই আমি বলিতেছিলাম যে, বৈষ্ণব কবির লালসার চিত্র অবশ্য চিত্রণীয় ও অতিশয় শিক্ষা-প্রদ। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের জন্য এ লালসা অবশ্যম্ভাবী। এ লালসার চিত্র না আঁকিলে বৈষ্ণব কবিতা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

(১) বিল্বমঙ্গল—কৃষ্ণকর্ণামৃত।

(২) গিরীশচন্দ্র ঘোষের বিল্বমঙ্গল

বৈষ্ণব কবিকুল শ্রীরাধাকে অশ্লীল ভাবে দেখিয়াছেন এমন যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত। তাঁহাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেন বৈষ্ণব পদাবলী হইতে শত হস্ত দূরে থাকেন। কারণ, এই ভাবে বৈষ্ণব কবিকে কখনই বুঝা যাইবে না।

লালসায় ও বিরহে প্রেমিক প্রেমিকার মনে নানা দশার উৎপত্তি হয়, যথা—

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥ *

চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। তাই শ্রীরাধা কহিতেছেন :—

"সখি রে মনের বেদনা কাহারে কহিব
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে ঝুরি দিবা রাতে
সদাই চমকে চিত॥
কুল তেয়াগিনু ভরম ছাড়িনু
লইনু কলঙ্কের ডালা.
যে জন যে বল আমারে না বল
ছাড়িতে নারিব কালা॥
সে ডালি মাথায় করি দেশে দেশে ফিরি
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরাচর কুলের বিচার
তবে সে আমার যাবে॥"

তাই আবার ভক্ত কবি কহিতেছেন :—

"চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া মরে সে ঝুরিয়া
কি তার আপন পরে॥"

শ্রীরাধার ইহাই তপস্যা। "ভক্ত যখন জগৎ সংসার ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়ায়, তখনই যথার্থ তাহার মনে প্রেম জাগিয়াছে।" (১) মানুষ এই শোক-

* উজ্জ্বল নীলমণি—বিপ্রলম্ভ প্রকরণম্।

(১) অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভক্ত চরিতামৃত।

তাপময় সংসারকে চিরদিন পতিভে বরণ করিয়া তাহার দাসত্ব অঙ্গীকার করে, এবং তাহাতেই আত্মাকে কৃতার্থ বলিয়া ভাবে। ভক্তের হৃদয়ে ভাগবত প্রেমের সঞ্চার হইলে এই সংসার রূপ পতির প্রতি তাহার বিরাগ উপস্থিত হয়। তেমন সময়ে দুইটী বিপরীতগামী ভাবের তুমুল কলহ ভক্তের হৃদয়ে উপস্থিত হয় যিনি ভক্তির জোরে এই সংসারাসক্তি রূপ বাধা অতিক্রম করিতে পারেন, তিনিই কৃষ্ণদর্শনে ও কৃষ্ণের সহিত মিলনের অধিকারী। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, সংসারাসক্ত জীব ভক্তের নিন্দা, পরিবাদ ও দ্বেষ করিয়া থাকে, নানা প্রয়োচনায় তাঁহার ভক্তির মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে। কেহ তাঁহাকে পাগল বলে, কেহ বা প্রতারক বলে; কারণ, সংসারী মানবের একটা কু অভ্যাস আছে যে, যাহা নিজের ভাল লাগে, না তাহা সে অপরে সহ্য করিতে পারে না। মহাকবি কালিদাস যথার্থ কহিয়াছেন :—

"মহাজন যিনি অসামান্ত লীলা তাঁর
বুঝিতে না পেরে অকারণ ভাবি মনে,
কুজন যে জন নিন্দা করে হে তাঁহার॥"

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য (১) প্রভৃতি সকল মহাজনেরই অদৃষ্টে যখন সংসারাসক্ত জীবের দ্বারা নির্য্যাতন ঘটিয়াছিল, তখন তদ্ভক্তগণের অদৃষ্টেও যে তদ্রূপ ঘটিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে বলিয়া কবে কেহ বা নিজ নির্দ্ধারিত পথ হইতে বিচলিত হইয়াছেন? ভক্তের ইহাই রীতি, সনাতন, রূপ গোস্বামী, হরিদাস প্রভৃতি মহাভক্তগণের জীবনী আলোচনা করিলে এই তথ্যই আমরা বুঝিতে পারি।

এখন আমাদের এই সকল তত্ত্ব শ্রীরাধার বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীরাধা ভক্তিরূপিণী, ভক্তির সজীব মূর্ত্তি, অতএব ভক্তের যে সকল ভাব উপস্থিত হয়,

---

কুমারসম্ভব—পঞ্চম সর্গ।

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকম্
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্।

(১) হেন কালে পাষণ্ডী হিন্দু চারি পাঁচ জন।
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।

* * *

পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥ চৈঃ চঃ আদি :—১৭।

তাঁহাতে আমরা সে সকলই পাইব। তাঁহার যথার্থ পতি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কল্পিত পতি আয়ান অর্থাৎ সংসার। ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সংসারের প্রতি আসক্তি বা মায়া ছিল,তাহাই তাঁহার শ্বশ্রু জটিলা,— সংসারাসক্তি চিরদিনই জটিলা। আবার সংসারাসক্ত জীবের মৎসরতা অথবা বিদ্বেষ-বুদ্ধি এই সংসারাসক্তিপ্রসূতা,অতএব ইহা চিরদিনই কুটিলা। এই কুটিলাই শ্রীরাধার পাপ ননদিনী। তাই শ্রীরাধার প্রতি জটিলা ও কুটিলার বিদ্বেষ কখনও ঘুচিল না ও ঘুচিবে না। শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত কহিয়াছেন,"ব্রজলীলায় শ্রীমতী রাধিকা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়াও আবার অপরের বিবাহিতা স্ত্রী। এটী বড় মধুর ভাব। সংসার-রূপ আয়ানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও নিঃস্বার্থ প্রেমিকা রাধার শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ। বেদবিহিত পথের শীতলতা ও রাগানুগ পথের মধুরতা প্রদর্শন করাই পরকীয়া প্রেমের মুখ্য উদ্দেশ্য। কোনও নীচবাসনাযুক্ত ইন্দ্রিয়-ভাব লইয়া যাইলে এ প্রেম বুঝিবার উপায় নাই।"(১)

ভক্তিপ্রসূত লালসার অস্ত্রে এই সকল বাধা ছিন্ন করিতে পারিলে তবে ভগবন্মিলন ঘটিতে পারে। তাই শ্রীরাধার হৃদয়ে এ সকলের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব উপস্থিত হইয়াছে। ভক্তকে যখন সংসারাসক্ত জীব সংসারের প্রলোভন দেখায়, তখন ভক্ত তাহার কি উত্তর দেন? তিনি বলেন, তোমরা সংসার লইয়া থাক, আমি ভগবান্ লইয়াই থাকিব। শ্রীরাধা ভক্ত ও সংসারী জীবগণ কুলবতী নারী; তাহারা কুল চায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চান:—

"কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন
এ দুটি নয়ান তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলি
নিমিখে নিমিখহারা।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও ধরম করম
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি আরতি
আর কার জানি হয়॥

(১) চৈতন্যচরিতামৃতের উপক্রমণিকা।

যে মোর করম কপালে আছিল
বিধি মিলাওল তায়।
তোমা কুলবতী ভজ নিজ পতি
থাক ঘরে কুল লই ॥
গুরু দুরজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া ॥
পড়সী দুর্জ্জন বলে কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাস কয় কানুর পিরীতি
জাতিকুলশীল ছাড়া ॥

যখন শ্রীরাধার এমন অবস্থা, তখন সখীর কার্য্য আরম্ভ হইল। সখী শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়া সংবাদ দিল :—

"মাধব তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন বাধা ॥
ভাবে ভরল তনু পুনঃ পুনঃ কম্পিত
পুনঃ পুনঃ শ্যামবিগোরী।
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত
ভূঁয়ে শুতয়ে পুনবেরি ॥
কুবল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভাণে।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ ভালে সমঝত
কোন করব চিত আনে ॥

এইবার আমরা পটপরিবর্ত্তন করিব। দেখাইব, শ্রীরাধার হৃদয়ে যত উল্লাস, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে ততোধিক উল্লাস, শ্রীরাধার হৃদয়ে যত লালসা, তার দ্বিগুণ লালসা শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে বিরাজমান। ভগবানের রূপে ভক্ত যেমন পাগল, ভগবানও ভক্তের রূপে তেমনি বিমোহিত। ভক্ত যেমন ভগবানের সবটুকু চায়, ভগবানও ভক্তের সবটুকু চাহেন—তাহার আত্মা, তাহার প্রাণ, তাহার দেহ, সবই ভগবানের লোভনীয়

হইয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব কবির রূপবর্ণনার প্রস্তাবও উপস্থিত করিতে হইবে। ভক্তের প্রেম ভগবান্‌কে কত আনন্দিত, কত বশীভূত করে, তাহার পরিচয় আমরা এইবার গ্রহণ করিব। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে আত্মীয়তা, তাহা কত নিগূঢ়, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। ভক্ত প্রেমমন্ত্র জপিতে জপিতে পাগল হইয়া প্রলাপ-বচনে কহেন :—

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কইল 'পি'।
রসের সাগর মন্থন করিতে
তাহে উপজিল 'রী'॥
পুন যে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল 'তি'।
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি॥
যাহার মরমে পশিল যতনে
এ তিন আখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন বড়ই বিষম
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥"

ভগবান্ বলেন :—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥

যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ (১)

ভক্তের প্রতি ভগবানের ভালবাসার মহত্ত্ব, বৈষ্ণব কবি বড় উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের যে ভালবাসা, বলা বাহুল্য বৈষ্ণব কবিতায় তাহাই শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা এই বার আমরা তাহারই পরিচয় লইতে প্রবৃত্ত হইব। আশা করি আপনারা আমাকে সে অবসর দিবেন।

শঙ্কর-প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

এজেণ্ট শ্রীকণ্ঠ শাস্ত্রীর নিকট হইতে যাহা সংগ্রহ করিলাম, তাহার সার এইঃ—

১। বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যের জন্ম বৃত্তান্ত।

বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যের গুরুদেব একজন সাধক ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কোন উপযুক্ত শিষ্য পান নাই পূজান্তে একদিন যথা সুখে বসিয়া আছেন, এমন সময় মহীশূর প্রদেশ হইতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গুরু দর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধটী নিতান্ত গুরুভক্ত ও পরম জ্ঞানী ছিলেন, গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভগবৎকথায় নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর যাইবার সময় কথায় কথায় নিজ অপুত্রক দশার কথা তুলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গুরুদেব কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বৃদ্ধের আক্ষেপ-বচন শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন যে, যদি তুমি তোমার পুত্রটীকে আমায় দেও, তাহা হইলে তোমার একটী পুত্র হইতে পারে, বৃদ্ধ বাস্তবিকই পুত্রাভাবে বড়ই ক্ষুণ্ণ ছিলেন, এবং সে বয়সে যে পুত্র হইতে পারে, তাহাতেও তাঁহার ঘোর সন্দেহ ছিল। তিনিও বিবেচনা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলেন যে, আমি ত পুন্নামক নরক

(১) শ্রীমদ্ভাগবতম্—৯মঃ স্কন্ধ ৪থ অধ্যায়॥

হইতে উদ্ধার পাইব, তা পুত্রটীকে আপনাকেই দিব।" গুরুদেব শিষ্যের আগ্রহাতিশয় দেখিয়াই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে বলিলেন যে, "ভগবৎকৃপায় তোমার একটী পুত্র হউক।" বৃদ্ধ এ প্রকার অভাবনীয় আশীর্ব্বচন লাভ করিয়া বাটী ফিরিলেন। অনন্তর ভগবদিচ্ছায় তদবধি এক বৎসরের মধ্যেই ব্রাহ্মণীর গর্ভধারণবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। যথাসময়ে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, গুরুদেবকেও সম্বাদ দিলেন, কিন্তু তিন বৎসরের ভিতর গুরু দর্শনে আসিলেন না। তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী পুত্রটীকে লইয়া গুরুদেব দর্শনে শৃঙ্গেরী আসিলেন, মনোগত ভাব এই---যদি গুরুদেব কৃপা করিয়া পুত্রটীকে না লইতে চাহেন তজ্জন্য উভয়ে ভিক্ষা করিবেন। ইঁহাদের তখন পুন্নাম নরকের ভাবনা গিয়াছে, এখন ভাবিতেছেন, গুরুদেব পুত্রটীকে লইলে ত সন্ন্যাসী করিবেন, সুতরাং বংশ রক্ষা ত হইবে না, এজন্য পুত্রটীকে গুরুদেবের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লইবেন। গুরুদেবের সদয় স্বভাব স্মরণ করিয়া বড় আশা যে, তাঁহাদের এ প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিবে না। যাহা হউক, বালকটীর তিন বৎসর বয়স সময়ে পিতামাতা পুত্রটীকে লইয়া শৃঙ্গেরী আসিলেন এবং উভয়েই অতি কাতরভাবে পুত্র ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরুদেব বৃদ্ধ পিতামাতার মায়ান্ধ অবস্থা দেখিয়া করুণাপরবশ হইলেন এবং আবার সেই পূর্ব্বের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, 'আচ্ছা, যদি তোমাদের আর একটী পুত্র সন্তান হয়,তাহা হইলে তোমরা ইহাকে আমায় দিবে?' বৃদ্ধ পিতামাতা ইহা শুনিয়া ভক্তিগদগদভাবে গুরুদেবকে ভূয়োভূয় প্রণাম করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলেন, অনন্তর, গুরুদেব পুনর্ব্বার ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া বলিলেন যে, "ভগবদিচ্ছায় তোমাদের আর একটী পুত্র সন্তান হউক।" বাস্তবিকই দুই বৎসর পরে এই দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হইল এবং তখন ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুনরায় শৃঙ্গেরী আসিয়া পাঁচ বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই পাঁচ বৎসরের শিশুই আজ বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য। পরে ইহার বিষয় আরও বর্ণিত হইবে।

২। বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যের শিক্ষা।

ইঁহার শিক্ষাও বড় বিস্ময়াবহ। ইঁহার গুরুদেব ইঁহাকে পাঁচ বৎসরের বয়সের সময় নিজ সন্নিধানে রাখেন এবং আদিগুরু শঙ্করা-

চার্য্যের অনুরূপ সেই পাঁচ বৎসরের সময় উপনয়ন-সংস্কার করিয়া অষ্টমবর্ষে সন্ন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাস প্রদানান্তর যতদিন না ইনি প্রায় ২০।২২ বৎসর বয়স্ক হন, ততদিন ইঁহাকে অপর কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই, দিন রাত যোগাভ্যাস ও শাস্ত্রাধ্যয়নে কাল কাটাইতে হইয়াছে।

৩। শৃঙ্গেরীর স্থান পরিবর্ত্তন।

ম্যানেজার মহাশয়ের অনুমান—আদি শঙ্করাচার্য্যের সময় শৃঙ্গেরী সহর বর্ত্তমান শৃঙ্গেরীর প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। এই স্থানটীকে ইনি পুরাতন শৃঙ্গেরী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি সন্ধ্যার সময় একটী ভৃত্য সঙ্গে এই স্থানটী দর্শন করি। এখানে পুরাতন "ঢিবি" কয়েকটী এখনও দেখা যায় এবং এখনও একটী ক্ষুদ্র জীর্ণ মন্দিরে একটী শিবলিঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র জীর্ণ মন্দিরটী পূর্ব্বে পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য স্বামীর গুরু পরম যোগী বিদ্যাশঙ্করের বাসস্থান ছিল।

৪। বিদ্যাশঙ্কর-কথা।

বিদ্যাশঙ্কর বিদ্যারণ্যের গুরু ছিলেন। ইনি পরমযোগী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারই প্রভাবে আচার্য্যশঙ্করপ্রচারিত অদ্বৈতসম্প্রদায়ের দক্ষিণ দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠা জন্মে। আচার্য্য শঙ্করের ২।৩ পুরুষ পরে জৈন সম্প্রদায় পুনরায় মস্তকোত্তোলন করে। তখন আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতমত দ্বারা জৈনমত বিধ্বস্ত করেন, ও অদ্বৈতমতেরও বিশেষ ক্ষতি সাধন করেন। এইরূপে আচার্য্য শঙ্করের মত, মধ্যে কিছু ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িলে বিদ্যাশঙ্কর নিজ শিষ্য বিদ্যারণ্য সাহায্যে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যারণ্য স্বামীও আদি-শঙ্করাচার্য্যের মত দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন এবং অদ্বৈতমতের পুনঃপ্রচার করিয়াছিলেন। ইনি সকল দর্শন মত আলোচনা করিয়া শঙ্কর দর্শনের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত করিয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ * গ্রন্থখানি এই উদ্দেশ্যে রচিত।

* ইতিপূর্ব্বে অস্মদ্দেশে এই গ্রন্থের যে সংস্করণ হইয়াছিল, তাহাতে ১৫টী দর্শন-মত মুদ্রিত হইয়াছিল এবং অন্তিমে শঙ্কর-দর্শন না দিয়া এই মর্ম্মে একটী শ্লোক দেওয়া হইয়াছিল যে, শঙ্কর-দর্শন জন্য যেন বিদ্যারণ্য অন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই শ্লোকটী পড়িয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে পঞ্চদশীকেই উক্ত গ্রন্থ বিবেচনা করিতেন, কেহ বা বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ নামক ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী ভাষ্যকেই তাহার

বিদ্যারণ্য স্বামী সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ রচনা করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই। ইহাতে পরমত-দূষণ স্পষ্টভাবে সাধিত হয় নাই; অন্যান্য দার্শনিক মতের সহিত তুলনার উদ্দেশ্যে কেবল বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু বিরুদ্ধমত খণ্ডনাভিপ্রায়ে ইনি নিতান্ত অল্প শ্রম করেন নাই। 'প্রধান মল্ল নিপাত ন্যায়ে' অদ্বৈতমতের অত্যন্ত বিরোধী যে দ্বৈত ও বিশিষ্টা-দ্বৈত মত, তাহার খণ্ডনার্থ একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এ গ্রন্থে রামানুজাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্যের মত তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডিত হই-য়াছে। দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থখানি অদ্যাবধি মুদ্রিত হইল না।

যাহা হউক, বিদ্যারণ্য স্বামীর এ প্রকারে দুই এক কথায় পরিচয় প্রদান অসম্ভব ব্যাপার। তবে নিতান্তই যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে, উত্তর ভারতে বেদান্তের সহিত "ন্যায়" মতের সংঘর্ষের ফলে চিৎসুখাচার্য্য ও মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃমি মনিষীগণ চিৎসুখী ও অদ্বৈত সিদ্ধি প্রভৃতি অতুলনীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতকে যেমন নিদাঘের মধ্যাহ্নকালীয় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সমান করিয়া তুলিয়াছেন, তদ্রূপ দক্ষিণ ভারতে, বিদ্যারণ্য স্বামী দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সংঘর্ষে, অদ্বৈতবাদকে শারদীয় পূর্ণশশিরূপে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। এই বিদ্যারণ্য যাঁহার কৃপায় এইরূপ প্রভাশালী হইয়াছিলেন, তিনি সেই পরম-যোগী বিদ্যাশঙ্কর। এই বিদ্যারণ্য যাঁহার পদ সেবা করিয়া এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তিনি সেই মহাপণ্ডিত বিদ্যাশঙ্কর।

বিদ্যাশঙ্কর পুরাতন শৃঙ্গেরীতে উক্ত স্থানে তপস্যা করিতেন। শতাধিক বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে একদিন শিষ্যবর্গকে বলিলেন যে, তিনি দেহত্যাগ করিবেন। শিষ্যবর্গ তাহাতে সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িল এবং যোগ-প্রভাবে আরও কিছুদিন এই মর্ত্ত্যধামে থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন মহাযোগী বিদ্যাশঙ্কর এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিলেন; শিষ্যগণকে বলিলেন যে, তোমরা আমায় সমাধিস্থ অবস্থায় ভূগর্ভে একটী গম্ভীরগর্ত্তমধ্যে স্থাপিত কর এবং গর্ত্তের উপরিভাগ প্রস্তরাদির দ্বারা দৃঢ়ভাবে বদ্ধ কর, এই ভাবে দ্বাদশবর্ষ

স্থান প্রদান করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুনা আনন্দাশ্রম হইতে যে সংস্করণটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ শ্লোকটী নাই এবং তৎপরিবর্ত্তে একটী শঙ্করদর্শন অধ্যায় দৃষ্ট হয়।

অতিক্রান্ত হইলে, আমাকে উত্তোলন করিও, আমার দেহ প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হইযা যাইবে এবং তখন এ দেহের আর অপচয় হইবে না। শিষ্যগণ কতকটা কৌতুহল বশতঃ এবং গুরুর আদেশ নিমিত্ত শোক-বেগ সম্বরণ করিল এবং তাহাই করিল। এইরূপে তিনবর্ষ অতীত হইল। ক্রমে এই কথা গোপন করিলেও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, এবং একদিন তদ্দেশীয় এক ভূস্বামীর প্ররোচনায় মঠের একটী পুরোহিত গোপনে গর্ত্তের মুখ উদ্‌ঘাটন করিল। উদ্‌ঘাটন করিবামাত্র ভিতর হইতে এমন একটী বায়ু নির্গত হইল যে, তাহাতে পুরোহিত অজ্ঞান হইয়া পডিলেন এবং পরে চক্ষু দুইটী চিরতরে হারাইলেন। রাত্রে মঠস্বামী স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, আচার্য্য বিদ্যাশঙ্কর দিব্য কলেবর ধারণ করিয়া তাঁহাদের দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করিযা তাঁহা-দিগকে তিরস্কার করিতেছেন। পরিশেষে গর্ত্তটী তদবস্থায বন্ধ করিয়া তদুপরি শিবস্থাপন করিতে আদেশ কবিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। অদ্যাবধি এই শিবমন্দিরটী শৃঙ্গেরীর শোভা বর্দ্ধন কবিতেছে এবং শিল্পবিদ্যার একটী নিদর্শনরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ক্রমশঃ।

বেদ ও বেদ্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মন্।

পূর্ব্বে দুইটি প্রস্তাবে অভিব্যক্তি বাদের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্বের ক্রমবিকাশপদ্ধতির ব্যাখ্যায় চিন্তাশীল পণ্ডিত স্পেন্সার (Spencer) নানা দিগ্দেশে, বিশেষতঃ ভারতে একরূপ একাধিপত্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া আমি প্রধানতঃ তাঁহারই দৃকভূমী হইতে অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যক্ষমূলক প্রতীচ্য দর্শনের যাঁহারা অল্পবিস্তর চর্চ্চা রাখেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, পণ্ডিত স্পেন্সারের সহিত ডারুইন (Derwin), হকসলী (Huxley), ফিস্কে (Fixe), বেন (Bain) প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দের মতবাদ লইয়া বিশেষ কোন বিরোধ নাই। প্রতীচ্য অভিব্যক্তি-বাদালোচনায় আমার স্পেন্সারের শরণাপন্ন হওয়া, ইহাও একটি

অন্যতম কারণ। কিন্তু তাই বলিয়া স্পেন্সারের (Spencer) সহিত বিশ্বের ক্রমবিকাশপদ্ধতি লইয়া প্রতীচ্য অপরাপর ক্রমবিকাশবাদীদিগের সহিত যে দ্বৈধ নাই, এ কথা আমি বলি না। কারণ ওয়াইজম্যান (Wieseman), ওয়ালেস (Wallace) প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ কর্ত্তৃক প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের বহুবিধ মৌলিক বিষয় লইয়া স্পেন্সারের সহিত বহুতর মতভেদ দৃষ্ট হয়। উদাহরণক্রমে সন্ততিপ্রবণতার বিষয়টি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ডারুইন (Derwin), স্পেন্সার (Spencer) বলেন, পিতার স্বোপার্জ্জিত গুণগ্রাম অপত্যে সংক্রামিত হয়। জর্ম্মান দেশীয় সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ওয়াইজ্‌ম্যান (Wieseman) কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। নানা যুক্তিতর্ক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, জনকের উপার্জ্জিত গুণগ্রাম অপত্যে সংক্রামিত হয় না। কেবল তাহাই নহে, ডারুইন (Derwin), স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, 'অপত্যে সংক্রমণ' (Heriditary Transmission) ব্যাপারটি জীবের জাত্যন্তর-পরিণামের বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু ওয়াইজ্‌ম্যান বলেন, জাত্যন্তর-পরিণামে 'অপত্যে সংক্রমণ' ব্যাপারের সহিত কোনই সংস্রব নাই—অবশ্য জনকের স্বোপার্জ্জিত গুণগ্রামের কথাই এতদ্দ্বারা বলা যাইতেছে—বুঝিতে হইবে। ওয়াইজ্‌ম্যানের (Wieseman) মতে বিশুদ্ধ 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই (Natural selection) জাত্যন্তর-পরিণামের একমাত্র কারণ।

পণ্ডিত ওয়ালেস্‌ (Wallace)ও জাত্যন্তর-পরিণতিতে 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের' কার্য্যকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু স্পেন্সার প্রভৃতি দার্শনিকেরা এবম্বিধ নির্ব্বাচনকে যেমন দৈবমাধ্যস্থ-পরিশূন্য বলিয়াছেন, পণ্ডিত ওয়ালেস (Wallace) তাহা বলেন না। তাঁহার মতে বিশ্বের প্রত্যেক ব্যাপারই সংকল্পাত্মক। কি জড়রাজ্যে, কি জৈবরাজ্যে, সকল পরিণামই সংকল্পমূলক। অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিপুঞ্জের প্রত্যেক রঙ্গভঙ্গে কোন বাহ্য ইচ্ছাশক্তির মাধ্যস্থ একান্ত আবশ্যক। ওয়ালেস বলেন, ইচ্ছাশক্তি ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সম্ভবপর নহে। কেন না যতই সামান্য হউক না কেন, কোন শক্তির লীলাবচিত্র্য অধ্যয়ন করিতে করিতে কখনও যদি আমরা উহাকে আমাদের ইচ্ছাশক্তি-প্রসূত রূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে শক্তির মূল-কারণ-স্বরূপে যখন আমরা অন্য কোনও তথ্য খুঁজিয়া পাই না, তখন সকল শক্তিই যে কাহারও না কাহারও ইচ্ছা-শক্তি-প্রসূত,

এ কথা সকলকেই ন্যায়সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আবার ইচ্ছা-শক্তি যে বাহ্যাভ্যন্তরীণ সর্ব্বপ্রকার শক্তির মূল অথবা সংকল্প,—সর্ব্বপ্রকার শক্তির আদ্যাবস্থা, এ কথা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার্য্য যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল যে কোন এক মহান্ ইচ্ছাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা নহে; পরন্তু উহা অনন্ত জ্ঞানময় কোনও পরম দেবতার মহান্ ইচ্ছা বা সংকল্পশক্তির এক চিত্তবিহ্বলকারী বিচিত্র অভিব্যক্তিমাত্র। যাহা হউক, পণ্ডিত ওয়ালেস্ (Wallace) এইরূপে বিশ্বের প্রত্যেক কার্য্যে কোনও বাহ্য ইচ্ছাশক্তির মাধ্যস্থ (Intervention of an external will) স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যাত অভিব্যক্তিবাদকে প্রতীচ্য জড়বাদীরা 'সাংকল্পিক' (Teliological) এই আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

কেবল পণ্ডিত ওয়ালেস্ (Wallace) যে সর্ব্বশক্তির মূলে ইচ্ছা-বা-সংকল্পের সন্ধান পাইযাছেন তাহা নহে। অধ্যাপক গ্রীন (T H. Green) ও বলিয়াছেন, মানব তাহার ইচ্ছাশক্তির সামান্য প্রকাশমাত্র ("The will is simply the man"—Prolegomena to Ethics"—p p 178.) ক্যাণ্ট (Kant)ও বলিয়াছেন, "মানবের 'সংকল্পই' তাঁহার প্রকৃত আত্মা" ("His will is his proper self"—Metahysics of Ethics p. 71)

কিন্তু স্পেন্সার (Spencer) প্রমুখ ক্রমবিকাশবাদিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রাকৃতিক পরিণামসমূহ কোন 'সংকল্প' বা চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব অপেক্ষা রাখে না। জড়শক্তির অন্ধ উদ্দেশ্যপরিশূন্য পরিবর্ত্তনক্রমেই ঐ সকল পরিণাম হইয়া থাকে। অন্ধ অচেতন প্রকৃতির নির্ব্বাচনই উচ্চাবচ পরিণামের একমাত্র কারণ। যথেচ্ছ প্রাকৃতিক অনুপ্রবেশ দ্বারাই সর্ব্ববিধ পরিণাম সংসাধিত হয়। কেবল ইহাই নহে। স্পেন্সার (Spencer), ডারুইন (Derwin) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, ঐরূপে কোন বাহ্য সংকল্প-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ অথবা কোন সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা, কৌতূহলপ্রয়াসী, পরোক্ষদর্শনাভিলাষী মানবজাতির আদিম-বা-অর্দ্ধ সভ্যাবস্থার লক্ষণ বা ফলমাত্র।

সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন, কৌতূহল প্রয়াসী মানবজাতির অর্দ্ধসভ্যাবস্থার লক্ষণ হউক,আর নাই হউক, এ কথা কিন্তু সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, অভিব্যক্তিবাদী অপরাপর প্রতীচ্য দার্শনিকদ্বয়ের সহিত স্পেন্সারের (Spencer) সহস্র মতবিরোধ সত্ত্বেও, পণ্ডিত স্পেন্সার

রচিত গ্রন্থচতুষ্টয় ও ডারুইন পণ্ডিতের "জাত্যন্তরোৎপত্তি" Origin of species, প্রভৃতি পুস্তকাবলী, বিশ্বের ক্রমবিকাশপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষিত-সমাজে প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। আমরা সেই জন্য কেবল স্পেন্সার (Spencer) ডারুইন (Derwin) প্রভৃতি পণ্ডিতের মতবিরোধের কথা প্রসঙ্গক্রমে সামান্যভাবে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদেরই পুনরনুধাবন করিতেছি।

বিশ্বের ক্রমবিকাশ আমরা পণ্ডিত স্পেন্সারাদির দৃক্‌ভূমী হইতে পূর্ব্বেই একরূপ অবলোকন করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত মতবাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু উক্তমতবাদ যেরূপ জটিল ও যেরূপ অবকৃষ্টভাবে (abstract) উপরে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে প্রোক্ত মতবাদের সারাংশ পুনরায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আলোচনা করিবার পরে তৎসমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিত স্পেন্সার একজন অসাধারণ চিন্তাশীল সন্দিগ্ধবাদী দার্শনিক। সন্দিগ্ধবাদী—কেননা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সন্দিহান। তিনি বলেন, কি জড়, কি চিৎ—কোনও দ্রব্যেরই প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে আমরা সক্ষম নহি। বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান মানবের পক্ষে একান্ত অসম্ভব বোধে তিনি তৎজ্ঞানকে একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিরপেক্ষ জ্ঞান যখন অসম্ভব তখন জ্ঞানমাত্রই যে আপেক্ষিক বা সম্বন্ধাত্মক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই তিনি তটস্থ লক্ষণ সাহায্যে দেশকালপাত্রভেদে অব্যভিচারী আপেক্ষিক জাগতিক জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া বুঝাইয়াছেন। 'জগৎ' কোন্ পদার্থ,---এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তিনি বলেন, অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদির সহিত অজ্ঞাত ও অবিজ্ঞেয় বাহ্যজ্ঞানের সন্নিকর্ষজনিত সংবেদন পুঞ্জই 'জগৎ' নামে প্রসিদ্ধ।

এক্ষণে দেখা যাউক, ইহার অভিব্যক্তি বলিতে স্পেন্সার কি বুঝাইয়া থাকেন। অভিব্যক্তির লক্ষণ কি?

'অভিব্যক্তি' বলিতে তিনি যথোক্ত জড়বর্গের ক্রমসংহনন ও তৎসহবর্ত্তী-কর্ম্ম বা গতির (motion) অপক্ষয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন—যে অপক্ষয় কালে অনির্দ্দেশ্য অবিশেষ সাম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া জড়বর্গ কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।---

"Evolution is the integration of matter and concommittant

dissepation of motion during which matter passes from indefinite incoherent homegeniety to a definite coherent leterogeniety."—First Prin · P 577

অভিব্যক্তি কিরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে ?

স্পেন্সার বলেন, আকর্ষণী বিপ্রকর্ষণী নামধেয় এমন দুইটি বিশ্বতোব্যাপী অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক শক্তি আছে, যাহাদিগের পরিণাম বা পরিবর্ত্তন-সমষ্টি তালে তালে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; তাহারা ঐ ভাবে ক্ষুভিত হইয়া জড়বর্গে অপরিমেয় কালব্যাপী প্রবাহক্রম বা পরিবর্ত্তনধারা সমুপস্থিত করে। তৎকালে আকর্ষণীশক্তির বলাধিক্য হয় এবং ফলস্বরূপ সার্ব্বভৌমিক সংহনন উপস্থিত হইয়া জগতের বিকাশ হয়। পূর্ব্বোক্ত অপরিমেয় কাল গত হইলে বিপ্রকর্ষণী শক্তির আবার বলাধিক্য হইয়া সার্ব্বভৌমিক বিলয়ন সংঘটিত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে, এই নিয়মেই সাম্যভাবস্থিত জড়বর্গ হইতে প্রথমে বিশ্বের বিকাশ, পরে আবার বিকাশ ও আবার, বিময়ন, বিলয়ন এইক্রমে প্রবাহরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"Apparently the universally coexistent forces of attraction and repulsion which * * * necessitate rhythm in the totality of its changes, produce now an immeasurable period turing which attractive forces predominating cause universal concentration and there an immeasurable period during which repulsive forces predominating cause universal deffusion—alternate eras of Evolution and Dissolution."—Ibid P. 537.

এইরূপে স্পেন্সার বলেন, যতদিন না সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ততদিন ক্রমাভিব্যক্তি যে জড়পরিণাম সমুপস্থিত করে, তাহার বিরাম নাই, অন্ত নাই, শান্তি নাই। তবে পরিশেষে যে সাম্যভাব ও শান্তি সর্ব্বত্রই বিরাজ করিবে, ইহা সুনিশ্চিত।

" The changes which Evolution presents cannot end until equilibrium is reached and that equilibrium must be reached"—Ibid.

বিশ্বরাজ্যের বর্ত্তমান অভিব্যক্তিই তবে কি ইহার প্রথমাভিব্যক্তি? না—ইহা বহুর মধ্যে একটি ?

—বহুর মধ্যে ইহা একটি মাত্র। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, অতীতেও বর্ত্তমানের ন্যায় উপর্য্যুপরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি ও লয় বহুবার হইয়াছিল এবং সেই একই বিধান নিয়ন্ত্রিত হইয়া বর্ত্তমানের অনুরূপ, ভবিষ্যতেও বহুবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত, ও লয়প্রাপ্ত হইবে —তবে অবশ্য দেশকালপাত্রভেদে কোন কোন বিশেষ ব্যাপারের নির্দ্দিষ্ট ফলাফল সম্বন্ধে সর্ব্বথা ঐক্য না থাকিতে পারে।—

"And thus there is suggested the conception of a past during which there have successive evolutions analogous to that now going on and a future during which successive other evolutions may go on ever on the principle but never be same in concrete results"

Ibid—P 537.

এই সকল অভিব্যক্তি তরঙ্গের উৎপত্তি ও লয়ের মূল কারণ কি?

স্পেন্সার বলেন, 'শক্তিসাতত্য'ই—ইহাদিগের মূল কারণ।—

"Persistence of Force is the ultimate cause of all these."

যে শক্তির—"সাতত্য" কথিত হইয়াছে তাহা কোন পদার্থ?

—পণ্ডিত বলেন, পেশিক প্রযত্নে (Mascular Effort) আমরা যে শক্তি অনুভব করিয়া থাকি "শক্তিসাতত্য" শব্দে তচ্ছক্তিকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই, কারণ এতচ্ছক্তির "সাতত্য" (Persistence) দৃষ্ট হয় না। সুতরাং যে শক্তির 'সাতত্য' কথিত হইতেছে, তাহার সেই নিগুর্ণ পরা-শক্তি যাহার অপরোক্ষজ্ঞান অনবচ্ছিন্নভাবে আমাদের নিত্য-অনুভূত-শক্তি-সাহায্যে নিয়তই হইয়া থাকে। অতএব "শক্তিসাতত্য" বলিতে আমরাও এমন কোন কারণের "সাতত্য"কে লক্ষ্য করিয়া থাকি, যাহা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের ও ধারণার অতীত। এতদ্দ্বারা আমরা আদ্যন্তশূন্য কোন অপরিচ্ছিন্ন সত্তা, সত্য বা "সৎ" পদবাচ্য অর্থকেই নির্দ্দেশ করিতেছি।

"But now what is the force of which we predicate persistence? It is not the force we are immediately conscious of in our own mascular efforts, for this does not persist. * * * Hence the force of which we ascert persistence is that ABSOLUTE FORCE of which we are indefinitely conscious as the

necessary correlate of the force we know. By the Persistence of Force we really mean persistence of some Cause which transcends our knowledge and concept In asserting it we assert an Unconditioned Reality without beginning or end."

Ibid—191-2

"সৎ" বা সত্যের লক্ষণ কি ?

—'সৎ' বা 'সত্য' শব্দে, স্পেন্সার বলেন, "জ্ঞান সম্বিতের সাতত্য"কেই বুঝাইয়া থাকে।—

"By reality we mean Persistence in consciousness"

পরম সত্যস্বরূপ যে শক্তির বা কারণের "সাতত্য" অভিহিত হইয়াছে, তাহা কিংস্বরূপ ?

—পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, স্পেন্সারের মতে পদার্থজাতের নিরপেক্ষ নিগুর্ণ জ্ঞানে—বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ কোন মানবের পক্ষে অসম্ভব। শক্তি সম্বন্ধেও তাহাই। স্পেন্সার বলেন, আমাদের যে সকল জ্ঞান আছে, তৎসমুদায়ই কার্য্যসহায়ে শক্তি হইতেই সমুদ্ভূত বা প্রাপ্ত। কিন্তু শক্তি জ্ঞান অপর কোন পদার্থ হইতে প্রাপ্তব্য নহে। বীজ-গণিতের ভাষায় বলিতে হইলে, যদি আমরা—ভূত (matter) কর্ম্ম (motion) ও শক্তি (Force), এই ত্রিতয়ের পরিবর্ত্তে 'ক', 'খ', ও 'গ' যথাক্রমে এই তিন অক্ষদ্বারা ইহাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, 'গ'-র মানানুসারে—'ক' ও 'খ'-র মান অবধারিত হইতে পারে। কিন্তু 'গ'-র মান কখনই জানা যাইবে না। অবিদিত 'গ'-র মান চির দিনই অজ্ঞাত ও অগোচর থাকিবে।

"All other modes of consciousness are derivable from experiences of Force but experiences of force are not derivable from anything else. * * * If, to use an algebric illustration, we represent. Matter Motion and Force by the symbols x, y and z. then we may ascertain the values of x and y in terms of z , but the value of z can never be found. Z is the unknown quality which must for ever remain unknown."

Ibid—P. 169-170.

তবে একথা বলা যায় যে, পরিদৃশ্যমান পদার্থের তত্ত্বচিন্তায় রত হইলে তদীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপক বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত দ্বিবিধ শক্তি আমাদের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটি—অক্রিয় বা অবিকারী ও দ্বিতীয়টি সর্ব্বপ্রকার বিকারের হেতু। বিকার-হেতু শক্তির আবার উদিত (actual) ও অব্যপদেশ্য (Potential) ভেদে দ্বিবিধ অবস্থা আছে। যাহা হউক, অবিকার হেতুকে লোকে 'আন্তর' ও বিকার হেতু শক্তিকে 'বাহ্য' এই দুই নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। পণ্ডিত স্পেন্সার বলেন, 'আন্তর' ও 'বাহ্য' ভেদে এই দ্বিবিধ শক্তিই নিত্য এবং এক পদার্থের ধন ও ঋণের (Positive and negative) ন্যায় পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধযুক্ত। যে শক্তির "সাতত্য" অভিহিত হইয়াছে, তাহার ইহাই স্বরূপ।

প্রত্যক্ষের অবিষয়, সর্ব্বকার্য্যের কারণস্বরূপ, আদ্যান্তরহিত এই শক্তি—চিচ্ছক্তি, বা অন্ধ জড় শক্তি?

—যে "শক্তিসাতত্য" অভিহিত হইয়াছে তাহা অন্ধ জড়শক্তি। স্পেন্সার বলেন, যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, চিচ্ছক্তি হইতে জড়শক্তি উদ্ভূত অথবা জড়শক্তি হইতে চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে আমি, শেষোক্তটিই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিব।—

"Nevertheless it may be as well to say here once for all that if we were compelled to choose between the alternatives of translating mental phenomenon into physical or translating physical phenomena into mental phenomena the later alternative would seem the more acceptation of the two"—Prin. of Psy. P. 15 · Vol. I

ক্রমশঃ

তীর্থ-প্রসঙ্গ।

শীত-ঋতু অপগতপ্রায়। উদয়োন্মুখ মধুমাসের প্রাণোন্মাদনায় ভ্রমণশীল চিত্ত অস্থির। স্বাদুশীতল সমীরে প্রভাতের রাঙ্গা রবি আলো ঢালিয়া মধুর শীতাতপে প্রাণিপুঞ্জের চিত্তবিনোদন করিতেছেন। বাতস্নিগ্ধ কিসলয়দলে মুখ লুকাইয়া সুকণ্ঠ দয়েল মধুর তান সাধিতেছে। শ্যামায়িত সরল-বনশ্রেণীর কি মনোলোভা শোভা! নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের চারু ছবিখানি নয়নে উপলব্ধি করিতেই কত সুখ—কত প্রাণভরা আনন্দ! এই আনন্দের রাশি বুকে ধরিয়া ৺চন্দ্রনাথ তীর্থের শ্যামক্রোড়ে উঠিতে চলিলাম।

বিখ্যাত 'চন্দ্রনাথ তীর্থ' পাঠকবর্গের সুবিদিত। কিন্তু এই শাস্ত্রসেবিত মহাতীর্থের ইতিবৃত্ত বোধ হয় অনেকেই জানেন না। তজ্জন্য সংক্ষেপে নিম্নে কিছু উল্লেখ করিলাম।

চৈত্রমাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে, পূজ্যপাদ বেদব্যাস কোন সময়ে কাশীতে তপস্যা করিতে যাইলে তত্রত্য তপস্বী ও মুনিগণ তাঁহার পরিচয় লাভার্থ জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ, কোন্ বংশজাত, তোমার নাম কি, কাহার পুত্র ও তুমি কোথায় বাস করিতে, ইত্যাদি সত্য করিয়া বল।" এই সব প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব বলেন যে, "আমি মৎস্যগন্ধাসুত, পরাশর মুনি আমার পিতা। ৺বিশ্বেশ্বর সেবা ও আপনাদের দর্শন জন্য এখানে আসিয়াছি। আপনাদের সঙ্গে এখানে বাস করাই আমার উদ্দেশ্য।"

তাঁহার কথা শুনিয়া মুনিগণ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, "হে কুলপাংশুল মৎস্যগন্ধাসুত, তোমার জননী যখন যমুনায় ফেরা দিয়া লোকজন পার করিত, সেই সময়ে পরাশর মুনি দৈবাৎ পার হইবার জন্য যমুনাতটে উপস্থিত হইয়া কামান্ধ হন; তাহাতেই তোমার উৎপত্তি! তুমি সেই মৎস্যগন্ধার পুত্র, আমাদিগের সহিত কিরূপে তপস্যা করিবে? ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আপন স্থানে চলিয়া যাও।"

ব্যাসদেব এরূপ ঘৃণিত ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইয়া মনে মনে শিবকে বলিতে লাগিলেন,—"হে জ্ঞানপ্রদানকাতর চতুর শিব! কেন বার বার ছলনা করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ? অদ্যই আমি তোমার স্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি।" অভিমানপূর্ণহৃদয় ব্যাসদেবের প্রস্থানোদ্যম দেখিয়া

ভগবান্ আশুতোষ তখনই সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ তপোধন, শ্রবণ কর, তুমি আমারই অংশসম্ভূত।

ক্ষেত্রং মেহস্তীহ গুহ্যং তদেবানাময়ি দুর্লভং।
মহারম্যং মহাগুহ্যং শ্রীচন্দ্রশেখরে মুনে॥
দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং অগ্নিকোণেহস্তি তদ্ভুবিং।
সদা কলৌ চ স্থাস্যামি উময়া চন্দ্রশেখরে॥

"হে মুনে! পৃথিবীর অগ্নিকোণে দেববাঞ্ছিত অতি গোপনীয় পরম রমণীয় শ্রীচন্দ্রশেখর তীর্থ আছে; আমি সেই চন্দ্রশেখরে উমার সহিত কলিকালে সর্ব্বদা থাকিব। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই স্থানে আমার লিঙ্গসকাশে যাও, তোমার সকল বাসনা সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।" তিনি সান্ত্বনাচ্ছলে ব্যাসদেবকে আরো বলিলেন,—"আমার সেই মঙ্গলময় ক্ষেত্র অতীব স্বাস্থ্যকর ও মোক্ষদায়ক। অন্ন-রূপধারিণী অন্নপূর্ণা সর্ব্বদা সেই স্থানে বসতি করিতেছেন। এই সিদ্ধপীঠে আমি সর্ব্বদা বাস করিব।" এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। তদনন্তর ব্যাসদেব শিববাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি কখনো হিমজলাবৃত হইয়া কখনো বা অগ্নিসমীপে ধ্যানাসক্ত প্রাণে উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে আশুতোষ তাঁহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া বলিলেন, "হে তপোগতপ্রাণ! তুমি বর গ্রহণ কর।" তাহা শুনিয়া ব্যাসদেব ভক্তিবিগলিতহৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "বিভো! কাশীস্থ ঋষিগণ যখন আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন আপনার উপদেশে আমি এখানে আসিয়াছি। আপনি আমার নিকট তখন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাই এখন পূর্ণ করুন, এখানে সর্ব্বদা অবস্থান করুন, ইহাই আমার কামনা।"

সমস্ত তীর্থৈরেকাত্র তীর্থাধিষ্ঠিতবিগ্রহঃ।
তিষ্ঠসিদ্ধ সমীপে চ শ্রীচন্দ্রশেখরে মুনে॥
গয়াদীনি চ তীর্থানি যানি সন্তীহ ভূতলে।
তান্যত্র স্থাপয়িত্বা তু ত্রৈলোক্যতারণং কুরু॥
সিদ্ধির্ভবতু তেহত্রৈব তীর্থৈঃ সার্দ্ধং তপোনিধিঃ।
ন তত্র গচ্ছতঃ পন্থাঃ কুত্রাপি পুনঃ নিষিদ্ধিতাঃ।

হে মুনে! এ জগতে গয়াদি যত তীর্থ আছে, সেই সমুদয় এই সিদ্ধসমীপে শ্রীচন্দ্রশেখর পর্ব্বতে স্থাপন করিয়া এবং সমুদয় তীর্থের সঙ্গে এখানে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিলোক ত্রাণ কর। তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইল বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে

শিব তাঁহার সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে ত্রিশূল নিক্ষেপ করিলেন। তখনি সেই ভূমিখণ্ড কুণ্ডরূপে পরিণত হইয়া তাহার জলমধ্য হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্যাসদেব প্রীত অন্তরে সেই কুণ্ডের পশ্চিম-ভাগে ধ্যানমগ্ন হইলেন। এখনও চর্ম্মাম্বর-পরিহিত সজটামণ্ডলমস্তক দ্বিভুজ উপবীতশোভিতকায় ব্যাসদেবের পাষাণময়ী ধ্যানমূর্ত্তি কুণ্ডের পশ্চিমাংশে দেখিতে পাওয়া যায়। কবীন্দ্রসেবিত সত্যবতীসুত এইরূপে ধ্যানমগ্ন হইলে পার্ব্বতীপতি ভগবান্ আশুতোষ ও—

দেশাৎ প্রাগ্ দক্ষিণে চাস্তি স্বয়ম্ভূলিঙ্গমদ্ভুতং।
পাষাণত্বং স্বয়ংভূত্বা চন্দ্রশেখরমূর্দ্ধনি॥
বিরূপাক্ষাগ্নিকোণে চ বারুণে বিল্বকোটরে।
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে বিষ্ঠতে পার্ব্বতীপতিঃ॥

(বঙ্গ) দেশের পূর্ব্বদক্ষিণকোণে সমুদ্রের উত্তরতীরে, চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের শীর্ষদেশে, বিরূপাক্ষের অগ্নিকোণে, বারুণ বিল্বকুঞ্জে, স্বয়ং পাষাণময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শাস্ত্রকার মহাদেবের উক্ত প্রতিজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াই লিখিয়াছেন যে,

অত্র কাশীং প্রয়াগঞ্চ ভুবনেশং সরিৎপতিং।
গঙ্গাঞ্চ নৈমিষারণ্যঞ্চৈকত্র দর্শনম্ভবেৎ॥

এই তীর্থে কাশী, প্রয়াগ, ভুবনেশ, সমুদ্র গঙ্গা ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি সর্ব্ব-তীর্থের একত্র দর্শন হয় বা ঐ সব তীর্থের ফল একত্র এখানে লাভ হয়।

মহাত্মা ব্যাসদেব এইরূপে চন্দ্রনাথতীর্থকে কলিযুগে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া মহাদেবের নিকট আব্দারের পরিসমাপ্তি করেন। সতীর দক্ষিণ হস্তার্দ্ধপতনই এখানে মহাপীঠস্থানের উদ্ভবের কারণ। পুরাণমুখে শুনা যায়, এতদাখ্যানে পার্ব্বতী দেবীও এখানে চিরকাল অবস্থিতা।

রবিকরফুল্লনবপল্লবোদ্গততরুরাজি মৃদুসমীরে দুলিয়া দুলিয়া দর্শকের অভিনন্দন করিতেছে। চূতমুকুলবাসে ভ্রমরোল্লাস ধ্বনিরূপ প্রকৃতির নীরব আহ্বানে আকুল প্রাণে পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছি। হৃদয়ের অতুল উল্লাসে কায়িক শ্রান্তি অনুভবই হইতেছিল না। এইরূপে ব্যাস-কুণ্ডে পৌঁছিলাম। ভগবান, আশুতোষ যে ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই কুণ্ডের সৃষ্টি। এই কুণ্ডটি এখন যাত্রিগণের স্নানসৌকর্য্যার্থ সরোবরে পরিণত করা হইয়াছে। এই ব্যাসকুণ্ডে উপস্থিত হইলেই সম্মুখে স্নান-

শস্যাস্তরণমণ্ডিত তরঙ্গায়িত পর্ব্বতশ্রেণী দর্শকের নয়নপথে আসে। শ্রেণী-পরম্পরা-রচিত বনভূমির শোভা অতুলনীয়। ব্যাসকুণ্ডে স্নানাহ্নিক করিয়া তীরবর্ত্তী মন্দিরাভ্যন্তরে ধ্যানমগ্ন ব্যাসমুনিকে দেখিতে হয়। এই মন্দিরে বাবা ভৈরবের মূর্ত্তি এবং শঙ্কর ও চণ্ডীমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। বাহিরে মন্দিরপ্রাঙ্গনে একটি সুবৃহৎ বটবৃক্ষ। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বৃক্ষটির সকলে একই অবস্থা দেখিয়া আসিতেছে, কিম্বদন্তী বলে, ভগবান্ চন্দ্র নাথের লীলা বৈচিত্রের ইহা একটি অন্যতম চাক্ষুষ প্রমাণ। এবং এতৎসম্বন্ধে পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে একটি আশ্চর্য্য কথাও প্রচলিত; শুনিলাম, কথাটি এই—

একদিন একটি মুসলমান যুবক কতকগুলি গরু লইয়া পাহাড়ে যাইতে যাইতে নিষেধ না মানিয়া উক্ত বটবৃক্ষের শিকড়ে বসিয়া মূত্র ত্যাগ করিয়া ঐ জায়গা অপবিত্র করে। মুসলমান যুবকটি সকলের কথা অবজ্ঞা করিয়া বলে, "গাছও যদি হিন্দুর দেবতা হয়, তবে আমরাই কেন বাকী থাকি?" কিন্তু মুসলমান যুবকটি কিছুদূর যাইতে না যাইতেই কে তাহাকে একটি চাপড় মারিয়া রাস্তা হইতে পাঁচহাত দূরে এক শ্মশানের মধ্যে ফেলিয়া দিল! সেই নির্জ্জন স্থানে কে যে ঐরূপ করিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। সে ঐ আঘাতে চীৎকার করিতে করিতে পড়িয়া গেল। ঐ চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া জনৈক পথিক আসিয়া তাহার এই অবস্থা দেখিল এবং গ্রামের দিকে যাইয়া তাহাদের জাতভাইদের সংবাদ দেওয়াতে কতিপয় মুসলমান যাইয়া উপদেবতাগ্রস্ত লোকটিকে লইয়া আসিল। তখন তাহার সংজ্ঞামাত্র ছিল না। শুনা যায়, তিন দিন অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া চতুর্থ দিনে তাহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। মুসলমানগণ পরে সকল বিষয় জানিতে পারিয়া সেই অবধি ভক্তিবিনীত প্রাণে উক্ত বৃক্ষকে হিন্দুদিগের ন্যায় অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিম্বদন্তী বলে, এই বটবৃক্ষে ভৈরব নামক দেবযোনীর অবস্থান। বৃক্ষটির অভ্যন্তরভাগে একটি বৃহৎ কোটর। স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের প্রমুখাৎ শুনিতে পাওয়া যায়, ভৈরব বাবাজি তখন সময়ে সময়ে সীতাকুণ্ড বাজার পর্য্যন্ত বেড়াইতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরই তাঁহার ভ্রমণকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। অধি-বাসিগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার নৈশবিহারজনিত পাদুকাধ্বনি ভীত অন্তরে শ্রবণ করিত। বাবাজি নাকি কর্ম্মকারের ঠক্‌ঠকি আদৌ শুনিতে পারেন না। সীতাকুণ্ড বাজারের বর্ত্তমান কামার দোকানগুলি সেজন্য এখনও দিনের

বেলাতেই কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া দোকান পাট বন্ধ করিয়া থাকে। ভৈরব বাবাজির সীমামধ্যে কোনও দুষ্ট লোক রাত্রিকালে বাস করিতে পারে না। তা'হলে তিনি নিদ্রিতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির কণ্ঠ দমন করিয়া এবং নানা বিভীষিকা দেখাইয়া পঞ্চ ক্রোশের বাহির করিয়া দিয়া থাকেন। কোন সময়ে জনৈক স্বৈরিণী বাবাজির সীমায় একখানি পর্ণকুটীরে বসতি করিত। আকারে সে বৈষ্ণবী ছিল, প্রকারের কথা সম্যক্ অবগত নহি। সে নাকি ঐরূপে ভয় পাইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করে। যাউক তাহার কথা, বাবাজি কিন্তু সৎপ্রকৃতির অনেক লোককে তাঁহার সীমানায় স্থান দিয়াছেন, ইহা নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। বিশেষতঃ এই ঘনপর্ব্বতসঙ্কুল চন্দ্রনাথ তীর্থে এত ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু থাকাতেও কোনও দিন কোনও মানুষের অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। ইহাও বাবার সামান্য করুণার কথা নহে।

অতঃপর ব্যাসকুণ্ড হইতে স্বয়ম্ভু শম্ভুনাথ দেবের বাটীতে চলিলাম। দেবালয় পথের (Temple Road) দুই পাশে শ্রেণীপরম্পরায় উত্থিত পর্ব্বতমালা। নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথে এ পর্ব্বতমালার গাম্ভীর্য্য প্রাণস্পর্শী! স্বভাবের গাম্ভীর্য্য সন্দর্শনে প্রাণ তন্ময় হইয়া যায়। নভঃকিরীটী নবকিসলয়ভূষণ গিরিরাজি তপোরত মহর্ষির মত অবিচল। কত যুগযুগান্তরের স্মৃতি বক্ষে রাখিয়া আবহমান কাল হইতে স্থির অবিচলিত ধ্যানমগ্নবৎ দণ্ডায়মান-ইহা কল্পনা করিতেও সুখ! আহা, এ হেন স্বভাব গাম্ভীর্য্য মানবে সম্ভবে কি?

বিজড়িতসহকারমাধবীপল্লবে নাচিয়া নাচিয়া বসন্ত দূর কে কিল কুল কখনো একসঙ্গে কখনো বা নিঃসঙ্গ মধুর তানে কণ্ঠ ফুলাইয়া ডাকিতেছে! সে মূর্চ্ছনা মাধুরী মন মাতাইয়া তোলে! বুঝি বা তাহারা প্রাণের সমস্ত আবেগে প্রকৃতি-পুঞ্জকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য—তাহাদের ভিতর ভগবন্মহিমার সুখস্মৃতি জাগাইবার জন্য কুহুযাদুমন্ত্রোচ্চারণে ফুলিয়া ফুলিয়া ডাকিতেছে! এমন পাষাণ হৃদয় কার যে, সে কুহুস্বরে তাহার প্রাণে এক প্রকার অব্যক্ত অস্ফুট উন্মাদনা না জাগে? ভগবন্! সামান্য পাখীর কুহুধ্বনিতেই যদি এত যাদু,—তবে তোমার মধুর হইতেও মধুর নামে মানব পাগল না হইবে কেন?

ক্রমশঃ।

কহিলে 'আবার আসিবে।'

হেরিলাম অপূর্ব্ব মূরতি, যবে
প্রথম রাজীবপদ করি দরশন।
যেন কার প্রেমে মাতোয়ারা দুটী আঁখি,
অনুক্ষণ হাঁসিতেছে বদন-কমল
করি চারিদিকে অমিয়া বর্ষণ ;
পঞ্চম বর্ষীয় বালক যেমতি
থাকে সদা আনন্দেতে ভোর।
ধন্ত রাণী ধন্ত দেবালয় তব ! এ কি
চঞ্চলপ্রতিমা হেথা করে বিচরণ !!

(২)

কোথা হ'তে আসিলা এ মানুষ রতন
দেব কি মানুষ বুঝা ভার ;
যেন এ মর্ত্ত্যের নাহি হবে ;
কিন্তু আপনার কেহ হবে,
নহে প্রথম দর্শনে কেন প্রাণ টানে !
মিটিল প্রাণের তৃষা বহুদিন পরে—
জীবনের সমস্যা পূরিল এতদিনে—
গেল দূরে কি আশ্চর্য্য মন অন্ধকার
সার্থক হইল বুঝি মানবজীবন
পরশে পরশমণি ॥

(৩)

ভাবিলাম কে হে তুমি হৃদয়রঞ্জন।
প্রেমনয়নের তারা, কেমনে যাইব
ফিরি ঘরে ! তুমি ছাড়া ঘর কোথা আছে।
ফিরে যেতে হবে, বুক ফাটে।
হে অন্তর্যামী মনোভাব সকল জানিলে ;
হাসিলে অপূর্ব্ব হাসি,
মনপ্রাণ করিলে শীতল,
নীরবে থাকিলে কতক্ষণ,
পূর্ব্বের কথা বুঝি করিলে স্মরণ ;
ভাবিলে কিংকর তরে, স্নেহমাখা স্বরে,
কহিলে জননীসম 'আবার আসিবে' ॥

শ্রীম—।

এস বাজায়ে বাঁশী।

এস হে! ওহে মানস-মোহন!
ওহে দয়াল হরি!
দাও হেরিতে ও রাঙ্গা চরণ,
দাও পরাণ ভরি।
এস হে নাচিয়া রাখাল সাজে,
হরি দুবাহু তুলি'।
শুনিব শুনিব নূপুরে বাজে
কিবা মধুর বুলি।
হেলা'য়ে চূড়া, বামেতে হেলায়ে
এস-এস হে সখা।
বন-কুসুম-মালা দুলা'য়ে দুলায়ে
দাও দাওহে দেখা।
দেখিব দেখিব নয়ন মুদে
ওই মধুর হাসি।
এস হে এস হে তাপিত হৃদে
এস বাজা'য়ে বাঁশী!

শ্রীভূপাল চন্দ্র সরকার।

রামকৃষ্ণ মিশন।

ঘাঁটালী বন্যাকার্য্য।

ঘাঁটালে রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাপ্রপীড়িতগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন, পাঠকবর্গ এসংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। কিরূপ ভাবে কার্য্য হইতেছে,, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অদ্য পাঠবর্গকে জানাইব। ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত আমাদের ব্রহ্মচারীরা শ্রীপুর, কাটান ও সাদিচক গ্রামে

৭টী অতি দুঃস্থ পরিবারকে ১৫৲ টাকা সাহায্য করেন। ঐ সময়ের মধ্যেই গড় প্রতাপ নগর, গম্ভীর নগর, নিশ্চিন্দিপুর, সুখচন্দ্রপুর, কিশমত, দুধারবাঁধ, গঙ্গাপ্রসাদ, বলরামপুর, ঠাককণ চক, পাঁচঘরা, কাগমান, রত্নেশ্বর বাটী, মনোহরপুর, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর ও গোপালপুর গ্রামের ৫২টী অন্নক্লিষ্ট পরিবারকে ৩ মণ ১২ সের চাল বিতরণ করেন। ৭ই অক্টোবর রাণীচক ও তন্নিকটবর্ত্তী ১৪টী গ্রামের ৭৪টী পরিবারকে ১০মণ ৪ সের চাল বিতরণ করা হইয়াছে।

বিগত ৮ই অক্টোবর আমাদের ব্রহ্মচারীরা লিখিতেছেন,—

"প্রায় ৬০০টী গ্রামের লোকের বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে। অনেক গরু ছাগল মারা পড়িয়াছে। মানুষও মারা পড়িয়াছে, শুনিলাম। লোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রামেই ৪।৫টি পরিবার এমন আছে, যাহারা একেবারে নিরাশ্রয়। তাহাদের কোন প্রকার আচ্ছাদন নাই এবং তাহাদের পরিবারে উপার্জ্জনক্ষমও কেহ নাই। তাহাদিগকে কুঁড়ে প্রস্তুত করিবার জন্য প্রত্যেককে ৩।৪ টাকা দিতে হইলেও প্রায় দশ বার হাজার টাকা আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট হইতে টেষ্টওয়ার্ক খুলিবার কথা চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে একেবারে উপার্জ্জনাক্ষম লোকদের কিছুই সাহায্য হইবে না। অতএব শীঘ্র শীঘ্র বেশী বেশী টাকা পাঠাইতে হইবে। সপ্তাহে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা পাঠান চাই।"

আমরা ইতিপূর্ব্বেই সংবাদপত্রে সহৃদয় দেশবাসীর নিকট ঘাঁটালবাসী-দের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু এখনও প্রয়োজনানুরূপ অর্থ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া প্রতি সপ্তাহে ১০০৲ টাকা মাত্র পাঠান হইতেছে। উহাতে অতি যৎসামান্যই সাহায্য হইতেছে। কিন্তু শীঘ্র সাধারণের নিকট উপযুক্ত সাহায্য না পাইলে ২।১ সপ্তাহের মধ্যেই এ সাহায্যও বন্ধ করিতে হইবে।

আমরা এখানে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, যে, ঘাঁটালবন্যা দুঃখপ্রতীকার কমিটি হইতে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মারফত ৭৮৲ টাকা পাইয়াছি এবং উক্ত কমিটি আরো সাহায্যে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এক্ষণে সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের নিকট নিবেদন :—তাঁহারা যাহা কিছু অর্থ বা বস্ত্র সাহায্য করিতে পারেন, সত্বর পাঠাইয়া দরিদ্র 'নারায়ণ' গণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন।

মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া)।

অথবা—

কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ১২।১৩, গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,

বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

ইতি।

বশম্বদ।

মঠ, বেলুড় পোঃ,
(হাওড়া)
১২ই অক্টোবর, ০৯।

সারদানন্দ
সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন।

রামকৃষ্ণ মিশন ঘাঁটাল বন্যা-কার্য্যে প্রাপ্তিস্বীকার।

আশ্বিনের উদ্বোধনে স্বীকৃত	১১॥০
ঘাঁটাল বন্যাদুঃখপ্রতীকার কমিটি মাঃ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	৭৬৲
শ্রীযুত কিরণচন্দ্র সেন (বঙ্গবাসী কলেজ কলিকাতা) সংগৃহীত	॥৵০
শ্রীযুত অনন্তকুমার সেন গুপ্ত (ডাণ্ডাস্ হোষ্টেল, কলিকাতা) সংগৃহীত	১৫৶০
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা	৪৲
শ্রীযুত কুঞ্জকৃষ্ণ রায় (কলিকাতা) সংগৃহীত	৫৲
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র কুণ্ড, ভবানীপুর	৩০৲
শ্রীমহাদেব কুণ্ডু, কলিকাতা	১৲
শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, বগুড়া	২৲
	১৪৫।০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৯—১১।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।

লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কে হুবিজ্ঞাতুমর্হতি ॥

ভবভূতি—উত্তর রামচরিত।

[সম্পাদকের নিবেদন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব জীবনবেদ আজ নানাস্থানে নানা লোকের দ্বারা আংশিক ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া জন সাধারণের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছে। শুধু কৌতূহল কেন—লোকে উঁহার একটু আধটু যাহা জানিতে পারিতেছে তাহাতেই বুঝিতেছে একপ অলৌকিক জীবনালোক বিগত চারি শত বৎসরের ভিতর আর ভারতগগন সমুদ্ভাসিত করে নাই এবং তজ্জন্য এই অলোকসামান্য আচার্য্যপ্রবরের শ্রীপদানুসরণে নিজ নিজ ক্ষুদ্র জীবন যথাসম্ভব গঠন করিতে আজ কাল অনেকেই প্রযত্নশীল। কাজেই লোকের এখন স্বতঃই জিজ্ঞাস্য হইয়াছে—ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য সবিস্তারঘটনাবলিসম্বলিত অবতার-প্রতিম উক্ত মহাপুরুষের সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত সম্পূর্ণ লীলাবিলাসকাহিনী কোথায় পাওয়া যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত ঐ ভাবের যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আংশিক পরিতৃপ্তি হয়; আবার তাহার অধিকাংশের ভিতর ভ্রম প্রমাদ থাকায় ভয়ে ভয়ে পড়িতে হয়। পাঠকের এইরূপ বিষম সমস্যাস্থলে "উদ্বোধন" এখন হইতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তচ্ছিষ্যমণ্ডলীর, বিশেষতঃ শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনালোচনা করিয়া যতদূর সম্ভব নির্ভুল ঘটনাবলির সংগ্রহে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীবিবেকানন্দপ্রসঙ্গ নামে উহা এখন হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। অতএব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যাবতীয় শিষ্যমণ্ডলীর নিকট উদ্বোধনের সানুনয় অনুরোধ তাঁহারা যেন ঐরূপ ঘটনাবলী যাঁহার যতদূর সাধ্য সংগ্রহ করিয়া বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ অথবা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করেন এবং সাধারণের এই বিষম অভাব দূর করেন। এখানে একথাও বলা উচিত যে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত" নাম দিয়া যে প্রবন্ধাবলী শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন এতদিন এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছিলেন, তন্মধ্যগত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাংশ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরলোকগত ভাগিনেয় হৃদয় রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। হৃদয়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবায় অনেক দিন পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকায় তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত ঘটনাবলী প্রকাশযোগ্য বলিয়াই উদ্বোধনে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু উহা ভ্রমপরিশূন্য নহে এবং উহাতেও অনেক কথা উল্টাপাল্টা দেখা গিয়াছে। গুরুদাস বর্ম্মন এখন উহা সংশোধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে যত্ন করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। অলমিতি।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাবিলাস—"গোপালের মা"।

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবরলোচনং
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিনং ॥
স্ফ রদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ-নীল-কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজং
*   *   *   *   *
বল্লবীবদনাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রতং ॥

শ্রীগোপালাষ্টক।

"And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me."

Mathew XVIII—6.

গোপালের মা ঠাকুরকে প্রথম কবে দেখিতে আসেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—তবে ১৮৮৫ খৃঃ চৈত্র বা বৈশাখ মাসে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যখন আমারা তাঁহাকে প্রথম দেখি, তখন তিনি প্রায় ছয় মাস ঠাকুরের নিকট গতায়াত করিতেছেন ও তাঁহার সহিত শ্রীভগবানের বালগোপাল ভাবে অপূর্ব্ব লীলাও চলিতেছে। আমাদের বেশ মনে আছে—সেদিন, গোপালের মা শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরের উত্তরপশ্চিম কোণে যে গঙ্গাজলের জালা ছিল, তাহারই নিকটে দক্ষিণপূর্ব্ব স্য হয়ে অর্থাৎ ঠাকুরের দিকে মুখ করে বসেছিলেন; বয়স প্রায় ষাট বৎসর হলেও বুঝিতে পারা কঠিন, কারণ, বৃদ্ধার মুখে বালিকার আনন্দ; আমাদের পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "তুমি গি—র ছেলে? তুমি তো আমাদের গো। ওমা, গি—র ছেলে আবার ভক্ত হয়েচে? গোপাল এবার আর কাউকে বাকি রাখবে না; এক এক করে সব্বাইকে টেনে নেবে! তা বেশ, পূর্ব্বে তোমার সহিত মায়িক সম্বন্ধ ছিল, এখন আবার তার চেয়ে অধিক নিকট সম্বন্ধ হল," ইত্যাদি—সে আজ চব্বিশ বৎসরের কথা।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ; আকাশ যতদূর পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হতে হয়, এ বৎসর আবার কার্ত্তিকের গোড়া থেকেই শীতের একটু আমেজ দেয়—আমাদের মনে আছে। এইরূপ নাতিশীতোষ্ণ হেমন্তেই বোধ হয় গোপালের মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শন লাভ করেন। পটলডাঙ্গার ৺গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের কামারহাটিতে গঙ্গাতীরে যে ঠাকুরবাটী ও বাগান আছে, সেখান হতেই নৌকায় করে তাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। তাঁহারা, বলিতেছি—কারণ গোপালের মা সে দিন একলা আসেন নাই; উক্ত উদ্যানস্বামীর বিধবা পত্নী কামিনী নাম্নী তাঁহার একটী আত্মীয়ার সহিত গোপালের মার সঙ্গে আসেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম তখন কলিকাতায় অনেকের নিকটেই পরিচিত। ইঁহারাও এই অলৌকিক ভক্ত সাধুর কথা শুনিয়াবধি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। কার্ত্তিক মাসে শ্রীবিগ্রহের নিয়ম সেবা করিতে হয়, সে জন্য গোবিন্দ বাবুর পত্নী বা গিন্নী ঠাকুরাণী ঐ সময়ে কামারহাটি উদ্যানে প্রতি বৎসর বাস করিয়া উক্ত সেবার স্বয়ং তত্ত্বাবধান করেন। কামারহাটি হ'তে দক্ষিণেশ্বর আবার দুই বা তিন মাইল মাত্র হবে—অতএব যাবারও বেশ সুবিধা। কামারহাটির গিন্নী এবং গোপালের মাও এই সুযোগের অবসরে রাণী রাসমণির কালীবাটীতে উপস্থিত হন।

ঠাকুর সে দিন ইঁহাদের সাদরে স্বগৃহে বসাইয়া ভক্তিতত্ত্বের অনেক উপদেশ দেন ও ভজন গাইয়া শুনান এবং পুনরায় আসিতে বলিয়া বিদায় দেন। আসিবার কালে গিন্নী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার কামারহাটির ঠাকুরবাড়ীতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ঠাকুরও সুবিধামত একদিন যাইতে প্রতিশ্রুত হেইলেন। বাস্তবিক ঠাকুর গিন্নীর ও গোপালের মার সেদিন অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। বলিলেন—"আহা, চোখ মুখের কি ভাব—ভক্তি-প্রেমে যেন ভাস্‌চে—প্রেমময় চক্ষু। তিলকটি পর্য্যন্ত সুন্দর—অর্থাৎ তাঁহাদের চাল চলন বেশ ভূষা ইত্যাদিতে ভিতরের ভক্তির ভাবই যেন ফুটে বেরুচ্চে—অথচ লোক-দেখান কিছু নাই।

পটল ডাঙ্গার ৺গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত কলিকাতার কোন সওদাগরি আফিসে মুৎসুদ্দি ছিলেন। কার্য্যদক্ষতা ও উদ্যমশীলতায় অনেক সম্পত্তির অধিকারী হন। পরে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। তাঁহার একমাত্র পুত্র উঁহার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। থাকিবার মধ্যে দুই কন্যা, ভূত ও নারাণ ও তাহাদের সন্তান সন্ততি। এদিকে বিষয় নিতান্ত অল্প নহে—কাজেই শেষ জীবনে ধর্ম্মালোচনা ও পুণ্যকর্ম্মেই কাল কাটিত। বাড়ীতে রামায়ণ মহাভারতাদি কথা দেওয়া, কামারহাটির বাগানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সমারোহে স্থাপন করা, ভাগবতাদি শাস্ত্রের পারায়ণ; সস্ত্রীক তুলাদণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র প্রভৃতিকে দান ইত্যাদি অনেক সৎকার্য্য করিয়া যান। বিশেষতঃ কামারহাটির বাগানে শ্রীবিগ্রহের পূজোপলক্ষে তখন বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই থাকিত এবং অতিথি অভ্যাগত, দীন দরিদ্র সকলকেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জীউর প্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হইত।

গোবিন্দ বাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার সতী সাধ্বী রমণীও শ্রীবিগ্রহের ঐরূপ সমারোহে সেবা অনেক দিন পর্য্যন্ত চালাইয়া আসিতেছিলেন। পরে নানা কারণে বিষয়ের অধিকাংশ নষ্ট হইলেও শ্রীবিগ্রহের সেবায় যাহাতে ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে

স্বয়ং তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা থাকিতেন। গিন্নী সেকেলে মেয়ে, জীবনে শোকতাপও ঢের পাইয়াছেন, কাজেই—ধর্ম্মানুষ্ঠানেই শান্তি, এ কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তবু পোড়া মায়া কি সহজে ছাড়ে—মেয়ে, জামাই, সমাজ, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদিও দেখিয়া চলিতে হইত। স্বামীর মৃত্যুর দিন হইতে নিজে কিন্তু কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন মাটীতে শয়ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, এক সন্ধ্যা ভোজন, ব্রত, নিয়ম, উপবাস, শ্রীবিগ্রহের সেবা, জপ, ধ্যান, দান ইত্যাদি লইয়াই থাকিতেন।

কামারহাটির ঠাকুরবাড়ীর অতি নিকটেই গোবিন্দ বাবুর পুরোহিতবংশের বাস। পুরোহিত, নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এক জন গণ্য মান্য ব্যক্তি ছিলেন। 'গোপালের মাতা' ইঁহারই ভগ্নী—পূর্ব্ব নাম অঘোরমণি দেবী—বালিকা-বয়সে বিধবা হওয়ায় পিত্রালয়েই চিরকাল বাস। গিন্নী বা গোবিন্দ বাবুর পত্নীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় ঠাকুরবাড়ীতে এবং ঠাকুরসেবাতেই কাল কাটিতে থাকে। ক্রমে অনুরাগের আধিক্যে গঙ্গাতীরে ঠাকুরবাড়ীতেই বাস করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় অঘোরমণি, গিন্নীর অনুমতি লইয়া মেয়ে মহলের একটি ঘরে আসিয়াই বসবাস করিলেন; পিত্রালয়ে দিনের মধ্যে দুই একবার যাইয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন মাত্র।

গিন্নীর যেমন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তপোনুষ্ঠানে অনুরাগ, অঘোরমণিরও তদ্রূপ, সেজন্য উভয়ের মধ্যে প্রীতির অভাব ছিল না। প্রভেদের মধ্যে বিষয়ের অধিকারিণী গিন্নীকে সামাজিক মানসম্ভ্রমাদি দেখিয়া চলিতে হইত, অঘোরমণির কিছুই না থাকায়, সে সব কিছুই দেখিতে হইত না। আবার নিজের পেটের একটাও না থাকায় জঞ্জাল কিছুই ছিল না। থাকিবার মধ্যে, বোধ হয় অলঙ্কারাদি স্ত্রীধন বিক্রয়ে প্রাপ্ত পাঁচ সাত শত টাকা; তাহাও কোম্পানির কাগজ করিয়া গিন্নীর নিকট গচ্ছিত। উহার সুদ লইয়া এবং সময়ে সময়ে বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইলে মূলধনে যতদূর সম্ভব অল্প স্বল্প হস্তক্ষেপ করিয়াই অঘোরমণির দিন কাটিত। অবশ্য গিন্নীও সকল বিষয়ে তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতার পরিবারবর্গকে সাহায্য করিতেন।

অঘোরমণি কড়ে রাঁড়ি—স্বামীর সুখ কোন দিনই জীবনে জানেন নাই। মেয়েরা বলে "ওরা সব যত্নী রাঁড়ি, নুনটুকু পর্য্যন্ত ধুয়ে খায়"—অঘোরমণিও বয়স প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাই। বেজায় আচার বিচার। আমরা জানি, এক দিন তিনি রন্ধন করিয়া বোক্‌নো হইতে ভাত তুলিয়া পরমহংসদেবের পাতে পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন প্রকারে ভাতের কাটিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোরমণির সে ভাত আর খাওয়া হইল না এবং ভাতের কাটিটিও

গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট আসিতেছেন, ইহা সেই সময়ের কথা।

দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরে দুই তিনটি উনুন পাতা ছিল। শ্রীশ্রীকালীমাতার ভোগরাগ সাঙ্গ হইতে অনেক বিলম্ব হইত, কখন কখন আড়াই প্রহর বেলা হইয়া যাইত। পরমহংসদেবের শরীর অসুস্থ থাকিলে—আর তাঁহার তো পেটের অসুখাদি নিত্য লাগিয়াই থাকিত—শ্রীশ্রীমা ঐ উনুনে সকাল সকাল দুটি ঝোলভাত তাঁহাকে রাঁধিয়া দিতেন। যে সকল ভক্তেরা ঠাকুরের নিকট মধ্যে মধ্যে রাত্রিযাপন করিতেন, তাঁহাদের নিমিত্তও ডাল রুটি ঐ উনুনে তৈয়ারি হইত। আবার কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রমহিলারা ঠাকুরের দর্শনে আসিয়া শ্রীশ্রীমার সহিত ঐ নহবৎ খানায় সমস্ত দিন থাকিতেন এবং কখন কখন রাত্রিযাপনও করিতেন—তাঁহাদের আহারাদিও শ্রীশ্রীমা ঐ উনুনে প্রস্তুত করিতেন। অঘোরমণি—অথবা ঠাকুর যেমন তাঁহাকে প্রথম প্রথম নির্দ্দেশ করিতেন, "কামারহাটির বামুনঠাকরুণ বা বামনী," যে দিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন সে দিন ঠাকুরের ঝোল ভাত রাঁধার পর শ্রীশ্রীমাকে গোবর,গঙ্গাজল প্রভৃতি দিয়া তিন বার উনুন পাড়িয়া দিতে হইত তবে ত হাতে বামনীর বোকুনো চাপিত! এতদূর বিচার ছিল।

"কামারহাটির বামনী" আবার ছেলেবেলা হতে বড় অভিমানিনী। কারুর কথা এতটুকু সহ্য করিতে পারিতেন না—কারুর নিকট হাত পাতা ত দূরের কথা। তার উপর আবার অন্যায় দেখিলেই লোকের মুখের উপর বলিয়া দিতে কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা ছিল না—কাজেই খুব অল্প লোকের সহিত তাঁহার বনিবনাও হইত গিন্নী যে ঘরখানিতে তাঁহাকে থাকিতে দিয়াছিলেন, তাহা একেবারে বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে। ঘরের দক্ষিণের তিনটি জানালা দিয়া সুন্দর গঙ্গাদর্শন হইত এবং উত্তরে ও পশ্চিমে দুইটি দরজা ছিল। 'বামনী' ঐ ঘরে বসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন ও দিবারাত্রি জপ করিতেন। এইরূপে ঐ ঘরে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল বামনীর সুখে দুঃখে কাটিয়া যাইবার পর তবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার প্রথম দর্শন হয়।

বামনীর পিতৃকুল বোধ হয় শাক্ত ছিল—শ্বশুরকুল কি ছিল, বলিতে পারি না—কিন্তু তাঁহার নিজের বরাবর বৈষ্ণবপদানুগা ভক্তি ও গুরুর নিকট হইতে গোপাল মন্ত্র গ্রহণ হইয়াছিল। গিন্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতাও বোধ হয় এই বিষয়ে সহায়ক হয়। কারণ, মালপাড়ার গোস্বামীবংশীয়েরাই গোবিন্দবাবুর গুরুবংশ এবং উঁহাদের দুই একজন কামারহাটির ঠাকুরবাটী হওয়া পর্যন্ত প্রায়ই ঐ স্থানে অবস্থান করিতেন। কিন্তু মায়িক সম্বন্ধে সন্তান-বাৎসল্যের আস্বাদ এ জন্মে কিছুমাত্র না পাইলাও কেমন

করিয়া যে অঘোরমণির বাৎসল্যরতিতে এত নিষ্ঠা হয় এবং শ্রীভগবান্‌কে পুত্র-স্থানীয় করিয়া গোপালভাবে ভজনা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার মীমাংসা হওয়া কঠিন। অনেকেই বলিবেন পূর্ব্ব জন্ম ও সংস্কার—যাহাই হউক, ঘটনা কিন্তু সত্য।

বিলাত আমেরিকায় সংসারে দুঃখ কষ্ট পাইয়া বা অপর কোন কারণে স্ত্রীলোকদিগের ভিতর ধর্ম্মনিষ্ঠা আসিলেই উহা দান, পরোপকার এবং দরিদ্র ও রোগীর সেবারূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। দিবারাত্রি সৎকর্ম্ম করা, ইহাই তাহাদের লক্ষ্য হয়—আমাদের দেশে উহার ঠিক বিপরীত। কঠোর ব্রহ্ম-চর্য্য, তপশ্চরণ, আচার এবং জপাদির ভিতর দিয়াই ঐ ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং সংসার ত্যাগ এবং অন্তর্মুখীনতার দিকে অগ্রসর হওয়াই দিন দিন সাধকের লক্ষ্য হইয়া উঠে। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের এ জীবনে দর্শন লাভ করা জীবের সাধ্য এবং উহাতেই যথার্থ শান্তি--একথা এদেশের জলবায়ুতে বর্ত্তমান থাকিয়া স্ত্রীপুরুষের অস্থিমজ্জায় পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কাজেই 'কামারহাটির বামনীর' একান্ত বাস ও তপশ্চরণ অন্যদেশের আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও এদেশের সহজ ভাব।

* * * * *

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই কামারহাটির বামনী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন—কেন, কি কারণে, এবং উহা কতদূর গড়াইবে, সে কথা অবশ্য কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধুভক্ত এবং ইঁহার নিকট পুনরায় সময় পাইলেই আসিব, এইরূপ ভাবে কেমন একটা অব্যক্ত টানের উদয় হইয়াছিল। গিন্নীও ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে সমাজে নিন্দা করে এই ভয়ে আর আসিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তার উপর মেয়ে জামাইদের জন্য তাঁহাকে অনেক কাল আবার পটলডাঙ্গার বাটীতেও কাটাইতে হইত—আর সেখান হতে দক্ষিণেশ্বর অনেক দূর, এবং আসিতে হলেও সকলকে জানাইয়া সাজ সরঞ্জম করিয়া আসিতে হয়—কাজেই আর আসা হয় না।

বামনীর কিন্তু ও সব ঝঞ্ঝাট তো নাই—কাজেই অল্প দিন পরে জপ করিতে করিতে ঠাকুরের নিকট আসিবার ইচ্ছা হইবামাত্র দুই তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনিয়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র বলিয়া উঠিলেন—"এসেছ—আমার জন্য কি এনেছ দাও।" গোপালের মা বলেন, "আমি তো একেবারে ভেবে অজ্ঞান, কেমন করে সে রোগো সন্দেশ বার করি—এঁকে কত লোকে কত কি ভাল ভাল জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে—আবার তাই ছাই কি আমি আসবামাত্র খেতে চাওয়া?" ভয়ে লজ্জায় কিছু না

বল্‌তে পেরে সেই সন্দেশগুলি বার কল্লেন—ঠাকুরও উহা মহা আনন্দ করে খেতে খেতে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আনো কেন? নারিকেল নাড়ু করে রাখ্‌বে, তাই দুটো একটা আস্‌বার সময় আন্‌বে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধ্‌বে, লাউশাক-চচ্চড়ি, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজ্‌নে খাড়ার তরকারী—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।" গোপালের মা বলেন "ধর্ম্মকর্ম্মের কথা দূরে গেল, এইরূপে কেবল খাবার কথাই হ'তে লাগ্‌লো; আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, ভাল সাধু দেখ্‌তে এসেছি—কেবল খাই খাই, কোল খাই খাই; আমি গরিব কাঙ্গাল লোক—কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক্‌ আর আসবো না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাট যেমন পেরিয়েচি, অমনি যেন পেছন থেকে তিনি টান্‌তে লাগ্‌লেন। কোন মতে এগুতে আর পারি না! কত জোরে মনকে বুঝিয়ে টেনে হিঁচড়ে তবে কামারহাটি ফিরি!" ইহার কয়েক দিন পরেই আবার 'কামারহাটির বামনী,' চচ্চড়ি হাতে করে তিন মাইল হেঁটে পরমহংসদেবের দর্শনে উপস্থিত। ঠাকুরও পূর্ব্বের ন্যায় আসিবামাত্র উহা চাহিয়া খাইয়া "আহা কি রান্না, যেন সুধা, সুধা" বলে আনন্দ করতে লাগ্‌লেন। গোপালের মার সে আনন্দ দেখে চোখে জল এল; ভাবিলেন—তিনি গরিব কাঙ্গাল বলে তাঁর এই সামান্য জিনীসের এত বড়াই কচ্চেন।

এইরূপে দুই চারি মাস ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতয়াত হতে লাগ্‌লো। যে দিন যা রাঁধেন, ভাল লাগ্‌লেই তাহা পরের বারে ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার সময় বামনী কামারহাটি থেকে নিয়ে আসেন। ঠাকুরও তাহা কত আনন্দ করে খান—আবার কখন বা কোন সামান্য জিনীস—যেমন সুষনি শাক সস্‌সড়ি, কলমি শাক চচ্চড়ি ইত্যাদি—আন্‌বার জন্য অনুরোধ করেন। কেবল "এটা এনো ওটা এনো", আর "খাই খাই"র জ্বালায় বিরক্ত হয়ে গোপালের মা কখন কখন ভাবেন, 'গোপাল তোমাকে ডেকে এই হলো? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, কেবল খেতে চায়! আর আস্‌বো না'। কিন্তু সে কি এক বিষম টান, দূরে গেলেই আবার, কবে যাব, কতক্ষণে যাব, এই মনে হয়।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও একবার কামারহাটিতে গোবিন্দ বাবুর বাগানে যান এবং শ্রীবিগ্রহের সেবাদি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। সেখানে শ্রীবিগ্রহের সাম্‌নে কীর্ত্তন ও আহারাদিও করেন। কীর্ত্তনের সময় তাঁহার অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া গিন্নী ও সকলে বিশেষ মুগ্ধ হন। তবে গোস্বামি-

পাদদিগের মনে পাছে প্রভুত্ব হারাইতে হয় বলিয়া একটু ঈর্ষা বিদ্বেষ আসিয়াছিল কিনা, বলা সুকঠিন। শুনিতে পাই, ঐরূপই হইয়াছিল।

* * * * *

'কামারহাটির বামনীর' বহুকালের অভ্যাস—রাত্রি ২টায় উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া ৩টার সময় হইতে জপে বসা। তার পর বেলা ৮টা ৯টার সময় জপ সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া স্নান ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীর দর্শন ও যথাসাধ্য সেবাকার্য্যে যোগদান করা। পরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগাদি হইয়া গেলে, দুই প্রহরের সময় আপনার নিমিত্ত রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হওয়া। পরে আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াই পুনরায় জপে বসা ও সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করিবার পর পুনরায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জপে কাটান। পরে একটু দুধ পান করিয়া কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম। স্বভাবতঃই তাঁহার বায়ুপ্রধান ধাত ছিল—নিদ্রা অতি অল্পই হইত। কখন কখন বুক ধড়ফড় ও প্রাণ কেমন করত। ঠাকুর শুনে বলেন, "ও তোমার হরিবাই—ও গেলে কি নিয়ে থাকবে? যখন ওরূপ হবে তখন কিছু খেও।"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ—শীত ঋতু অপগত হইয়া কুসুমাকর সরস বসন্ত আসিয়া উপস্থিত। পত্র-পুষ্প-গীতিপূর্ণ বসুন্ধরা এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় জাগরিতা। উন্মাদনার ইতর বিশেষ নাই—আছে কিন্তু জীবের প্রবৃত্তির। যাহার যেরূপ সু বা কু প্রবৃত্তি ও সংস্কার, তাহার নিকট সেই উন্মাদনা সেই ভাবে প্রকাশিত। সাধু সদ্বিষয়ে নব জাগরণে জাগরিত—অসাধু অন্যরূপে—ইহাই প্রভেদ।

এই সময়ে 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ বসিতে না বসিতেই দেখেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বসিয়া!—স্পষ্ট, জীবন্ত, যেমন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া দর্শন করেন, সেইরূপ! ভাবিলেন—"একি? এমন সময়ে, ইনি, কোথা থেকে, কেমন করে, হেথায় এলেন?" গোপালের মা বলেন, "আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখ্‌ছি, আর ঐ কথা ভাব্‌চি—এদিকে গোপাল (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি 'গোপাল' বলিতেন) বসে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছে! তার পর সাহসে ভর করে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) ডান হাত খানি ধরেছি, অমনি সে মূর্ত্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশ মাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়া দেখাইয়া) এত বড় ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে, এক হাত তুলে, আমার মুখ পানে চেয়ে (সে কিরূপ, আর কি চাউনি!) বল্‌লে "মা, ননী দাও!" আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান—সে এক চমৎকার কারখানা—কেঁদে বল্লুম "বাবা, আমি

দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা। কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে—কেবল খেতে দাও বলে! কি করি, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উঠে সিকে থেকে শুখ্‌নো নারিকেল নাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বল্লুম—বাবা, গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য্য জিনীস খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।"

"তার পর জপ, সে দিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়! যেমন সকাল হোলো অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চল্লো!—কাঁধে মাথা রেখে। এক হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধ'রে সমস্ত পথ চল্লুম।"

অঘোরমণি দক্ষিণেশ্বরে ঐরূপ ভাবে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সকল কথা জানাইলেন—ভাবের আধিক্যে কত অশ্রুজল ফেলিলেন—কত কি প্রলাপ বকিলেন, "এই যে গোপাল কোলে," "ঐ তোমার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) ভিতর ঢুকে গেল," "ঐ আবার বেরিয়ে এলো," "আয় বাবা, দুঃখিনী মার কাছে আয়"—ইত্যাদি। বার বার দেখিলেন, চপল গোপাল কখন বা ঠাকুরের অঙ্গে মিশাইয়া গেল, আবার কখন বা বাহিরে আসিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব বাল্যলীলাতরঙ্গতুফান তুলিয়া তাঁহাকে বাহ্য জগতের কঠোর শাসন, নিয়ম প্রভৃতি সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল। সে ভাবতরঙ্গে পড়িয়া কে আপনাকে সামলাইতে পারে?

অদ্য হইতে অঘোরমণি বাস্তবিকই "গোপালের মা" হইলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে থাকিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মার ঐরূপ অপরূপ অবস্থা দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন—শান্ত করিবার জন্য তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন—এবং ঘরে যত কিছু ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী ছিল, সে সব আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। খাইতে খাইতেও ভাবের ঘোরে বামনী বলিতে লাগিল, "বাবা, গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এজন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েচে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতা করে বেচে দিন কাটিয়েচে, তাই বুঝি এত যত্ন আজ কর্‌চো!"—ইত্যাদি।

সমস্ত দিন এইরূপে কাছে রাখিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে কামারহাটি পাঠাইয়া দিলেন। ফিরিবার সময়ও গোপাল পূর্ব্বের ন্যায় বামনীর কোলে চাপিয়া চলিল। ঘরে ফিরিয়া গোপালের মা পূর্ব্বাভ্যাসে জপ করিতে বসিলেন, কিন্তু সে দিন আর কি জপ করা

যায় ?—যার জন্ম জপ, যাকে এত কাল ধরে ভাবা—সে যে সম্মুখে—নানা রঙ্গ, নানা আবদার করিতেছে! বামনী শেষ উঠে গোপালকে কাছে নিয়ে তক্ত-পোষের উপর বিছানায় শয়ন করিল। শয়ন করিয়াও নিষ্কৃতি নাই—গোপাল শুধু মাথায় শুইয়া খুঁৎ খুঁৎ করে! অগত্যা ব্রাহ্মণী আপনার বাম বাহুপরি গোপা-লের মাথা রাখিয়া তাহাকে কোলের গোড়ায় শোয়াইয়া কত কি বলিয়া ভুলাইতে লাগিল—"বাবা, আজ এই রকমে শো; রাত পোয়ালেই কাল কল্‌কেতা গিয়ে ভুতোকে (গিন্নির বড় মেয়ে) বলে তোমায় বিচি ঝেড়ে বেছে নরম বালিস করিয়ে দেব,"---ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোপালের মা নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া গোপালকে উদ্দেশ্যে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইতেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরদিন, সকাল সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওযাইবার জন্য বাগান হতে শুষ্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন। দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্না ঘরে আনিয়া জমা করিয়া রাখিতেছে! এইরূপে মায় পোয়ে কাঠ কুড়ান হোলো—তার পর রান্না। রান্নার সময়ও গোপাল কখন কাছে বসে, কখন পিঠের উপর পড়িয়া সব দেখিতে লাগিল, কত কি বলিতে লাগিল, কত কি আবদার ও দুরন্ত-পনা করিতে লাগিল! ব্রাহ্মণীও কখন মিষ্ট কথায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন, কখন বকিতে লাগিলেন।

* * *

এখন হইতে গোপালের মার জপ তপ সব শেষ হইল। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের নিকট ঘন ঘন আসা যাওয়া বাড়িয়া গেল। [ঠাকুরের চরণে জপের মালাদি একদিন ফেলিয়া দিলেন ও সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। ঠাকুরও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোপালের মাকে বলিলেন, "তোমার আপনার জন্য জপ তপ সব শেষ হয়েছে—তবে যদি কিছু কর তো এই শরীরটার কল্যাণের জন্য কর্‌তে পার।" গোপালের মাও বলিলেন, "বেশ বলেছ, বাবা গোপাল, তাই কর্‌বো---তা না হলে কি নিয়ে থাকি।" এই বলিয়া জপের মালা ফের গ্রহণ করিয়া তদবধি গোপালের কল্যাণেই জপ করিতে লাগিলেন।]

গোপালের মার ইতিপূর্ব্বে যে এত খাওয়া দাওয়ার আচার নিষ্ঠা ছিল, সে সবও এই মহাভাবতরঙ্গে পড়িয়া দিন দিন কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গোপাল তাঁর মন প্রাণ এক কালে অধিকার করিয়া বসিয়া কত রূপে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগ্‌লো, তার ইয়ত্তা নাই। নিষ্ঠা রাখেন কি করে?—গোপাল যে যখন

তখন খেতে চায়, আবার নিজে খেতে খেতে মার মুখে গুঁজে দেয়!—তাকি ফেলে দেওয়া যায়?—আর ফেলে দিলে সে যে কাঁদে! বামনী এই অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গে পড়িয়া অবধি দেখিয়াছিল যে, উহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই খেলা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবই তাঁর "নবীন-নীরদ-শ্যাম, নীলেন্দীবর লোচন গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ!" কাজেই তাঁকে রেঁধে খাওয়ান, তাঁর এঁটো খাওয়া ইত্যাদিতে আর দ্বিধা রহিল না।

এইরূপে অনবরত দুই মাস কাল কামারহাটির ব্রাহ্মণী গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দিবারাত্রি বুকে পিঠে করিয়া এক সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন! ভাবরাজ্যে এইরূপ দীর্ঘকাল বাস করিয়া, "চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যামের" প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও দর্শন, মহাভাগ্যবানেরই সম্ভবে। একে তো শ্রীভগবানে বাৎসল্যরতিই জগতে দুর্লভ,—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশ মাত্র মনে থাকিতে উহার উদয় অসম্ভব—তাহার উপর সেই রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহায়ে ঘনীভূত হইয়া শ্রীভগবানের এইরূপ দর্শন লাভ করা যে আরও কত দুর্লভ, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। প্রবাদ আছে, 'কলৌ জাগ্রতি কালী' ও 'কলৌ জাগর্ত্তি গোপালঃ'—তাই বোধ হয় অদ্যাপিও শ্রীভগবানের ঐ দুই ভাবের এইরূপ জ্বলন্ত উপলব্ধি কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার খুব হয়েছে। কলিতে এরূপ অবস্থা বরাবর থাক্‌লে, শরীর থাকে না।' বোধ হয় ঠাকুরের ইচ্ছাই ছিল, বাৎসল্যরতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দরিদ্র ব্রাহ্মণীর ভাবপূত শরীর, লোকহিতায় আরও কিছুদিন এ সংসারে থাকে। পূর্ব্বোক্ত দুই মাসের পর গোপালের মার দর্শনাদি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা কমিয়া গেল। তবে একটু স্থির হইয়া বসিয়া গোপালের চিন্তা করিলেই পূর্ব্বের ন্যায় দর্শন পাইতে লাগিলেন।

আজ এই পর্য্যন্ত—বারান্তরে গোপালের মার জীবনের শেষভাগ পাঠককে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বামী বিবেকানন্দের অসম্পূর্ণ রচনাবলী।

পরিব্রাজক।

২৮শে অক্ট রাত্রি ৯টার সময় ভিয়েনাতে সেই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ট্রেণ আবার ধরা হলো। ৩০এ অক্টোবর ট্রেণ পৌছুল কনষ্টান্টিনোপলে। এ দুরাত একদিন ট্রেণ চল্‌লো হুঙ্গারি সর্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে। হুঙ্গারির অধিবাসী, অষ্ট্রিয় সম্রাটের প্রজা। কিন্তু অষ্ট্রিয় সম্রাটের উপাধি

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ ও হুঙ্গারির রাজা। হুঙ্গারির লোক এবং তুর্কিরা একই জাত, তিব্বতির কাছাকাছি। হুঙ্গাররা কাস্পিয়ান্ হ্রদের উত্তর দিয়ে ইয়ুরোপে প্রবেশ করেছে, আর তুর্করা আস্তে আস্তে পারস্যের পশ্চিম প্রান্ত হয়ে আসিমিনর হয়ে ইয়ুরোপ দখল করেছে। হুঙ্গারির লোক ক্রশ্চান—তুর্ক মুসলমান। কিন্তু সে তাতার রক্তের যুদ্ধপ্রিয়তা উভয়েই বিদ্যমান। হুঙ্গাররা অষ্ট্রিয়া হতে তফাৎ হবার জন্য বারম্বার যুদ্ধ করে, এখন কেবল নামমাত্র একত্র। অষ্ট্রিয় সম্রাট্ নামে হুঙ্গারির রাজা। এদের রাজধানী বুডাপেস্ত অতি পরিষ্কার সুন্দর সহর। হুঙ্গার জাতি আনন্দপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়, পারিসের সর্ব্বত্রে হুঙ্গারিয়ান্ ব্যাপ্ত।

সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি টুর্কির জেলা ছিল—রুষযুদ্ধের পর প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন; তবে সুলতান এখনও বাদসা এবং সর্বিয়া বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কোনও অধিকার নাই। ইয়ুরোপে তিন জাত সভ্য—ফরাসী, জর্ম্মান আর ইংরেজ। বাকিদের দুর্দ্দশা আমাদেরই মত, অধিকাংশ এত অসভ্য যে, এসিয়ায় অত নীচ কোনও জাত নেই। সর্বিয়া বুলগেরিয়াময় সেই মেটে ঘর, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা মানুষ, আবর্জ্জনারাশি,—মনে হল বুঝি দেশে এলুম! আবার ক্রশ্চান কি না—দু চারটা শুয়র অবশ্যই আছে। দুশো অসভ্য মানুষে যা ময়লা কর্‌তে পারে না, একটা শোরে তা করে দেয়। মেটে ঘর তার মেটে ছাদ, ছেঁড়া ন্যাতা চোতা পরণে, শূকর সহায় সর্বিয় বা বুলগরি! বহু রক্তস্রাবে, বহু যুদ্ধের পর, তুর্কের দাসত্ব ঘুচেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষম উৎপাত ইয়ুরোপী ঢঙ্গে ফৌজ গড়তে হবে, নইলে কারু একদিনও নিস্তার নাই। অবশ্য দুদিন আগে বা পরে ওসব রুষের উদরসাৎ হবে, কিন্তু তবুও সে দুদিন জীবন অসম্ভব, ফৌজ বিনা। কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্ চাই। কুক্ষণে ফ্রান্স জর্ম্মানির কাছে পরাজিত হলো। ক্রোধে আর ভয়ে ফ্রান্স দেশশুদ্ধ লোককে সেপাই কর্‌লে। পুরুষমাত্রকেই কিছু দিনের জন্য সেপাই হতে হবে—যুদ্ধ শিখ্‌তে হবে; কারু নিস্তার নাই। তিন বৎসর বারিকে বাস করে, ক্রোড়পতির ছেলে হক্ না কেন, বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধ শিখ্‌তে হবে। গবর্ণমেন্ট খেতে পর্‌তে দেবে আর বেতন রোজ এক পয়সা। তার পর তাকে দুবৎসর সদা প্রস্তুত থাক্‌তে হবে নিজের ঘরে; তার পর আরও ১৫ বৎসর তাকে দরকার হলেই যুদ্ধের জন্য হাজির হতে হবে। জর্ম্মানি সিঙ্গি খেপিয়েছে, তাকেও কাযে কাযে তৈয়ার হতে হলো; অন্যান্য দেশকেও—এর ভয়ে ও, ওর ভয়ে এ সমস্ত ইয়ুরোপময় ঐ কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্;—এক ইংলণ্ড ছাড়া। ইংলণ্ড দ্বীপ, জাহাজ ক্রমাগত বাড়াচ্ছে, কিন্তু এ বোয়ার যুদ্ধের

শিক্ষা পেয়ে বোধ হয় কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সনই বা হয়। রুষের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে অধিক, কাযেই রুষ সকলের চেয়ে বেশী ফৌজ খাড়া করে দিতে পারে। এখন এই যে সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ সব, তুর্কিকে ভেঙ্গে ইয়ুরোপীরা বনাচ্ছে, তাদের জন্ম না হতে হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত সুসজ্জ ফৌজ তোপ প্রভৃতি চাই; কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে? চাষা কাযেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে—আর সহরে দেখ্‌বে কতকগুলা ঝাব্বাঝুব্বা পোরে সেপাই। ইউরোপময় সেপাই সেপাই, সর্ব্বত্র সেপাই। তবু স্বাধীনতা আর এক জিনীস, গোলামী আর এক; পরে যদি জোর করে করায় ত অতি ভাল কাযও কর্‌তে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাক্‌লে কেউ কোন বড় কায কর্ত্তে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামীর চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইয়ুরোপের লোকেরা ঐ সর্বিয়া বুলগের প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি এক দিনে কাজ শিখ্‌তে পারে? ভুল কর্‌বে বই কি—দুশ কর্‌বে;—করে শিখ্‌বে,—শিখে ঠিক কর্‌বে। দায়িত্ব হাতে পড়্‌লে অতি দুর্ব্বল সবল হয়—অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।

রেলগাড়ী হুঙ্গারী রোমানী প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে চল্‌লো। মৃতপ্রায় অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যেও যে সব জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে হুঙ্গারীয়ানে জীবনী-শক্তি এখনও বর্ত্তমান। যাহাকে ইয়ুরোপীয় মনীষিগণ ইন্দোয়ুরোপীয়ান বা আর্য্যজাতি বলেন, ইয়ুরোপে দু একটী ক্ষুদ্র জাতি ছাড়া আর সমস্ত জাতি সেই মহাজাতির অন্তর্গত। যে দু একটী জাতি সংস্কৃত-সম ভাষা বলে না, হুঙ্গারী-য়ানেরা তাহাদের অন্যতম। হুঙ্গারীয়ান আর তুর্কী একই জাতি। অপেক্ষা-কৃত আধুনিক সময়ে এই মহাপ্রবল জাতি এসিয়া ও ইয়ুরোপখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেছে। যে দেশকে এখন তুর্কীস্থান বলে, পশ্চিম হিমালয় ও হিন্দুকোষ পর্ব্বতের উত্তরে স্থিত সেই দেশই এই তুর্কী জাতির আদি নিবাসভূমি। ঐ দেশের তুর্কীনাম চাগওই। দিল্লীর মোগল-বাদসাহবংশ, বর্ত্তমান পারস্য-রাজবংশ, কনষ্টান্টিনোপল্‌-পতি-তুর্কবংশ ও হুঙ্গারীয়ান্‌ জাতি, সকলেই সেই চাগওই দেশ হতে ক্রমে ভারতবর্ষ আরম্ভ করে ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করেছে এবং আজও এই সকল বংশ আপনাদের চাগওই বলে পরিচয় দেয় এবং এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়। এই তুর্কীরা বহুকাল

পূর্ব্বে অবশ্য অসভ্য ছিল। ভেড়া ঘোড়া গরুর পাল সঙ্গে, স্ত্রীপুত্র ডেরা ডাণ্ডা সমেত, যেখানে পশুপালের চর্‌বার উপযোগী ঘাস পেত, সেইখানেই তাঁবু গেড়ে কিছুদিন বাস কর্‌ত। ঘাস জল সেখানকার ফুরিয়ে গেলে অন্যত্র চলে যেত। এখনও এই জাতির অনেক বংশ মধ্য এসিয়াতে এই ভাবেই বাস করে। মোগল প্রভৃতি মধ্যএসিয়াস্থ জাতিদের সহিত এদের ভাষাগত সম্পূর্ণ ঐক্য, আকৃতিগত কিছু তফাৎ। মাথার গড়নে ও হনুর উচ্চতায় তুর্কের মুখ মোগলের সমাকার, কিন্তু তুর্কের নাক খ্যাঁদা নয় অপিচ সুদীর্ঘ, চোখ সোজা এবং বড়, কিন্তু মোগলদেব মত দুই চোখের মাঝে ব্যবধান অনেকটা বেশী। অনুমান হয় যে বহুকাল হতে এই তুর্কী জাতির মধ্যে আর্য্য এবং সেমিটিক্ রক্ত প্রবেশ লাভ করেছে। সনাতন কাল হতে এই তুরস্ক জাতি বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। আর এই জাতির সহিত সংস্কৃতভাষী, গান্ধারী ও ইরাণীব মিশ্রণে—আফগান, হাজারা, বরকজাই, ইউসফ্‌জাই প্রভৃতি—যুদ্ধপ্রিয় সদা রণোন্মত্ত ভারতবর্ষের নিগ্রহকারী জাতি সকলের উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কালে এই জাতি বাবম্বার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশ সকল জয় করে বড় বড় রাজ্য সংস্থাপন করেছিল। তখন এরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, অথবা ভারতবর্ষ দখল কর্‌বার পর বৌদ্ধ হয়ে যেত। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে হুষ্ক যুষ্ক কনিষ্ক নামক তিন প্রসিদ্ধ তুরস্ক সম্রাটের কথা আছে, এই কনিষ্কই মহাযান নামে উত্তরাম্নায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্থাপক। বহুকাল পরে ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যএসিয়াস্থ গান্ধার কাবুল প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্র সকল একেবারে উৎসন্ন করে দেয়। মুসলমান হওয়ার পূর্ব্বে এরা যখন যে দেশ জয় কর্‌ত, সে দেশের সভ্যতা বিদ্যা গ্রহণ কর্‌ত; এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণ করে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা কর্‌ত। কিন্তু মুসলমান হয়ে পর্য্যন্ত এদের যুদ্ধপ্রিয়তাটুকুই কেবল বর্ত্তমান, বিদ্যা সভ্যতার নাম গন্ধ নেই, বরং যে দেশ জয় করেন, সে দেশের সভ্যতা ক্রমে ক্রমে নিভে যায়। বর্ত্তমান আফগান গান্ধার প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে তাদের বৌদ্ধ পূর্ব্বপুরুষদের নির্ম্মিত অপূর্ব্ব স্তূপ, মঠ, মন্দির, বিরাট্ মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান। তুর্কী মিশ্রণ ও মুসলমান হবার ফলে সে সকল মন্দিরাদি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আধুনিক আফগান প্রভৃতি এমন অসভ্য ও মূর্খ হয়ে গেছে যে, সে সকল প্রাচীন স্থাপত্য নকল করা দূরে থাকুক্, জিন প্রভৃতি অপদেবতার নির্ম্মিত বলে বিশ্বাস করে এবং মানুষের যে অত বড় কারখানা করা সাধ্য নয়, তা স্থির ধারণা করেছে। বর্ত্তমান পারস্য দেশের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ এই

যে, রাজবংশ হচ্চে প্রবল অসভ্য তুর্কীজাতি ও প্রজারা হচ্চে অতি সুসভ্য আর্য্য, প্রাচীন পারস্য জাতির বংশধর। এই প্রকারে সুসভ্য আর্য্যবংশোদ্ভব গ্রীক ও রোমকদিগের শেষ রঙ্গভূমি কন্‌স্তান্তিনোপল্‌ সাম্রাজ্য মহাবল বর্ব্বর তুরস্কের পদতলে উৎসন্ন গেছে। কেবল ভারতবর্ষের মোগল বাদসারা এ নিয়মের বহির্ভূত ছিল; সেটা বোধ হয় হিন্দুভাব ও রক্তসংমিশ্রণের ফল। রাজপুত বারট ও চারণদের ইতিহাস গ্রন্থে ভারতবিজেতা সমস্ত মুসলমান বংশই তুরক নামে অভিহিত। এ অভিধানটী বড় ঠিক্, কারণ ভারতবিজেতা মুসলমান বাহিনীরা যে কোন জাতিতেই পরিপূর্ণ ছিল না কেন, নেতৃত্ব সর্ব্বদা এই তুরক জাতিতেই ছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মত্যাগী মুসলমান—তুরস্কদের—নেতৃত্বে ও বৌদ্ধ বা বৈদিকধর্ম্ম ত্যাগী তুরস্কাধীন বা তুরস্কের বাহুবলে মুসলমানকৃত হিন্দু জাতির অংশবিশেষের দ্বারা, পৈতৃক ধর্ম্মে স্থিত অপর বিভাগদের বারম্বার বিজয়ের নাম ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ, জয় এবং সাম্রাজ্য-সংস্থাপন। এই তুরকদের ভাষা অবশ্যই তাহাদের চেহারার মত বহু মিশ্রিত হয়ে গেছে। উহাদের যে সকল দল মাতৃভূমি চাগওই হতে যত দূরে গিয়ে পড়েছে, তাদের ভাষা তত মিশ্রিত হয়ে গেছে। এবার পারস্যের শা প্যারিস প্রদর্শনী দেখে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্‌ হয়ে রেলযোগে স্বদেশে গেলেন। দেশকালের অনেক ব্যবধান থাকিলেও, সুলতান ও শা সেই প্রাচীন তুর্কী মাতৃভাষায় কথোপকথন কল্লেন। তবে সুলতানের তুর্কী ফার্সী, আরবী ও দুচার গ্রীক্ শব্দে মিশ্রিত। শার তুর্কী অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ।

প্রাচীন কালে এই চাগওই তুরস্কের দুই দল ছিল। এক দলের নাম সাদা ভেড়ার দল, আর এক দলের নাম কাল ভেড়ার দল। এই দুই দলই জন্ম-ভূমি কাশ্মীরের উত্তর ভাগ হতে ভেড়া চরাতে চরাতে ও দেশ লুটপাট করতে করতে ক্রমে কাস্পীয়ান হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হল। সদা ভেড়ারা কাস্পীয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইযুরোপে প্রবেশ কল্লে এবং ধ্বংসাবশিষ্ট রোম রাজ্যের এক টুক্‌রা নিয়ে হঙ্গারী নামক রাজ্য স্থাপন কল্লে। কাল ভেড়ারা কাস্পীয়ান হ্রদের দক্ষিণ দিয়ে ক্রমে পারস্যের পশ্চিম ভাগ অধিকার করে ককেসাস্ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করে ক্রমে এসিয়া মাইনর প্রভৃতি আরবদের রাজ্য দখল করে বস্‌ল; ক্রমে খলিফার সিংহাসন অধিকার কর্‌লে; ক্রমে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের যে টুকু বাকি ছিল, সেটুকু উদরসাৎ ক'র্‌লে। অতি প্রাচীন কালে এই তুরক জাতি বড় সাপের পূজা করত। বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুরা এদেরই নাগ-তক্ষকাদি বংশ বলত। তার পর এরা বৌদ্ধ হয়ে যায়; পরে যখন যে দেশ জয়

কর্‌ত, প্রায় সেই দেশের ধর্ম্মই গ্রহণ কর্‌ত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যে দুদলের কথা আমরা বল্‌ছি, তাদের মধ্যে সাদাভেড়ারা কৃশ্চানদের জয় করে কৃশ্চান হয়ে গেল, কাল ভেড়ারা মুসলমানদের জয় করে মুসলমান হয়ে গেল। তবে এদের কৃশ্চানী বা মুসলমানীতে, অনুসন্ধান কর্‌লে, নাগপূজার স্তর এবং বৌদ্ধ স্তর এখনও পাওয়া যায়।

হুঙ্গারীয়ানরা জাতি এবং ভাষায়তুরস্ক হলেও ধর্ম্মে কৃশ্চান—রোমান ক্যাথলিক। সেকালে ধর্ম্মের গোঁড়ামি, ভাষা রক্ত দেশ প্রভৃতি কোন বন্ধনী মান্‌ত না। হুঙ্গারীয়ানরা তুর্কীর চিরকাল প্রবল শত্রু এবং হুঙ্গারীয়ানদের সাহায্য না পেলে অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি কৃশ্চান রাজ্য অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হত না। বর্ত্তমান কালে বিদ্যার প্রচার, ভাষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা রক্তগত ও ভাষাগত একত্বের উপর অধিক আকর্ষণ হচ্চে; ধর্ম্মগত একত্ব ক্রমে শিথিল হয়ে যাচ্চে। এই জন্য কৃতবিদ্য হুঙ্গারীয়ান ও তুরুস্কদের মধ্যে একটা স্বজাতীয়ত্ব ভাব দাঁড়াচ্চে।*

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও হুঙ্গারী বারম্বার তা হতে পৃথক্ হবার চেষ্টা করেছে। অনেক বিপ্লব বিদ্রোহের ফলে এই হয়েছে যে, হুঙ্গারী এখন নামে অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের একটী প্রদেশ আছে বটে, কিন্তু কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অষ্ট্রীয়া সম্রাটের নাম অষ্ট্রীয়ার বাদসা ও হুঙ্গারীর রাজা। হুঙ্গারীর সমস্ত আলাদা এবং এখানে প্রজাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ। অষ্ট্রীয় বাদসাকে এখানে নামমাত্র নেতা করে রাখা হয়েছে, এ টুকু সম্বন্ধও যে বেশী দিন থাক্‌বে তা বলে বোধ হয় না। তুর্কী-স্বভাবসিদ্ধ রণকুশলতা, উদারতা প্রভৃতি গুণ হুঙ্গারীয়ানে প্রচুর বিদ্যমান। অপিচ মুসলমান না হওয়ায় সঙ্গীতাদি দেবদুর্লভ শিল্পকে সয়তানের কুহক বলিয়া না ভাবার দরুণ সঙ্গীতশিল্পে হুঙ্গারীয়ানরা অতি কুশলী ও ইয়ুরোপময় প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বে আমার বোধ ছিল, ঠাণ্ডাদেশের লোক লঙ্কার ঝাল খায় না; ওটা কেবল উষ্ণপ্রধান দেশের কদভ্যাস। কিন্তু যে লঙ্কা খাওয়া হুঙ্গারীতে আরম্ভ হল ও রোমানী বুলগারী প্রভৃতিতে সপ্তমে পৌঁছুল, তার কাছে বোধ হয় মান্দ্রাজীও হার মেনে যায়।

পরিব্রাজকের ডায়েরি—প্রথম অংশ—কনষ্টাণ্টিনোপল্।

কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রথম দৃশ্য রেল হতে পাওয়া গেল। প্রাচীন সহর—পগার (পাচীল ভেদ করে বেরিয়েছে) অলিগলি ময়লা—কাঠের বাড়ী ইত্যাদি—কিন্তু ঐ সকলে একটা বিচিত্রতাজনিত সৌন্দর্য্য আছে। ষ্টেশনে বই নিয়ে বিষম হাঙ্গামা। মাদামোয়ে

কনষ্টাণ্টিনোপলে ১১ দিন অবস্থান।

জেল কাল্‌ছে ও ভুল বোয়া করাসী ভ বাঃ চুঙ্গীর কর্মচারীদের ঢের বুঝালে, ক্রমে উভয় পক্ষের কলহ। হেড কর্মচারীদের অফিসার তুর্ক—তার খানা হাজির—কাজে ঝগড়া অল্পে অল্পে মিটে গেল—সব বই দিলে—দুখানা দিলে না। বল্লে—"এই, হোটেলে পাঠাচ্ছি"—সে আর পাঠান হল না। স্তাম্বুল বা কনষ্টাণ্টিনোপলের সহর বাজার দেখা গেল। পোণ্ট বা সমুদ্রের খাড়ি পারে, পেরা বা বিদেশী-দিগের কোয়ার্টার, হোটেল ইত্যাদি। সেখান হতে গাড়ী করে সহর বেড়ান ও পরে বিশ্রাম। সন্ধ্যার পর বুড়স্ পাশার দর্শনে গমন। পরদিন বোট চড়ে বাস্ফোর ভ্রমণে যাত্রা। বড্ড ঠাণ্ডা, জোর হাওয়া, প্রথম ষ্টেশনেই আমি আর মিঃ ম্যাঃ—নেবে গেলাম। সিদ্ধান্ত হল,—ওপার, স্কুটারিতে গিয়ে পার পের হিয়াসান্থের সঙ্গে দেখা করা। ভাষা না জানায়, বোটভাড়া ইঙ্গিতে করে ওপার গমন ও গাড়ী ভাড়া। পথে সুফি ফকিরের তাকিয়া দর্শন—এই ফকিরেরা লোকের রোগ ভাল করে। তার প্রথা এইরূপ—প্রথম কল্‌মা পড়া ঝুঁকে ঝুঁকে, তার পর নৃত্য, তার পর ভাব,তার পর রোগ আরাম—(রোগীর শরীর) মাড়িয়ে দিয়ে। পেয়র হিয়া-সান্থের সঙ্গে আমেরিকান্ কলেজ সম্বন্ধী অনেক কথাবার্ত্তা। আরাবের দোকান ও বিদ্যার্থী টর্ক দর্শন। স্কুটারি হতে প্রত্যাবর্ত্তন। নৌকো খুঁজে পাওয়া—সে কিন্তু ঠিক জায়গায় যেতে না পারক। যা হউক যেখানে নাবালে, সেইখান হইতেই ট্রামে করে ঘরে (স্তাম্বুলের হোটেলে) ফেরা। মিউজিয়ম—স্তাম্বুলের যেখানে প্রাচীন অন্দর মহল ছিল, গ্রীক বাদসাদের—সেইখানে প্রতিষ্ঠিত। অপূর্ব্ব Sarcophage (শবদেহ রক্ষা করিবার প্রস্তরনির্ম্মিত আধার) ইত্যাদি দর্শন। তোপখানার উপর হতে সহরের মনোহর দৃশ্য। অনেক দিন পরে এখানে ছোলা-ভাজা খাইয়া আনন্দ। তুর্কি পোলাও, কবাব ইত্যাদি এখানকার খাবার ভোজন। স্কুটারির কবরে খানা। প্রাচীন পাঁচীল দেখ্‌তে যাওয়া। পাঁচীলের মধ্যে জেল, ভয়ঙ্কর। উড্‌স পাশা ও বস্ফোর যাত্রী। ফরাসী (Charge d' affaires) পররাষ্ট্রসচিবের অধীনস্থ কর্মচারীর সহিত ভোজন (dinner)—জনৈক গ্রীক পাশা ও একজন আলবানি ভদ্রলোকের সহিত দেখা। পেরর হিয়াসান্থের লেক্‌চার, পুলিস বন্ধ করেছে—কাজেই আমার লেক্‌চার বন্ধ। দেবনমল, ও চোবেজী, একজন গুজরাতি বামুনের সহিত সাক্ষাৎ। এখানে হিন্দুস্থানী মুসলমান ইত্যাদি অনেক ভারত-বর্ষীয় লোক আছে। তুর্কী ফিললজি। নুরবের কথা—তার ঠাকুরদাদা ছিল ফরাসী। এরা বলে কাশ্মীরীর মত সুন্দর। এখানকার স্ত্রীলোকদিগের পরদা-হীনতা। বেশ্যাভাব মুসলমানি। খুদ্‌পাশা (Arian ?) আর্মানি, আরমানিয়ান

হবে। আরমানিয়ানদের বাস্তবিক কোনও দেশ নাই। যে সব স্থানে তারা বাস করে, সেথায় মুসলমানই অধিক। আর্মিনিয়া বলে কোন স্থান অজ্ঞাত। বর্ত্তমান সুলতান খুর্দ্দদের হামিদিয়ে-রেসল্লা তৈরি করেছেন, তাদের কজাকদের (Cossack) মত শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তারা Conscription হতে খালাস হবে।

বর্ত্তমান সুলতান, আর্মেনিয়ান এবং গ্রীক পোট্রিয়ার্কদের ডাকিয়া বলেন যে, তোমরা tax না দিয়ে সেপাই হও, তোমাদের জন্মভূমি রক্ষা কর। তাতে তারা জবাব দেয় যে, ফৌজ হয়ে লড়ায়ে গিয়ে মুসলমান সিপাইদের সহিত একত্রে মলে কৃশ্চান সিপাইদের কবরের গোলমাল হবে। উত্তরে সুলতান বল্লেন যে, প্রত্যেক পল্টনে না হয় মোল্লা ও কৃশ্চিয়ান পাদ্রী থাকিবে, এবং লড়ায়ে যখন কৃশ্চান ও মুসলমান ফৌজের শবদেহ সকল একত্রে এক গাদায় কবরে পুত্‌তে বাধ্য হবে, তখন না হয় দুই ধর্ম্মের পাদ্রীই (funeral service) শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়্‌ল; না হয় এক ধর্ম্মের লোকের আত্মা, বাড়ার ভাগ, অন্য ধর্ম্মের শ্রাদ্ধমন্ত্রগুলো শুনে নিলে। কৃশ্চিয়ানরা রাজি হোল না—কাজেই তারা tax দেয়। তাদের রাজি না হবার ভেতরের কারণ হচ্ছে ভয়, যে মুসলমানের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে পাছে সব মুসলমান হয়ে যায়। বর্ত্তমান স্তাম্বুলের বাদসা বড়ই ক্লেশসহিষ্ণু—প্রাসাদে থিয়েটার ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ পর্য্যন্ত সব কায নিজে বন্দোবস্ত করেন। পূর্ব্ব সুলতান মুরাদ বাস্তবিক নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিল—এ বাদসা অতি বুদ্ধিমান্। যে অবস্থায় ইনি রাজ্য পেয়েছিলেন, তা থেকে এত সাম্‌লে উঠেছেন যে আশ্চর্য্য। পার্লামেণ্ট এথায় চলিবে না।

পরিব্রাজকের ডায়েরি—দ্বিতীয় অংশ—এথেন্স, গ্রীস্।

বেলা দশটার সময় কনষ্টাণ্টিনোপল্ ত্যাগ। এক রাত্রি এক দিন সমুদ্রে। সমুদ্র বড়ই স্থির। ক্রমে Golden horn (সুবর্ণ শৃঙ্গ) ও মারমোরা। দ্বীপপুঞ্জ মারমোরার একটীতে গ্রীক ধর্ম্মের মঠ দেখিলাম। এখানে পুরাকালে ধর্ম্মশিক্ষার বেশ সুবিধা ছিল—কারণ, এক দিকে আসিয়া আর একদিকে ইয়ুরোপ। মেডিটরেনি দ্বীপপুঞ্জ প্রাতঃকালে দেখিতে গিয়ে প্রোফেসর লেপরের সহিত সাক্ষাৎ—পূর্ব্বে পাচিয়াপ্পার কলেজ, মান্দ্রাজে ইহার সহিত পরিচয় হয়। একটী দ্বীপে এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। নেপচুণের মন্দির আন্দাজ, কারণ, সমুদ্রতটে। সন্ধ্যার পর এথেন্স পৌঁছিলাম। এক রাত্রি কারণটাইনে

থেকে সকাল বেলা নামিবার হুকুম এলো। বন্দর পাইরিউসটি ছোট সহর। বন্দরটি বড়ই সুন্দর, সব য়ুরোপের স্থায়, কেবল মধ্যে মধ্যে এক আধ জন ঘাগরা-পরা গ্রীক। সেথা হতে পাঁচ মাইল গাড়ী ক'রে সহরের প্রাচীন প্রাচীর যাহা এথেন্সকে বন্দরের সহিত সংযুক্ত কোর্‌তো তাই দেখ্‌তে যাওয়া গেল। তার পর সহর দর্শন—আক্রোপলিস, হোটেল, বাড়ী, ঘর, দোর অতি পরিষ্কার। রাজবাটীটি ছোট। সে দিনই আবার পাহাড়ের উপর উঠে আক্রোপলিস, বিজয়ার মন্দির, পারথেনন ইত্যাদি দর্শন করা গেল। মন্দিরটি সাদা মর্ম্মরের নির্ম্মাণ—কয়েকটি ভগ্নাবশেষ স্তম্ভও দণ্ডায়মান দেখিলাম। পরদিন পুনর্ব্বার মাদামোয়াজেল মেল-কার্বির সহিত ঐ সকল দেখ্‌তে যাইলাম—তিনি ঐ সকলের পূর্ব্বেতিহাস সম্বন্ধে নানা কথা বুঝিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন ওলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, থিয়েটার ডাইওনিসিয়াস্ ইত্যাদি সমুদ্রতট পর্য্যন্ত দেখা গেল। তৃতীয় দিন এলুসি যাত্রা। উহা গ্রীকদের প্রধান ধর্ম্মস্থান। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এলুসি রহস্যের (Eleusinian Mystery) অভিনয় এখানেই হত। এখানকার প্রাচীন থিয়েটারটি এক ধনী গ্রীক নূতন করে করে দিয়েছে। Olympian games এর পুনরায় বর্ত্তমান কালে প্রচলন হয়েছে। সে স্থানটি স্পার্টার নিকট। তায় আমেরিকানরা অনেক বিষয়ে জেতে। গ্রীকরা কিন্তু দৌড়ে সে স্থান হতে এথেন্সের এই থিয়েটার পর্য্যন্ত আসায় জেতে। টার্কের কাছে ঐ গুণের (দৌড়ের) বিশেষ পরিচয়ও তারা এবার দিয়েছে। চতুর্থ দিন বেলা দশটার সময় রুষী ষ্টিমার 'জারে' আরোহণে ইজিপ্ট যাত্রী হওয়া গেল। ঘাটে এসে জানিলাম, ষ্টিমার ছাড়্‌বে ৪টার সময়—আমরা বোধ হয় সকাল সকাল এসেছি অথবা মাল তুল্‌তে দেরি হবে। অগত্যা ৫৭৬ হইতে ৪৮৬ খৃঃ পূর্ব্বে আবির্ভূত জেলাদাস ও তাঁর তিন শিষ্য ফিডিয়াস, মিরণ, পলিক্লেটের ভাস্কর্য্যের কিছু পরিচয় লইয়া আসা গেল। এখুনি খুব গরম আরম্ভ। রুষীয়ান জাহাজে স্ক্রুর উপর ফার্ষ্ট ক্লাস। বাকি সবটা ডেক—যাত্রী, গরু আর ভেড়ায় পূর্ণ। এ জাহাজে আবার বরফও নাই।

পরিব্রাজকের ডায়েরি—তৃতীয় অংশ—ফ্রান্সের প্যারিনগরস্থ লুভার (Louvre) মিউজিয়মে দৃষ্ট গ্রীক শিল্পকলা।

মিউজিয়ম দেখিয়া গ্রীককলার তিন অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। প্রথম "মিসেনি" (Mycenæan), দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক। (Achian) আচেনি রাজ্য, সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে অধিকার বিস্তার করেছিল, আর সেই সঙ্গে ঐ সকল দ্বীপে

প্রচলিত, আসিয়া হতে গৃহীত, সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এইরূপেই প্রথমে গ্রীসে কলাবিদ্যার আবির্ভাব। অতি পূর্ব্ব অজ্ঞাত কাল হতে খৃঃ পূঃ ৭৭৬ বৎসর যাবৎ "মিসেনি" শিল্পের কাল। এই "মিসেনি" শিল্প প্রধানতঃ আসিয়া শিল্পের অনুকরণেই ব্যাপৃত ছিল। তার পর ৭৭৬ খৃঃ পূঃ কাল হতে ১৪৬ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত হেলেনিক বা যথার্থ গ্রীক শিল্পের সময়। দোরিয়ান জাতির দ্বারা আচেনি সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ইয়ুরোপখণ্ডস্থ ও দ্বীপপুঞ্জনিবাসী গ্রীকরা আসিয়া-খণ্ডে বহু উপনিবেশ স্থাপন করলে। তাতে বাবিল ও ইজিপ্তের সহিত তাদের ঘনতর সংঘর্ষ উপস্থিত হলো; উহা হইতেই গ্রীক আর্টের উৎপত্তি হয়ে ক্রমে আসিয়া শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ-চেষ্টা এখানকার শিল্পে জন্মিল। গ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাৎ এই যে, গ্রীক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যাথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করছে।

খৃঃ পূঃ ৭৭৬ হতে খৃঃ পূঃ ৪৭৫ পর্য্যন্ত আর্কেইক গ্রীক শিল্পের কাল। এখনও মূর্ত্তিগুলি শক্ত (Stiff)—জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাস্‌ছে। এ বিষয়ে ঐ গুলি ইজিপ্তের শিল্পিগঠিত মূর্ত্তির ন্যায়। সব মূর্ত্তিগুলি দু পা সোজা করে খাড়া (কাঠ) হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুল দাড়ি সমস্ত (regular lines) সরলরেখাকারে খোদিত, বস্ত্র সমস্ত, মূর্ত্তির গায়ের সঙ্গে জড়ান—তাল পাকান, পতনশীল বস্ত্রের মত নয়।

আর্কেইক গ্রীক শিল্পের পরেই ক্লাসিক্ গ্রীক্ শিল্পের কাল—৪৭৫ খৃঃ পূঃ হতে ৩২৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ এথেন্সের প্রভুত্বকাল হতে আরব্ধ হয়ে সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারকাল। পিল-পনেশ এবং আটিকা রাজ্যই এই সময়কার শিল্পের চরম উন্নতিস্থান। এথেন্স আটিকা রাজ্যের প্রধান সহর ছিল। কলাবিদ্যানিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "(ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প, চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই উহা স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্য্যের চূড়ান্ত নিদর্শন স্বরূপ মূর্ত্তিসমূহ যে কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে বিধিনিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হইয়া উঠে।" এই ক্লাসিক গ্রীক শিল্পের দুই সম্প্রদায়—প্রথম আটিক, দ্বিতীয় পিল-পনেসিয়েন। আটিক সম্প্রদায়ে আবার দুই প্রকার ভাব—প্রথম মহাশিল্পী

ফিডিয়াসের প্রতিভাবল; "অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব, যাহা কোন কালে মানবমনে আপন অধিকার হারাইবে না।"—এই বলিয়া যাহাকে জনৈক ফরাসী পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্কোপাস আর প্র্যাক্সিটেল, আটিক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক। এই সম্প্রদায়ের কার্য্য, শিল্পকে ধর্ম্মের সঙ্গ হইতে একেবারে বিচ্যুত করে কেবলমাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা।

ক্লাসিক গ্রীক শিল্পের পিলোপনিসিয়ান নামক দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষক পলিক্লেট এবং লিসিপ্স। ইহাদের একজন খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এবং অন্য-জন খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য মানব-শরীরের গড়নপরিমাণের আন্দাজ (proportion) শিল্পে যথাযথ রাখিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা।

৩২৩ খৃঃ পূঃ হইতে ১৪৬ খৃঃ পূঃ কালপর্য্যন্ত অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর হইতে রোমকদিগের দ্বারা আটিকাবিজয়কাল পর্য্যন্ত গ্রিক শিল্পের অবনতি কাল। জাঁকজমকের বেশী চেষ্টা এবং মূর্ত্তিসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কর্‌বার চেষ্টা এই সময়ে গ্রীক শিল্পে দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর রোমানদের গ্রীস অধিকার কাল সময়ে গ্রীক শিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিল্পীদের কার্য্যের নকল মাত্র করিয়াই সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে, হুবহু কোনও লোকের মুখ নকল করা।

শিবের ভূত।

জর্ম্মানির এক জেলায় ব্যারণ "ক"য়ের বাস। অভিজাতবংশে জাত ব্যারণ "ক" তরুণ যৌবনে উচ্চপদ, মান, ধন, বিদ্যা এবং বিবিধ গুণের অধিকারী। যুবতী, সুন্দরী, বহুধনের অধিকারিণী, উচ্চকুলপ্রসূতা অনেক মহিলা ব্যারণ "ক"য়ের প্রণয়াভিলাষিণী। রূপে, গুণে, মানে, বংশে, বিদ্যায়, বয়সে, এমন জামাই পাবার জন্য কোন্ মা বাপের না অভিলাষ? কুলীনবংশজা এক সুন্দরী যুবতী, যুবা ব্যারণ "ক"য়ের মনও আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু বিবাহের এখনও দেরি। ব্যারণের মান ধন সব থাকুক, এ জগতে আপনার জন নাই, এক ভগ্নী ছাড়া। সে ভগ্নী পরমা সুন্দরী বিদুষী। সে ভগ্নী নিজের মনোমত সুপাত্রকে মাল্যদান কর্‌বেন—ব্যারণ বহুধন ধান্যের সহিত ভগ্নীকে সুপাত্রে সমর্পণ কর্‌বেন—তার পর নিজে বিবাহ কর্‌বেন, এই প্রতিজ্ঞা। মা বাপ ভাই সকলের স্নেহ সে ভগ্নীতে, তাঁর বিবাহ না হলে, নিজে বিবাহ করে সুখী হতে চান না।

তার উপর এ পাশ্চাত্য দেশের নিয়ম হচ্ছে যে, বিবাহের পর বর—মা, বাপ, ভগ্নী, ভাই,—কারুর সঙ্গে আর বাস করে না ; তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিয়ে স্বতন্ত্র হন। বরং স্ত্রীর সঙ্গে শ্বশুরঘরে গিয়া বাস করা সমাজসম্মত, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর পিতামাতার সঙ্গে বাস কর্ত্তে কখনও আস্‌তে পারে না। কাজেই নিজের বিবাহ ভগ্নীর বিবাহ পর্য্যন্ত স্থগিত রয়েছে।

* * * * *

আজ মাস কতক হলো সে ভগ্নীর কোনও খবর নাই। দাসদাসীপরিসেবিত নানাভোগের আলয়, অট্টালিকা ছেড়ে—একমাত্র ভাইয়ের অপার স্নেহবন্ধন তাচ্ছল্য করে—সে ভগ্নী, অজ্ঞাতভাবে গৃহত্যাগ করে, কোথায় গিয়েছে! নানা অনুসন্ধান বিফল। সে শোক ব্যারণ "ক"য়ের বুকে বিদ্ধশূলবৎ হয়ে রয়েছে। আহার বিহারে—আর তাঁর আস্থা নাই—সদাই বিমর্ষ, সদাই মলিনমুখ। ভগ্নীর আশা ছেড়ে দিয়ে আত্মীয়জনেরা ব্যারণ "ক"য়ের মানসিক স্বাস্থ্য সাধনে বিশেষ যত্ন কর্ত্তে লাগ্‌লেন। আত্মীয়েরা তাঁর জন্য বিশেষ চিন্তিত—প্রণয়িনী সদাই সশঙ্ক।

* * * * *

প্যারিসে মহাপ্রদর্শনী। নানাদিগ্দেশাগত গুণিমণ্ডলীর এখন প্যারিসে সমাবেশ—নানাদেশের কারুকার্য্য, শিল্পরচনা, প্যারিসে আজ কেন্দ্রীভূত। সে আনন্দতরঙ্গের আঘাতে শোকে জড়ীকৃত হৃদয় আবার স্বাভাবিক বেগবান্ স্বাস্থ্য লাভ কর্‌বে, মন দুঃখচিন্তা ছেড়ে বিবিধ আনন্দজনক চিন্তায় আকর্ষিত হবে—এই আশায়, আত্মীয়দের পরামর্শে বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে ব্যারণ "ক" প্যারিসে যাত্রা করিলেন।

বাৎসল্য রস ও বৈষ্ণব কবিকুল।

[শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।]

ব্রজের বাৎসল্যই বৈষ্ণব কবির গীতের বিষয়। বাৎসল্যও দ্বিবিধ—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা বাৎসল্যরতি, ও কেবলা বাৎসল্যরতি। বসুদেব দেবকীর বাৎসল্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র, এই জন্য তাঁহাদের প্রীতি সংকুচিত। তাঁহাদের স্নেহের

মধ্যে একটু ভয়, একটু সম্ভ্রম, একটু মহত্বজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত। তাই মথুরায় কংশ বিনাশ করিতে আসিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব দেবকীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিলেন তখন—

বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দুয়ের মনে ভয় হৈল॥ (১)

ভাগবত কহিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অবনীতে প্রকাশিত হইয়াই বসুদেব দেবকীকে নিজ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন (২)। বোধ হয় সেই মহত্বস্মৃতি বসুদেব দেবকীর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল, বাৎসল্যদ্বারা তাহা কখনও সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হয় নাই। এই জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে অবিমিশ্র বাৎসল্যের স্থান ছিল না, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎসল্যে আত্মহারা ছিলেন না। ভগবান্ ভালবাসা চান, স্তুতি চান না। আমরা দেখিতে পাই যে, যশোমতীও ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বিমোহিতা হন নাই। তিনি তখনও শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রভাবে ভাবিতেছিলেন, আর ঐরূপ দর্শন করিয়াও তাঁহার বাৎসল্যরসের সঙ্কোচ হয় নাই। (৩) যশোমতীর হৃদয়ে "আমার ছেলে এত বড় লোক"—এই ভাবের উদয় হয় নাই, তিনি ভাবিতেন, তাঁহার গোপাল চিরকালই তাঁহার দুধের ছেলে। তাহার হৃদয়ে শিশু গোপালের প্রতি স্নেহ ভিন্ন অন্য কোনও ভাবই আসিত না। বিশ্বরূপাদি দর্শনে তাঁহার অগ্রেই মনে হইত "এ আবার কি ভেল্কি? ইহাতে আমার গোপালের কোন অকল্যাণ হবে না তো?" ভক্তের এই সুবিমল স্বর্গীয় ভাবে ভগবান্ বশীভূত হন। ঐরূপ ভক্তের কাছে ভগবান নিজের ঐশ্বর্য্য সংকুচিত করিয়া শিশুভাবে, বালকভাবে তাঁহার সমক্ষে সর্ব্ববিধ শিশুলীলা প্রকাশিত করিয়া তাহার স্নেহের জন্য নিজে যেন লালায়িত—এইরূপ ভাব দেখান; 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকেন, মার আদরের ভিখারী হন, মার তাড়না সহ্য করেন ও মার উপর অত্যাচার করেন; কারণ, তাঁহার চির প্রতিজ্ঞা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। (৪)

"যে আমায় যে ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাবে, আমি তাহার নিকট সেইভাবে

(১) চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য ১৯, চৈতন্য বাক্য।
(২) শ্রীমদ্‌ভাগবত—১০ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়।
(৩) ঐ ঐ ৮ম অধ্যায়।
(৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৪র্থ অধ্যায়।

প্রকাশিত হই।" যুগে যুগে ভক্তের বাসনা পুরাইবার জন্ত ভগবান্ এমনি অপূর্ব্ব লীলার সৃজন করিয়া থাকেন ও করিবেন; যুগে যুগে ভাগ্যবান্ ভক্তের হৃদয়ে এই পবিত্র ভাবের লহরী খেলিয়াছে ও খেলিবে। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ভাবই হৃদয়ে ধারণ করিয়া, যশোমতীর অপার বাৎসল্যের অনুভূতি করিয়া পথে পথে "বাপ রে, কৃষ্ণরে" বলিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছিলেন। (১) আবার সেই পরম শিক্ষকের (শ্রীগৌরাঙ্গের) কাছ হইতে এই নিরবচ্ছিন্ন বাৎসল্যভাব হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত করতঃ শিশুরূপী ভগবানের মধুরমূর্ত্তি, ঘনীভূত-ভাব-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াই ভক্তিবিগলিতচিত্তে বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন:—

ভাল নাচত মোহন নন্দ দুলাল,
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন বোলত,
কিঙ্কিণী তাহে রসাল।
স্থলকমলদল জিনিয়া চরণতল,
অরুণ কিরণ কিয়ে আভা।
তার উপরে নখচাঁদ বিরাজিত,
হেরইতে জগমন লোভা॥
মণি আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত,
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি চাঁদ বদন তুলি,
নবীন কোকিল যেন বোলে॥

শ্রীভগবানের এই অপরূপ ভাবময় মধুর মূর্ত্তি অবলম্বনে ব্রজে যে নিরাবিল বাৎসল্যের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, বৈষ্ণব কবি প্রেমসিক্ত তুলিকায় সেই বাৎসল্যের ছবি তুলিয়াছেন, তাই সেই সকল চিত্র নির্ম্মল হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল।

ভাল নাচরে নাচরে নাচরে নন্দদুলাল।
ব্রজরমণীগণ চৌদিকে বেড়ল,
যশোমতী দেই করতাল।
ঝুনুর ঝুনুর ধ্বনি ঘাঘর কিঙ্কিণী
গতি নট খঞ্জন ভাঁতি।
হেরইতে অখিল, নয়ন মন ভুলল,
ইহ নব নীরদ কাঁতি॥

(১) শ্রীচৈতন্যভাগবত—আদি ১৫শ।

করে করি মাথন   সেই রমণীগণ
থাওই নাচই রঙ্গে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ   পঙ্কজ সুললিত
চরণ চালই কত ভঙ্গে॥
কুঞ্চিত কেশ   বেশ দিগম্বর
কটীতটে ঘুঙ্ঘুর সাজ।
বংশী কহই কিবে   জগজন মঙ্গল
শ্রবণে সুধাসম বাজ॥

অপত্যস্নেহ সকল স্নেহের উপরে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসিতে পাবেন, ছেলের সাধ্য কি মাকে ততখানি ভালবাসা দেয়? সেজন্ম ভগবানকে পিতৃভাবে ভালবাসা বা মাতৃভাবে ভালবাসা খুব উচ্চ ভাব বটে, কিন্তু ভগবান্‌কে পুত্র-ভাবে স্নেহ করাতেই বোধ হয় বাৎসল্যরসের পরিসমাপ্তি। কারণ, শ্রীভগবান্‌-সম্বন্ধে, ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র যতক্ষণ ভক্তের মনে থাকিবে, ততক্ষণ উহা কখন আসে না বা আসিতে পারে না—কথায় বলে, স্নেহ চিরদিন নিম্নগামী। এই গভীর সত্যের উপর বৈষ্ণবের বাৎসল্যরতি প্রতিষ্ঠিত। তাহাই উপলব্ধি করিয়া মাতা যশোমতীর স্নেহানন্দ বৈষ্ণব কবি বড় উজ্জ্বলভাবে আঁকিয়াছেন—

নন্দদুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থনদণ্ড   উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেয় করতালি।
দেখ দেখ রোহিণী   গদ গদ কহে রাণী,
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম দাসে কয়   রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর॥

বৈষ্ণব কবি মাতৃহৃদয়ের নিপুণ চিত্রকর। তাঁহারা মাতৃস্নেহের সকল প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিখুঁত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। নন্দরাণীর কৃষ্ণ-বিরহাশঙ্কার কাতরতা বৈষ্ণব কবি নিম্নলিখিত ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

গোপাল যাবে বাথানে   কি শুনিলাম শ্রবণে,
যাদু মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কত   চমকি চমকি উঠি
নয়ান নিমিখে হই হারা॥

বাৎসল্যের কি সজীব কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল চিত্র! মা যশোদার গোপালময় জীবন, গোপালময় আত্মা, গোপালময় বিশ্ব। গোপাল ছাড়া তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই—এবং সেই গোপাল চিরকালই তাঁহার দুধের ছেলে। তিনি কখনও গোপালকে বড় বড় কথায় স্তুতি করেন না—কিন্তু প্রেমানন্দে কখনও গোপালকে আদর করেন, কখনও শাসন করেন—কেননা, তিনি জানেন, তাঁহার গোপাল চির-দিনই, তাঁহার। ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ বাৎসল্যরসে নিরবচ্ছিন্ন আত্মী-য়তা বৈষ্ণব কবি ভিন্ন আর কেহ ধারণা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব ভক্তের লেখনীই বাৎসল্যভাবাপন্ন ভক্তের নিম্নলিখিত লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রথমে জগৎকে এই অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করেন—

আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি (শ্রীভগবান্) তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥ (১)

তাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—

নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে।

যশোমতী যেমন গোপালকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, নাচাইয়া, খেলাইয়া, সুখিনী—গোপালও তেমনি খাইয়া পরিয়া নাচিয়া খেলিয়া মায়ের আনন্দবর্দ্ধনে তৎপর। বৈষ্ণব কবির বাৎসল্যরসের চিত্র হইতে আমরা এই অমৃতময় তথ্যে উপনীত হই।

এখন আমরা বৈষ্ণব কবির মাতৃত্বের চিত্র আর একটু দেখাইতে প্রবৃত্ত হইব। পাঠকগণ দেখিবেন যে, সে চিত্রগুলি এত সহজ ও স্বাভাবিক যে, কোথাও তাহাদের কবিত্ব, ব্যাখ্যার দ্বারা ফুটাইতে হয় না। ফলকথা, সেগুলি মাতৃ-স্নেহের উজ্জ্বল আলেখ্য।

সবারে সকল কাজে নিয়োজিয়া
আনন্দে নন্দের রাণী।
কানুর শয়ন ভবনে আসিয়া
কহয়ে মধুর বাণী॥

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত—আদি; ৪র্থ

উঠহ বাছনি মু খাঁউ নিছনি
আলস করহ দূর।
তোর সখাগণে জুরিল ভবনে
উদয় করিল সুর॥
রামের বসন পরিলা কখন
কে নিল বসন তোর।
রাঙা উতপল নয়নযুগল
কি লাগি দেখিয়ে জোর॥
নীল নলিন আতপে মলিন
কেন বা এমন দেহ।
উনমত হৈয়া বৃষহ ধাইয়া
কুদিঠি দিল বা কেহ॥
হিয়ার উপর কণ্টক আঁচড়
গিয়াছিলা কোন্ বনে।
আমার কপালে না জানি কি ফলে
পরাণে মরিব মেনে॥

এই সুগভীর স্নেহবৈক্লব্যে যশোমতী কৃষ্ণের ক্ষণিক বিরহও সহিতে পারেন না।

ঘর পর নাহি জানে, সে জন চলিল বনে
এ তাপ কেমনে সবে মায়।
ও মোর যাদব দুলালিয়া।
কিবা ঘরে নাহি ধন কেনে বা যাইবে বন
রাখালে রাখিবে ধেনু লইয়া॥

মায়ের এই স্নেহময় ভাব দেখিয়া গোপালও চঞ্চল হইয়াছেন :—

রহিয়া রহিয়া যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
জননী প্রবোধে বারে বারে।

মাতৃস্নেহের এমনি আর একটী জলন্ত চিত্র মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে দিয়াছেন।

নিশম্য চৈনাম্ তপসে কৃতোদ্যমাম্
সুতাং গিরীশপ্রতিসক্তমানসাম্।

উবাচ মেনা পরিরভ্য বক্ষসা
নিবারয়ন্তী মহতো মুনিব্রতাৎ ॥
মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাঃ।
তপঃ ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবম্।
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ (১)

গিরিরাণী মেনকা, ধূর্জ্জটিপ্রেমাসক্তচিত্তা, তপস্যায় কৃতনিশ্চয়া, নিজ দুহিতা উমার তাদৃশ কথা শুনিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং মুনিদিগের ন্যায় সুকঠোর ব্রতধারণ করিয়া তপশ্চরণ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য নিষেধ করিতে লাগিলেন। কহিলেন—"বাছা,বাড়ীতে থাকিয়া পূজাদি কর, দেবতারা তাহাতেই প্রসন্ন হইবেন, কোথায় তোমার এই সুকোমল শরীর, আর কোথায় কঠিন তপশ্চরণ—ইহা দ্বারা উহা কি কখন সম্ভবে? শিরীষকুসুম ভ্রমরেরই লঘুপদভার সহ্য করিতে পারে, পক্ষীর নহে।"

এই স্নেহভরে নন্দরাণী গোপালকে নিত্য সাজান ও আনন্দপুলকে আঁখি ভরিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হন—বৈষ্ণবকবি এ বিষয়ে কি চিত্রই দেখাইয়াছেন!—

আনন্দিত নন্দরাণী, সাজাইয়া যদুমণি
নানা আভরণ পীতবাস।
রূপ হেরি ব্রজনারী, আঁখির নিমিখ ছাড়ি
পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস ॥

* * * * *

গোঠে যায় শ্রীহরি চূড়া বাঁধে মন্ত্র পড়ি
পীঠে দিল পাট কি ডোর।
ধড়ার আঁচল ভরি খেতে দিল ননী ক্ষীর
কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর ॥

কিন্তু স্নেহ ভালবাসা শুধু আনন্দময় নহে, পরন্তু অনেক সময়েই জ্বালাযন্ত্রণা ও আশঙ্কাময়। ভালবাসিতের বিপৎ ও বিরহই ঐ কষ্টের উৎপাদক। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বুকে রাখিয়াও সদাই বিরহাশঙ্কায় ব্যাকুলা হইতেন; তখন তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক বিরহ যে কত কষ্টজনক, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

(১) কুমার সম্ভব—৫ম সর্গ।

কান্দে ব্রজেশ্বরী উচ্চৈঃস্বর করি
কোথারে গোকুল চন্দ।
ভুলি কার বোলে ঝাঁপ দিলা জলে
ভুজগে হইলা বন্ধ॥
অপুত্রক হৈয়া মন্দির লইয়া
আছিনু পরম সুখে।
পুত্র হৈয়া তুমি জঠরে জনমি
শেল দিয়া গেলা বুকে॥
নিদারুণ বিধি যে বাদ সাধিলা
বিচারিলা অদভুত।
কি দোষ পাইয়া লইলা কাড়িয়া
আমার সোণার সুত॥
শিরে কর হানে বিষ জল পানে
সঘনে ধাইয়া যায়।
দুবাহু পসারি বলরাম ধরি
প্রবোধ করয়ে তায়॥

মাতৃস্নেহের কি গভীর, কি কোমল কি হৃদয়গ্রাহী চিত্র! এমন গভীর ভালবাসা না দিতে পারিলে কি ভগবান্‌কে আপন করা যায়? এখানে দেখিতে পাই যে, যশোমতী ভুলিয়া গিয়াছেন যে যাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে তাঁহার বিপদ্ নাই, তিনি কেবলই দেখিতেছেন যে তাঁহার "সোণার সুত" আজ কোথায় গেল! এই কেবলাপ্রীতির পরীক্ষা লইবার জন্যই চক্রীর চক্র, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইল তাই—

ব্রজবাসিগণ জীবন শেষ।
দেখিযা উঠিলা নন্দ বেশ।

আর অমনি ব্রজবাসিগণের—

মরণ শরীরে আইল প্রাণ।

আজও শ্রীভগবান্ ব্রজের ভাবে ভাবিত ভক্তের বশীভূত! কারণ, ঐরূপ স্বার্থগন্ধমাত্রবর্জিতা, শুদ্ধা, কেবলা, একতানপ্রবাহিনী ভালবাসার প্রথম পূর্ণবিকাশ ব্রজে এবং তজ্জন্যই ব্রজ—

প্রেমামৃতে শীতল কেল।

বৈষ্ণব ভক্ত ও কবিকুলের মতে ব্রজের প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্ত বিরহানল প্রজ্বালিত করা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রবাস। বিরহ-বহ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াই প্রেম-সুবর্ণের বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা জানা যয়। যশোমতীর বিরহাবস্থাও বৈষ্ণবকবি বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা কত মর্ম্মস্পর্শী তাহা পড়িলেই বুঝা যাইবে। তাহার অশ্রু বিধৌত পবিত্রতা হৃদয়ে ভালবাসার এক-তানতা আনয়ন করিয়া মানবকে শুদ্ধ, পবিত্র, সমাধিগত করে!

রজনী প্রভাতে মাতা যশোমতী
নবনী লইয়া করে।
কানাই বলাই বলিয়া ডাকয়ে
নিঝরে নয়ন ঝরে॥
তবে মনে পড়ে তারা মধু পুরে
তবহি হারায় জ্ঞান।
কুরল কুন্তলে লোটায় ভূতলে
ক্ষণে রহি মুরছান।
শ্রীদাম সুদাম আয় সো ভবনে
শ্রবণে বদন দিয়া।
তুয়া নাম করি উঠয়ে ফুকরি
শুনি স্থির বাঁধে হিয়া॥
চেতন পাইয়া সুবলে লইয়া
যতেক বিলাপ করে।
সে কথা শুনিতে মনুষ্য পশুর
পরাণ নাহিক ধরে॥
তিল আধ তোরে না দেখিলে মরে
বনে না পাঠায় যেহ।
এ পুরুষোত্তম কহ রে সে জন
কেমনে ধরিবে দেহ॥

মনুষ্যহৃদয়জ্ঞ বৈষ্ণব কবি যশোদার এই উন্মাদ অবস্থা এত নৈপুণ্য সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা পড়িলে চক্ষের জল সম্বরণ করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে।

গোকুল নগরে ভ্রময়ে জনু বাউরী

উদাসল কুন্তল ভারা।

কাঁহা মঝু তনয় ব্রজ-নন্দন

কহইতে বহে জলধারা॥

মাধব সে জননী নন্দরাণী

তুয়া বিরহানলে উমতি পাগলী জনু

কাহারে কি পুছয়ে বাণী॥

অব কাহে বেণু শবদ নাহি শুনি

কোন বনে সমাহা গেল।

বুঝি বলরাম সঙ্গে নাহি গেওল

কি পরমাদ আজি ভেল॥

ঐছে বিলাপ শুনই ব্রজ সহচরী

রোই আওল তছু পাশ।

বহু পরবোধ বচনে গৃহে আনত

কহে পুরুষোত্তম দাস॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিধুরা যশোমতীর কাতর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার জন্য বৈষ্ণবকবিকে কেবল কল্পনার সাহায্য লইতে হয় নাই। অনেকের মানস-পটে নিমাই-বিরহোন্মত্তা শচীমাতার পবিত্র করুণ ছবি তখনও জাগিতেছিল। কেহ কেহ অশ্রুকম্পিত করে সেই অপরূপ ছবিও আঁকিয়াছেন :—

"কহ অবধূত, আমার নিমাই কেমন আছে,

ক্ষুধার সময় জননী বলিয়া

তোমারে কখন কিছু পুছে।

যে অঙ্গ কোমল ননীর পুতুল

আতপে মিলায় যে।

যতির নিয়মে নানা দেশ গ্রামে

কেমনে ভ্রময়ে সে॥

একতিল যারে না দেখি মরিতাম

বাড়ীর বাহিরে দূরে।

সে এখন মোরে ছাড়িয়ে আছয়ে

কোথা নীলাচল পুরে॥

মুঞি অভাগিনী আছি একাকিনী
জীবনে মরণ পারা।
কোথা বা যাইব কারে কি কহিব
প্রেমদাস জ্ঞানহারা॥

পবিত্র ভক্তিরসে ও নয়নের জলে সিক্ত হইয়া এই সকল পদগুলি হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই মর্ম্মস্থলস্পর্শিনী স্বাভাবিকতাই বৈষ্ণব কবিতার প্রধান গুণ।

বাৎসল্যরতির ভগবদ্-বিরহ-বৈক্লব্যের চিত্র আমরা দেখিয়াছি। এই অমৃতময় ভাবে ভগবানেরও হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে :—

আরে সখি কবে হাম ব্রজপুর যায়ব
কবে পিতা নন্দ যশোদা মায়ের স্থানে
ক্ষীরসর মাখন খায়ব।

এই চিত্রের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি মিলনানন্দের চিত্রে। তাহাও বৈষ্ণবকবি বড় সরস ভাবে আঁকিয়াছেন।

মাতা যশোমতী ধাই উনমতী
গোপাল লইল কোলে।
স্তনক্ষীরধারে তনু বাহি পড়ে
ঝরয়ে নয়ান লোরে
নিজ ঘরে যাইয়া ক্ষীরসর লইয়া
ভোজন করাইয়া বোলে
ঘরের বাহির আর না করিব
সদাই রাখিব কোলে॥

তাঁহার হৃদয়ে আজ স্নেহ উছলিয়া উঠিয়াছে—কংসবিধ্বংসী মহাশক্তি-বিভবসম্পন্ন যদুপতিকে তিনি আজও দেখিতেছেন "তাঁহার সেই দুধের গোপাল!"

কোলেতে করিয়া নয়নজলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
মরিব তবে এবারে আমি॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥

ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কতজন কে করে লেখা॥
খাওয়াই পিয়াই শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে॥

আমরা এই খানেই বাৎসল্যরসের চিত্র সমাপ্ত করিলাম এই সকল চিত্রের আধ্যাত্মিকতা যে স্বতঃ পরিস্ফুট, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

ধর্ম্ম বিজ্ঞান।

চতুর্থ অধ্যায়।

আত্মার মুক্ত স্বভাব।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যের বিশ্লেষণ দ্বৈতবাদে পর্য্যবসিত—উঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, চরম তত্ত্ব—প্রকৃতি ও আত্মা সমূহ। আত্মার সংখ্যা অনন্ত, আর যেহেতু আত্মা অমিশ্র পদার্থ, সেই হেতু উঁহার বিনাশ নাই, সুতরাং উঁহা প্রকৃতি হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র। প্রকৃতির পরিণাম হয় এবং তিনি এই সমুদয় প্রপঞ্চ প্রকাশ করেন। সাংখ্যের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়। উঁহা অমিশ্র আর প্রকৃতি আত্মার অপবর্গ বা মুক্তি সাধনের জন্যই এই সমুদয় প্রপ-ঞ্চজাল বিস্তার করেন আর আত্মা যখন বুঝিতে পারেন, তিনি প্রকৃতি নহেন, তখনই তাঁহার মুক্তি। অপর দিকে ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, প্রত্যেক আত্মাই সর্ব্বব্যাপী। আত্মা যখন অমিশ্র পদার্থ, তখন তিনি সসীম হইতে পারেন না; কারণ, সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাব, দেশ কাল বা নিমিত্ত দ্বারা কৃত হইয়া থাকে। আত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে ইহাদের অতীত, তখন তাঁহাতে সসীম ভাব কিছু থাকিতে পারে না। সসীম হইতে গেলে তাঁহাকে দেশের মধ্যে থাকিতে হইবে আর তাহার অর্থ, উঁহার একটী দেহ অবশ্যই থাকিবে, আবার যাঁহার দেহ আছে, তিনি অবশ্য প্রকৃতির অন্তর্গত। যদি আত্মার আকার থাকিত, তবে ত আত্মা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইতেন। অতএব আত্মা নিরাকার; আর যাহা নিরাকার, তাহা এখানে, সেখানে বা অন্য কোনখানে আছে, এ কথা

বলা যায় না। উহা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে। সাংখ্য দর্শনইহার উপরে আর যায় নাই।

সাংখ্যদের এই মতের বিরুদ্ধে বেদান্তীদের প্রথম আপত্তি এই যে, সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নহে। যদি প্রকৃতি একটী অমিশ্র বস্তু হয় এবং আত্মাও যদি অমিশ্র বস্তু হয়, তবে দুইটী অমিশ্র বস্তু হইল আর যে সকল যুক্তিতে আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রমাণ হয়, তাহা প্রকৃতির পক্ষেও খাটিবে, সুতরাং উহাও সমুদয় দেশ কাল নিমিত্তের অতীত হইবে। প্রকৃতি যদি এইরূপই হয়, তবে উহার কোনরূপ পরিণাম বা বিকাশ হইবে না। ইহাতে গোল হয় এই যে, দুটী অমিশ্র বা পূর্ণ বস্তু স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা অসম্ভব। বেদান্তীদের এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত? তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, স্থূল জড় হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির সমুদয় বিকার যখন অচেতন, তখন যাহাতে মন চিন্তা করিতে পারে এবং প্রকৃতি কার্য্য করিতে পারে, তাহার জন্য উহাদের পশ্চাতে উহাদের পরিচালক শক্তিস্বরূপ একজন চৈতন্যবান্ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। বেদান্তী বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এই যে চৈতন্যবান্ পুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা ঈশ্বর বলি, সুতরাং এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। তিনি জগতের শুধু নিমিত্ত কারণ নহেন, উপাদান কারণও বটেন। কারণ কখন কার্য্য হইতে পৃথক্ নহে। কার্য্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি। অতএব ইনিই প্রকৃতির কারণ স্বরূপ। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত—বেদান্তের যত বিভিন্ন রূপ বা বিভাগ সকলেরই, এই প্রথম সিদ্ধান্ত যে, ঈশ্বর এই জগতের শুধু নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনি উহার উপাদান কারণও বটেন, যাহা কিছু জগতে আছে, সবই তিনি। বেদান্তের দ্বিতীয় সোপান এই যে, এই যে আত্মাগণ, ইহারাও ঈশ্বরের অংশস্বরূপ, সেই অনন্ত বহ্নির এক এক স্ফুলিঙ্গমাত্র। অর্থাৎ যেমন এক বৃহৎ অগ্নিরাশি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তদ্রূপই সেই পুরাতন পুরুষ হইতে এই সমুদয় আত্মা বাহির হইয়াছে *

এ পর্য্যন্ত ত বেশ হইল, কিন্তু তথাপি এ সিদ্ধান্তেও তৃপ্তি হইতেছে না। অনন্তের অংশ—একথার অর্থ কি? অনন্ত যাহা, তাহা ত অবিভাজ্য। অনন্তের কখন অংশ হইতে পারে না। পূর্ণ বস্তু কখন বিভক্ত হইতে পারে না। তবে

* যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥
—মুণ্ডকোপনিষৎ।২।১।১

এই যে বলা হইল, আত্মাসমূহ তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের মত বাহির হইয়াছে, এ কথার তাৎপর্য্য কি? অদ্বৈত-বেদান্তী এই সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করেন যে, প্রকৃত পক্ষে পূর্ণের অংশ নাই। তিনি বলেন, প্রত্যেক আত্মা প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অংশ নহেন, প্রত্যেকে প্রকৃত পক্ষে সেই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। তবে এত আত্মা কিরূপে আসিল? লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া লক্ষ লক্ষ সূর্য্য দেখাইতেছে আর প্রত্যেক জলকণাতেই ক্ষুদ্রাকারে সূর্য্যের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এইরূপ এই সকল আত্মা প্রতিবিম্বস্বরূপ, সত্য নহে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে সেই 'আমি' নহে, যিনি এই জগতের ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের এক অবিভক্ত সত্তাস্বরূপ। অতএব এই সকল বিভিন্ন প্রাণী, মানুষ, পশু ইত্যাদি এগুলি প্রতিবিম্ব-স্বরূপ, সত্য নহে। উহারা প্রকৃতির উপর পতিত মায়াময় প্রতিবিম্বমাত্র। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন আর সেই পুরুষ, 'আপনি,' 'আমি' ইত্যাদি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু এই ভেদ-প্রতীতি মিথ্যা বই আর কিছুই নহে। তিনি বিভক্ত হন নাই, বিভক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে মাত্র। আর তাঁহাকে দেশকালনিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখাতেই এই আপাতঃপ্রতীয়মান বিভাগ বা ভেদ হইয়াছে। আমি যখন ঈশ্বরকে দেশকালনিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া দেখি, তখন আমি তাঁহাকে জড় জগৎ বলিয়া দেখি— যখন আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে অথচ সেই জালের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে দেখি, তখন তাঁহাকে পশু বলিয়া—আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে মানবরূপে—আরো উচ্চে যাইলে দেবরূপে দেখিয়া থাকি। কিন্তু তথাপি তিনি জগৎব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক অনন্ত সত্তা এবং আমরাই সেই সত্তাস্বরূপ। আমিও তাহা, আপনিও তাহা—উহার অংশ নহে, সমগ্রটাই। "তিনি অনন্ত জ্ঞাতারূপে সমুদয় প্রপঞ্চের পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন, আবার তিনি স্বয়ং সমুদয় প্রপঞ্চস্বরূপ।" তিনি বিষয়, বিষয়ী—উভয়ই। তিনিই 'আমি,' তিনিই 'আপনি।' ইহা কিরূপে হইল? এই বিষয়টী নিম্নলিখিত ভাবে বুঝান যাইতে পারে। জ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে?*

জ্ঞাতা কখন নিজেকে জানিতে পারে না। আমি সবই দেখিতে পাই, কিন্তু আপনাকে দেখিতে পাই না। সেই আত্মা—যিনি জ্ঞাতা ও সকলের প্রভু, যিনি প্রকৃত বস্তু—তিনিই জগতের সমুদয় দৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রতিবিম্ব

* বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ।৪।১৪।

ব্যতীত নিজেকে দেখা বা নিজেকে জানা অসম্ভব। আপনি আরসি ব্যতীত আপনার মুখ দেখিতে পান না। তদ্রূপ আত্মাও প্রতিবিম্বিত না হইলে নিজের স্বরূপ দেখিতে পান না। সুতরাং এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আত্মার নিজেকে উপলব্ধির চেষ্টাস্বরূপ। প্রাণ পঙ্ক (Protoplasm) তাঁহার প্রথম প্রতিবিম্ব, তারপর উদ্ভিদ্, পশু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্টতর প্রতিবিম্বগ্রাহক হইতে সর্ব্বোত্তম প্রতিবিম্বগ্রাহক পূর্ণ মানবের প্রকাশ হয়। যেমন কোন মানুষ নিজমুখ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া একটী ক্ষুদ্র কর্দ্দমাবিল জল পল্বলে দেখিতে চেষ্টা করিয়া মুখের একটা ওপর ওপর আকার দেখিতে পাইল। তারপর সে অপেক্ষাকৃত নির্ম্মলতর জলে অপেক্ষাকৃত উত্তম প্রতিবিম্ব দেখিল, তারপর উজ্জ্বল ধাতুতে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব দেখিল শেষে একখানি আরসি লইয়া তাহাতে দেখিল তখন সে নিজে ঠিক যেমনটী, ঠিক তেমনি আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিল। অতএব বিষয় ও বিষয়ী উভয়স্বরূপ সেই পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব—'পূর্ণ মানব।' আপনারা এখন দেখিতে পাইলেন, মানব স্বভাববশতঃই কেন সকল বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকে, আর সকল দেশেই পূর্ণ-মানবগণ কেন স্বভাবতঃই ঈশ্বর রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আপনারা মুখে যাহাই বলুন না কেন, ইঁহাদের উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। এই জন্যই লোকে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধাদি অবতার-গণের উপাসনা করিয়া থাকে। তাঁহারা অনন্ত আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশস্বরূপ। আপনি, আমি, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন ধারণা করি না কেন, ইঁহারা তাহা হইতেও উচ্চতর। একজন পূর্ণ-মানব এই সকল ধারণা হইতে শ্রেষ্ঠতর। তাঁহাতেই জগৎরূপ বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়—বিষয় ও বিষয়ী এক হইয়া যায়। তাঁহার সকল ভ্রম ও মোহ চলিয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার এই অনুভূতি হয় যে, তিনি চিরকালই সেই পূর্ণ পুরুষ রহিয়াছেন। তবে এই বন্ধন কিরূপে আসিল? এই পূর্ণ পুরুষের পক্ষে অবনত হইয়া অপূর্ণ স্বভাব হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? মুক্তের পক্ষে বদ্ধ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন তিনি কোন কালেই বদ্ধ হন নাই, তিনি নিত্যমুক্ত। আকাশে নানাবর্ণের নানা মেঘ আসিতেছে। উহারা মুহূর্ত্তকাল তথায় থাকিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই এক নীল আকাশ বরাবর সমান ভাবে রহিয়াছে। আকাশের কখন পরিবর্ত্তন হয় না, মেঘেরই কেবল পরিবর্ত্তন হইতেছে। এইরূপ আপনারাও পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ স্বভাব, অনন্তকাল ধরিয়া পূর্ণ রহিয়াছেন। কিছুতেই কখন আপনাদের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না কখন করিবেও না।

এইযে সব ধারণা, যে—আমি অপূর্ণ, আমি নর, আমি নারী, আমি পাপী, আমি মন, আমি চিন্তা করিয়াছি, আমি চিন্তা করিব—এই সমুদয়ই ভ্রমমাত্র। আপনি কখনই চিন্তা করেন না, আপনার কোন কালে দেহ ছিল না, আপনি কোন কালে অপূর্ণ ছিলেন না। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু। যাহা কিছু আছে বা হইবে, আপনি তৎসমুদয়ের সর্ব্বশক্তিমান্ নিয়ন্তা—এই সূর্য্য চন্দ্র তারা পৃথিবী উদ্ভিদ্, এই আমাদের জগতের প্রত্যেক অংশের—মহান্ শাস্তা। আপনার শক্তিতেই সূর্য্য কিরণ দিতেছে, তারাগণ তাহাদের প্রভা বিকীরণ করিতেছে, পৃথিবী সুন্দর হইয়াছে। আপনার আনন্দের শক্তিতেই সকলে পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিতেছে ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। আপনিই সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, আপনিই সর্ব্বস্বরূপ। কাহাকে ত্যাগ করিবেন, কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন?—আপনিই সমুদয়! যখন এই জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়।

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি এক মাসের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতিশয় মনোরম দৃশ্যসমূহ, অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ হ্রদাদি—দেখিতে পাইতাম। একদিন আমি অতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া একটী হ্রদে জলপান করিব ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অমনি উহা অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঘাতের সহিত এই জ্ঞান আসিল যে সারা জীবন ধরিয়া আমি যে মরীচিকার কথা পড়িয়া আসিয়াছি, এই সেই মরীচিকা। তখন আমি আমার নিজের এই নির্ব্বুদ্ধিতা স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলাম যে, গত একমাস ধরিয়া এই যে সব সুন্দর দৃশ্য ও হ্রদাদি দেখিতে পাইতে-ছিলাম, তাহারা মরীচিকাব্যতীত আর কিছুই নহে, অথচ আমি তখন উহা বুঝিতে পারি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম—সেই হ্রদ ও সেই সব দৃশ্য আবার দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আমার এ জ্ঞানও আসিল যে উহা মরীচিকা মাত্র। একবার জানিতে পারাতে উহার ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। এইরূপই এই জগ-দ্ভ্রান্তি একদিন ঘুচিবে। এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড একদিন আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে। ইহার নামই প্রত্যক্ষানুভূতি। দর্শন, কেবল কথার কথা বা তামাসা নহে। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। এই শরীর উড়িয়া যাইবে, এই পৃথিবী এবং আর যাহা কিছু সবই উড়িয়া যাইবে—আমি দেহ বা আমি

মন, এই যে আমাদের জ্ঞান, ইহা কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া যাইবে—অথবা যদি কর্ম্ম সম্পূর্ণক্ষয় হইয়া থাকে তবে একেবারে চলিয়া যাইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না; আর যদি কর্ম্মের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে যেমন কুম্ভকারের চক্র—হাঁড়ি প্রস্তুত হইয়া গেলেও পূর্ব্ববেগে কিয়ৎক্ষণ ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকিয়া যাইবে। এই জগৎ—নর, নারী প্রাণী—সবই আবার আসিবে—যেমন পরদিনেও মরীচিকা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় উহারা শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে না, কারণ, সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে, আমি উহাদের স্বরূপ জানিয়াছি। তখন উহারা আর বদ্ধ করিতে পারিবে না, কোনরূপ দুঃখ কষ্ট শোক আর আসিতে পারিবে না। যখন দুঃখকর বিষয় কিছু আসিবে, মন তাহাকে বলিতে পারিবে যে আমি জানি তুমি ভ্রমমাত্র। যখন মানব এই অবস্থা লাভ করে, তাহাকে জীবন্মুক্ত বলে। জীবন্মুক্ত অর্থে জীবিত অবস্থায়ই যে মুক্ত। জ্ঞানযোগীর জীবনের উদ্দেশ্য এই জীবন্মুক্ত হওয়া। তিনিই জীবন্মুক্ত, যিনি এই জগতে অনাসক্ত হইয়া বাস করিতে পারেন। তিনি জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় থাকেন—উহা যেমন জলের মধ্যে থাকিলেও জল উহাকে কখনই ভিজাইতে পারে না, তদ্রূপ তিনি জগতে নির্লিপ্ত ভাবে থাকেন। তিনি মনুষ্য জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শুধু তাহাই কেন, সকল প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি সেই পূর্ণ স্বরূপের সহিত অভেদ ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন। যতদিন আপনার জ্ঞান থাকে যে, ভগবানের সহিত আপনার অতি সামান্য ভেদও আছে, ততদিন আপনার ভয় থাকিবে। কিন্তু যখন আপনি জানিবেন যে, আপনিই তিনি, তাঁহাতে আপনাতে কোন ভেদ নাই, বিন্দুমাত্র ভেদ নাই, তাঁহার সমগ্রটাই আপনি, তখন—সকল ভয় দূর হইয়া যায়। "সেখানে কে কাহাকে দেখে? কে কাহার উপাসনা করে? কে কাহার সহিত কথা বলে? কে কাহার কথা শুনে? যেখানে একজন অপরকে দেখে, একজন অপরকে কথা বলে, একজন অপরের কথা শুনে, উহা নিয়মের রাজ্য। যেখানে কেহ কাহাকে দেখে না, কেহ কাহাকে কথা বলে না, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই ভূমা, তাহাই ব্রহ্ম।"* আপনিই তাহা এবং সর্ব্বদাই তাহা আছেন, তখন—জগতের কি হইবে? আমরা জগতের কি উপকার করিতে পারিব—এরূপ প্রশ্নই সেখানে উদয় হয় না।

---

* ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক দেখ।

এ সেই শিশুর কথার মত—আমি বড় হইলে আমার মিঠাইএর কি হবে? বালকও বলিয়া থাকে, আমি বড় হইলে আমার মার্ব্বেলগুলির কি দশা হবে, তবে আমি বড় হব না। ছোট ছেলেও বলে, আমি বড় হইলে আমার পুতুলগুলির কি দশা হইবে?—এই জগৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলিও তদ্রূপ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালেই জগতের অস্তিত্ব নাই। যদি আমরা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি, যদি আমরা জানিতে পারি যে এই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর যাহা কিছু সব স্বপ্নমাত্র, উহাদের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, তবে এই জগতের দুঃখ দারিদ্র্য, পাপ পুণ্য—কিছুতেই আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিবে না। যদি উহাদের অস্তিত্বই না থাকে তবে কাহার জন্ম এবং কিসের জন্ম আমি কষ্ট করিব? জ্ঞানযোগীরা ইহাই শিক্ষা দেন। অতএব সাহস অবলম্বন করিয়া মুক্ত হউন, আপনাদের চিন্তাশক্তি আপনাদিগকে যতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে সাহসপূর্ব্বক ততদূর অগ্রসর হউন এবং সাহসপূর্ব্বক উহা জীবনে পরিণত করুন। এই জ্ঞান লাভ করা বড় কঠিন। ইহা মহাসাহসীর কার্য্য—যে, সমুদয় পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সাহস করে—শুধু মানসিক বা কুসংস্কাররূপ পুতুল নহে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহরূপ পুতুলগুলিকেও যে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, ইহা তাহারই কার্য্য।

এই শরীর আমি নহি—ইহার নাশ অবশ্যম্ভাবী এইত হইল উপদেশ। কিন্তু এই উপদেশের দোহাই দিয়া লোকে অনেক কিম্ভূত ব্যাপার করিয়া থাকে। একজন লোক উঠিয়া বলিল, "আমি দেহ নহি, অতএব আমার মাথাধরা আরাম হইয়া যাক্।" কিন্তু তাহার শিরঃপীড়া যদি তাহার দেহে না থাকে, তবে আর কোথায় আছে? সহস্র সহস্র শিরঃপীড়া ও সহস্র সহস্র দেহ আসুক যাক—তাহাতে আমার কি?

"আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আমার পিতাও নাই, মাতাও নাই, আমার শত্রুও নাই মিত্রও নাই; কারণ, তাহারা সকলেই আমি। আমিই আমার বন্ধু, আমিই আবার শত্রু, আমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আমিই সেই, আমিই সেই।"*

---

* ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥
—নির্ব্বাণষটক।৫।

যদি আমি সহস্র দেহে জ্বর ও অন্যান্য রোগ ভোগ করিতে থাকি, আবার লক্ষ লক্ষ দেহে আমি স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছি। যদি সহস্র সহস্র দেহে আমি উপবাস করি, আবার অন্য সহস্র দেহে প্রচুর পরিমাণে আহার করিতেছি। যদি সহস্র দেহে আমি দুঃখভোগ করিতে থাকি" আবার সহস্র দেহে আমি সুখভোগ করিতেছি। কে কাহার নিন্দা করিবে? কে কাহার স্তুতি করিবে? কাহাকে চাহিবে, কাহাকে ছাড়িবে? আমি কাহাকেও চাইও না, কাহাকেও ত্যাগও করি না; কারণ, আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। আমিই আপন স্তুতি করিতেছি, আমিই আমার নিন্দা করিতেছি, আমি নিজের দোষে নিজে কষ্ট পাইতেছি আর আমি যে সুখী, তাহাও আমার নিজের ইচ্ছায়। আমি স্বাধীন। এই জ্ঞানীর ভাব—তিনি মহা সাহসী—অকুতোভয়, নির্ভীক। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যাক না কেন, তিনি হাস্য করিয়া বলেন, উহার কখনও অস্তিত্বই ছিল না, উহা কেবল মায়া ও ভ্রম মাত্র। এইরূপে তিনি তাঁহার চক্ষের সমক্ষে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে যথার্থই অন্তর্হিত হইতে দেখেন আর বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করেন—

এ জগৎ কোথায় ছিল? কোথায়ই বা মিলাইয়া গেল?*

এই জ্ঞানের সাধনসম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আর একটী আশঙ্কার আলোচনা ও তৎসমাধানে চেষ্টা করিব। এ পর্য্যন্ত যাহা বিচার করা হইল, তাহা ন্যায় শাস্ত্রের সীমা বিন্দুমাত্র উল্লঙ্ঘন করে নাই। যদি কোনও ব্যক্তি বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে সিদ্ধান্ত করে, যে একমাত্র সত্তাই বর্ত্তমান আর সমুদয়ই কিছুই নহে, ততক্ষণ তাহার থামিবার যো নাই। যুক্তিপরায়ণ মানবজাতির পক্ষে এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই, যিনি অসীম, সদা পূর্ণ, সদানন্দময়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তিনি এই সব ভ্রমের অধীন হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্নই জগতের সর্ব্বত্র সকল সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে। সাধারণ চলিত কথায় প্রশ্নটী এইরূপে করা হয়—এই জগতে পাপ কিরূপে আসিল। প্রশ্নটীর ইহাই চলিত ও ব্যবহারিক রূপ আর অপরটী অপেক্ষাকৃত দার্শনিক রূপ। কিন্তু উত্তর একই। নানারূপে নানাভাবে নানাধরণে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, কিন্তু নিম্নতররূপে প্রশ্ন কৃত হইলে উহার ঠিক

---

* ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।

—বিবেকচূড়ামণি ।৪৮৫

মীমাংসা হয় না; কারণ, আপেল্, সাপ ও নারীর গল্পে * এই তত্ত্বের কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। ঐ অবস্থার প্রশ্নটীও যেমন শিশুজনোচিত, উহার উত্তরও তদ্রূপ। কিন্তু বেদান্তে এই প্রশ্নটী অতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে—এই ভ্রম কিরূপে আসিল ?—আর উত্তরও তদ্রূপ গভীর। উত্তরটী এই যে, অসম্ভব প্রশ্নের উত্তরের আশা করিও না। ঐ প্রশ্নটীর অন্তর্গত বাক্যগুলি পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রশ্নটাই অসম্ভব। কেন ? পূর্ণতা বলিতে কি বুঝায় ? যাহা দেশকালনিমিত্তের অতীত, তাহাই পূর্ণ। তার পর আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ণ কিরূপে অপূর্ণ হইল ? ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত ভাষায় নিবদ্ধ করিলে প্রশ্নটী এই আকারে দাঁড়ায়—"যে বস্তু কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, তাহা কিরূপে কার্য্যরূপে পরিণত হয় ?" এখানে ত আপনিই আপনাকে খণ্ডন করিতেছেন। আপনি প্রথমেই মানিয়া লইয়াছেন, উহা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, তার পর আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপে উহা কার্য্যে পরিণত হয়। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সীমার ভিতরেই কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। যতদূর পর্য্যন্ত দেশকালনিমিত্তের অধিকার, ততদূর পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পরের বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করাই নিরর্থক; কারণ, প্রশ্নটী ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। দেশকালনিমিত্তের গণ্ডীর ভিতরে কোন কালে উহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না, আর উহাদের অতীত প্রদেশে গেলে কি উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহা তথায় গেলেই জানা যাইতে পারে। এই হেতু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রশ্নটীর উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন না। যখন লোকে পীড়িত হয়, তখন কিরূপে ঐ রোগের উৎপত্তি হইল, তাহা প্রথমে জানিতে হইবে,—এই বিষয়ে বিশেষ জেদ না করিয়া রোগ যাহাতে সারিয়া যায়, তাহারই জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন।

এই প্রশ্ন আর এক আকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্নদৃষ্টির কথা বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্ম্মজীবনের সঙ্গে অনেকটা সম্বন্ধ

---

* বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্টে আছে, ঈশ্বর আদি নর আদম ও আদি নারী ইবাকে সৃজন করিয়া তাহাদিগকে নন্দনকানন নামক সুরম্য উদ্যানে স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে ঐ উদ্যানস্থ জ্ঞান-বৃক্ষের ফলভোজনে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান সর্পরূপধারী হইয়া প্রথমে ইবাকে প্রলোভিত করিয়া তৎপরে তাহার দ্বারা আদমকে ঐ বৃক্ষের ফলভোজনে প্রলোভিত করে। উহাতেই তাহাদের ভালমন্দ জ্ঞান উপস্থিত হইয়া পাপ প্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করিল।

আছে এবং ইহাতে তত্ত্বটী অনেকটা স্পষ্টতর হইয়া আসে। প্রশ্নটী এই—এই ভ্রম কে প্রসব করিল ? কোন সত্য কি কখন ভ্রম প্রসব করিতে পারে ? কখনই নহে। আমরা দেখিতে পাই, একটা ভ্রমই আর একটা ভ্রম প্রসব করিয়া থাকে, সেটী আবার একটী ভ্রম প্রসব করে, এইরূপ চলিতে থাকে। ভ্রমই চিরকাল ভ্রম প্রসব করিয়া থাকে। রোগই রোগ প্রসব করিয়া থাকে, স্বাস্থ্য কখন রোগ প্রসব করে না। জল ও জলের তরঙ্গে কোন ভেদ নাই—কার্য্য, কারণেরই আর একরূপমাত্র। কার্য্য যখন ভ্রম, তখন তাহার কারণও অবশ্য ভ্রম হইবে। এই ভ্রম কে প্রসব করিল ? অবশ্য আর একটী ভ্রম। এইরূপে তর্ক করিলে তর্কের আর শেষ হইবে না—ভ্রমের আর আদি পাওয়া যাইবে না। এখন আপনাদের একটী প্রশ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে যে, "ভ্রমের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে কি আপনার অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল না ? কারণ, আপনি জগতে দুটী সত্তা স্বীকার করিতেছেন—একটী আপনি, আর একটী ঐ ভ্রম।" ইহার উত্তর এই যে, ভ্রমকে সত্তা বলা যাইতে পারে না। আপনারা জীবনে সহস্র সহস্র স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু সেগুলি আপনাদের জীবনের অংশস্বরূপ নহে। স্বপ্ন আসে আবার চলিয়া যায়। উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ভ্রমকে একটা সত্তা বা অস্তিত্ব বলিলে উহা আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু উহা অযৌক্তিক কথা মাত্র। অতএব জগতে নিত্যমুক্ত ও নিত্যানন্দস্বরূপ একমাত্র সত্তা আছে, আর তাহাই আপনি। অদ্বৈতবাদীদের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই যে সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী রহিয়াছে এগুলির কি হইবে ? তাহারা সব থাকিবে। উহারা কেবল অন্ধকারে আলোর জন্য হাতড়ান মাত্র, আর ঐরূপ হাতড়াইতে হাতড়াইতে আলোক আসিবে। আমরা এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি যে আত্মা আপনাকে দেখিতে পায় না। আমাদের সমুদয় জ্ঞান মায়ার (মিথ্যার) জালের মধ্যে অবস্থিত, মুক্তি উহাদের বাহিরে। এই জালের মধ্যে দাসত্ব, ইহার সমুদয়ই নিয়মাধীন। উহার বাহিরে আর কোন নিয়ম নাই। এই ব্রহ্মাণ্ড যতদূর পর্য্যন্ত, ততদূর পর্য্যন্ত সত্তা নিয়মাধীন, মুক্তি তাহার বাহিরে। যতদিন আপনি দেশকালনিমিত্তের জালের মধ্যে রহিয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনি মুক্ত—এ কথা বলা নিরর্থক। কারণ, ঐ জালের মধ্যে সমুদয়ই কঠোর নিয়মে, কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ। আপনি যে কোন চিন্তা করেন, তাহা পূর্ব্ব কারণের কার্য্যস্বরূপ, প্রত্যেক ভাবই কারণের কার্য্যস্বরূপ। ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। যখনই সেই অনন্ত সত্তা যেন এই মায়াজালের

মধ্যে পড়ে, তখনই উহা ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছা মায়াজালে আবদ্ধ সেই পুরুষের কিঞ্চিদংশমাত্র, সুতরাং "স্বাধীন ইচ্ছা" বাক্যটীর কোন অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। স্বাধীনতা বা মুক্তিসম্বন্ধে এই সমুদয় বাগাড়ম্বরও বৃথা। মায়ার ভিতর স্বাধীনতা নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায়, মনে, কার্য্যে একখণ্ড প্রস্তর বা এই টেবিলটার মত বদ্ধ। আমি আপনাদের নিকট বক্তৃতা দিতেছি, আর আপনারা আমার কথা শুনিতেছেন, এই উভয়ই কঠোর কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন। মায়া হইতে যত দিন না বাহিরে যাইতেছেন, ততদিন স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই। ঐ মায়াতীত অবস্থাই আত্মার যথার্থ স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ যতদূর তীক্ষ্ণবুদ্ধি হউক না কেন, এখনকার কোন বস্তুই স্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে না—এই যুক্তির বল যতদূর স্পষ্টরূপে দেখুক না কেন, সকলকেই বাধ্য হইযা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, তাহা না করিয়া থাকিতেই পারে না। যতক্ষণ না আমরা বলি যে আমরা স্বাধীন, ততক্ষণ কোন কাযই চলিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যে স্বাধীনতার কথা বলিয়া থাকি, তাহা অজ্ঞানরূপ মেঘরাশির মধ্য দিয়া নির্ম্মল নীলাকাশরূপ সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মার চকিতদর্শনমাত্র, আর নীলাকাশরূপ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তস্বভাব আত্মা উহার বাহিরে রহিয়াছেন। যথার্থ স্বাধীনতা এই ভ্রমের মধ্যে, এই মিথ্যার মধ্যে, এই বাজে দুনিয়ার মধ্যে, ইন্দ্রিয়-মন-দেহ-সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকিতে পারে না। এই সমুদয় অনাদি অনন্ত স্বপ্ন—যাহা আমাদের বশে নাই, যাহাদিগকে বশে আনাও যায় না, যাহারা অযথা-সন্নিবেশিত, ভগ্ন ও অসামঞ্জস্যময়—সেই সমুদয় স্বপ্নগুলিকে লইয়া আমাদের এই জগৎ। আপনি যখন স্বপ্নে দেখেন যে, বিশ-মুণ্ড একটা দৈত্য আপনাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে, আর আপনি তাহার নিকট হইতে পলাইতেছেন, আপনি উহাকে অসংলগ্ন জ্ঞান করেন না। আপনি মনে করেন, এ ত ঠিকই হইতেছে। আমরা যাহাকে নিয়ম বলি, তাহাও এইরূপ। যাহা কিছু আপনি নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা কেবলমাত্র আকস্মিক ঘটনামাত্র, উহাদের কোন অর্থ নাই। এই স্বপ্নাবস্থায় আপনি উহাকে নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। মায়ার ভিতর, যতদূর পর্য্যন্ত এই দেশকালনিমিত্তের নিয়ম বিদ্যমান, ততদূর পর্য্যন্ত স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই আর এই বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালীসমূহ সমুদয়ই এই মায়ার অন্তর্গত। ঈশ্বর-ধারণা এবং পশু ও মানবের ধারণা সমুদয়ই এই মায়ার মধ্যে, সুতরাং সবগুলিই সমভাবে

ভ্রমাত্মক সবগুলিই স্বপ্নমাত্র। তবে আজকাল আমরা কতকগুলি অতিবুদ্ধি দিগ্‌গজ দেখিতে পাই। আপনারা তাঁহাদের মত যেন তর্ক বা সিদ্ধান্ত না করিয়া লেন, সেই বিষয়ে সাবধান হইবেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরধারণা ভ্রমাত্মক, কিন্তু এই জগতের ধারণা সত্য। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই উভয় ধারণাই একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারই কেবল যথার্থ নাস্তিক হইবার অধিকার আছে, যিনি ইহজগৎ পরজগৎ উভয়ই অস্বীকার করেন। উভয়টীই একই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্রতম জীব পর্য্যন্ত, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সেই এক মায়ার রাজত্ব একই প্রকার যুক্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর ধারণা ভ্রমাত্মক জ্ঞান করেন, তাঁহার নিজ দেহ ও মনের ধারণাও ভ্রমাত্মক জ্ঞান করা উচিত। যখন ঈশ্বর উড়িয়া যান, তখন দেহ ও মনও উড়িয়া যায় আর যখন উভয়েরই লোপ হয়, তখনই যাহা যথার্থ সত্তা, তাহা চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়।

"তথায় চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নহে। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইনা বা জানিতেও পারি না।"*

ইহার তাৎপর্য্য আমরা এখন এই বুঝিতে পারিতেছি যে, যতদূর পর্যন্ত বাক্য, চিন্তা বা বুদ্ধি যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত মায়ার অধিকার, ততদূর পর্য্যন্ত বন্ধনের ভিতর। সত্য উহাদের বাহিরে। তথায় চিন্তা মন বা বাক্য কিছুই পঁহুছিতে পারে না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিচারের দ্বারা ত বেশ বুঝা গেল, কিন্তু এইবার সাধনের কথা আসিতেছে। এই সব ক্লাসে আসল শিক্ষার বিষয় সাধন। এই একত্ব উপলব্ধির জন্য কোন প্রকার সাধনের প্রয়োজন আছে কি? নিশ্চিত আছে। সাধনের দ্বারা যে আপনাদিগকে এই ব্রহ্ম হইতে হইবে, তাহা নহে, আপনারা ত পূর্ব্ব হইতেই তাহা আছেন। আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে হইবে বা পূর্ণ হইতে হইবে, একথা সত্য নহে। আপনারা সদাই পূর্ণস্বরূপ রহিয়াছেন আর যখনই আপনারা মনে করেন, আপনারা পূর্ণ নহেন, সে ত একটা ভ্রম। এই ভ্রম—যাহাতে আপনাদিগকে অমুক পুরুষ, অমুক নারী বলিয়া বোধ হইতেছে, অপর একটী ভ্রমের দ্বারা দূর হইতে পারে আর সাধনা বা অভ্যাসই সেই অপর ভ্রম। আগুন আগুনকে খাইয়া ফেলিবে—আপনারা এক

* ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ। ইত্যাদি
—কেন উপনিষৎ।১।৩।

ভ্রমকে নাশ করিবার জন্য অপর ভ্রমের সাহায্য লইতে পারেন। একখণ্ড মেঘ আসিয়া অপর খণ্ড মেঘকে সরাইয়া দিবে, শেষে উভয়টাই চলিয়া যাইবে। তবে এই সাধনাগুল কি? আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে মুক্ত হইব তাহা নহে, আমরা সদাই মুক্ত। আমরা বদ্ধ, এরূপ ভাবনামাত্রই ভ্রম, আমরা সুখী বা আমরা অসুখী, এরূপ ভাবনামাত্রই গুরুতর ভ্রম। আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাসনা ও চেষ্টা করিতে হইবে, এই ভ্রম আসিয়া প্রথম ভ্রমটীকে তাড়াইয়া দিবে; তখন উভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে।

মুসলমানের' শিয়ালকে অতিশয় অপবিত্র মনে করিয়া থাকে, হিন্দুরাও তদ্রূপ কুকুরকে অশুচি ভাবিয়া থাকে। অতএব শৃগাল বা কুকুর খাবার ছুঁইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়, উহা আর কাহারও খাইবার যো নাই। কোন মুসলমানের বাটীতে একটী শৃগাল প্রবেশ করিয়া টেবিল হইতে কিছু খাদ্য লইয়া খাইয়া পলাইল। লোকটী বড়ই দরিদ্র ছিল। সে নিজের জন্য সেদিন অতি উত্তম ভোগের আয়োজন করিয়াছিল আর সেই ভোজ্যদ্রব্য সমুদয় শিয়ালের স্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেল! আর তাহার খাইবার যো নাই! কাজে কাজেই সে একজন মোল্লার কাছে গিয়া নিবেদন করিল—"সাহেব, গরিবের এক নিবেদন শুনুন। একটা শিয়াল আসিয়া আমার খাদ্য হইতে খানিকটা লইয়া খাইয়া গিয়াছে, এখন ইহার একটা উপায় করুন। আমি অতি সুখাদ্য সব প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার বড়ই বাসনা ছিল যে, পরম তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিব। এখন শিয়াল ব্যাটা আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। আপনি ইহার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা দিন।" মোল্লা মুহূর্ত্তেকের জন্য একটু ভাবিলেন, তার পর উহার একমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, "ইহার একমাত্র উপায়—একটা কুকুর লইয়া আসিয়া যে থালা হইতে শিয়ালটা খাইয়া গিয়াছে, সেই থালা হইতে তাহাকে একটু খাওয়ানো। এখন কুকুর শিয়লের নিত্য বিবাদ। তা শিয়ালের উচ্ছিষ্টটাও তোমার পেটে যাইবে, কুকুরের উচ্ছিষ্টটাও যাইবে, ঐ দুই উচ্ছিষ্টে পরস্পর সেখানে ঝগড়া লাগিবে, তখন সব শুদ্ধ হইয়া যাইবে।" আমরাও অনেকটা এইরূপ সমস্যায় পড়িয়াছি। আমরা যে অপূর্ণ, ইহা একটী ভ্রম; আমরা উহা দূর করিবার জন্য আর একটী ভ্রমের সাহায্য লইলাম যে, পূর্ণতালাভের জন্য আমাদিগকে সাধনা করিতে হইবে। তখন একটী ভ্রম আর একটী ভ্রমকে দূর করিয়া দিবে, যেমন আমরা একটা কাঁটা

তুলিবার জন্য আর একটা কাঁটার সাহায্য লইতে পারি এবং শেষে উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে পারি। এমন লোক আছেন, যাঁহাদের পক্ষে একবার তত্ত্বমসি শুনিলেই তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের উদয় হয়। চকিতের মধ্যে এই জগৎ উড়িয়া যায় আর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু আর সকলকে এই বন্ধনের ধারণা দূর করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়

প্রথম প্রশ্ন এই, জ্ঞানযোগী হইবার অধিকারী কাহারা? যাঁহাদের নিম্নলিখিত সাধন সম্পত্তিগুলি আছে। প্রথমতঃ, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, এই জীবনে বা পরজীবনে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ বাসনার ত্যাগ। যদি আপনিই এই জগতের স্রষ্টা হন, তবে আপনি যাহা বাসনা করিবেন, তাহাই পাইবেন; কারণ, আপনি উহা স্বীয় ভোগের জন্য সৃষ্টি করিবেন। কেবল কাহারো শীঘ্র, কাহারো বা বিলম্বে ঐ ফললাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ উহা প্রাপ্ত হয়, অপরের পক্ষে তাহাদের ভূত-সংস্কারসমষ্টি তাহাদের বাসনাপূর্ত্তির ব্যাঘাত করিতে থাকে। আমরা ইহজন্ম বা পর জন্মের ভোগ বাসনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকি। ইহজন্ম বা পরজন্ম বা আপনার কোনরূপ জন্ম আছে, ইহা একেবারে অস্বীকার করুন; কারণ, জীবন মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। আপনি যে জীবন সম্পন্ন প্রাণী, ইহাও অস্বীকার করুন। জীবনের জন্য কে ব্যস্ত? জীবন একটা ভ্রমমাত্র, মৃত্যু উহার আর এক দিক্ মাত্র। সুখ এই ভ্রমের এক দিক্, দুঃখ আর এক দিক্। সকল বিষয়েই এইরূপ। আপনার জীবন বা মৃত্যু লইয়া কি হইবে? এ সকলই ত মনের সৃষ্টি মাত্র। ইহাকেই ইহামুত্রফলভোগবিরাগ বলে।

তারপর শম বা মনঃসংযমের প্রয়োজন। মনকে এমন শান্ত করিতে হইবে যে, উহা আর তরঙ্গাকারে ভগ্ন হইয়া সর্ব্ববিধ বাসনার লীলাক্ষেত্র হইবে না। মনকে স্থির রাখিতে হইবে, বাহিরের বা ভিতরের কোন কারণ হইতে উহাতে যেন তরঙ্গ না উঠে—কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে হইবে। জ্ঞানযোগী শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ সহায় লন না। তিনি কেবল দার্শনিক বিচার, জ্ঞান ও নিজ ইচ্ছাশক্তি—এই সকল সাধনেই বিশ্বাসী। তারপর তিতিক্ষা—কোনরূপ বিলাপ না করিয়া সর্ব্বদুঃখ সহন। যখন, আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, সেদিকে খেয়াল করিবেন না। যদি সম্মুখে একটী ব্যাঘ্র আসে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকুন। পলাইবে কে? অনেক লোক আছেন, যাঁহারা তিতিক্ষা অভ্যাস করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হন।

এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা ভাবতে গ্রীষ্মকালে প্রখর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তাপে গঙ্গাতীরে শুইয়া থাকেন আবার শীতকালে গঙ্গাজলে সারাদিন ধরিয়া ভাসেন। তাঁহারা এ সকল গ্রাহ্যই করেন না। অনেক লোকে হিমালয়ের তুষার রাশির মধ্যে বসিয়া থাকে কোন প্রকার বস্ত্রাদির জন্য খেয়ালও করে না। গ্রীষ্মই বা কি? শীতই বা কি? এ সকল আসুক যাক—আমার তাহাতে কি? আমি ত শরীর নহি। এই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এইরূপ যে লোকে করিয়া থাকে, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। যেমন আপনাদের দেশের লোকে কামানের মুখে বা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লাফাইয়া পড়িতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের দেশের লোকও তদ্রূপ তাঁহাদের দর্শনানুসারে চিন্তাপ্রণালী নিয়মিত করিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে সাহসিকতা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিয়া থাকেন। "আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—'সোঽহং, সোঽহং'।" দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে বিলাসিতাকে বজায় রাখা যেমন পাশ্চাত্য আদর্শ, তেমনি আমাদের আদর্শ কর্ম্ম জীবনে সর্ব্বোচ্চদরের আধ্যাত্মিক ভাব রক্ষা করা। আমরা উহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাই যে, ধর্ম্ম কেবল ভুয়ো কথামাত্র নহে, কিন্তু এই জীবনেই ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ-রূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহাই তিতিক্ষা—সমুদয় সহ্য করা—কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ না করা। আমি নিজে এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা বলেন "আমি আত্মা—আমার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের আবার গৌরব কি? সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, শীত উষ্ণ, এ সকল আমার পক্ষে কিছুই নহে। ইহাই তিতিক্ষা—দেহের ভোগ সুখের জন্য ধাবমান হওয়া নহে। ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম মানে কি এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে যে, "আমাকে এই দাও, ওই দাও?" ধর্ম্ম সম্বন্ধে এ সকল আহাম্মকি ধারণা। যাহারা ধর্ম্মকে ঐরূপ মনে করে, তাহাদের ঈশ্বর ও আত্মার যথার্থ ধারণা নাই। মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন, "চিল শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তার নজর থাকে গোভাগাড়ে"। যাহা হউক আপনাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল ধারণা আছে, তাহার ফলটা কি বলুন দেখি। রাস্তা সাফ করা আর উত্তমরূপে অন্নবস্ত্রের যোগাড় করা? অন্নবস্ত্রের জন্য কে ভাবে? প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লোক আসি-তেছে, লক্ষ লোক যাইতেছে—কে গ্রাহ্য করে? এই ক্ষুদ্র জগতের সুখ দুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন কেন? যদি সাহস থাকে, উহাদের বাহিরে চলিয়া যান। সমুদয় নিয়মের বাহিরে চলিয়া যান, সমগ্র জগৎ উড়িয়া যাক্—আপনি একলা আসিয়া দাঁড়ান। "আমি নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দস্বরূপ—সোঽহং, সোঽহং।

পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত।

[শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।]

আশুতোষ চিকিৎসাবিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থে ফ্রান্সে যাইবার প্রার্থনা করায় তাঁহার পিতা বলেন,—"কেন, কি দুঃখে যাইবে? আমার অতুল সম্পত্তি, তোমরা দুই ভাই মাত্র, বড় মানুষি করিয়া চলিবে। আশুতোষ বিশেষ জিদ করায় তাঁহার পিতা ভয় প্রদর্শন করেন, যে যদি যাও, আমার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও তোমায় দিব না, তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নামে উইল করিয়া যাইব।" কিন্তু আশুতোষ নিষেধ না শুনিয়া ফ্রান্সে শিক্ষার্থে গেল।

আশুতোষের মাসিক দুই শত টাকা ছাত্রবৃত্তি ছিল ও যে কলেজে তিনি পড়িতেন, তাহা কোন এক ধনাঢ্য ফরাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত। তথায় ব্যবস্থা ছিল যে বিজ্ঞানশিক্ষার্থে ফরাসীদেশে যাইলে তাহার ব্যয়সঙ্কুলান কলেজ হইতেই হইবে। তিনি যাওয়ায় প্রথমে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু পুত্রের যশঃসংবাদ দিন দিন শোনায় পিতার মন নরম হয় এবং পুত্রকে ইংলণ্ড যাইয়া ব্যারিষ্টারী শিখিতে আদেশ দেন। ছয় বৎসর পরে আশুতোষ ব্যারিষ্টার হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গৃহে স্থান পাইলেন।

আশুতোষের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দেবেন্দ্রের উপর তাঁহার পিতা বিরক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্র মূর্খ ও নীচাত্মা—ইহাই তাঁহার অসন্তোষের কারণ। উইলে দেবেন্দ্রকে সিকি সম্পত্তি মাত্র দিয়া সমস্ত বিষয় আশুতোষকে দিয়া যান।

পিতার মৃত্যুর পর যখন উইল পাঠ হইল, দেবেন্দ্রের ক্রোধের সীমা রহিল না। দেবেন্দ্র পিতাকে নানা কুবাক্য বলিতে লাগিলেন। কিন্তু আশুতোষ কহিল, "ক্ষান্ত হও, আমি পিতার অমতে ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে ইউরোপে যাইলে তিনি আমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন। এক্ষণে আমি পিতৃবাক্য রক্ষা করিব। উইলে আমায় যাহা দিয়াছেন তাহা তোমার, কিন্তু তোমার সিকি সম্পত্তি ব্যতীত, এ সম্পত্তিতে তোমার স্বেচ্ছাচার চলিবে না। অতিথশালা প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া কলাপ আছে, এই সম্পত্তির আয় দ্বারা তাহা প্রথমতঃ রক্ষিত হইবে; সে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও যাহা বাকি থাকিবে তাহা সামান্য নহে; সে আয়ে তোমার সিকি সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করিয়াও একজন গণ্য বড়লোকের মত চলিবে।"

দেবেন্দ্র যদিও আশুতোষের বৈমাত্রেয় ভাই এবং উভয়ের বয়সের তিন বৎসর মাত্র পার্থক্য, তথাপি তিনি দেবেন্দ্রকে ভাল বাসিতেন। লেখাপড়ায় অযত্ন দেখিয়া শাসন করিতেন বটে, কিন্তু যেমন শিশু ভ্রাতার প্রতি অধিক বয়স্ক জ্যেষ্ঠের সন্তানবৎ স্নেহ থাকে, দেবেন্দ্রের প্রতি সেইরূপ স্নেহই ছিল, বিশেষতঃ তাঁহার বুদ্ধিমতী বিমাতা মৃত্যুশয্যায় দেবেন্দ্রকে সপত্নীপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান,—"বলেন, "বাবা, এ অভাগা নিশ্চয় মূর্খ হইবে, দিন দিন কর্ত্তার বিরাগভাজন হইতেছে। তুমি ইহার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বিপদ হইতে রক্ষা করিও।" ইহাতে দেবেন্দ্রের প্রতি মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হইলেও বিমাতার মৃত্যুশয্যার অনুরোধ স্মরণ রাখিয়া সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিতেন।

দেবেন্দ্র অতি নীচচেতা। ভ্রাতার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইত। তাহার সর্ব্বদাই চেষ্টা ছিল,—কোথায় কি সম্পত্তি অল্প মূল্যে কিনিবে। নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিবার তাহার সখ ছিল। জহরতের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য, অল্পদরে বহুমূল্য কোনও দ্রব্য কিনিতে পারিলেই দুই চারিজন সমপ্রকৃতি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেখাইত, কেমন অল্পমূল্যে ফাঁকি দিয়া ক্রয় করিয়াছে। বন্ধুরা সকলেই ধনাঢ্য ব্যক্তি; এবং দেবেন্দ্রের মত কোথায় কি অল্পমূল্যে পাইবেন—খোঁজেন। মজলিস করিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা হয়—কে কেমন সেয়ানা, তাহারই বাহাদুরী—অতি নীচ আলাপ—কে কেমন তাহার রক্ষিতা বেশ্যাকে ফাঁকি দিয়াছে; কে কোন দরিদ্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া বেতিসুদে আসল ভারি করিয়া সম্পত্তি বেচিয়া লইয়াছে; অমুক বাবু পাঁচ হাজার টাকা দিয়া জুড়ি কিনিয়াছে, কিন্তু তাহার একটা খোঁড়া হইয়াছে, আহা কি দুঃখের বিষয়! সকলেই দেবেন্দ্রকে উপদেশ দিয়া বলিত, তুমি তো এদিকে এত দাওবাজ, পালপার্ব্বণ অতিথশালার খরচগুলো কমাইয়া দাও না কেন? দেবেন্দ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিত যে তাহার কুচুটে ভাই যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে তাহার কিছু করিবার জো নাই।

দেবেন্দ্রের সরোজিনী নামে পরমাসুন্দরী স্ত্রী ছিল, একটী মাত্র পুত্র সন্তান, নাম নৃত্যগোপাল, অতি সুবোধ; কিন্তু স্ত্রী পুত্রের প্রতি কোন যত্ন ছিল না। শেষাশেষি সরোজিনী, অতিসম্পাত কুড়াইতে বারণ করায় একরূপ তাহার সহিত আলাপ রহিত হইয়াছে।

এই সমস্ত দেবেন্দ্রের নীচ প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া একদিন আশুতোষ আসিয়া বলিলেন,—"দেবেন্দ্র, দুঃখে না পড়িলে লোকে কোনও দ্রব্য অল্পমূল্যে বিক্রয় করে

না। বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করাই আমাদের বংশাবলীর নিয়ম। কিন্তু তুমি লোকের বিপদের সুযোগ অনুসন্ধান করো, কখনও বা সম্পত্তির লোভে চেষ্টা করিয়া বিপদগ্রস্থ করো। অল্পমূল্যে জহরতাদি কেনো, হয়তো তাহা চোরাই মাল হইতে পারে। এ সমস্ত তোমার ভাল নয়।" কিন্তু, তাহাতে দেবেন্দ্র কটূক্তি করিয়া বলিল,—"যাও—যাও, তুমি যা করেচ, সে সব জুচ্চুরী করে, আপনার প্রতি দৃষ্টি করো না, আমায় উপদেশ দিতে এসেছ।" আশুতোষ বিরক্ত হইয়া গেলেন, কিন্তু মনে ভাবিলেন, বড মন্দ বলে নাই। আমি তো লোকের নিকট টাকা লই, কিন্তু টাকার সম্পূর্ণ কাজটা করা হয় না। এ জজের ঘরে একবার, ও জজের ঘরে একবার বেড়াইয়া কিসে কি অধিক হয়, ইহারই চেষ্টা করিয়া থাকি। সমস্ত বড়লোক আমার Client, কিন্তু প্রায়ই তাহাদের মকদ্দমা মিথ্যা, অনেক সময়েই গরীব প্রজা পীড়ন; এ কার্য্য আর করিব না। তাঁহার সমব্যবসায়ী বন্ধুবর্গ এ সংকল্প বাতুলতা বলিয়া উপহাস করিল এবং সকলেই বলিল,—"মকদ্দমা সত্য মিথ্যা জানা তো আমাদের কার্য্য নয়, Client এর পক্ষ সমর্থন করাই কার্য্য। কার্য্য, গৌরবের—দোষের কার্য্য নয়, কেন পরিত্যাগ করিবে?" আশুতোষ বলিল,—"আমার বিজ্ঞানচর্চ্চা, বিশেষ উদ্ভিদ্ বিদ্যাচর্চ্চা আনন্দপ্রদ। আমি সেই কার্য্যই করিব।"

আশুতোষ কার্য্য পরিত্যাগ করায় দেবেন্দ্র খুব খুসী। দাদা যে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা রোজগার করে, তাহা আর হইবে না, দুহাতে খরচ করা, দান করা—চলিবে না, সখ করিয়া নিত্য নূতন ঘোড়া কেনা বন্ধ হইবে। কিন্তু দুই এক বৎসরে সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। আশুতোষ ঔষধের বাগান করিয়াছে। ঔষধ প্রস্তুত করে, সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী যশ ও জাহাজ জাহাজ ঔষধ রপ্তানি হয়—ইহাতে কমা দূরে থাকুক, চতুর্গুণ আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। দাদাকে কি রূপে টক্কর দিই, দেবেন্দ্রের মনে এই চিন্তাই দিবারাত্র। এমন সময় এক ব্যক্তি একখণ্ড হীরক বিক্রয় করিতে আসিল। হীরকখানি প্রায় কহিনুরের সমকক্ষ বলা যায়। যাচাই করিয়া দেখিলেন—কৃত্রিম হীরা নয়, কিন্তু মূল্য অতি সামান্য। এ কি চোরাই মাল? না—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ রহিয়াছে, আদালতে প্রমাণ হইয়াছে, যে বিক্রেতা সত্যই তাহার অধিকারী। সে পারস্যদেশবাসী, হীরা বিক্রয় করিয়া দেশে যাইবে, কিন্তু বিলম্ব করিতে পারে না। যে সে ব্যক্তি তো এ হীরা ক্রয় করিতে পারিবে না। পঞ্চাশ হাজার টাকা সহজে কে বাহির করিবে? দেবেন্দ্র দর-দাম করিয়া সে হীরা ত্রিশ হাজারে ক্রয় করিলেন ও পূর্ব্বপ্রথামত বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ

করিলেন—কারণ হীরা দেখাইবেন। বন্ধুগণ আসিলেন, হীরার প্রকৃত মূল্য কত, যাচাই করিবার জন্য তাঁহারা একজন জহুরীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। হীরা প্রদর্শিত হইল, কিন্তু দেখিবামাত্র জহুরী শিহরিয়া উঠিল। জহুরী বলিল,—"বাবু, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন ?" সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, কেন—এ কি সত্য হীরা নয় ?" জহুরী বলিল,—"সত্যই হীরা, কিন্তু সর্ব্বনেশে হীরা।" সকলে বলিয়া উঠিল, "কেন—কেন ?" জহুরী বলিল, "এই হীরার লোভে পারস্যের রাজপুত্র এক ওমরাওর পুত্রকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিল। কিন্তু সেই হীরা পরিয়া রাজপুত্র যখন শয়ন করিতে যান, দেখেন—সেই মৃত ওমরাও-পুত্র তাহার ঘরে আসিয়াছে—হস্ত প্রসারণ করিয়া হীরা চাহিতেছে। দিন দিন এইরূপ হওয়ায় পারস্য-রাজকুমার হীরা বিক্রয় করিলেন। যাহার নিকট হীরা থাকে, তাহার নিকটই সেই মৃত ওমরাও-পুত্র যায়। এক মাস এই হীরা যাহার অধিকারে থাকে, অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হয়! একথায় সকলে উপহাস করিল। জহুরী বলিল,—"মহাশয়, উপহাস করিবেন না। এ হীরা শেষ যাহার নিকট ছিল, সে হঠাৎ একদিন পথে পড়িয়া যায়, চিকিৎসালয়ে আনীত হয়, অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিল, সেই অবস্থাতেই বিহ্বল বকিত। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইত, যেন কেহ তাহার নিকট আসিয়াছে এবং সে সভয়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। এইরূপ দুই তিন দিন গত হইলে তাহার মৃত্যুদিবসে চৈতন্য হয়। তখন সে ডাক্তারকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছিল। ডাক্তার তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। বৃত্তান্ত এই যে পারস্য-রাজকুমার ওমরাও-পুত্রকে বধ করিয়া হীরা গ্রহণ করেন ও ভয় পাইয়া হীরা বিক্রয় করেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নিস্তার হয় নাই, অচিরে তিনি জলমগ্ন হইয়া মারা যান। এইরূপে যার যার নিকট এই হীরা ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই সপরিবারে মৃত্যুমুখে পড়ে। শেষ যাহার কাছে ছিল। সে হীরা বিক্রয় করিতে আসে, কিন্তু পথে এক বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছা যায়, তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভাই এই হীরা পায়, তাহারই পূর্ব্বোক্তরূপে হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একজন ডোমকে এই হীরা দিয়াছিল, সেই ডোম তিন টাকায় এক জনকে বিক্রয় করে। চোরাই মাল কিনিয়াছে বলিয়া পুলিস তাহাকে ধরে, কিন্তু আদালতে প্রমাণ হয়, চোরাই মাল নয়। সেই ব্যক্তিই ইহা দেবেন্দ্র বাবুকে বিক্রয় করিয়াছে, সে আমার নিকট বলিয়াছিল যে, যদ্যপি সে এই হীরা দেবেন্দ্র বাবুকে বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে সে মরিবে না।" সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমায় কি নিমিত্ত বলিয়াছিল ?" জহুরী উত্তর করিল, "আমি একজন জহুরী, আমি দূষিত

হীরা জানায়, তাহাকে হীরা রাখিতে নিষেধ করি। সে জন্তে সে আমায় উত্তরে এই কথা বলে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "দেবেন্দ্র বাবুকে বিক্রয় করিতে তাহাকে কে বলিয়াছে।" সে একটী চমৎকার ঘটনা বলিল। বলিল,—"বাসায় শুইয়া আছি, রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন পারস্ত উপসাগরে একখানি সজ্জিত নৌকা। নৌকা হইতে কে এক ব্যক্তি একজনকে জলে নিক্ষেপ করিল। দেখিলাম, সে উঠিয়া তীর হইতে, যে তাহাকে জলে নিমগ্ন করিয়াছিল, তাহাকে জলনিমগ্ন করিল। পরে উভয়ে উঠিয়া আসিয়া অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যথায় যায়, তথায় সকলে মরে। শেষে হাসপাতালে যাইয়া একজনকে মারিল। কিছুপরে দেখি, প্রথমে যে জলনিমগ্ন হইয়াছিল, সে আমায় বলিল—আমি কে জানিস্? হাস্‌পাতালে হীরার কথা শুনেছিস্—সে হীরা আমারই। হীরা তোর নিকট আছে, তুই যদি দেবেন্দ্র বাবুকে বেচিতে পারিস্, তোর ভাল হইবে। দেবেন্দ্রের শাস্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে শাস্তি দিব।" এ কথায় নানাপ্রকার বাদানুবাদ হইতে লাগিল, কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বিশ্বাস করিল না।

* * * * *

দুই তিন মাস পরে বন্ধুরা শুনিল যে, দেবেন্দ্র পাগল হইয়া সেই হীরাখানি জলে ফেলিয়া দিয়াছে!

দেবেন্দ্র সত্যই পাগল হইয়াছে। দেবেন্দ্রের পুত্র নিত্যগোপাল আশুতোষের নিকট আসিয়া বলিল, "জেঠা মশায়, বাবা যেন কি একরূপ হইয়াছেন, তাই মা আপনাকে বলিতে আসিয়াছেন।" ভাদ্রবধূ অন্তরালে থাকিয়া নিত্যগোপালের দ্বারা জহরীর গল্পের কথা জানাইলেন। এই জহরীকে দুইবার তিনি চোরাই মাল কেনা অভিযোগ হইতে রক্ষা করেন। জহরীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় জহরী বলিল যে, "মহাশয়, আমি হীরার লোভে মিথ্যা গল্প করিয়াছিলাম, তবে যে হীরাখানি বেচিয়াছিল, সে ডোমের নিকট খরিদ করিয়াছিল সত্য;—সেই ডোম হাসপাতালে এক ব্যক্তির বিশেষ শুশ্রূষা করে, সেইজন্ত মৃত্যুকালে সে ব্যক্তি হীরাখানি দেয়। সে একজন সৈনিক, চীন যুদ্ধে লুট করিয়া হীরাখানি পাইয়াছিল। ডোমের নিকট কেনায় পর পুলিস কেস্ হইয়াছিল—সত্য। ডোমের নিকট যে কিনিয়াছিল, তাহার ধারণা ছিল, হীরা প্রকৃত হীরা নয়। আমি অল্প দামে হীরাখানি খরিদ করিব, এইজন্ত 'ও ঝুটা হীরা'—এই ধারণা তাহার করিয়া দিই।" আশুতোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারস্তের রাজকুমার"

—এ সব কথা কি? "জহরী বলিল, আমি এরূপ একটী গল্প নভেলে পড়িয়াছিলাম। হীরাখানি দেবেন্দ্র বাবুর নিকট ভয় দেখাইয়া লইব, এই উদ্দেশ্যে এই গল্প করি।"

প্রিয়নাথ নামে আশুতোষের এক সহাধ্যায়ী সুযোগ্য ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন,—দেবেন্দ্রের মূর্ত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেবল চর্ম্মাবৃত দেহ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, বিকট-জ্যোতি-যুক্ত চক্ষুর্দ্বয়, যেন ঠিক্‌রিয়া আসিতেছে। গভীর দুশ্চিন্তাক্রান্ত হইয়া বসিয়া আছে। আশুতোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবেন্দ্র, তোর কি অসুখ হয়েছে?" দেবেন্দ্র বলিল,—"না না কিছু না, আর উপায় নাই, তারা সকলে একত্র হইয়াছে। আমি কোন রকমে ফাঁকী দিয়া কাটাইতেছি!" জহরীর গল্পের কথা বলিল। বলিল,—"হীরা ফেলিয়া দিয়াছি, তথাপি সেই ওমরাও পুত্র হীরা চাহিতে আসে! পারস্ত-রাজপুত্র তাহার পাশে দাড়াইয়া হাসে! আজ মাসাবধি হইল, তাহারা একা আসে না। যাহার বাড়ী ঠকাইয়া লইয়াছিলাম, সে বুড়ো আসে, সে ঐ কোণে বসিয়া কাসে। যাহার তালুক কিনিয়াছিলাম, তাহারা মায়ে-বেটায় দোরের পার্শ্বে বসিয়া ফুস্ ফুস্ করে। মাগী ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলে। সেই নিঃশ্বাসে সাপের ছাওয়ালো সৃষ্টি হইয়া ছোট ছোট ফণা তুলিয়া ঘরময় বেড়ায়! সব মরিয়াও মরে নাই; সকলের চর্ম্ম নাই, মাংস নাই, তবু জীবিত আছে! হাড়ে হাড়ে বাজাইয়া নাচে, হাঃ হাঃ করিয়া হাসে; চক্ষু নাই—তবু চোখের কোঠর দিয়া আমাকে লক্ষ্য করে! এখনি সব আস্‌বে—এখনি সব আস্‌বে,—তোমরা পালাও—পালাও।"

আশুতোষ জহরীকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। অন্য ঘরে ছিল, ডাকাইলেন। জহরী মিথ্যা গল্প করিয়াছিল—বলিল। কিন্তু দেবেন্দ্র উচ্চহাস্য করিল। দেবেন্দ্র বলিল,—"কি মিছে—কি মিছে! ঐ যে তারা দুজনে আসিয়াছে! ঐ যে সুখ সিঁড়িতে উঠিতেছে! বলিতেছে—হীরা গঙ্গাতে ফেলিয়া দিয়াছিস্,—ডুব দিয়ে তোল। ঐ দেখ ওমরাওপুত্র হাত পাতিয়া বলিতেছে,—দে হীরা আমায় দে। যা—যা—জলে থেকে তুলিয়া আন্। শুনিতেছ না—শুনিতেছ না?" আশুতোষ বলিলেন, "তুমি স্থির হও, আমি ডুবুরী দিয়া হীরা উঠাইয়া আনিব।" দেবেন্দ্র বলিল—"না না—ডুবুরী আনিলে হইবে না, আমাকেই তুলিতে হইবে। হীরা আনিলেও নিস্তার নাই,—ঐ ওরা সব বাড়ী ফিরিয়া চাহিতেছে, জায়গাজমী চাহিতেছে—জিনিসপত্র চাহিতেছে।"

আশুতোষ সতর্ক লোকজন নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভাদ্রবধূকে বলিলেন,—"বৌ বিশেষ সতর্ক থাকিবে, যেন কোনরূপে কোথাও উঠিয়া যায় না।" নিত্য আসিয়া ভাইয়ের তদ্বির করেন। ক্রমে পৈত্রিক বাটীতে আসিয়া ভ্রাতার তদ্বিরের জন্য রাত্রি-বাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই ভ্রাতার নিকট সতর্ক লোক থাকে। বায়ু সেবনের নিমিত্ত লইয়া যান। এই সকল উপায়ে যেন নিদারুণ ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হইতে লাগিল। ক্রমে এতদূর উপশম হইল যে, স্ত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, স্ত্রীর প্রতি এখন আর পূর্ব্বের উপেক্ষার ব্যবহার নাই; ইহাতে সকলের মনে আশা জন্মিল।

নিত্যগোপাল তখন দশ বৎসরের বালক, কিন্তু চিন্তাশীল। পিতার অবস্থার কথা চিন্তা করে। একদিন প্রিয়নাথের সহিত আশুতোষের কথায় বুঝিতে পারিল, তাহার পিতার পাপজনিত মস্তিষ্কবিকার। বালকের প্রতি যদিও দেবেন্দ্রের স্নেহের অভাব ছিল, কিন্তু বালক মাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পিতার বিষয় ভাবিত। একদিন 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' পড়িয়া বালক জানিল, যে, ব্রহ্মশাপে সাগরবংশ ধ্বংস হওয়ায় গঙ্গা আনিয়া ভগীরথ, বংশের উদ্ধার সাধন করিয়াছিল। বালক ভাবিতে লাগিল, পিতার পাপ মোচনার্থে সে কি কোন কার্য্য করিতে পারে না? আশুতোষের অপেক্ষাও যেন বালক পিতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু বালকের হৃদয়ে নাই। যে কারণেই হউক, তাহার মনে হইত যে তাহার পিতার কোনরূপ উপশম হয় নাই। বাহ্যিক উপশম মাত্র। আশঙ্কা পিতৃব্যকে জানাইল, কিন্তু আশুতোষ সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন,—"তুমি বালক, বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার পিতা আরোগ্যের পথে আসিয়াছে।" এরূপ আশারও যথেষ্ট কারণ, স্ত্রীর গৃহে শয়ন করিতে দেবেন্দ্র নিত্য যান এবং ভাদ্রবধূর দ্বারা আশুতোষ সংবাদ পান যে, উত্তরোত্তর উন্নতিই বটে, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন প্রাতে একটা গোলযোগে আশু-তোষের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেবেন্দ্র হস্তমুখ ধুইতে যাইয়া আর ফিরিয়া আইসে নাই। অনেক অনুসন্ধান হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রের তত্ত্ব পাওয়া গেল না। বৈকালে সংবাদ আসিল, যে হেদোয় একটা মড়া ভাসিয়া উঠিয়াছে, মৃতদেহ তীরে তোলা হইয়াছে, সকলেই বলিতেছে—সে দেবেন্দ্র। ব্যগ্র চিত্তে আশুতোষ গিয়া দেখে যে—দেবেন্দ্রই বটে! দৃঢ়মুষ্টিতে কাদা ধরিয়া রহিয়াছে!

দেবেন্দ্রের এইরূপ অপঘাত মৃত্যুর পর সরোজিনীর আত্মগ্লানির সীমা রহিল না। তাঁহার স্থির ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার অসতর্কতাতেই তাঁহার স্বামী

বাটী হইতে বহির্গত হইয়া আত্মহত্যা করিতে পারিয়াছেন। এই ঘোর দুশ্চিন্তায় দুই তিন মাস পরে তাঁহারও মৃত্যু হইল।

আশুতোষ নিত্যগোপালকে বাড়ী লইয়া গেলেন। নিত্যগোপাল সকাতরে জ্যেষ্ঠতাতকে মিনতি করিয়া বলিল, "আমি গয়াধামে পিতামাতার পিণ্ডদান করিব।" আশুতোষ নিজেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, কিন্তু বিশেষ কার্য্যবশতঃ যাইতে পারিলেন না, উপযুক্ত লোক সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার দুই চারি দিন পরে আশুতোষ নিত্যগোপালের হস্তাক্ষরে একখানি পত্র পাইলেন। পত্র পড়িয়া স্তম্ভিত হইলেন। নিত্যগোপাল লিখিয়াছে—যে, তাহার পিতা অপঘাতে মরিয়াছেন, তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিবেন। ভগীরথ পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থে কঠোর তপস্যায় গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। ভগীরথের সার্থক জন্ম। নিত্যগোপাল শুনিয়াছে যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিলে চতুর্দ্দশ পুরুষ ঊর্দ্ধে ও নিম্নে মুক্ত হয়। তাই পিতৃপুরুষের হিতার্থে নিত্যগোপাল সেই পথ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহাকে তাহার বিশেষ অনুরোধ যে, যে সকল ব্যক্তির নিকট মন্দ উপায়ে তাহার পিতা সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, সে সকল তাহাদের যে উত্তরাধিকারী আছে, তাহাদিগকে পুনরর্পিত হউক। বক্রী যে বিষয় থাকিবে, সমস্ত যেন সৎকার্য্যে নিয়োজিত হয়। পত্রপাঠে আশুতোষ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, ভাবিয়াছিলেন, সমস্ত সম্পত্তি সুবোধ নিত্যগোপালকেই দিবেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে শোকমিশ্রিত আনন্দও জন্মিল, এক বিন্দু অশ্রুপাতও হইল। গদ গদ বচনে বলিলেন, "আমাদের কুল উদ্ধারের নিমিত্ত পিতৃদেবগণের পুণ্যে কে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।"

তীর্থ-প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীকালীকুমার অধিকারী।

ক্রমে শম্ভুনাথ-বাড়ীতে সমুপস্থিত হইলাম। সুন্দর স্থান! ঝিল্লিতান-মুখরিতকাননরাজি কুসুমের মধুর হাসিতে মনোহর! চারিদিক্ বন্য সুষমায় ভরপুর! সে শোভা যিনি দেখেন নাই, তাঁহার কল্পনা করাও অসাধ্য। প্রথম প্রহর বেলা অবসানপ্রায়। ছায়াশীতল বিটপিরাজিতে চারিদিক পূর্ণ। প্রভাতের রৌদ্র নাতিখর। সারাপথ হাঁটিয়াছি, পায়ে একটু বেদনা অনুভূত হইলেও অক্লান্তোৎ-ফুল্লপ্রাণে উৎসাহের অভাব নাই। নাটমন্দিরের সোপানে বসিয়া সুরভিস্নাত

মধুর মলয়ে আত্মাবসাদ দূর করিতে লাগিলাম। কত লোক পূজার ডালি লইয়া ভক্তিমিশ্রিত কোমল সুরে স্তবগীতি উচ্চারণ করিয়া বাবার দর্শনে যাইতেছে। তাহাদের মুখ কি স্বর্গীয়সুষমামিশ্র! পুষ্পস্তবকশোভনসুকরা পুরাঙ্গনাগণ বিলোলচক্ষে এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া প্রফুল্লমনে বিরলবসতি স্তব্ধবনভূমির শোভা বাড়াইয়া বাবার মন্দিরে যাইতেছেন। পিঞ্জরিতপ্রাণ বালাগণ বুঝি আজ উন্মুক্ত পৃথিবী দর্শনে বড় আনন্দিতা, তাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তদৃষ্টিচঞ্চলা! বনভূমিও বুঝি তাঁহাদের পুষ্পস্পর্শচরণপাতসুখজন্ম বিহ্বলা!

আশ্রমস্থ সঘনানিবিড়বিটপিকুল অবিচ্ছেদ্যঘনপল্লবাকীর্ণ; নানাজাতীয় পক্ষি-রবে সেইস্থল কলগীতিমুখর। বিচিত্র সুরমাধুর্য্যে কর্ণকুহর তৃপ্ত হইতে লাগিল। এ প্রকার নয়নাভিরাম স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রাণ আদৌ চাহে না। অতঃপর শম্ভুনাথদেবের মন্দিরে চলিলাম। শম্ভুনাথ লিঙ্গটি—স্বয়ম্ভু, অষ্টশক্তিসমন্বিত এবং 'ক্রমদীশ্বর' নামে খ্যাত। মন্দিরটীতে তিনটি প্রকোষ্ঠ। ৩য় প্রকোষ্ঠে, যেখানে ক্রমদীশ্বর শিব আছেন, সেখানে জগন্মাতা অন্নপূর্ণা, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতামায়ীর মূর্ত্তিও আছে। ২য় প্রকোষ্ঠ খালি এবং প্রথম প্রকোষ্ঠে অসংখ্য শালগ্রাম বর্ত্তমান। মন্দিরদ্বারে পাষাণময় দ্বারপাল—ভৈরব! বাবার মাহাত্ম্য বিশেষ প্রকট। এই ক্রমদীশ্বর শিব ও তাঁহার দ্বারপাল ভৈরব সম্বন্ধে কতকগুলি জন-শ্রুতি শুনিলাম। তাহার দুই একটি এখানে দিতেছি।

একদিন একজন ভদ্রলোক বাবা শম্ভুনাথদেবের সান্ধ্যারতি সন্দর্শনার্থ যান। আরতি শেষ হইয়া গেলে পরও তিনি হৃদয়ের আবেগে ঐস্থান হইতে যাইতে পারিলেন না। দর্শকবৃন্দ ক্রমে সকলই চলিয়া গেলে, তিনি একাকী রহিয়া গেলেন। আরতি সমাধা হইলে পূজারিগণও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, সেই সময় ঐ ভদ্রলোকটি জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, ঘণ্টাচামরপুষ্পপাত্রহস্তে একজন যোগিপুরুষ বদ্ধার্গল কপাটদ্বয় অনা-য়াসে খুলিয়া বাবার মন্দিরে চলিয়া গেলেন! তিনি ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, ইহা আমার সুপ্তোত্থিত চক্ষুতে জড়তার ভ্রান্তিচ্ছায়া পড়িলনা ত! পুনঃ করকুসিত লোচনে চাহিলেন, এবারও স্পষ্ট দেখিলেন, ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ হইতেছে! বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে তিনি ভাবিয়া কিছুই কিনারা করিতে না পারিয়া জাগরিত থাকিয়া আরো দেখিবার আশায় প্রস্তুত রহিলেন। জ্যোৎস্নাপুলকে বনশৈল-সমাকীর্ণ। নিস্তব্ধ পার্ব্বত্যদেশ নীরবে হাসিতেছে। টঁ—শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। গভীর নিস্তব্ধতায় অরণ্যানী মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন,

ক্রমদীশ্বরশিবপ্রকোষ্ঠে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, এত মৃদু যে, শ্রবণশক্তি সংযত না করিলে শুনিতে পাওয়া যায় না। ভদ্রলোকটি ইহার কিছু তথ্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া অবশেষে স্থানীয় একজন পূজারিকে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন। পূজারিগণ ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! শাস্ত্রে যে এখানে মুনিঋষিরা আছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহারই প্রমাণ বোধ হয় আজ আপনি পাইলেন। আমরাও সময় সময় ঐরূপ শুনিতে পাই, কিন্তু কিছু দেখি নাই।" ঐ ভদ্রলোকটি স্বয়ং আমাদের কাছে ঐরূপ গল্প করায় ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য ভাবিলাম।

আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাশয় আমাদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনিও একদিন রাত্রিতে ঐখানে থাকিয়া, 'জপস্তবকরো' 'জপস্তবকরো' ইত্যাকার শব্দ শুনিয়াছিলেন।

এ স্থানটি দেখিলেই দেবতাদের লীলাভূমি বলিয়া অনুভব হয়। যেখানে বাবা ক্রমদীশ্বর বর্ত্তমান, তাহার অনতিদূরেই একটি নির্ঝরধারা আসিয়াছে। এই নির্ঝর ধারা শাস্ত্রে মন্দাকিনী বলিয়া খ্যাত; লিঙ্গমূর্ত্তির নিকটে আসিয়া ধারাবাহী জলগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পরে আবার ধারাকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই ধারাটি এখন পাইপে বদ্ধ করিয়া সহরে আনা হইতেছে। ইহার ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন, ঢাকা জিলার রাজা শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ কুণ্ড বাহাদুর। ৭৫০০ হাজার টাকাতে এই জলের কল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের বেশ সুবিধা হইয়াছে। এই জলে অস্পৃশ্য কিছুরই সংস্রব নাই।

ক্রমদীশ্বর শিবমন্দিরের দ্বারে যে দ্বারপাল ভৈরব আছেন, তাঁহার সূক্ষ্মসতর্ক-দৃষ্টি জনশ্রুতিপ্রসিদ্ধ। কথিত আছে, কোনও লোক অনাচারপরায়ণ হইয়া বা অপরিষ্কৃতাবস্থায় দেবকার্য্য করিলে দ্বারপাল ভৈরববাবাজি তাহার প্রতি রুষ্ট হন। এ বিষয়ে অনেক কিম্বদন্তী আছে, কিন্তু আমরা বাহুল্যভয়ে তদ্ব্যাখ্যানে বিরত রহিলাম।

শুনা যায়, শম্ভুনাথ দেবের একটি অনুচর আছে, ক্ষেত্রপিশাচ নামে সে বিখ্যাত। ক্ষেত্রপিশাচের অনেক অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে, এই ক্ষেত্রপিশাচ যে দিন ডাকে, তাহার তিন দিন মধ্যেই একজন-না-এক-জনের মৃত্যু এখানে অনিবার্য্য। একদিন আমার একটি আত্মীয় বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত মৃত্যুদশায় নীত হইলে সকলের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে শিবযাত্রা করাইয়া ৺শম্ভুনাথের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

৮

নিশীথ-সময়ে উক্ত ক্ষেত্রপিশাচের কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একটি বিকট চীৎকার শ্রুত হইল! পূজারিগণ বলাবলি করিতে লাগিল, "উহা ঐ পিশাচেরই আওয়াজ, আজ আর ইহার (আত্মীয়টীর) নিস্তার নাই।" ঘণ্টাটাক্ পরেই দূরে 'হরিধ্বনি' শুনা গেল। বুঝা গেল যে, বাহিরে একজনের মৃত্যু হইয়াছে। তখন আবার পূজারিগণ বলিল, "আমাদের আত্মীয়টির মৃত্যুসূচনা পূর্ব্বোক্ত আওয়াজে হয় নাই।" বাস্তবিকও এ যাত্রা আত্মীয়টি রক্ষা পাইলেন। লোকে বলে উক্ত পিশাচ একজন শিবদূত।

কথাপ্রসঙ্গে এখানে আমরা আর একটি তীর্থের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই তীর্থের নাম—'জ্যোতির্ম্ময়!'

জ্যোতির্ম্ময়ের একটি বিশেষত্ব এই যে, পাষাণে অগ্নি জ্বলিতেছে; আবার জলধারাহত পাষাণেও কোথায় কোথায় অগ্নি জ্বলিতেছে। শাস্ত্রে ঐ বিষয়ে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে। যথা :—

ধর্ম্মাগ্নি বর্ত্ততে দেবি তৎপূর্ব্বে শিবরূপধৃক্।
যং দৃষ্ট্বা ভারতে বর্ষে মোক্ষমাপ্নোতি মানবঃ॥

হে দেবি! তৎপূর্ব্বে (রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর কুণ্ডের) শিবরূপধারী ধর্ম্মাগ্নি বর্ত্তমান আছেন, ভারতবর্ষে মানবগণ তদ্দর্শনে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

এই জ্যোতির্ম্ময়ের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকুণ্ড নামে তিনটি কুণ্ড আছে। গিরিকন্দরকুণ্ঠবায়ুপরিচালিত ব্রততীকুঞ্জে কুণ্ডত্রয়ের শোভা মনোরম। নানাবিধ পক্ষিরবে,পত্রবিচ্ছেদপথপ্রবিষ্টরৌদ্রকান্তিতে ও স্বভাবশীতল শৈত্যে স্থানটি বিধাতার নিপুণ সৃষ্টির নিদর্শন বলিয়া অনুভূত হয়।

সীতাকুণ্ডটি এখন মজিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে যে, এই কুণ্ড কলিযুগের চারি হাজার বৎসর পর্য্যন্ত প্রকাশ থাকিয়া পরে গুপ্ত হইবে। যথা :—

কলেশ্চতুঃসহস্রাণি বর্ষাণি লক্ষণান্বিতং।
প্রকাশমানং তৎ স্থিত্বা ততো গুপ্তং ভবিষ্যতি॥

· চণ্ডিকাখণ্ড।

কিন্তু কখন যে কুণ্ডটি গুপ্ত হইয়াছে, তাহার ঠিক বিবরণ আমরা চেষ্টা করিয়াও শুনিতে পাই নাই। কুণ্ডটির ভিতরে সম্প্রতিও আগুন জ্বলিতেছে।

সীতাকুণ্ডের মন্দিরটির অনতিদক্ষিণে রামকুণ্ড এবং লক্ষ্মণকুণ্ডদ্বয় জড়িতকলেবরে বর্ত্তমান। কুণ্ডদ্বয়ের গঠনক্রিয়া ভ্রাতৃভাবের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধব্যঞ্জক। শ্রীরাম-চন্দ্রের বনগমনকালে বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া লক্ষ্মণ অগ্রজের

অনুসরণ করিয়া যেমন একপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কুণ্ড দুইটি তাহারই নিদর্শনস্বরূপ একত্র বিজড়িত।

আজ এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে ঊণকোটী শিবের বাড়ী, বিরূপাক্ষ, চন্দ্রনাথ, পাতালপুরী, বাড়বানল এবং লবণাক্ষ প্রভৃতি দর্শনযোগ্য আরো অনেক স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রার্থনা।

মা, কেন আমায় সংসারে আনিলে? যদি আনিলে, তোমার রচিত মনোমুগ্ধকারী ভোগ্য দ্রব্যসমূহের মধ্যে আমায় রাখিলে কেন? এই ভোগ্য বিষয়গুলির দিব্য মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, হায় মা, তোমায় ভুলিয়াছি—তোমায় ভুলিয়াছি বলিয়া মায়ায় মজিয়াছি—মায়ায় মজিয়াছি বলিয়া যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। যে উদ্দেশ্যে এ জগতে আসিলাম তাহার কিছুইতো করিতে পারিলাম না—কেবল আমোদে প্রমোদে নানাবিধ বাজে কাজে দিনগুলি অতিবাহিত করিলাম! দীন দয়াময়ী মা, তুমি কোথায়? মাগো, অবোধ সন্তানকে রেখে কোথায় আছ মা? তোমা ছাড়া হয়ে আমি যে কুপথগামী হয়েছি মা! তুচ্ছ সুখের আশায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিলাম—কিন্তু সুখতো পাইলাম না। ফলে কুপ্রবৃত্তির বশে এবং ইন্দ্রিয়গ্রামের তাড়নায় আপনাকে উৎসন্ন দিয়াছি, অধঃপাতিত করিয়াছি! জীবন দীর্ঘায়ুহীন হইয়াছে, দেহ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়াছে, হৃদয় দীন, বুদ্ধি মলিন এবং জ্ঞান অবিদ্যায় বিলীন হইয়াছে, শক্তি সঙ্কুচিত এবং ভক্তি তিরোহিত হইয়াছে। তোমায় ভুলিয়া তোমার প্রদত্ত সত্য, শৌচ, দয়া, দান, ক্ষমা, সন্তোষ, সরলতা, শম ও ইন্দ্রিয়দমন, স্বধর্ম্মপালন, সমদৃষ্টিতা, তিতিক্ষা, লাভে উপেক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চা, বৈরাগ্য, আত্মসংযম, কর্ত্তব্য বিবেচনা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, শ্রদ্ধা, নিরহঙ্কারিতা প্রভৃতি যত সদ্গুণ সব হারাইয়াছি! তোমায় ভুলিয়াছি বলিয়া আমার জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, তোমায় ভুলিয়াছে বলিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যার স্নেহে, সংসারের মোহে কর্ত্তব্যপথ হারাইয়াছি এবং কুপথে ঘুরিয়া কষ্ট পাইতেছি। হায় মা! তোমায় ভুলিয়াছি বলিয়া তৃপ্তির পরিবর্ত্তে অতৃপ্তি, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি চিরদিনই ঘিরিয়া

রহিয়াছে। মা, আমি অতীব দীন দুঃখী। এই দীন দুঃখীর মা হইয়া একবার দেখা দাও—এ ত্রিতাপতাপিত প্রাণ জুড়াইয়া যাউক। এ অশান্তি-বিদগ্ধ জীবন শান্তিনীরে অবগাহন করুক। মা, কি দুরদৃষ্ট—চক্ষু থাকিতেও তোমায় দেখিতে পাইলাম না! কর্ণ থাকিতেও তোমার অভয়বাণী শুনিতে পাইলাম না! রসনা থাকিতেও তোমার মধুময় নামামৃত আস্বাদন করিতে পারিলাম না! মা, আমার মানবদেহ ধারণ বিফল হইল! মা তারা! শুনিয়াছি, তুমি অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, নির্ধনের ধন, দুর্ব্বলের বল, এবং কাঙ্গালের নিধি। মা তুমি দীন দুঃখীর মা, তাই বড় ব্যাকুল প্রাণে তোমার "দীনদয়াময়ী" নামমাত্র সম্বল করিয়া ডাকিতেছি। নশ্বর ঐশ্বর্য দিয়া এই ভিক্ষুকের মন ভুলাইয়া তোমার চারু চরণচ্ছায়াদানে কৃপণতা করিও না। মা, ইহ সংসারের সকল কথা শেষ করিয়া দাও, সকল বৃত্তি পুড়াইয়া দাও এবং 'আমার' বলিতে যাহা কিছু আছে সব হরণ করিয়া লও এবং আমার প্রবৃত্তি-স্রোতকে তোমার চরণসরোজাভিমুখে চালিত কর। মা কৃপাময়ি! আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দাও, মা, ধর্ম্মপথে মতি এবং রতি দাও, আমায় ত্যাগ শিক্ষা দাও। মাগো প্রাণে বড় জ্বালা, বড় ব্যথা। সন্তানের ব্যথা তুমি ভিন্ন আর কে বুঝিবে মা! প্রাণের ভিতর দিবা-নিশি দাউ দাউ নিরাশানল জ্বলিতেছে। সে জ্বালাময়ী জ্বালা কি জুড়াইবে না? একবার কৃপাবারি সেচনে জ্বালা নির্ব্বাপিত কর মা,—নতুবা মরি! মাগো, আর কি নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে না? এ অধম সন্তানের কালরাত্রির কি অবসান হইবে না? এ নিরানন্দ প্রাণ কি আর আনন্দরসে আপ্লুত হইবে না? আশায় ও আশ্বাসে এ হৃদয় কি আর নৃত্য করিবে না? সত্য সত্যই কি অধঃ-পতনের অগাধ সমুদ্রে ডুবিব! জননি! তোমার কৃপা ব্যতিরেকে এ অধম সন্তানের আর অন্য উপায় নাই! মা তুমি আমার সর্ব্বপ্রকার আশা ও সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল—আমার জীবনের অবলম্বন। সুখে এবং দুঃখে, স্বাস্থ্য এবং রোগে, সম্পদে এবং বিপদে, শয়নে ও জাগরণে তুমি আমার জীবনের জীবনরূপে আমাতে রহিয়াছ। মা, তুমি আমার নয়নের দৃষ্টি, কর্ণের শ্রুতি এবং হৃদযন্ত্রের অবিরাম স্পন্দন। মা! তুমি কেবল একমাত্র নিত্য সত্য। সকলের মূল তুমি, সকলই তুমি এবং তুমিই সকল বস্তু। তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তুমি জগতের আদি কারণ-রূপা, তুমি অনন্ত, অনাদ্যা ও সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি। তোমার শক্তিতে ব্রহ্মা সৃজন করেন, তোমার শক্তিতে বিষ্ণু পালন করেন এবং তোমার শক্তিতে মহেশ্বর সংহার করেন! তোমার শক্তিতে বায়ু অবিরত বহিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, চন্দ্র

সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি নিরন্তর আলোক দান করিতেছে। এই বিশ্বসংসার তোমা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমাতেই বাস করিতেছে এবং লয় হইয়া তোমাতেই থাকিবে। এই বিশ্বের ক্ষুদ্র এবং মহৎ সমস্ত বস্তু তোমার অপার মহিমার পরিচয় দিতেছে। মা, তুমি এক হইয়াও অনেক, নির্গুণা হইয়াও সগুণা, নিরাকারা হইয়াও সাকারা এবং নির্লিপ্তা হইয়াও ইচ্ছাময়ী। তুমি সর্ব্বজনে বুদ্ধি, শক্তি, স্মৃতি, দয়া, শ্রদ্ধা, শান্তি, সুখ এবং মাতৃরূপে বাস করিতেছ। ক্ষুধায় তুমি মা অন্নপূর্ণা, পালনে তুমি মা জগদ্ধাত্রী, দারিদ্র্যে তুমি মা লক্ষ্মী, অবিদ্যায় তুমি মা সরস্বতী, বিপদে তুমি মা দুর্গা এবং কালভয়ে তুমি মা কালী—তোমায় বারম্বার নমস্কার। আনন্দময়ি মা! জীবনের বেলা আর অধিক নাই। জীবন-সন্ধ্যা সমাগত। মা, এ সংসার-পান্থশালায় আর থাকিতে চাহি না। মা, এ অধম দীন পুত্রকে কোলে তুলিয়া তোমার দিব্যধামে লইয়া চল। মা, আমার মরমের আর্ত্ত-গাথা তোমার নিকট কি পৌছায় না! মা শান্তিময়ি, এ অবোধ অনাথ পথহারা বালককে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও। মা, তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যে কয় দিন এই পান্থশালায় থাকি, সে কয় দিন যেন সকল কর্ম্মের প্রারম্ভে, মধ্যে এবং অবসানে বলিতে পারি "জয় মা আনন্দময়ি" আশীর্ব্বাদ কর, মা, যেন তোমার অভয়বাণী শুনিতে শুনিতে, তোমার মধুময় নামরস আস্বাদন করিতে করিতে, তোমার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে এবং তোমার চিন্তায় বিভোর থাকিতে থাকিতে এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হই!

শ্রীআদ্যাপ্রসাদ ঘোষ।

রামকৃষ্ণ মিশন।

ঘাঁটাল বন্যাকার্য্য।

পাঠকবর্গকে কার্য্যের বিবরণের কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে চারিটী কেন্দ্র হইতে কার্য্য হইতেছে:—ঘাঁটাল কেন্দ্র, রাণীচক কেন্দ্র, গোপীগঞ্জ কেন্দ্র ও ইরপালাকেন্দ্র। প্রথমোক্ত তিনটী কেন্দ্র হইতে চাল বিতরণ হইতেছে, ইরপালা হইতে গৃহশূন্য ব্যক্তিদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা হইতেছে। বিগত ১০ই অক্টোবর ঘাঁটাল কেন্দ্র হইতে পূর্ব্বপ্রকাশিত, গ্রামগুলি ব্যতীত

শীতলপুর, বরদা, দণ্ডীপুর, ধর্ম্মতলা, ময়রাপুকুর, সিংপুর, দাসপুর ও রামচন্দ্রপুর গ্রামে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৩টী পরিবারের ৯২ জন লোককে ৮ মণ ৩৪ সের চাল দেওয়া হয়। ঐ সময়েই গোপীগঞ্জ কেন্দ্র হইতে উত্তরবাড়, বেনাই, আলিপুর, মহিষঘাটা, দক্ষিণবাড়, মোহনখালি, আরিটী, ভুঁইআড়া, নিশ্চিন্দিপুর, নৈহাটী, চৈপট ও ফরিদপুর গ্রামে ৮৫টী পরিবারের ৮৯ জন লোককে ৯ মণ ৩৪ সের চাল দেওয়া হয়।

১৯শে অক্টোবর ইরপালা কেন্দ্রের অন্তর্গত কিশমতখড়কপুর, দীর্ঘলগ্রাম, সাওয়াই, মঙ্গরুল, দেওয়ানচক, সুলতানপুর, আলিয়া, কুলিয়া, জয়বাগ, আমড়াপাট, লক্ষ্মণপুর, মুরটালা, বাসবরি ও ইরপালা গ্রামের ৬৪টী পরিবারকে কুটীর নির্ম্মাণের জন্য ১৭৮৲ সাহায্য করা হয়। ২১শে অক্টোবর রাণীচক কেন্দ্রের অন্তর্গত রাণীচক, দাড়ি, চৈপাটচক, জগৎপুর, কুমারচক, গড়, ভগবতীপুর, খঞ্জপুর, খুদিচক, কায়েগারে, তিয়ালিশ, বিষ্ণুপুর, লাগোলা, কলাগাছিয়া, দুবরাজপুর ও হলডাঙ্গা গ্রামের ৬৯টী পরিবারের ৯৯ জন ব্যক্তিকে ১০ মণ ২০ সের চাল দেওয়া হয়। ২২শে অক্টোবর গোপীগঞ্জ কেন্দ্রে—১০ই অক্টোবরে যে গ্রামগুলিতে চাল বিতরণ হয়, সেগুলি ব্যতীত পাঁচগাছিয়া, কুলটিকরি, জয়রামচক ও আদমপুর গ্রামে ১০৭টী পরিবারের ১৩৯ জন ব্যক্তিকে ১৫ মণ ২০ সের চাল দেওয়া হয়। ২৪শে অক্টোবর ঘাঁটাল কেন্দ্রে পূর্ব্বোক্ত গ্রামগুলি ব্যতীত রাধানগর, রাজনগর, প্রতাপপুর, দীর্ঘলগ্রাম, মানস্থকা, কোন্নগর, নওয়াদা, খর, মঙ্গরল, স্থরা ও পাঁচাগুা গ্রামে ৯৩টী পরিবারের ১১৬ জন ব্যক্তিকে ১২ মণ চাল দেওয়া হয়।

আমরা এস্থলে বিশেষভাবে ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট, মেদিনীপুরের কালেক্টর আর,জি, কিল্‌বির মারফত আমাদের ব্রহ্মচারিগণের হস্তে ২০০৲ দুই শত টাকা নিঃসহায় বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিতরণের জন্য দিয়াছেন; আর ঘাঁটাল বন্যাদুঃখপ্রতিকারসমিতির নিকট হইতে পূর্ব্বস্বীকৃত ৭৬৲ টাকা ব্যতীত আরও ৩৮০৷৶০ পাওয়া গিয়াছে। বারাণসীধাম হইতে স্বামী অচলানন্দও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান সংগ্রহ করিয়া এই কার্য্যের সাহায্যার্থ ১০০০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ঘাঁটাল বন্যা-কার্য্যে প্রাপ্তিস্বীকার।

কার্ত্তিকের উদ্বোধনে স্বীকৃত	১৪৫৷০
শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র তালপত্র, কলিকাতা	১৲
শ্রীপ্রফুল্লনাথ রুদ্র, কলিকাতা	২৸০

কলিকাতা ইডেন হিন্দুহোটেলের ৩নং ওয়ার্ডের ছাত্রগণ	৬৸৵০
শ্রীঅখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা	১৲
শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	১০৲
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন (বরিশাল) সংগৃহীত (১ম দফা)	২৫৲
শ্রীবেণীমাধব মুখোপাধ্যায়, রংপুর	১৲
কলিকাতা ইডেন হিন্দুহোষ্টেলের ১নং ওয়ার্ডের ছাত্রগণ	৭৵০
মাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উনাও (ইঁহার মৃত দাসীর সঞ্চিত অর্থ)	৪৯॥০
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন (বরিশাল) সংগৃহীত (২য় দফা)	৩০৲
সেখ মতি উদ্দিন, ডায়মণ্ড হারবার	৫০৲
শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা	৫৲
শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) সংগৃহীত	১৲
জনৈক বন্ধু, বালি	১৲
শ্রীসুশীলকুমার সিংহ, কলিকাতা	১৲
শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, গোবরুপুর	৫৲
মিঃ জে, এল, দাস, কলিকাতা	৫৲
শ্রীফণিভূষণ পাল, কলিকাতা	১৲
শ্রীমুনীন্দ্রকুমার সাহা, দিনাজপুর	১৲
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, ঢাকা	২৸০
শ্রীগিরীন্দ্রকুমার গুহ, কলিকাতা	১৲
মিঃ পি, সি, ঘোষ, মিরাট	৫০৲
মিঃ এস, সি, সিংহ পাবনা	৫৲
শ্রীমুনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরা	১৲
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন (বরিশাল) সংগৃহীত (৩য় দফা)	২০৲
ঐ ঐ (৪র্থ দফা)	২৫৲
ঐ ঐ (৫ম দফা)	২৫৲
শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু দেব বর্ম্মা, দেওঘর	৫।৵০
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন (বরিশাল) সংগৃহীত (৬ষ্ঠ দফা)	১৫৲
শ্রীপ্রবোধচন্দ্রকুণ্ডু, ভবানীপুর	৫॥৵০
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী	১৲
জনৈক বন্ধু মাঃ শ্রীনাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ, ঘাঁটাল	৫৲
শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘাঁটাল	১৲
শ্রীকৃষ্ণদাস নায়ক, ঘাঁটাল	।০
ঘাঁটাল বন্যাদুঃখপ্রতীকারসমিতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ঘাঁটাল	১
ঐ ঐ ২য় দফা	৮৲
ঐ ঐ ৩য় দফা	২৫৲

ঐ	ঐ	৪র্থ দফা	২৫৲
ঐ	ঐ	৫ম দফা	৬৫৫/০
ঐ	ঐ	৬ষ্ঠ দফা	৬১৸৵০

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট মাঃ আর. জি, কিলবি (কলেক্টার) মেদিনীপুর	২০০৲
শ্রীনিত্যরঞ্জন সেন, কলিকাতা	১৪৸০
শ্রীকালীদাস শূর, হুগলি	৫৲
শ্রীসতীশচন্দ্র পাল, মিরাট	১৲
শ্রীরাখালচন্দ্র দাস, মুর্শিদাবাদ	১৲
শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়, শিমুলতলা	৪৲
শ্রীমিহিরলাল লস্কর, রঘুনাথপুর	||১০
শ্রীসত্যভূষণ দে, বরিশাল	১০৲
শ্রীরাধাচরণ সেন, গোরক্ষপুর	২৲
শ্রীদীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহ	১৲
শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, সিলেট	১৩৷০
শ্রীগিরীন্দ্রকুমার গুহ, ভবানীপুর	১৲
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস (মেদিনীপুর) সংগৃহীত	৩৷৷০
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, চুঁচুড়া	৩৪।/০
শ্রীনবীনকিশোর চৌধুরী, পাবনা	২৫৲
শ্রীনীলমণি শূর, কলিকাতা	৫০৲
মাঃ স্বামী অচলানন্দ, বারাণসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানসংগ্রহ	১০০০৲
শ্রীক্ষিতীশ্বর মিত্র, কলিকাতা	৫৲
শ্রীশচন্দ্র মতিলাল, কলিকাতা	১৲
শ্রীপ্রফুল্লনাথ রুদ্র, (কলিকাতা) সংগৃহীত	৬৭৸৶০
শ্রীনন্দলাল মল্লিক মাঃ শ্রীপ্রফুল্লনাথ রুদ্র, কলিকাতা	১০৲
দর কৃষ্ণনগর মধ্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ মাঃ শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাস, মেদিনীপুর	৪৲
শ্রীজ্ঞানানন্দ দাস সংগৃহীত মেদিনীপুর	১৭৲
শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, কালীঘাট	৮৲
ঘাঁটাল বন্যাদুঃখ প্রতীকার সমিতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (৭ম দফা)	১২৩৲
	২৩৪২।৶১০

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীকিরণচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রফুল্লনাথ রুদ্র, শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু হোষ্টেলের ১ নং ওয়ার্ডের ছাত্রগণ, শ্রীগিরীন্দ্রকুমার গুহ (কলিকাতা) ও শ্রীবিজয়মঙ্গল রায় (বরিশাল)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৯-২২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাবিলাস—গোপালের মা।

'কামারহাটির বামনীর' গোপালরূপী শ্রীভগবানের দর্শনের কিছুকাল পরে রথের সময় ঠাকুর একদিন কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন— বাগ-বাজারের বলরাম বসুর বাটীতে। ভক্তদের ভিড় লাগিয়াছে—বলরাম বাবুও আনন্দে আটখানা হইয়া সকলকে সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। বসুজ মহাশয় পুরুষানুক্রমে বনিয়াদি ভক্ত—এক পুরুষে নয়। ঠাকুরের কৃপাও তাঁহার ও তৎপরিবারবর্গের উপর অসীম। ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনা— এক সময়ে ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করা দেখিবার সাধ হইলে ভাবাবস্থায় তদ্দর্শন হয়; সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—অসীম জনতা,হরিনামে উদ্দাম উন্মত্ততা!—আর সেই উন্মাদতরঙ্গের ভিতর উন্মাদ শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মাদনী আকর্ষণ!—সেই অপার জনসংঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানের পঞ্চবটীর দিক্ হতে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—উহারই ভিতর যে কয়েক-খানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিতে চিরঅঙ্কিত ছিল, বলরাম বাবুর ভক্তিজ্যোতিপূর্ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি তাহাদের অন্যতম। বলরাম বাবু যে দিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হন, সে দিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন—এ ব্যক্তি সেই লোক।

বসুজ মহাশয়ের কোঠারে (উড়িষ্যার অন্তর্গত) জমীদারী, ও শ্যামচাঁদ বিগ্রহের সেবা আছে. শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ ও শ্যামসুন্দরের সেবা আছে এবং কলিকাতার বাটীতেও ৺জগন্নাথদেবের বিগ্রহ * ও সেবাদি আছে। ঠাকুর বলিতেন, "বলরামের শুদ্ধ অন্ন—ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথ ফকিরের সেবা—ওর বাপ সব ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম কচ্চে—

* এই বিগ্রহ এখন কোঠারে আছেন।

ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন হড়াৎ হড়াৎ করে আপনা হতে নেমে যায়।" বাস্তবিক ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর বলরাম বাবুর অন্নই (ভাত) তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি। কলিকাতায় ঠাকুর যে দিন প্রাতে আসিতেন, সে দিন মধ্যাহ্নভোজন বলরামের বাটীতেই হইত। ব্রাহ্মণ ভক্তদিগের বাটী ব্যতীত অপর কাহারও বাটীতে কোন দিন অন্নগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ—তবে অবশ্য নারায়ণ বা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অন্য কথা।

অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগের অতি সামান্য নিত্য নৈমিত্তিক চেষ্টাদিতেও কেমন একটু অলৌকিকত্ব, নূতনত্ব থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত যাঁহারা একদিনও সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার মর্ম্ম বিশেষরূপে বুঝিবেন। বলরাম বাবুর অন্ন খাইতে পারা সম্বন্ধেও একটু তলাইয়া দেখিলে উহাই উপলব্ধি হইবে। সাধনকালে ঠাকুর এক সময়ে জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন—"মা আমাকে শুক্‌নো সাধু করিস্ নি—রসে বসে রাখিস্", জগদম্বাও তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার রসদ্ (খাদ্যাদি) জোগাইবার নিমিত্ত চারিজন রসদার প্রেরিত হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন—ঐ চারিজনের ভিতর রাণী রাসমণির জামাতা, মথুরানাথ প্রথম ও বলরাম বাবু দ্বিতীয় ছিলেন। সিমলার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে (যাহাকে ঠাকুর কখন "সুরেন্দর" ও কখন "সুরেশ" বলিয়া ডাকিতেন) 'অর্দ্ধেক রসদার'—অর্থাৎ সুরেন্দ্র পুরা একজন রসদার নয়—বলিতেন। মথুরানাথের সেবা চক্ষে দেখা আমাদের ভাগ্যে হয় নাই—কারণ আমরা তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির অনেক পরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। তবে ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। কিন্তু বলরাম বাবুর সেবাধিকার যাহা দেখিয়াছি তাহাই আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। সে সব কথা অপর কোন সময়ে বলিবার চেষ্টা করিব। এখন এইটুকুই বলি যে বলরাম বাবু যে দিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন, সেই দিন হইতে ঠাকুরের অদর্শন দিন পর্য্যন্ত, ঠাকুরের নিজের যাহা কিছু আহার্য্যের প্রয়োজন হইত, প্রায় সে সমস্তই জোগাইতেন—চাল, মিছরী, সুঁজি, সাগু, বার্লি, ভার্ম্মিসেলি, টেপিওকা ইত্যাদি; এবং সুরেন্দ্র বা সুরেশ মিত্তির, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিবার অল্পকাল পর হইতেই ঠাকুরের সেবাদির নিমিত্ত যে সকল ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাত্রি যাপন

করিতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত লেপ বালিস ও ডাল রুটির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

কি গূঢ় সম্বন্ধে যে এই সকল ব্যক্তি ঠাকুরের সহিত সম্বদ্ধ ছিলেন তাহা কে বলিতে পারে? কোন্ কারণে ইঁহারা এই উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হন, তাহাই বা কে বলিবে? আমরা এই পর্য্যন্তই বুঝিয়াছি যে, ইঁহারা মহা ভাগ্যবান—জগদম্বার চিহ্নিত ব্যক্তি! নতুবা লোকোত্তর পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বর্ত্তমান লীলায় ইঁহারা এইরূপে বিশেষ সহায়ক হইয়া জন্মাধিকার লাভ করিতেন না। নতুবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত মনে ইঁহাদের মুখ-চ্ছবি এরূপ ভাবে অঙ্কিত থাকিত না—যাহাতে তিনি দর্শন মাত্রেই বুঝিলেন ও বলিলেন—"ইহারা এখানকার, এই বিশেষ অধিকার লইয়া আসিয়াছে।"

'ইহারা আমার' না বলিয়া 'এখানকার' বলিলেন, কারণ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপাপবিদ্ধ মনে অহংবুদ্ধি এতটুকুও স্থান পাইত না। তাই 'আমি, আমার' এই কথাগুলি প্রয়োগ করা তাঁহার পক্ষে বড়ই কঠিন ছিল। কঠিন ছিলই বা বলি কেন? তিনি ঐ দুই শব্দ আদৌ বলিতে পারিতেন না। যখন নিতান্তই বলিতে হইত, তখন 'শ্রীশ্রীজগদম্বার দাস বা সন্তান আমি' এই অর্থে বলিতেন, এবং উহাও পূর্ব্ব হইতে ঐ ভাব ঠিক ঠিক মনে আসিলে তবেই বলা চলিত, সে জন্য কথোপকথনকালে কোন স্থলে 'আমার' বলিতে হইলে ঠাকুর নিজ শরীর দেখাইয়া 'এখানকার' এই কথাটি প্রায়ই বলিতেন—ভক্তেরাও উহা হইতে বুঝিয়া লইতেন—যথা 'এখানকার লোক', 'এখানকার ভাব নয়' ইত্যাদি বলিলেই আমরা বুঝিতাম তিনি, 'তাঁহার লোক নয়' বা 'তাঁহার ভাব নয়', বলিতেছেন।

যাক্ এখন সে কথা—এখন আমরা রসদ্দারদের কথাই বলি—প্রথম রসদ্দার মথুরানাথ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কলিকাতায় প্রথম শুভাগমন হইতে সাধনাবস্থা শেষ হইবার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন; দ্বিতীয় দেড়জন—দেড় বলিতেছি, কারণ, সুরেশ বাবু অর্দ্ধেক বলিয়া পরিগণিত হইতেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের ছয় সাত বৎসর পূর্ব্ব হইতে চারি পাঁচ বৎসর পর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার ও তদীয় সন্ন্যাসী ভক্তদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহারা ঐরূপ করিয়াছিলেন বলিয়াই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে, মুন্সী বাবুদিগের পুরাতন ভগ্ন জীর্ণ বাটীতে প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর-মঠ আজ বেলুড়-মঠে পরিণত! হিসাবের বাকি

আর দেড়জন রসদ্দার—কোথায় তাঁহারা? যে দুইজন ইংলণ্ড ও আমেরিকা-নিবাসিনী মহিলা (মিস্ এফ্ এচ্ মূলার ও মিসেস্ সারা সি বুল্) শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজিকে বেলুড়-মঠ স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন—তাঁহারাই কি ঐ দেড়জন?—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ স্বামীজির অদর্শনে এ কথা এখন আর কে মীমাংসা করিবে?

* * * * *

আজ রথযাত্রা। বলরাম বাবু দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর রথের সময় ঠাকুরকে বাটীতে লইয়া আসেন। বাগবাজার, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে, তাঁহার বাটী অথবা তাঁহার ভ্রাতা কটকের প্রসিদ্ধ উকীল রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের বাটী। বলরাম বাবু তাঁহার ভ্রাতার বাটীতেই থাকিতেন। বাটীর নম্বর ৫৭। এই ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট বাটীতে ঠাকুরের যে কতবার শুভাগমন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইযাছে, তাহার ইযত্তা কে করিবে? দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুর কখন কখন রহস্য করিয়া 'মা কালীর কেল্লা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, কলিকাতার বসুপাড়ার এই বাটীকে তাঁহার দ্বিতীয় কেল্লা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর বলিতেন, "বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা"—কর্ত্তা গিন্নি হইতে বাটীর এগুাবাচ্ছা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত, ভগবানের নাম না করিয়া জলগ্রহণ করে না এবং পূজা পাঠ সাধুসেবা সদ্বিষযে দান প্রভৃতিতে সকলের সমান অনুরাগ। প্রায অনেক পরিবারেই দেখা যায, যদি একজন কি দুইজন ধার্ম্মিক তো অপর সকলে আর একরূপ, বিজাতীয়—এ পরিবারে কিন্তু সেটি নাই; সকলেই একজাতীয় লোক। পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ধর্ম্মানুরাগী পরিবার বোধ হয় অল্পই পাওয়া যায়—তাহার উপর আবার পরিবারস্থ সকলের এইরূপ এক বিষযে অনুরাগ থাকা এবং পরস্পর পরস্পরকে ঐ বিষযে সাহায্য করা, ইহা দেখিতে পাওযা কদাচ কখনই হয়। কাজেই এই পবিবারবর্গই যে ঠাকুরের দ্বিতীয কেল্লা স্বরূপ হইবে এবং এখানে আসিয়া যে ঠাকুর বিশেষ আনন্দ পাইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ছিল, কাজেই রথের সময় রথ টানাও হইত—কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই। ঝাড়ী সাজান, বাদ্যভাণ্ড, বাজে লোকের হুড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি—এ সবের কিছুই নাই। ছোট একখানি রথ, বাহির

বাটীর দোতলায়, চকমিলান বারাণ্ডায়, চারিদিকে ঘুরে ঘুরে টানা হইত—একদল কীর্ত্তন আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিত—আর ঠাকুর ও তাঁর ভক্তগণ ঐ কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। কিন্তু সে আনন্দ, সে ভগবদ্ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য—সে আর] অন্যত্র কোথা পাওয়া যাইবে? সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ৺জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আবির্ভূত—সে অপূর্ব্ব দর্শন আর কোথায় মিলিবে? সে বিশুদ্ধ প্রেমস্রোতে পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া নয়নাশ্রুরূপে বাহির হইত—ভক্তের আর কি কথা!—এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কীর্ত্তনের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইতেন। তার পর অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিত এবং ভক্তেরা দুই চারিজন ব্যতীত, যে যার বাটীতে চলিয়া যাইতেন। লেখকের এই আনন্দ সম্ভোগ জীবনে একবার মাত্রই হইয়াছিল—ঐ দিনেই গোপালের মাকেও এই বাটীতে ঠাকুরের কথায় আনিতে পাঠান হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের রথযাত্রার কথাই আমরা এখানে বলিতেছি।* ঠাকুর এইবার রথের সময় এখানে আসিয়া বলরাম বাবুর বাটীতে দুইদিন দুইরাত থাকিয়া তৃতীয় দিনে বেলা ৮টা ৯টার সময় নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন।

*　　*　　*　　*　　*

আজ ঠাকুর প্রাতেই এ বাটীতে এসেছেন। বাহিরে কিছুক্ষণ বসার

---

* পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা গোপালের মার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দেখিতে যাওয়ার সময় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং আমাদের সহিত তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দেখা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের চৈত্র বা বৈশাখ বলিয়াছি। অনুসন্ধানে স্থির হইল যে উহা এক বৎসর পূর্ব্বে সম্পন্ন হয়—অর্থাৎ গোপালের মা ১৮৮৩ খৃঃর অগ্রহায়ণে ঠাকুরকে প্রথম দেখেন এবং ১৮৮৪ খৃঃর চৈত্র বা বৈশাখেই আমাদের সহিত তাঁহার দেখা হয়। আর ৬৪৮ পৃষ্ঠার শেষভাগে "কিছুক্ষণ বসিতে না বসিতেই দেখেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বসিয়া।" উহার পরিবর্ত্তে এই লাইনটি বসিবে—"জপ সাঙ্গ হইলে, ইষ্টদেবকে জপ সমর্পণ করিবার অগ্রে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র এমন সময় দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বাম দিকে বসিয়া, দক্ষিণ হস্তটি মুটো করিয়া রহিয়াছেন!" এবং সর্ব্বশেষ লাইনে যেখানে আছে "কেঁদে বল্লুম বাবা" ইত্যাদি, তাহার পূর্ব্বে এই কথাগুলি বসিবে "চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম (সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়িতে জন মানব নেই তাই, নয়তো লোক জড় হত)।

পর তাঁহাকে অন্দরে জলযোগ করবার জন্য লয়ে যাওয়া হল। বাহিরে দু চারটি করে অনেকগুলি পুরুষ ভক্তের সমাগম হয়েছে, ভিতরেও নিকটবর্ত্তী বাটী সকল হতে ঠাকুরের যত স্ত্রী ভক্ত সকলে এসেছেন। ইঁহাদের অনেকেই বলরাম বাবুর আত্মীয়া বা পরিচিতা এবং তাঁহার বাটীতে যখনই পরমহংসদেব উপস্থিত হতেন বা তিনি নিজে যখনই শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে যেতেন, তখনই ইঁহাদের সংবাদ দিয়া বাটীতে আনতেন বা আনিয়ে সঙ্গে লয়ে যেতেন। ভাবিনী ঠাকুরুণ, অসীমের মা, গন্থুর মা ও তাঁর মা—এইরূপ এর মা, ওর পিসি, এর ননদ, ওর পড়সি প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের আজ সমাগম হয়েছে।

এই সকল সতী সাধ্বী ভক্তিমতী স্ত্রীলোকদিগের সহিত কামগন্ধহীন ঠাকুরের যে কি এক মধুর সম্বন্ধ ছিল তাহা বলে বুঝাবার নহে। ইহাদের অনেকেই ঠাকুরকে নিজের সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা বলে তখনি জানেন। সকলেই উহা বিশ্বাস করেন, আবার কোন কোন ভাগ্যবতী উহা গোপালের মার ন্যায় দর্শনাদি দ্বারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেছেন। কাজেই ঠাকুরকে ইঁহারা আপনার হতেও আপনার বলে জানেন, তাঁহার নিকট কোনরূপ ভয় ডর বা সঙ্কোচ অনুভব করেন না, ঘরে কোনরূপ ভাল খাবারদাবার তৈয়ার করলে তাহা পতিপুত্রদের আগে না দিয়া ঠাকুরের জন্য আগে পাঠান বা স্বয়ং লয়ে যান। ঠাকুর থাকতে এই সকল ভদ্র মহিলারা কতদিন যে পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলিকাতায় নিজেদের বাটীতে গতায়াত করেছেন, তাহা বলা যায় না। কোন দিন সন্ধ্যার পর, কোন দিন রাত দশটায়, আবার কোন দিন বা উৎসব কীর্ত্তনাদি সাঙ্গ হতে ও ফিরিতে রাত দুই প্রহরেরও অধিক হয়ে গিয়েছে। ইহাদের কাহাকেও ঠাকুর ছেলেমানুষের মত, কত আগ্রহের সহিত, নিজের পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগের ঔষধ জিজ্ঞাসা করতেন; কেহ তাঁহাকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করতে দেখে হাসলে বলতেন—"তুই কি জানিস্? ও কত বড় ডাক্তারের স্ত্রী—ও দু চারটে ঔষধ জানেই জানে।" কাহারও ভাবপ্রেম দেখে বলতেন—"ও কৃপাসিদ্ধ গোপী।" কাহারও মধুর রান্না খেয়ে বলতেন—"ও বৈকুণ্ঠের রাঁধুনি, সুক্তোয় সিদ্ধ হস্ত" ইত্যাদি। ঠাকুর জল খেতে খেতে আজ এই সকল স্ত্রীলোকদিগকে 'গোপালের মার' সৌভাগ্যের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন—"ওগো,

সেই যে কামারহাটি থেকে বামনের মেয়েটি আসে, যার গোপালভাব, তার সব কত কি দর্শন হয়েছে; সে বলে, গোপাল তার কাছে থেকে হাত পেতে খেতে চায়। সে দিন ঐ সব দেখে শুনে ভাবে প্রেমে উন্মাদ হয়ে উপস্থিত। খাওয়াতে দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হোলো। থাক্‌তে বল্লুম, কিন্তু থাক্‌লো না। যাবার সময়ও সেইরূপ উন্মাদ—গায়ের কাপড় খুলে ভুঁয়ে লুটিয়ে যাচ্ছে, হুঁস্ নেই। আমি আবার কাপড় তুলে দিয়ে বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দি! খুব ভক্তি বিশ্বাস—বেশ! তাকে এখানে আন্‌তে পাঠাও না।"

বলরাম বাবুর কাণে এ কথা উঠবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ কামারহাটি হতে 'গোপালের মাকে' আন্‌তে লোক পাঠালেন—কারণ, আস্‌বার সময় যথেষ্ট আছে; ঠাকুর, আজ সমস্ত দিন রাত এখানেই থাক্‌বেন কি না?

*　*　*　*　*

জলযোগ সাঙ্গ হলে ঠাকুর বাহিরে এসে বস্‌লেন ও ভক্তদের সহিত নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগ্‌লেন।

ক্রমে ঠাকুরের মধ্যাহ্নে ভোজন হয়ে গেল—ভক্তেরাও প্রসাদ পেলেন। একটু বিশ্রামের পর ঠাকুর বাহিরের হল ঘরে বসে ভক্তদের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তাঁহার ভাবাবেশ হল। আমরা সকলেই বালগোপালের ধাতুময়ী মূর্ত্তি দেখেছি—দুই জানু ও এক হাত ভূমিতে হামা দেওয়ার ভাবে রেখে ও এক হাত তুলে উর্দ্ধমুখে যেন কাহারও মুখপানে সাহ্লাদ-সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও কি চাহিতেছে—ভাবাবেশে ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ঠিক সেইরূপ সংস্থান হয়ে গেল, কেবল চক্ষু দুটি যেন বাহিরের কিছুই দেখিতেছে না, এইরূপভাবে অর্দ্ধনিমীলিত অবস্থায় রহিল! ঠাকুরের এইরূপ ভাবাবস্থারম্ভ হবার একটু পরেই গোপালের মারও গাড়ি আসিয়া বলরাম বাবুর বাটীর দরজায় দাঁড়াইল! এবং গোপালের মাও উপরে এসে ঠাকুরকে আপনার ইষ্টরূপে দর্শন করলেন! উপস্থিত সকলে গোপালের মার ভক্তির জোরেই ঠাকুরের সহসা এইরূপ গোপাল-ভাবাবেশ হয়েছে জেনে তাঁহাকে বহু ভাগ্যবতী জ্ঞানে সম্মান ও বন্দনা কর্‌লেন। সকলে বলিতে লাগিলেন—'কি ভক্তি, ভক্তির জোরে ঠাকুর সাক্ষাৎ গোপালরূপ ধারণ কর্‌লেন'—ইত্যাদি। গোপালের মা

বল্‌লেন—'আমি কিন্তু বাবু ভাবে অমন কাট্ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল হাস্‌বে খেল্‌বে বেড়াবে দৌড়ুবে—ও মা, ওকি ? একেবারে যেন কাট্! আমার অমন গোপাল দেখে কাজ নেই!' বাস্তবিকই ভাব-সমাধিতে ঠাকুরের ঐরূপ বাহ্য জ্ঞান হারান প্রথম যে দিন দেখেন সে দিন ভয়ে ডরে কাতর হয়ে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বলেন—'ও বাবা, তুমি অমন হলে কেন ?'—সে কামারহাটিতে ঠাকুর যে দিন প্রথম দিন গিয়াছিলেন।

আমরা যখন ঠাকুরের নিকট যাই, ঠাকুরের বয়স তখন উনপঞ্চাশের কাছাকাছি—বোধ হয়, উনপঞ্চাশ হতে পাঁচ ছয় মাস বাকি আছে; গোপালের মাও ঐ সময়েই যান্। ঠাকুরের কাছে যাবার পূর্ব্বে মনে হত ছোট ছেলে নাচে, অঙ্গভঙ্গী করে, তা লোকের বেশ লাগে; কিন্তু একটা বুড়ো মিন্‌সে, সাজোয়ান মরদ্ যদি ঐরূপ করে, তা হলে লোকের বিরক্তিকর বা হাস্যোদ্দীপকই হয়। "গণ্ডারের যেমটি নাচ কি কারো ভাল লাগে"—স্বামী বিবেকানন্দ বল্‌তেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে এসে দেখি সব উল্টো ব্যাপার। বয়সে প্রৌঢ় হলেও ঠাকুর নাচেন, গান, কত হাবভাব দেখান—কিন্তু তার সকলগুলিই কি মিষ্টি ? বাস্তবিক 'একটা বুড়ো মিন্‌সেকে নাচ্‌লে যে এত ভাল দেখায়, এ কথা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই!'—গিরিশবাবু এ কথাটি বল্‌তেন। আজ বলরাম বাবুর বাড়ীতে এই যে তাঁর গোপাল-ভাবাবেশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান বালগোপালের ন্যায় হল, তাই বা কত সুন্দর। কেন যে ঐরূপ সুন্দর বোধ হত, তা তখন বুঝিতাম না—কেবল সুন্দর ইহাই অনুভব করিতাম! এখন বুঝি যে, যে ভাব যখন তাঁর ভিতরে আস্‌ত, তা তখন পুরাপুরিই আসত, তার ভিতর এতটুকু আর অন্য ভাব থাক্‌ত না—এতটুকু "ভাবের ঘরে চুরি" বা লোক দেখান ভাব থাক্‌ত না। সে ভাবে তিনি তখন একেবারে অনুপ্রাণিত, তন্ময় বা (তিনি নিজে যেমন রহস্য করে বল্‌তেন) ডাইলুট (dilute) হয়ে যেতেন—কাজেই তিনি বৃদ্ধ হয়ে বালকদের অভিনয় কর্‌চেন বা পুরুষ হযে স্ত্রীর অভিনয় কর্‌চেন, এ কথা লোকের মনে আর উদয় হতেই পেত না! ভিতরের প্রবল ভাব-তরঙ্গ শরীরের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরিয়ে শরীরটাকে যেন এককালে পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত করে ফেল্‌তো!

* * * * *

ভক্তসঙ্গে আনন্দে দুই দিন দুই রাত ঠাকুরের বলরাম বাবুর বাটীতে কাটিয়াছে। আজ তৃতীয় দিন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন। বেলা আন্দাজ ৮টা কি ৯টা হইবে—ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। স্থির হইল, গোপালের মা ও অন্য একজন স্ত্রীভক্ত (গোপালের মাতা) ও ঐ নৌকায় ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, তদ্ভিন্ন দুই একজন বালক ভক্ত যাঁহারা ঠাকুরের পরিচর্য্যার জন্য সঙ্গে আসিয়াছিলেন—তাঁহারাও যাইবেন। বোধ হয় শ্রীযুক্ত কালী (স্বামী অভেদানন্দ) উঁহাদের অন্যতম।

ঠাকুর বাটীর ভিতরে যাইয়া জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া এবং ভক্ত-পরিবারের প্রণাম গ্রহণ করিয়া নৌকায় যাইয়া উঠিলেন। গোপালের মা প্রভৃতিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া নৌকায় উঠিলেন। বলরাম বাবুর পরিবারবর্গের অনেকে ভক্তি করিয়া গোপালের মাকে কাপড় ইত্যাদি এবং তাঁহার অভাব আছে জানিয়া রন্ধনের নিমিত্ত হাতা বেড়ি প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রব্য তাঁহাকে দিয়াছিলেন। সে পুঁটুলি বা মোটটি নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। নৌকা ছাড়িল।

যাইতে যাইতে পুঁটুলি দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসায় জানিলেন—উহা গোপালের মার, ভক্ত পরিবারেরা তাঁহাকে যে সকল দ্রব্যাদি দিয়াছেন, তাহারই পুঁটুলি। শুনিয়াই ঠাকুরের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। গোপালের মাকে কিছু না বলিয়া অপর স্ত্রীভক্ত, গোলাপ মাতাকে লক্ষ্য করিয়া ত্যাগের বিষয়ে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন—"যে ত্যাগী, সেই ভগবানকে পায়। যে লোকের বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুধু হাতে চলে আসে, সে ভগবানের গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসে।"—ইত্যাদি। সেদিন যাইতে যাইতে ঠাকুর গোপালের মার সহিত একটিও কথা কহিলেন না, আর বারবার ঐ পুঁটুলিটির দিকে দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ঐ ভাব দেখে গোপালের মার মনে হতে লাগ্‌লো, পুঁটুলিটা গঙ্গার জলে ফেলে দি। একদিকে ঠাকুরের যেমন পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ভাবে ভক্তদের সহিত হাসি তামাসা, ঠাট্টা খেলা-ধূলা ছিল, অপর দিকে আবার তেমনি কঠোর শাসন!—কাহারও এতটুকু বেচাল দেখ্‌তে পারতেন না। ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র জিনিসের তত্ত্বাবধান ছিল, কাহারও অতি সামান্য ব্যবহার বেতাবের হলে, অমনি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার উপর পড়ত ও যাহাতে উহার সংশোধন হয়, তাহার চেষ্টা আসিত। চেষ্টারও বড়

একটা বেশী আড়ম্বর করুতে হ্ত না, একবার মুখ ভারী করে তাহার সহিত কিছুক্ষণ কথা না কহিলেই সে ছটফট করিত ও স্বকৃত দোষের জন্য অনুতপ্ত হইত! তাহাতেও যে নিজের ভুল না শোধরাইত, ঠাকুরের শ্রীমুখ হতে দুই একটী সামান্য তিরস্কারই তাহার মতি স্থির করিতে যথেষ্ট হইত। অদ্ভুত ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তের সহিত অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যবহার ও শিক্ষাদান এইরূপেই চলিত—প্রথম তাহার হৃদয় অমানুষী ভালবাসায় সম্পূর্ণরূপে অধিকার, তার পর যাহা কিছু বলিবার কহিবার—দুই চারি কথায় বলা বা বুঝান!

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়াই গোপালের মা নহবতে শ্রীশ্রীমার নিকট ব্যাকুল হইয়া যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"অঃ বৌমা, গোপাল এই সব জিনিসের পুঁটুলি দেখে রাগ করেছে; এখন উপায়?—তা এসব আর নিয়ে যাব না, এই খানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই।"

শ্রীমার অপার দয়া—বুড়িকে কাতর দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন— "উনি বলুনগে। তোমায় দেবার তো কেউ নেই, তা তুমি কি করবে মা— দরকার বলেই তো এনেচ?"

গোপালের মা তত্রাচ একখানা কাপড় ও আরও কি কি দুই একটি জিনিস বিলাইয়া দিলেন ও ভয়ে ভয়ে দুইখানা তরকারি রেঁধে ঠাকুরকে ভাত খাওয়াতে গেলেন। অন্তর্য্যামী ঠাকুর তাঁহাকে অনুতপ্তা দেখিয়া আর কিছুই বলিলেন না। আবার গোপালের মার সহিত হেসে কথা কয়ে পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। গোপালের মাও আশ্বস্তা হয়ে ঠাকুরকে খাইয়ে দাইয়ে বৈকালে কামারহাটি ফিরিলেন।

পূর্ব্বে বলেছি, গোপালের মার ভাবঘন গোপাল মূর্ত্তি দর্শন, প্রথম দর্শনের দুই মাস পরে আর তত সদা সর্ব্বক্ষণ থাকে নাই। তাই বলে কেহ না মনে করে বসেন যে, উহার পরে, তাঁর কালেভদ্রে কখন গোপাল দর্শন হত। কারণ, প্রতিদিনই দিনের মধ্যে দুই দশবার গোপালের দর্শন পাইতেন। যখনই দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হত, তখনই পাইতেন, আবার যখনই কোন বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার প্রয়োজন হত তখনই গোপাল সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হয়ে সঙ্কেতে, কথায় বা নিজে হাতেনাতে করে দেখিয়ে তাঁহাকে ঐরূপ করিতে প্রবৃত্ত করিতেন। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে বার বার মিশে গিয়ে শিখিয়েছিলেন তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব অভিন্ন। খাবার শোবার জিনিস চেয়ে চিন্তে নিয়ে কি ভাবে তাঁর সেবা করা উচিত তা শিখিয়েছিলেন। আবার

কোন কোন বিশেষ বিশেষ শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদিগের সহিত একত্র বিহার করে বা তাঁহাদের সহিত অন্য কোনরূপ আচরণ করে দেখিয়ে নিজ মাতাকে বুঝাইয়াছিলেন, ইঁহারা ও তিনি অভেদ—ভক্ত ও ভগবান এক!" কাজেই তাঁহাদের ছোঁয়া ন্যাপা বস্তু ভোজনেও তাঁর দ্বিধা ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবে ইষ্টদেব-বুদ্ধি দৃঢ় হবার পর হতে আর তাঁর বড় একটা গোপালমূর্ত্তির দর্শন হইত না। যখন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই দেখিতে পাইতেন—এবং ঐ মূর্ত্তির ভিতর দিয়াই বাল-গোপালরূপী ভগবান তাঁহাকে যত কিছু শিক্ষা দিতেন। প্রথম প্রথম ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই অশান্তি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন—"গোপাল, তুমি আমায় কি করলে, আমার কি অপরাধ হল, কেন আর আমি তোমায় আগেকার মত (গোপালরূপে) দেখতে পাই না," ইত্যাদি—তাহাতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর দেন—"ওরূপ সদা সর্ব্বক্ষণ দর্শন হলে কলিতে শরীর থাকে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটা থেকে তার পর শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে যায়।" বাস্তবিক প্রথম দর্শনের পর দুই মাস গোপালের মা সর্ব্বদাই একটা ভাবের ঘোরে থাকিতেন। রান্না বাড়া, স্নান আহার, জপ ধ্যান প্রভৃতি যা কিছু করতেন, সব যেন পূর্ব্বের বহু কালের অভ্যাস ছিল বলে, আর করতে হয় বলে তাঁর শরীরটা আপনা আপনি কোন রকমে সেরে নিত, এই পর্য্যন্ত! তিনি নিজে সদা সর্ব্বক্ষণ যেন একটা বিপরীত নেশার ঝোঁকে থাকিতেন।—কাজেই ঐ ভাবে শরীর আর কয়দিন থাকে? দুই মাসও যে ছিল ইহাই আশ্চর্য্য! দুই মাস পরে সে নেশার ঝোঁক অনেকটা কাটিয়া গেল। কিন্তু গোপালকে পূর্ব্বের ন্যায় না দেখতে পাওয়ার আবার এক বিপরীত ব্যাকুলতা আসিল। বায়ুপ্রধান ধাত—বায়ু বেড়ে শরীরে বুকের ভিতর একটা দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেই জন্যই বলেন—"বাই বেড়ে বুক যেন আমার করাত দিয়ে চিরুচে।" ঠাকুর তাহাতেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করে বলেন—"ও তোমার হরিবাই; ও গেলে কি নিয়ে থাকবে গো, ও থাকা ভাল; যখন বেশী কষ্ট হবে, তখন কিছু খেয়ো।" এই বলে ঠাকুর তাঁকে নানারূপ ভাল ভাল জিনিস সে দিন খাওয়ান।

* * * * * * *

কলিকাতা হতে আমরা যেমন মেয়ে পুরুষ অনেকে ঠাকুরকে দেখতে

যেতাম, অনেকগুলি মাড়োয়ারি মেয়ে পুরুষও তেমনি দেখতে আস্তো। তারা সব অনেকগুলি গাড়িতে করে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে এসে, গঙ্গাস্নান করে, ফুল তুলে শিবপূজাদি সেরে, পঞ্চবটীতে আড্ডা করত ও গাছতলায় উনুন খুঁড়ে ডাল, লেট্টি, চুরমা প্রভৃতি প্রস্তুত করে দেবতাকে নিবেদন করে, আগে ঠাকুরকে সেই সব রকম খাবার দিয়ে যেতো—পরে আপনারা প্রসাদ পেতো। ইঁহাদের ভিতর আবার অনেকে ঠাকুরের নিমিত্ত বাদাম; কিস্‌মিস্, পেস্তা, ছোয়ারা, থালা মিছরি, আঙ্গুর, বেদানা, পেয়ারা, পান প্রভৃতি নিয়ে এসে, তাঁহার সম্মুখে ধরে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করত—কারণ, তারা আমাদের বাঙ্গালীর মত নয়, খালি হাতে যে সাধুর আশ্রমে বা দেবতার স্থানে যেতে নাই, এ কথা সকলেই জানতো, এবং কিছু না কিছু লয়ে আসতোই আস্তো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু দুই এক জনের ছাড়া ঐ সকল মাড়োয়ারি-প্রদত্ত জিনিসের কিছুই স্বয়ং গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন— "ওরা যদি এক খিলি পান দেয় ত তার সঙ্গে ষোলটা কামনা জুড়ে দেয়। আমার মকদ্দমার জয় হোক্, আমার রোগ ভাল হোক্, আমার ব্যবসায় লাভ হোক্," ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজে তো খেতেন না, আবার ভক্তদেরও ঐ সকল খাবার খেতে দিতেন না—তবে ডাল রুটি ইত্যাদি রান্না খাবার, যা তারা ঠাকুর দেবতাকে ভোগ দিয়ে তাঁকে দিয়ে যেতো, সে সব প্রসাদ বলে নিজেও কখন একটু আধটু গ্রহণ কর্‌তেন ও আমাদের সকলকে খেতে দিতেন। পূর্ব্বকথিত মিছরি মেওয়া প্রভৃতি খাবার অধিকারী ছিল এক মাত্র নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দজী)। ঠাকুর বল্‌তেন—"ওর (নরেন্দ্রের) কাছে জ্ঞান-অসি রয়েছে—খাপ্ খোলা তরোয়াল—ওর ওসব খেলে কিছুই দোষ হবে না, বুদ্ধি মলিন হবে না।" তাই ঠাকুর ভক্তদের ভিতর যাকে পাইতেন, তাকে দিয়ে ঐ সব খাবার নরেন্দ্রনাথের বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। যে দিন কাহাকেও পাইতেন না, সে দিন নিজের ভাতুষ্পুত্র, মা কালীর ঘরের পূজারি রামলালকে দিয়াই পাঠাইয়া দিতেন। আমরা রামলাল দাদার নিকট শুনেছি, নিত্য নিত্য ঐরূপ লইয়া যাইতে পাছে রামলাল বিরক্ত হয় তাই একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর রামলালকে জিজ্ঞাসা কর্‌চেন, "কিরে তোর কলিকাতায় কোন দরকার নাই?"

রামলাল—আজ্ঞে আমার কলিকাতায় আর কি দরকার। তবে আপনি বলেন ত যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না তাই বল্‌ছিলাম; বলি, অনেক দিন বেড়াতে টেড়াতে যাস্‌নি, তাই যদি বেড়িয়ে আস্‌তে ইচ্ছা হয়ে থাকে। তা একবার যানা। যাস্ তো ঐ টিনের বাক্সর পয়সা আছে নিয়ে বরানগর থেকে সেয়ারের গাড়িতে করে যাস্। তা না হলে রোদ লেগে অসুখ কর্‌বে। আর ঐ মিছরি, বাদামগুলো নরেন্দ্রকে দিয়ে আস্‌বি ও তার খবরটা নিয়ে আস্‌বি—সে অনেক দিন আসেনি, তার খবরের জন্য মনটা আঁটু পাটু কচ্চে।

রামলাল দাদা বলেন, "আহা সে কত সঙ্কোচ, পাছে আমি বিরক্ত হই।" বলা বাহুল্য—রামলালদাদাও এরূপ অবসর হলেই কলিকাতা শুভাগমন করে ভক্তদের আনন্দ বর্দ্ধন কর্‌তেন।

* * * * *

আজ অনেকগুলি মাড়োয়ারি ভক্ত ঐরূপে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় ফল মিছরি ইত্যাদি ঠাকুরের ঘরে ঢের জমেছে। এমন সময় গোপালের মা ও কতকগুলি স্ত্রীভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিতে এসে উপস্থিত। গোপালের মাকে দেখে ঠাকুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথা থেকে, পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে ছেলে যেমন মাকে পেয়ে কত প্রকার আদর করে, তেমনি কর্‌তে লাগ্‌লেন। গোপালের মার শরীরটার সম্বন্ধে বল্‌লেন—"এ খোলটার ভিতর কেবল হরিতে ভরা; হরিময় শরীর।" গোপালের মাও চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলেন—ঠাকুর পায়ে হাত দিচ্চেন বলে একটুও সঙ্কুচিত হলেন না। পরে ঘরে যত কিছু ভাল ভাল জিনিস ছিল, সব এনে এনে ঠাকুর তাঁকে খাওয়ালেন। গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে যাইলেই ঠাকুর ঐরূপ কর্‌তেন ও খাওয়াতেন। গোপালের মা তাহাতে একদিন বলেন, "গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে ভাল বাস কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তুমি যে আমায় আগে কত খাইয়েছ।"

গোপালের মা—"আগে—কবে খাইয়েছি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"জন্মান্তরে।"

সমস্ত দিন দক্ষিণেশ্বরে থেকে গোপালের মা যখন কামারহাটি ফির্‌বেন বলে বিদায় গ্রহণ কর্‌ছেন, তখন ঠাকুর, মাড়োয়ারিদের দেওয়া যত মিছরি এনে গোপালের মাকে দিলেন—সঙ্গে লয়ে যেতে। গোপালের মা বলি-লেন—"অত মিছরি সব দিচ্চ কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—(গোপালের মার চিবুক সাদরে ধরে)—ওগো ছেলে

গুড়, হলে চিনি, তার পর হলে মিছরি!—এখন মিছরি হয়েছে—মিছরি খাও আর আনন্দ কর।"

মাড়োয়ারিদের মিছরি ঐরূপে গোপালের মাকে ঠাকুর দেওয়াতে, সকলে অবাক হয়ে রইল—বুঝিল ঠাকুরের কৃপায় এখন আর গোপালের মার মন কিছুতেই মলিন হবার নয়। গোপালের মা আর কি করেন, অগত্যা ঐ মিছরিগুলি লয়ে গেলেন—নতুবা গোপাল (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ছাড়েন না; আর শরীর থাকিতে তো সকল জিনিসেরই প্রয়োজন—গোপালের মা যেমন কখন কখন আমাদের বলতেন, "শরীর থাকতে সব চাই, জিরেটুকু মেথিটুকু পর্য্যন্ত, এমন দেখিনি।"

* * * * *

গোপালের মা পূর্ব্বাবধি জপ ধ্যান করতে করতে যাহা কিছু দেখতেন সব ঠাকুরকে এসে বলতেন। তাতে ঠাকুর বলেন—"দর্শনের কথা কাকেও বলতে নাই, তা হলে আর হয় না।" গোপালের মা বলেন—"কেন? সে সব ত তোমারি দর্শনের কথা?" ঠাকুর তাহাতে বলেন—এখানকার দর্শন হলেও আমাকে বলতে নাই।" গোপালের মা বলিলেন—"বটে?" তদবধি তিনি আর দর্শনাদির কথা কাহারও নিকট বড় একটা বলিতেন না—বড় সরল উদার ছিলেন, কি না?—শ্রীরামকৃষ্ণদেব যা বলেন, তাতেই একেবারে পাকা বিশ্বাস! আর সংশয়াত্মা আমরা?—আমাদের ঠাকুরের কথা যাচাই করতে করতেই জীবনটা গেল—জীবনে পরিণত করে তার ফলভোগ করে আনন্দ করা আর হল না! যাক্—। এই সময় একদিন গোপালের মা ও শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ স্বামীজি) উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। নরেন্দ্রনাথের তখনও ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারবাদে বেশ ঝোঁক। ঠাকুর দেবতা—পৌত্তলিকতায়, বিশেষ বিদ্বেষ—তবে এটা ধারণা হয়েছে যে, পুতুল, মূর্ত্তি টুর্ত্তি অবলম্বন করেও লোক নিরাকার, সর্ব্বভূতস্থ ভগবানে কালে পৌঁছায়। ঠাকুরের রহস্যবোধটা খুব ছিল। একদিকে এই সর্ব্বগুণান্বিত সুপণ্ডিত মেধাবী বিচারপ্রিয় ভগবদ্ভক্ত নরেন্দ্রনাথ এবং অপর দিকে গরিব কাঙ্গালী, নামমাত্রাবলম্বনে শ্রীভগবানের দর্শন ও কৃপাপ্রয়াসী, সরলবিশ্বাসী গোপালের মা, যিনি কখন লেখাপড়া জ্ঞানবিচারের ধার দিয়েও যান নাই—উভয়কে একত্র পেয়ে এক মজা বাধিয়ে দিলেন। নরেন্দ্রনাথের নিকট তিনি যেরূপে বালগোপালরূপী ভগবানের দর্শন পান এবং তদবধি

গোপাল যে ভাবে তাঁহার সহিত লীলাবিলাস করিতেছেন, সে সমস্ত কথা গোপালের মাকে বলিতে বল্‌লেন। গোপালের মা ঠাকুরের কথা শুনে বল্‌লেন—'তাতে কিছু দোষ হবে না তো, গোপাল?' পরে ঠাকুরের আশ্বাস পেয়ে অশ্রুজল ফেল্‌তে ফেল্‌তে গদ গদ স্বরে গোপালরূপী শ্রীভগবানের প্রথম দর্শনের পর হতে দুই মাস কাল পর্য্যন্ত যত লীলাবিলাসের কথা আদ্যোপান্ত বল্‌তে লাগ্‌লেন—কেমন করে গোপাল তাঁর কোলে উঠে কাঁধে মাথা রেখে কামারহাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত সারাপথ এলো, আর তার লাল টুকটুকে পা দুখানি তাঁর বুকের উপর ঝল্‌ছে; আস্‌তে আস্‌তে তিনি স্পষ্ট দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; ঠাকুরের অঙ্গে কেমন মাঝে মাঝে প্রবেশ কর্‌ছে ও বাহির হতে লাগ্‌লো; শোবার সময় বালিশ না পেয়ে বারবার খুঁৎ খুঁৎ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, রাঁধবার কাঠ কুড়ুলে; খাবার জন্ম দৌরাত্ম্য কর্‌লে!—ইত্যাদি ইত্যাদি। বল্‌তে বল্‌তে বুড়ী ভাবে বিভোর হয়ে ক্ষেপে ক্ষেপে উঠ্‌তে লাগ্‌লো ও গোপালরূপী শ্রীভগবানকে পুনরায় দর্শন করতে লাগ্‌লো! নরেন্দ্রনাথের বাহিরে কঠোর জ্ঞানবিচারের আবরণ থাক্‌লেও ভিতরটা চিরকালই ভক্তিপ্রেমে ভরা ছিল—তিনি বুড়ীর ঐরূপ ভাবাবস্থা ও দর্শনাদির কথা শুনে অশ্রুজল সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লেন না। আবার বল্‌তে বল্‌তে বুড়ী বারবার নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লেন—"বাবা, তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, আমি দুঃখী কাঙ্গালী কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না—তোমরা বল, আমার এ সব ত মিথ্যা নয়?" নরেন্দ্রনাথও বারবার বুড়িকে আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে বল্‌লেন—"না, মা, তুমি যা দেখেছ সে সব সত্য"!—ইত্যাদি ইত্যাদি। গোপালের মা যে ব্যাকুল হয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-নাথকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন তার কারণ, তখন আর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীগোপালের দর্শন পান না শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই যখন তখন দেখেন।

* * * * *

ইতিমধ্যে ঠাকুর একদিন শ্রীযুক্ত রাখালকে (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) সঙ্গে নিয়ে কামারহাটিতে গোপালের মার নিকট এসে উপস্থিত—বেলা দশটা আন্দাজ—কারণ, গোপালের মার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, নিজ হস্তে ভাল করে রন্ধন করে একদিন ঠাকুরকে খাওয়ায়। বুড়ী তো ঠাকুরকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। যা যোগাড় কর্‌তে পেরেছিল তাই জলযোগের জন্য দিয়ে জল খাইয়ে, বাবুদের বৈঠক খানার ঘরে ভাল করে বিছানা করে তাঁদের বসিয়ে

নিজে কোমর বেঁধে রাঁধ্‌তে গেলেন। ভিক্ষা শিক্ষা করে নানা ভাল ভাল জিনিস জোগাড় করেছিলেন—নানা প্রকার রান্না করে মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে বেশ করে খাইয়ে দাইয়ে বিশ্রামের জন্য মেয়েমহলের দোতালায় দক্ষিণ দিকের ঘরখানিতে আপনার লেপখানি পেতে, ধোপদস্ত চাদর একখানি তার উপর বিছিয়ে ভাল করে বিছানা করে দিলেন। ঠাকুরও তাহাতে শয়ন করে একটু বিশ্রাম কর্‌তে লাগ্‌লেন। শ্রীযুক্ত রাখালও ঠাকুরের পাশেই শয়ন কর্‌লেন—কারণ, রাখাল মহারাজকে ঠাকুর নিজের ছেলে বলেই বল্‌তেন ও তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারও সর্ব্বদা কর্‌তেন (সে অনেক কথা, যথাস্থানে বল্‌বার চেষ্টা কর্‌বো)।

এই সময়ে ঐ স্থানে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঠাকুর দেখেন। তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনা বলেই তা আমরা এখানে বল্‌তে সাহসী হচ্চি, নতুবা চেপেই যাব মনে করেছিলাম। ঠাকুরের দিনে বেতে নিদ্রা বড় অল্প হত, কাজেই তিনি স্থির হয়ে শুয়ে আছেন; আর রাখাল মহারাজ তাঁর পাশে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় ঠাকুর বলেন—"একটা দুর্গন্ধ বেরুতে লাগ্‌লো, তার-পর দেখি, ঘরের কোণে দুটো মূর্ত্তি, বিটকেল চেহারা, পেট থেকে বেরিয়ে পড়ে নাড় ভুঁড়িগুলো ঝুল্‌চে; আর মুখ হাত পা, মেডিকেল কলেজে যেমন এক-বার মানুষের হাড়গোড় সাজান দেখেছিলাম (মানব অস্থিকঙ্কাল), ঠিক সেই রকম। তারা আমাকে অনুনয় করে বল্‌চে, 'আপনি এখানে কেন, আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে আমাদের (নিজেদের অবস্থার কথা মনে পড়ে—বোধ হয়।) বড় কষ্ট হচ্চে! এদিকে তারা ঐরূপ কাকুতি মিনতি কচ্চে, ওদিকে রাখাল ঘুমুচ্চে। তাদের কষ্ট হচ্চে দেখে বেটুয়াও গামছাখানা নিয়ে চলে আস্‌বার জন্য উঠ্‌চি, এমন সময় রাখাল জেগে বলে উঠ্‌লো 'ওগো তুমি কোথায় যাও?' আমি তাকে 'পরে সব বল্‌বো' বলে তার হাত ধরে নীচে নেমে এলাম ও বুড়িকে (তার তখন খাওয়া হয়েছে মাত্র) বলে নৌকায় গিয়ে উঠ্‌লাম। তখন রাখালকে সব বল্লি—ঐখানে দুটো ভূত আছে। বাগানের পাশেই কামারহাটির কল - ঐ কলের সাহে-বেরা খানা খেয়ে হাড় গোড় গুলো যা ফেলে দেয়, তাই খায় ও ঐ ঘরে থাকে। বুড়িকে ও কথার কিছু বল্লুম না—তাকে ঐ বাড়িতেই সদা সর্ব্বক্ষণ একলা থাকতে হয়?—ভয় পাবে।"

* * * * *

কলিকাতার যে রাস্তাটি বাগবাজারের গঙ্গার ধার দিয়ে উত্তরমুখো হয়ে পুল পেরিয়ে, বরাবর বরানগর বাজার পর্য্যন্ত গিয়েছে, সেই রাস্তার উপরেই মতি-ঝিল্ বা কলিকাতার বিখ্যাত ধনী পরলোকগত মতিলাল শীলের উদ্যানসম্মুখস্থ ঝিল্। ঐ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে রাস্তার মিশি-যাছে তাহার পূর্ব্বে, রাস্তার অপর পারেই রাণী কাত্যায়নীর (লালা বাবুর পত্নী) জামাতা কৃষ্ণগোপাল ঘোষের উদ্যানবাটী। ঐ বাগানেই শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব আটমাস কাল বাস করিয়া (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত) ভক্ত-দিগের স্থূলনেত্রের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হন। ঐ উদ্যানই তাঁহাদিগের নিকট 'কাশীপুরের বাগান' নামে অভিহিত হইয়া সকলের মনে কতই না হর্ষ-শোকের উদয় করিয়া দেয়। তোমরা বলিবে—ঠাকুর ত তখন রোগ-শয্যায়, তবে হর্ষ আবার কিসের? রোগশয্যা আপাতঃ বটে, কিন্তু ঠাকুরের দেব-শরীরে ঐ প্রকার রোগের বাহিক বিকাশ তাঁহার ভক্তদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ ও একত্র সম্মিলিত করিয়া কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রণয়বন্ধনে যে গ্রথিত করিয়াছিল, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ, সন্ন্যাসী গৃহী, জ্ঞানী ভক্ত—এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বিকাশ ভক্তদিগের ভিতর এখানেই স্পষ্টীকৃত হয়—আবার ইহারা সকলেই যে এক পরিবারের অন্তর্গত, এ ধারণার সুদৃঢ় ভিত্তি এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর কত লোকেই যে এখানে আসিয়া ধর্ম্মালোক অপরোক্ষানুভব করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এখানেই শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথের সাধনায় নির্ব্বিকল্প সমাধি অনুভব, এখানেই নরেন্দ্রপ্রমুখ দ্বাদশজন বালক-ভক্তের ঠাকুরের শ্রীহস্ত হইতে গৈরিক বসন লাভ, আবার এখানেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারির অপরাহ্নে (বেলা ৩টা হইতে ৪টার ভিতর) উদ্যানপথে শেষদিন পরিভ্রমণ করিতে নামিয়া আগন্তুক ও ভক্তবৃন্দের সকলকে দেখিয়া ঠাকুরের অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং —"আমি আর তোমাদের কি বল্‌বো, তোমাদের চৈতন্য হোক্"।—বলিয়া সকলের বক্ষ শ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করেন। দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ, এখানেও সেইরূপ স্ত্রীপুরুষের নিত্য জনতা হইত। এখানেও শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের আহার্য্য প্রস্তুতাদি সেবায় নিত্য নিযুক্তা এবং গোপালের মা প্রমুখ ঠাকুরের সকল স্ত্রীভক্তেরা তাঁহার নিকট আসিয়া ঠাকুরের ও তদীয় ভক্ত-

গণের সেবার সহায়তা করিতেন কেহ কেহ রাত্রিযাপনও করিয়া যাইতেন। কাশীপুর উদ্যানে ভক্তদিগের অপূর্ব্ব মেলার কথা আমরা যথাস্থানে সম্যক্ বলিবার চেষ্টা করিব। এখন ইহাই বলিয়া ক্ষান্ত হই যে, এখানে নিত্য নূতন লীলা ও নূতন নূতন ভক্ত সকলের সমাগম দেখিয়া এবং ঠাকুরের সদানন্দমূর্ত্তি ও নিত্য অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিপ্রকাশ দর্শন করিয়া অনেক পুরাতন ভক্তেরও মনে হইয়াছিল, ঠাকুর লোকহিতের নিমিত্ত একটা রোগের ভাণ করিয়া রহিয়াছেন মাত্র—ইচ্ছামাত্রেই ঐ রোগ দূরীভূত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ হইবেন।

*　*　*　*　*

কাশীপুরের উদ্যান—ঠাকুরের বার্লি, ভার্মিসেলি, সুজি প্রভৃতি তরল পদার্থ আহারে দিন কাটিতেছে। একদিন তিনি পালো দেওয়া ক্ষীর—যেমন কলিকাতায় নিমন্ত্রণ-বাটীতে খেতে পাওয়া যায়—খেতে ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌লেন। কেহই তাতে ওজর আপত্তি কর্‌লে না—কারণ, দুধে সিদ্ধ সুজি বা বার্লি যখন খাওয়া চল্‌চে, তখন পালো মিশ্রিত ক্ষীর একটু খেলে, আর অসুখ কি বাড়্‌বে? ডাক্তারেরাও অমত কর্‌লে না। স্থির হল—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র (যোগানন্দ স্বামীজি) আগামী কাল ভোরে কলিকাতা গিয়া ঐরূপ ক্ষীর একখানা কিনে আন্‌বেন।

যোগীন্দ্র বা যোগেন্ ঠিক সময়ে রওনা হলেন। পথে যেতে যেতে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—'বাজারে ক্ষীরের পালো ছাড়া আরো কত কি ভেজাল মিশান থাকে—ঠাকুরের খেলে অসুখ বাড়্‌বে না ত?' ভক্তদের সকলেই ঠাকুরকে প্রাণের প্রাণ বলে দেখ্‌তো, কাজেই সকলের মনেই ঠাকুরের অসুখ হওয়া অবধি ঐ এক চিন্তা—যোগেনের তাই ঐ চিন্তা হল। আবার ভাবিলেন—কিন্তু ঠাকুরকে তো জিজ্ঞাসা করে আসেন নাই, কোন ভক্তের দ্বারা ঐরূপ ক্ষীর তৈয়ার করিয়া লইয়া যাইবেন কি না—তবে উপায়? তিনি তো ঐরূপ কর্‌লে বিরক্ত হবেন না? সাত পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে পৌঁছিলেন এবং আসার কারণ জিজ্ঞাসায় সকল কথা বল্‌লেন। সেখানে ভক্তেরা সকলে বল্‌লেন 'বাজারে ক্ষীর কেন? আমরাই পালো দিয়ে ক্ষীর করে দিচ্চি; কিন্তু এবেলা তো নিয়ে যাওয়া হবে না, কারণ—কর্‌তে দেরী হবে। অতএব তুমি এবেলা এখানে খাওয়া দাওয়া কর, ইতিমধ্যে ক্ষীর তৈয়ার হয়ে যাবে। বেলা তিনটার

সময় নিয়ে যেও।' যোগেনও ঐ কথায় রাজী হয়ে ঐরূপ কর্‌লেন এবং বেলা প্রায় ৪ টার সময় ক্ষীর নিয়ে কাশীপুরে এসে উপস্থিত হলেন।

এ দিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মধ্যাহ্নেই ক্ষীর খাবেন বলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, শেষে যাহা খেতেন, তাহাই খেলেন। পরে যোগেন এসে পৌঁছিলে সকল কথা শুনে বিশেষ বিরক্ত হয়ে যোগেনকে বল্‌লেন—'তোকে বাজার থেকে কিনে আন্‌তে বলা হল, বাজারে ক্ষীর খাবার ইচ্ছা তুই কেন ভক্তদের বাড়ী গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে এইরূপে ক্ষীর নিয়ে এলি? তার পর ও ক্ষীর ঘন, গুরুপাক ওকি খাওয়া চল্‌বে—ও আমি খাব না ইত্যাদি।' বাস্তবিকই তিনি উহা স্পর্শও কর্‌লেন না—শ্রীশ্রীমাকে উহা সমস্ত গোপালের মাকে খাওয়াতে বলে, বল্‌লেন 'ভক্তের দেওয়া জিনিস, ওর ভিতরে গোপাল আছে, ও খেলেই তাঁর খাওয়া হবে।'

* * * * *

ঠাকুরের অদর্শন হলে গোপালের মার আর অশান্তির সীমা রহিল না। অনেক দিন আর কামারহাটি ছেড়ে কোথাও যান নাই। একলা নির্জ্জনে থাক্‌তেন। পরে কি দর্শনাদি হয়ে সে ভাবটার শান্তি হল, তা বল্‌তে পারি না। তবে একবার গঙ্গার অপর পারে মাহেশে রথযাত্রা দেখ্‌তে গিয়া সর্ব্বভূতে শ্রীগোপালের দর্শন পেয়ে তাঁর বিশেষ আনন্দ হয়, একথা শুনেছি। তখন রথ, রথের উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যারা রথ টান্‌চে—সেই অপার জনসংঘ সকলই দেখেন তাঁহার গোপাল—ভিন্ন ভিন্নরূপ ধারণ করে রয়েছেন! এইরূপে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপের দর্শনাভাস পেয়ে ভাবে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। জনৈকা স্ত্রীবন্ধুর নিকট তিনি নিজে উহা বল্‌বার সময় বলেছিলেন—'তখন আর আমাতে আমি নেই—নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র করেছিলেম।'

এখন হতে প্রাণে কিছু মাত্র অশান্তি হলে তিনি বরানগর মঠে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের নিকট আস্‌তেন এবং আসিলেই শান্তি পেতেন। যেদিন তিনি মঠে আস্‌তেন, সেদিন সন্ন্যাসী ভক্তেরা তাঁহাকেই ঠাকুরকে ভোগ দিয়া খাওয়াইতে অনুরোধ কর্‌তেন। গোপালের মাও সানন্দে দুই একখানা তরকারি নিজ হাতে রেঁধে ঠাকুরকে খাওয়াতেন। মঠ যখন আলমবাজারে ও পরে গঙ্গার অপর পারে নীলাম্বর বাবুর বাটীতে উঠাইয়া লয়ে যাওয়া হয়, তখনও গোপালের মা এইরূপে ঐ ঐ স্থানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত

দিন থেকে আনন্দ করতেন—কখন এক আধ দিন রাত্রি যাপনও করেছেন।

শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজি বিলাত হতে প্রত্যাগমনের পর সারা (Mrs Sara C Bull), জয়া (Miss J Mac Leod) ও নিবেদিতা যখন ভারতে আসেন, তখন তাঁহারা গোপালের মাকে কামারহাটিতে দর্শন করিতে যান এবং তাঁহার কথায় ও আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হন। আমাদের মনে আছে, গোপালের মা সেদিন তাঁহার গোপালকে তাঁহাদের ভিতর দেখে তাঁদের দাড়ি ধরে চুম্বন করেন, আপনার বিছানায় সাদরে বসিয়ে মুড়ি নারিকেল লাড়ু প্রভৃতি যাহা ঘরে ছিল, তা খেতে দেন, ও জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁহার দর্শনাদির কথা তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বলেন। তাঁহারাও উহা আনন্দে ভক্ষণ করেন এবং ঐ মুড়ির কিছু আমেরিকায় লয়ে যাবেন বলে চাহিয়া লন।

* * * *

গোপালের মার অদ্ভুত জীবনকথা শুনিয়া সিষ্টার নিবেদিতা এতই মোহিত হন যে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন গোপালের মার শরীর অসুস্থ ও বিশেষ অপটু হওয়ায় তাঁহাকে বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে আনা হয় তখন তাঁহাকে (১৭ নং বসুপাড়া) বাগবাজারস্থ নিজভবনে লইয়া রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোপালের মাও তাঁহার আগ্রহে স্বীকৃতা হইয়া তথায় গমন করেন, কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার ধীরে ধীরে সকল বিষয়েরই দ্বিধা শ্রীগোপালজী দূরীভূত করিয়া দেন। উহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ একদিন মা কালীর প্রসাদী পাঁটা এক বাটী খাইয়া হস্ত ধৌত করিতে যাইলে ঠাকুর জনৈকা স্ত্রী-ভক্তকে ঐ স্থান পরিষ্কার করিতে বলেন—গোপালের মাও তথায় দাঁড়াইয়া-ছিলেন। গোপালের মা ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া ঐ সকল হাড়গোড় উচ্ছি-ষ্টাদি তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তে সরাইয়া ঐ স্থান পরিষ্কার করেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া আনন্দে জনৈকা স্ত্রীভক্তকে বলেন—'দেখ, দেখ, দিন দিন কি উদার হয়ে যাচ্ছে।'

• সিষ্টার নিবেদিতার ভবনে এখন হইতে গোপালের মা বাস করিতে লাগলেন। স্বামিজীর মানস-কন্যা নিবেদিতাও কন্যা নির্ব্বিশেষে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত নিকটবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মণ

পরিবারের মধ্যে করিয়া দেওয়া হইল। আহারের সময় গোপালের মা তথায় যাইয়া দুইটি ভাত খাইয়া আসিতেন—রাত্রের লুচি ইত্যাদি, ঐ ব্রাহ্মণ পরিবারের কেহ স্বয়ং গোপালের মার ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেন। এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর বাস করিয়া গোপালের মা গঙ্গাগর্ভে শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহাকে তীরস্থ করিবার সময় নিবেদিতা পুষ্প চন্দন মাল্যাদি দিয়া তাঁহার শয্যাদি স্বহস্তে সুন্দর ভাবে ঢাকিয়া দেন, এক দল কীর্ত্তনীয়া আনয়ন করেন এবং স্বয়ং অনাবৃতপদে সাশ্রুনয়নে সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গমন করিয়া যে দুই দিন গঙ্গাতীরে গোপালের মা জীবিতা ছিলেন, সে দুইদিন তথায়ই রাত্রিযাপন করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই, অথবা সন ১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ় ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উদীয়মান সূর্য্যের রক্তিমাভায় যখন পূর্ব্বগগন রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে এবং নীলাম্বরতলে দুই চারিটি ক্ষীণপ্রভ তারকা ক্ষীণজ্যোতি চক্ষুর ন্যায় পৃথিবীর পানে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে, যখন শৈলসুতা ভাগীরথী জোয়ারে পূর্ণিত হইয়া ধবল তরঙ্গে দুই কূল প্লাবিত করিয়া মৃদু মধুর নাদে প্রবাহিতা, সেই সময়ে গোপালের মার শরীর সেই তরঙ্গে অর্দ্ধ-নিমজ্জিতাবস্থায় স্থাপিত করা হইল এবং তাঁহার পূত প্রাণ-পঙ্ক শ্রীভগবানের অভয় পাদ মিলিত হইলে তিনি অভয়ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

* * * *

আত্মীয়েরা কেহ নিকটে না থাকায় বেলুড় মঠের জনৈক ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারীই গোপালের মার মৃত শরীরের সৎকার করিয়া দ্বাদশ দিন নিয়ম রক্ষা করিলেন।

শোকসন্তপ্ত-হৃদয়া সিষ্টার নিবেদিতা ঐ দ্বাদশ দিন গত হইলে গোপালের মার পরিচিতা পল্লীস্থ অনেকগুলি স্ত্রীলোককে নিজ স্কুলবাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া কীর্ত্তন ও উৎসবাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

গোপালের মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে ছবিখানি এতদিন পূজা করিয়াছিলেন, তাহা বেলুড় মঠে ঠাকুরঘরে রাখিবার জন্য দিয়া যান এবং ঐ ঠাকুর-সেবার জন্য দুই শত টাকাও ঐ সঙ্গে দিয়া গিয়াছিলেন।

শরীরত্যাগের দশ বার বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি আপনাকে সন্ন্যাসিনী বলিয়া গণ্য করিতেন এবং সর্ব্বদা গৈরিক বসনই ধারণ করিতেন।

আজ এই পর্য্যন্ত। এই পূত-চরিত্রের আর কিছু কথা যদি আমরা

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে উহা অন্য কোন সময়ে পাঠককে উপহার দিব—ইচ্ছা রহিল।

ধর্ম্মবিজ্ঞান।

পঞ্চম অধ্যায়।

বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা।

আমরা দেখিয়াছি, বৈরাগ্য বা ত্যাগই এই সমুদয় বিভিন্ন যোগের মূল ভিত্তি। কর্ম্মী কর্ম্মফল ত্যাগ করেন ভক্ত সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী প্রেমস্বরূপের জন্য সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম ত্যাগ করেন। যোগী যাহা কিছু অনুভব করেন, তাঁহার যাহা কিছু অভিজ্ঞতা সমুদয় পরিত্যাগ করেন, কারণ, তাঁহার যোগশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, সমুদয় প্রকৃতি, যদিও আত্মার ভোগ ও অভিজ্ঞতার জন্য, কিন্তু উহা অবশেষে তাঁহাকে জানাইয়া দেয় যে, তিনি প্রকৃতিতে অবস্থিত নহেন, কিন্তু প্রকৃতি হইতে নিত্যস্বতন্ত্র। জ্ঞানী সমুদয় ত্যাগ করেন, কারণ, জ্ঞান শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কোন কালেই প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি, এই সকল উচ্চতর বিষয়ে 'ইহাতে কি লাভ'—এ প্রশ্ন করাই যাইতে পারে না। লাভালাভের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাই এখানে অস্বাভাবিক আর যদিই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, তাহা হইলেও আমরা ঐ প্রশ্নটী উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া কি পাই? লাভ মানে কি? না—সুখ—যে জিনিষে লোকের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন না করে, যাহাতে তাহার সুখ বৃদ্ধি না করে, তদপেক্ষা যাহাতে তাহার বেশী সুখ, তাহাতেই তাহার বেশী লাভ, বেশী হিত। সমুদয় বিজ্ঞান ঐ এক লক্ষ্য সাধনে অর্থাৎ মনুষ্যজাতিকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে আর যাহাতে বেশী পরিমাণ সুখ আনয়ন করে, মানুষ তাহাই গ্রহণ করিয়া যাহাতে অল্প সুখ, সেটী ত্যাগ করে। আমরা দেখিয়াছি, সুখ হয় দেহে বা মনে, অথবা আত্মায় অবস্থিত। পশুদিগের এবং পশুপ্রায় অনুন্নত মনুষ্যগণের সমুদয় সুখ দেহে। একটা ক্ষুধার্ত্ত কুকুর বা ব্যাঘ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করে, কোন মানুষ তাহা পারে না। সুতরাং কুকুর ও ব্যাঘ্রের সুখের

আদর্শ সম্পূর্ণরূপে দেহগত। মানুষে আমরা একটু উচ্চস্তরের সুখ দেখিয়া থাকি মানুষ জ্ঞানালোচনায় সুখী হইয়া থাকে। সর্ব্বোচ্চ স্তরের সুখ জ্ঞানীর তিনি আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। আত্মাই তাঁহার সুখের একমাত্র উপকরণ। অতএব জ্ঞানীর পক্ষে এই আত্মজ্ঞানেই পরম লাভ বা হত ; কারণ, ইহাতেই তিনি পরম সুখ পাইয়া থাকেন। জড় বিষয়সমূহ বা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা তাঁহার নিকট সর্ব্বোচ্চ লাভের বিষয় হইতে পারে না, কারণ, তিনি জ্ঞানে যেরূপ সুখ পাইয়া থাকেন, উহাতে তদ্রূপ পান না। আর প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানই সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য, আর আমরা যত প্রকার সুখের বিষয় অবগত আছি, তন্মধ্যে উহাই সর্ব্বোচ্চ সুখ। যাহারা অজ্ঞানে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা দেবগণের পশুতুল্য ' এখানে দেব অর্থে জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি যন্ত্রবৎ কার্য্য ও পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে জীবনটাকে সম্ভোগ করে না, জ্ঞানী ব্যক্তিই জীবনটাকে সম্ভোগ করেন। একজন বড় লোক হয় ত এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একখানা ছবি কিনিল, কিন্তু যে শিল্প বুঝিতে পারে, সেই উহা সম্ভোগ করিবে। ক্রেতা যদি শিল্পজ্ঞানশূন্য হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা নিরর্থক, সে কেবল উহার অধিকারী মাত্র। সমগ্র জগতের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিই কেবল জগতের সুখ সম্ভোগ করেন। অজ্ঞানী ব্যক্তি কখনই সুখভোগ করিতে পারে না, তাহাকে অজ্ঞাতসারেও অপরের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্তসমূহ দেখিয়া আসিলাম, দেখিলাম—তাঁহাদের মতে একমাত্র আত্মা আছে, দুই আত্মা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। আমরা দেখিলাম—সমগ্র জগতে এক সত্তামাত্র বিদ্যমান আর সেই এক সত্তা ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে উহাকেই এই জড় জগৎ বলিয়া বোধ হয়। যখন কেবল মনের ভিতর দিয়া উহা দৃষ্ট হয়, তখন উহাকে চিন্তা ও ভাবজগৎ বলে আর যখন উহার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান হয়, তখন উহা এক অনন্ত পুরুষ বলিয়া প্রতীত হয়। এই বিষয়টী আপনারা বিশেষরূপ স্মরণ রাখিবেন—ইহা বলা ঠিক নহে যে, মানুষের ভিতর একটি আত্মা আছে, যদিও বুঝাইবার জন্য প্রথমে আমাকে ঐরূপ ধরিয়া লইতে হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে কেবল এক সত্তা রহিয়াছে এবং সেই সত্তা আত্মা—আর তাহাই যখন ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া অনুভূত হয়, তখন তাহাকেই দেহ বলে, যখন উহা চিন্তা বা ভাবের মধ্য দিয়া অনুভূত হয়, তখন উহাকেই মন বলে আর যখন উহা স্বস্বরূপে উপলব্ধ হয়, তখন উহা আত্মারূপে, সেই এক অদ্বিতীয় সত্তারূপে প্রতীত হয়। অতএব ইহা

ঠিক নহে যে, এক জায়গায় দেহ, মন ও আত্মা—এই তিনটী জিনিষ রহিয়াছে—যদিও বুঝাইবার সময় ঐরূপে ব্যাখ্যা করাতে বুঝাইবার পক্ষে বেশ সহজ হইয়াছিল—কিন্তু সবই সেই আত্মা আর সেই এক পুরুষই বিভিন্ন দৃষ্টি অনুসারে কখন দেহ, কখন মন ও কখন বা আত্মারূপে কথিত হইয়া থাকে। একমাত্র পুরুষই আছেন, অজ্ঞানীরা তাঁহাকেই জগৎ বলিয়া থাকে। যখন সেই ব্যক্তিই জ্ঞানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হয় তখন সে সেই পুরুষকেই ভাবজগৎ বলিয়া থাকে। আর যখন পূর্ণ জ্ঞানোদয়ে সমুদয় ভ্রম উড়িয়া যায়, তখন মানব দেখিতে পায়, এ সমুদয়ই আত্মা ব্যতীত আর কিছু নহে। চরম সিদ্ধান্তএই যে, 'আমিই সেই এক সত্ত্বা।' জগতে দুটী তিনটী সত্তা নাই, সবই এক। সেই এক সত্তাই মায়ার প্রভাবে বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছে, যেমন অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। সেই দড়িটাকেই সাপ বলিয়া দেখায়। এখানে একটা দড়ি আলাদা,ও সাপ—আলাদা দুটী পৃথক্ বস্তু নাই। কেহই তথায় দুটী বস্তু দেখে না। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ বেশ সুন্দর দার্শনিক পারিভাষিক শব্দ হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ অনুভূতির সময় আমরা এক সময়েই সত্য ও মিথ্যা কখনই দেখিতে পাই না। আমরা সকলে জন্ম হইতেই অদ্বৈতবাদী. উহা হইতে পলাইবার উপায় নাই। আমরা সকল সময়েই এক দেখিয়া থাকি। যখন আমরা রজ্জু দেখি, তখন মোটেই সর্প দেখি না, আবার যখন সর্প দেখি, তখন মোটেই রজ্জু দেখি না—উহা তখন উড়িয়া যায়। যখন আপনাদের ভ্রম দর্শন হয়, তখন আপনারা যথার্থ মানুষদের দেখেন না। মনে করুন, দূর হইতে রাস্তায় আপনার একজন বন্ধু আসিতেছে। আপনি তাহাকে অতি উত্তমরূপে জানেন, কিন্তু আপনার সমক্ষে কুজ্ঝটিকা থাকাতে আপনি তাঁহাকে অন্য লোক বলিয়া মনে করিতেছেন। যখন আপনি আপনার বন্ধুকে অপর লোক বলিয়া মনে করিতেছেন, তখন আপনি আর আপনার বন্ধুকে দেখিতেছেন না, তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। আপনি একটি মাত্র লোককে দেখিতেছেন। মনে করুন, আপনার বন্ধুকে 'ক' বলিয়া অভিহিত করা গেল। তাহা হইলে আপনি যখন 'ক' কে 'খ' বলিয়া দেখিতেছেন, তখন আপনি 'ক' কে আদতেই দেখিতেছেন না। এইরূপ সকল স্থলে আপনাদের একেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। যখন আপনি আপনাকে দেহরূপে দর্শন করেন, তখন আপনি দেহমাত্র, আর কিছু নহেন আর জগতের অধিকাংশ মানবেরই এইরূপ উপলব্ধি। তাহারা আত্মা মন ইত্যাদি কথা মুখে বলিতে পারে, কিন্তু তাহারা দেখে এই স্থূল ভৌতিক আকৃতিটা—স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদ

ইত্যাদি। আবার কোন কোন লোক তাঁহাদের জ্ঞানভূমির বিশেষপ্রকার অবস্থায় আপনাদিগকে চিন্তা বা ভাবরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। আপনারা অবশ্য স্যর হম্‌ফ্রি ডেভি সম্বন্ধে যে গল্প কথিত হইয়া থাকে, তাহা জানেন তিনি তাঁহার ক্লাসে হাস্যজনক বাষ্প (Laughing gas) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা নল ভাঙ্গিয়া ঐ বাষ্প বাহির হইয়া যায় ও তিনি নিঃশ্বাসযোগে উহা গ্রহণ করেন। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে তিনি ক্লাসের ছেলেদের বলিলেন, যখন আমি ঐ অবস্থায় ছিলাম, আমি বাস্তবিক অনুভব করিতেছিলাম যে, সমগ্র জগৎ চিন্তা বা ভাব-গঠিত। ঐ বাষ্পের শক্তিতে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার দেহজ্ঞান বিস্মরণ হইয়াছিল আর যাহা পূর্ব্বে তিনি শরীর বলিয়া দেখিতেছিলেন, তাহাই এক্ষণে চিন্তা বা ভাবসমূহরূপে দেখিতে পাইলেন। যখন অনুভূতি আরও উচ্চতর অবস্থায় যায়, যখন এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে চিরদিনের মত অতিক্রম করা যায়, তখন সকলের পশ্চাতে যে সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইতে থাকে। উহাকে তখন আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপে—সেই এক আত্মারূপে—অনন্ত পুরুষরূপে দর্শন করি।

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধিকালে অনির্ব্বচনীয়, নিত্যবোধ, কেবলানন্দ, নিরুপম, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম, গগনসম, নিষ্কল, নির্ব্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মমাত্র হৃদয়ে সাক্ষাৎ করেন।*

অদ্বৈত মতে এই সমস্ত বিভিন্নপ্রকার স্বর্গনরকের এবং আমরা সকল ধর্ম্মে যে নানাবিধ ভাব দেখিতে পাই, এ সকলের কিরূপে ব্যাখ্যা করে? যখন মানুষের মৃত্যু হয়, কথিত হইয়া থাকে যে, সে স্বর্গে বা নরকে যায়, এখানে ওখানে নানাস্থানে যায় অথবা স্বর্গে বা অন্য কোন লোকে দেহধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করে। অদ্বৈতবাদী বলেন, এ সমুদয়ই ভ্রম। প্রকৃতপক্ষে কেহই জন্মায়ও না, মরেও না। স্বর্গও নাই, নরকও নাই অথবা ইহলোকও নাই। এই তিনটীরই কোন কালেই অস্তিত্ব নাই। একটী ছেলেকে অনেক ভূতের গল্প বলিয়া সন্ধ্যা-

---

* কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহং।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পং
হৃদিকলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥
—বিবেকচূড়ামণি ।৪১০।

বেলা তাহাকে বাহিরে যাইতে বল ; একটা স্থাণু রহিয়াছে। বালক কি দেখে ? সে দেখে—একটা ভূত হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। মনে করুন, একজন প্রণয়ী রাস্তার এক কোণ হইতে তাহার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে—সে সেই স্থাণুটীকে তাহার প্রণয়িনী মনে করে। একজন পাহারাওয়ালা উহাকে চোর বলিয়া মনে করিবে, আবার চোর উহাকে পাহারাওয়ালা ঠাওরাইবে। সেই একই স্থাণু বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইতেছে। স্থাণুটীই সত্য আর এই যে বিভিন্নভাবে উহার দর্শন—তাহা কেবল নানাপ্রকার মনের বিকার মাত্র। একমাত্র পুরুষ—এই আত্মাই আছেন। তিনি কোথাও যানও না, আসেনও না। অজ্ঞান মানব স্বর্গ বা তথাবিধ স্থানে যাইবার বাসনা করে, সারা জীবন সে কেবল ক্রমাগত উহারই চিন্তা করিয়াছে। এই পৃথিবীর স্বপ্ন যখন তাহার চলিয়া যায়, তখন সে এই জগৎকেই স্বর্গরূপে দেখিতে পায়—দেখে যে, এথায় দেববৃন্দ বিরাজ করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবন তাহার পূর্ব্বপিতৃপুরুষদিগকে দেখিতে চায়, সে আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই দেখিতে পায়, কারণ, সে স্বয়ংই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি কেহ আরো অধিক অজ্ঞান হয় এবং গোঁড়ারা চিরকাল তাহাকে নরকের ভয় দেখাইয়া থাকে, তবে সে মৃত্যুর পর এই জগৎকেই নরকরূপে দর্শন করে, আর ইহাও দেখে যে, তথায় লোকে নানাবিধ শাস্তিভোগ করিতেছে। মৃত্যু বা জন্মের আর কিছুই অর্থ নহে, কেবল দৃষ্টির পরিবর্ত্তন। আপনিও কোথাও যান না বা আপনি যাহার উপর আপনার দৃষ্টিক্ষেপ করেন, তাহাও কোথাও যায় না। আপনি ত নিত্য, অপরিণামী। আপনার আবার যাওয়া আসা কি ? ইহা অসম্ভব। আপনি ত সর্ব্বব্যাপী। আকাশ কখন গতিশীল নহে, কিন্তু উহার উপরে মেঘ এদিক্ ওদিকে যাইয়া থাকে—আমরা মনে করি আকাশই গতিশীল হইয়াছে। রেলগাড়ী চড়িয়া যাইবার সময় যেমন পৃথিবীকে গতিশীল বোধ হয়, এও ঠিক তদ্রূপ। বাস্তবিক ত পৃথিবী নড়িতেছে না, রেলগাড়ীই চলিতেছে। এইরূপ আপনি যেখানে ছিলেন, সেখানেই আছেন, কেবল এই সকল বিভিন্ন স্বপ্ন, মেঘসমূহের ন্যায় এদিক্ ওদিকে যাইতেছে। একটা স্বপ্নের পর আর একটা স্বপ্ন আসিতেছে—উহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। এই জগতে নিয়ম বা সম্বন্ধ বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, পরস্পর যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ 'আলিসের অদ্ভুত দেশ দর্শন' (Alice in Wonderland) নামক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। আমি ঐ বইখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম

—আমার মাথায় বরাবর ছেলেদের জন্য ঐরূপ বই লেখার ইচ্ছা ছিল। আমার উহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল এই যে, আপনারা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অসঙ্গত জ্ঞান করেন, তাহাই উহার মধ্যে আছে—কোনটীর সহিত কোনটীর কোন সম্বন্ধ নাই। একটা ভাব আসিয়া যেন আর একটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতেছে—পরস্পরে কোন সম্বন্ধ নাই। যখন আপনারা শিশু ছিলেন, আপনারা ভাবিতেন, উহাদের মধ্যে অদ্ভুত সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই লোকটী তাঁহার শৈশবাবস্থার চিন্তাগুলি—শৈশবাবস্থায় যাহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হইত, তাহাই লইয়া শিশুদিগের জন্য এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। আর অনেকে ছেলেদের জন্য যে সব গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তাঁহারা বড় হইলে তাঁহাদের যে সকল চিন্তা ও ভাব আসিয়াছে, সেইগুলি ছেলেদের গেলাইবার চেষ্টা করেন—কিন্তু ঐ বইগুলি ছেলেদের কিছুমাত্র উপযোগী নহে—বাজে অনর্থক লেখামাত্র। যাহা হউক, আমরাও সকলেই—বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুমাত্র। আমাদের জগৎও ঐরূপ অসম্বদ্ধ জিনিষমাত্র—ঐ এলিসের অদ্ভুত রাজ্য—কোনটীর সহিত কোনটীর কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। আমরা যখন কয়েকবার ধরিয়া কতকগুলি ঘটনাকে একটী নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটিতে দেখি, আমরা তাহাকেই কার্য্যকারণ নামে অভিহিত করি, আর বলি যে, উহা আবার ঘটিবে। যখন এই স্বপ্ন চলিয়া গিয়া তাহার স্থলে অন্য স্বপ্ন আসিবে, তাহাকেও ইহারই মত সম্বন্ধযুক্ত বোধ হইবে। স্বপ্নদর্শনের সময় আমরা যাহা কিছু দেখি, সবই সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নাবস্থায় আমরা সেগুলিকে কখনই অসম্বদ্ধ বা অসঙ্গত মনে করি না—কেবল যখনই জাগিয়া উঠি, তখনই সম্বন্ধের অভাব দেখিতে পাই। এইরূপ যখন আমরা এই জগৎরূপ স্বপ্নদর্শন হইতে জাগিয়া উঠিয়া ঐ স্বপ্নকে সত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, তখন উহা সমুদয়ই অসম্বদ্ধ ও নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে—কতকগুলা অসম্বদ্ধ জিনিষ যেন আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইতেছে, কিছুই জানি না। কিন্তু আমরা জানি যে, উহা শেষ হইবে। আর ইহাকেই মায়া বলে। এই সমুদয় পরিণামশীল বস্তু—রাশি রাশি গতিশীল ঊর্ণাপুঞ্জবৎ কাদম্বিনীজালের ন্যায় আর সেই অপরিণামী সূর্য্য আপনি স্বয়ং। যখন আপনি সেই অপরিণামী সত্তাকে বাহির হইতে দেখেন, তখন তাহাকে আপনি ঈশ্বর বলেন আর ভিতর হইতে দেখিলে উহাকে আপনার নিজ আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া দেখেন। উভয়ই এক। আপনা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর নাই, আপনা হইতে—যথার্থ যে আপনি—তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর ঈশ্বর নাই—

সকল ঈশ্বর বা দেবতাই আপনার তুলনায় ক্ষুদ্রতর, ঈশ্বর, স্বর্গস্থ পিতা প্রভৃতির সমুদয় ধারণা আপনারই প্রতিবিম্বমাত্র। ঈশ্বর স্বয়ংই আপনার প্রতিবিম্ব বা প্রতিমাস্বরূপ। 'ঈশ্বর মানবকে নিজ প্রতিবিম্বরূপে সৃষ্টি করিলেন—এ কথা ভুল। মানুষ ঈশ্বরকে নিজ প্রতিবিম্বানুযায়ী সৃষ্টি করে—এই কথাই সত্য। সমুদয় জগতের মধ্যেই আমরা আমাদের প্রতিবিম্বানুযায়ী ঈশ্বর বা দেবগণের সৃষ্টি করিতেছি। আমরাই দেবতা সৃষ্টি করি, তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করি, আর যখনই এই স্বপ্ন আমাদিগের নিকট আসিয়া থাকে, তখন আমরা উহাকে ভাল বাসিয়া থাকি।

এই বিষয়টী বুঝিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, অদ্যকার প্রাতের বক্তৃতার সার কথাটা এই যে, একটী সত্তামাত্রই আছে আর সেই এক সত্তাই বিভিন্ন মধ্যবর্ত্তী বস্তুর মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইলে তাহাকেই পৃথিবী বা স্বর্গ বা নরক বা ঈশ্বর বা ভূতপ্রেত বা মানব বা দৈত্য বা জগৎ বা এই সমুদয় যাহা কিছু বোধ হয়। কিন্তু এই সমুদয় বিভিন্ন পরিণামী বস্তুর মধ্যে যাঁহার কখন পরিণাম হয় না—যিনি এই চঞ্চল মর্ত্ত্য জগতের একমাত্র জীবনস্বরূপ, যে এক পুরুষ বহু ব্যক্তির কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি নিজ আত্মার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তিলাভ হয়—আর কাহারও নহে। *

সেই এক সত্তার সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। কিরূপে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি হইবে—কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, ইহাই এক্ষণে জিজ্ঞাস্য। কিরূপে এই স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারী—আমাদের ইহা চাই, ইহা করিতে হইবে, এই যে স্বপ্ন—ইহা হইতে কিরূপে আমরা জাগিব? আমরাই জগতের সেই অনন্ত পুরুষ আর আমরা জড়ভাবাপন্ন হইয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারীরূপ ধারণ করিয়াছি—একজনের মিষ্ট কথায় গলিয়া যাইতেছি আবার আর এক জনের কড়া কথায় গরম হইয়া পড়িতেছি—ভালমন্দ সুখদুঃখ আমাদিগকে নাচাইতেছে! কি ভয়ানক নির্ভরতা, কি ভয়ানক দাসত্ব! আমি—যে সকল সুখদুঃখের অতীত, সমগ্র জগৎই যাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ—সূর্য্য চন্দ্র তারা যাহার মহাপ্রাণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসমাত্র, আমি এইরূপ ভয়ানক দাসভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি! আপনি আমার গায়ে একটা চিমটি কাটিলে আমার লাগিয়া থাকে। কেহ যদি একটী মিষ্ট কথা বলে, অমনি আমার আনন্দ হইতে থাকে। আমার কি দুর্দ্দশা দেখুন—দেহের দাস, মনের দাস, জগতের দাস, একটা ভাল কথার দাস,

* কঠোপনিষদ্, ৫ম বল্লী, ১৩শ শ্লোক দেখুন।

একটা মন্দ কথার দাস, বাসনার দাস, সুখের দাস, জীবনের দাস, মৃত্যুর দাস—সব জিনিষের দাস! এই দাসত্ব ঘুচাইতে হইবে কিরূপে?

এই আত্মার সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, তৎপরে উহা লইয়া মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, তৎপরে উহার নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে। *

অদ্বৈতজ্ঞানীর ইহাই সাধন-প্রণালী। সত্যের সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে উহার বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত সেইটী মনে মনে দৃঢ়ভাবে বলিতে হইবে। সর্ব্বদাই ভাবুন—'আমি ব্রহ্ম'—অন্য সমুদয় চিন্তাকে দুর্ব্বলতা-জনক বলিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। যে কোন চিন্তায় আপনাদিগকে নরনারী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা দূর করিয়া দিন্। দেহ যাক্, মন যাক্, দেবতারাও যাক্, ভূত প্রেতাদিও যাক্, সেই এক সত্তা ব্যতীত আর সবই যাক্।

যেখানে একজন অপরকে দেখে, একজন অপর কিছু শুনে, একজন অন্য কিছু জানে, তাহা ক্ষুদ্র বা সসীম, আর যেখানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপর কিছু শুনে না, একজন অপর কিছু জানে না, তাহাই ভূমা অর্থাৎ মহান্ বা অনন্ত।†

তাহাই সর্ব্বোত্তম বস্তু, যেখানে বিষয়ী ও বিষয় এক হইয়া যায়। যখন আমিই শ্রোতা ও আমিই বক্তা যখন আমিই আচার্য্য ও আমিই শিষ্য, যখন আমিই স্রষ্টা ও আমিই সৃষ্ট, তখনই কেবল ভয় চলিয়া যায়। কারণ, আমাকে ভীত করিবার অপর কেহ বা কিছু নাই। আমি ব্যতীত যখন আর কিছুই নাই, তখন আমাকে ভয় দেখাইবে কিসে? দিনের পর দিন এই তত্ত্ব শুনিতে হইবে। অন্য সমুদয় চিন্তা দূর করিয়া দিন। আর সমুদয় দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিন, নিরন্তর ইহা আবৃত্তি করুন। যতক্ষণ না উহা হৃদয়ে পঁহুছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রত্যেক স্নায়ু, প্রত্যেক মাংসপেশী, এমন কি, প্রত্যেক শোণিতবিন্দু পর্য্যন্ত 'আমিই সেই, আমিই সেই,' এই ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, ততক্ষণ কর্ণের ভিতর দিয়া ঐ তত্ত্ব ক্রমাগত ভিতরে প্রবেশ করাইতে হইবে। এমন কি, মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও বলুন—আমিই সেই। ভারতে এক সন্ন্যাসী ছিলেন—তিনি শিবোঽহং শিবোঽহং আবৃত্তি করিতেন। একদিন একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল ও তাঁহাকে টানিয়া লইয়া

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৫ম অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক দেখুন।

† 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা
অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং।"
—ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৭ম প্রপাঠক ২৪ খণ্ড

গিয়া মারিয়া ফেলিল। যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ শিবোঽহং শিবোঽহং ধ্বনি শুনা গিয়াছিল। মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, সমুদ্রতলে, উচ্চতম পর্ব্বতশিখরে, গভীরতম অরণ্যে, যেখানেই পড়ুন না কেন, সর্ব্বদা আপনাকে বলিতে থাকুন—আমিই সেই, আমিই সেই। দিনরাত্রি বলিতে থাকুন—আমিই সেই। ইহা শ্রেষ্ঠতম তেজের পরিচয়, ইহাই ধর্ম্ম।

দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। * কখনই বলিবেন না, 'হে প্রভো, আমি অতি অধম পাপী' কে আপনাকে সাহায্য করিবে? আপনি জগতের সাহায্যকর্ত্তা—আপনাকে আবার এ জগতে কিসে সাহায্য করিতে পারে? আপনাকে সাহায্য করিতে কোন মানব, কোন্ দেবতা বা কোন্ দৈত্য সক্ষম? আপনার উপর আবার কাহার শক্তি খাটিবে? আপনিই জগতের ঈশ্বর—আপনি আবার কোথায় সাহায্য অন্বেষণ করিবেন? যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছেন, আপনার নিজের নিকট হইতে ব্যতীত আর কাহারও নিকট পান নাই। আপনি প্রার্থনা করিয়া যাহার উত্তর পাইয়াছেন, অজ্ঞতাবশতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, অপর কোন পুরুষ তাহার উত্তর দিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আপনি স্বয়ংই সেই প্রার্থনার উত্তর দিয়াছেন। আপনার নিকট হইতেই সাহায্য আসিয়াছিল, আর আপনি সাগ্রহে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন যে, অপর কেহ আপনাকে সাহায্য প্রেরণ করিতেছে। আপনার বাহিরে আপনার সাহায্যকর্ত্তা আর কেহ নাই—আপনিই জগতের স্রষ্টা। গুটিপোকার ন্যায় আপনিই আপনার চারিদিকে গুটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কে আপনাকে উদ্ধার করিবে? আপনার ঐ গুটিটি কাটিয়া ফেলিয়া সুন্দর প্রজাপতিরূপে—মুক্ত আত্মারূপে বাহির হইয়া আসুন। তখনই, কেবল তখনই আপনি সত্য দর্শন করিবেন। সর্ব্বদা আপন মনকে বলিতে থাকুন, আমিই সেই। এই বাক্যগুলি আপনার মনের অপবিত্রতা-রূপ আবর্জ্জনা রাশিকে পুড়াইয়া ফেলিবে, উহাতেই আপনার ভিতরে পূর্ব্ব হইতেই যে মহাশক্তি অবস্থিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করিয়া দিবে, উহাতেই আপনার হৃদয়ে যে অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহাকে জাগাইবে। সর্ব্বদাই সত্য—কেবলমাত্র সত্য—শ্রবণ করিয়াই এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। যেখানে দুর্ব্বলতার চিন্তা বিদ্যমান, সেই স্থানের দিকে ঘেঁসিবেন না। যদি জ্ঞানী হইতে চান, সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা পরিহার করুন।

---

* নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

—মুণ্ডক উপনিষদ্ ৩।২।৪

সাধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মনে যত প্রকার সন্দেহ আসিতে পারে, সব ভঞ্জন করিয়া লউন। যুক্তি তর্ক বিচার যতদূর করিতে পারেন, করুন। তার পর যখন মনের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ইহাই এবং কেবলমাত্র ইহাই সত্য, আর কিছু নহে, তখন আর তর্ক করিবেন না, তখন মুখ একেবারে বন্ধ করুন। তখন আর তর্ক যুক্তি শুনিবেন না, নিজেও তর্ক করিবেন না। আর তর্ক যুক্তির প্রয়োজন কি? আপনি ত বিচার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, আপনি ত সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এখন তবে আর বাকি কি? এখন সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। অতএব বৃথা তর্কে আর অমূল্য কালহরণে কি ফল? এক্ষণে ঐ সত্যকে ধ্যান করিতে হইবে, আর যে কোন চিন্তায় আপনাকে তেজস্বী করে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহাতে দুর্ব্বল করে, তাহাকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত মূর্ত্তি প্রতিমাদি এবং ঈশ্বরের ধ্যান করেন। ইহাই স্বাভাবিক সাধনপ্রণালী, কিন্তু ইহাতে অতি মৃদু গতিতে অগ্রসর হইতে হয়। যোগীরা তাঁহার দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন কেন্দ্র বা চক্রের উপর ধ্যান করেন ও মনোমধ্যস্থ শক্তিসমূহের পরিচালনা করেন। জ্ঞানী বলেন, মনেরও অস্তিত্ব নাই, দেহেরও নাই। এই দেহ ও মনের চিন্তাকে দূর করিয়া দিতে হইবে, অতএব উহাদের চিন্তা করা অজ্ঞানোচিত কার্য্য। উহা যেন একটা রোগ আনিয়া আর একটা রোগ আরোগ্য করার মত। অতএব তাঁহার ধ্যানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন—নেতি নেতি; তিনি সকল বস্তুর অস্তিত্বই নিরাস করেন, আর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আত্মা। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণাত্মক (বিলোম) সাধন। জ্ঞানী কেবলমাত্র বিশ্লেষণ-বলে জগৎটাকে আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন। 'আমি জ্ঞানী' এ কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী হওয়া বড়ই কঠিন। বেদ বলিতেছেন,—

পথ অতি দীর্ঘ, এ যেন শাণিত ক্ষুরধারার উপর দিয়া ভ্রমণ; কিন্তু নিরাশ হইও না। উঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন ক্ষান্ত হইও না। *

অতএব জ্ঞানীর ধ্যান কি প্রকার হইল? জ্ঞানী দেহ মন বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার

* "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"
—কঠ উপনিষদ্। ১।৩।১৪

চিন্তাকে অতিক্রম করিতে চাহেন। তিনি যে দেহ, এই ধারণাকে দূর করিয়া দিতে চাহেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, যখনই আমি বলি, আমি অমুক স্বামী, তৎক্ষণাৎ দেহের ভাব আসিয়া থাকে। তবে কি করিতে হইবে? মনের উপর বলপূর্ব্বক আঘাত করিয়া বলিতে হইবে, 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা।' রোগই আসুক, অথবা অতি ভয়াবহ আকারে মৃত্যু আসিয়াই উপস্থিত হউক, কে গ্রাহ্য করে? আমি দেহ নহি। দেহ সুন্দর রাখিবার চেষ্টা কেন? এই মায়া, এই ভ্রান্তি আবার সম্ভোগের জন্য? এই দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য? দেহ যাউক, আমি দেহ নহি। ইহাই জ্ঞানীর সাধনপ্রণালী। ভক্ত বলেন, "প্রভু আমাকে এই জীবনসমুদ্র সহজে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই দেহ দিয়াছেন, অতএব যত দিন না যাত্রা শেষ হয়, ততদিন ইহাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে।" যোগী বলেন, "আমাকে দেহের যত্ন অবশ্যই করিতে হইবে, যাহাতে আমি ধীরে ধীরে সাধন পথে অগ্রসর হইয়া পরিণামে মুক্তিলাভ করিতে পারি।" জ্ঞানী মনে করেন, আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমি এই মুহূর্ত্তেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিব। তিনি বলেন, "আমি নিত্যমুক্ত, কোন কালেই আমি বদ্ধ নহি; আমি অনন্তকাল ধরিয়া এই জগতের ঈশ্বর। আমাকে আবার পূর্ণ কে করিবে? আমি নিত্য পূর্ণ স্বরূপ।" যখন কোন মানব স্বয়ং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সে অপরেও পূর্ণতা দেখিয়া থাকে। লোকে যখন অপরের মধ্যে অপূর্ণতা দেখে, তখন তাহার নিজ মনেরই ছাপ উহার উপর পড়াতে সে ঐরূপ দেখিতেছে, বুঝিতে হইবে। তাহার নিজের ভিতর যদি অপূর্ণতা না থাকে, তবে সে কিরূপে অপূর্ণতা দেখিবে? অতএব জ্ঞানী পূর্ণতা অপূর্ণতা কিছুই গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার পক্ষে উহাদের কিছুই অস্তিত্ব নাই। যখনই তিনি মুক্ত হন, তিনি আর ভালমন্দ দেখেন না। ভালমন্দ কে দেখে? যাহার নিজের ভিতর ভালমন্দ আছে। অপরের দেহ কে দেখে? যে নিজেকে দেহ মনে করে। যে মুহূর্ত্তে আপনি দেহভাবরহিত হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই আর আপনি জগৎ দেখিতে পাইবেন না। উহা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। জ্ঞানী কেবল বিচারজনিত সিদ্ধান্তবলে এই জড়বন্ধন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাই 'নেতি' 'নেতি' মার্গ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

আত্মার একত্ব।

পূর্ব্ব বক্তৃতায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ়তর করিবার জন্য আমি একখানি উপনিষদ* হইতে কিছু পাঠ করিয়া শুনাইব। তাহাতে দেখিবেন, অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে কিরূপে এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত।

যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন মহর্ষি ছিলেন। আপনারা অবশ্য জানেন যে, ভারতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সকলকেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—

প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, আমি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম, এই আমার যাহা কিছু অর্থ, বিষয় সম্পত্তি বুঝিয়া লও।

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগবন্, যদি আমি ধনরত্নে পূর্ণা সমুদয় পৃথিবী প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি আমি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, তাহা হইতে পারে না। ধনী লোকেরা যেরূপে জীবন ধারণ করে, তোমার জীবনও তদ্রূপ হইবে, কারণ, ধনের দ্বারা কখন অমৃতত্ব লাভ হয় না।"

মৈত্রেয়ী কহিলেন, "যাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? যদি তাহা আপনার জানা থাকে, আমাকে তাহা বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তুমি বরাবরই আমার প্রিয়া ছিলে, এক্ষণে এই প্রশ্ন করাতে তুমি প্রিয়তরা হইলে। এস, আসন গ্রহণ কর, আমি তোমাকে তোমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব। তুমি উহা শুনিয়া উহা ধ্যান করিতে থাক।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন,

"হে মৈত্রেয়ি, স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে, তাহা স্বামীর জন্য নহে, কিন্তু আত্মার জন্যই স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, কারণ সে আত্মাকে ভালবাসিয়া

* বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ ও ৪র্থ অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণ দেখ। এই অধ্যায়ের প্রায় সমুদয়ই ঐ দুই অংশের ভাবানুবাদ ও ব্যাখ্যামাত্র।

থাকে। স্ত্রীকে স্ত্রীর জন্য কেহ ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে। কেহই সন্তানগণকে তাহাদের জন্য ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতুই সন্তানগণকে ভাল বাসিয়া থাকে। কেহই অর্থকে অর্থের জন্য ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু লোকে আত্মাকে ভালবাসে সেই হেতু অর্থ ভালবাসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই ব্রাহ্মণের জন্য নহে, কিন্তু আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ব্রাহ্মণকে ভালবাসিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়কেও লোকে ক্ষত্রিয়ের জন্য ভাল বাসে না, আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ক্ষত্রিয়কে ভাল বাসিয়া থাকে। এই জগৎকেও লোকে যে ভালবাসে, তাহা জগতের জন্য নহে, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু জগৎ তাহার প্রিয়। দেবগণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই দেবগণের জন্য নহে, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই হেতু দেবগণ তাহার প্রিয়। অধিক কি, কোন বস্তুকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই বস্তুর জন্য নহে, কিন্তু তন্মধ্যে যে আত্মা বিদ্যমান তাহার জন্যই সে ঐ বস্তুকে ভাল বাসে। অতএব এই আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে হইবে, তৎপরে মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, তার পর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ উহার ধ্যান করিতে হইবে। হে মৈত্রেয়ি, আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা এই সমুদয় যাহা কিছু, সবই জ্ঞাত হয়।"

এই উপদেশের তাৎপর্য্য কি? এ এক অদ্ভুত রকমের দর্শন। আমরা জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝি, সকলের ভিতর দিয়াই আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন। লোকে বলিয়া থাকে, সর্ব্বপ্রকার প্রেমই স্বার্থপরতা—স্বার্থপরতার যতদূর নিম্নতম অর্থ হইতে পারে, সেই অর্থে সকল প্রেমই স্বার্থপরতাপ্রসূত; যেহেতু আমি আমাকে ভালবাসি, সেই হেতু অপরকে ভালবাসিয়া থাকি। বর্ত্তমানকালেও অনেক দার্শনিক আছেন, যাঁহাদের মত এই যে, স্বার্থই জগতে একমাত্র সকল কার্য্যের প্রবৃত্তিদায়িনী শক্তি। একথা এক হিসাবে সত্য আবার অন্য হিসাবে ভুল। এই আমাদের 'আমি' সেই প্রকৃত 'আমি' বা আত্মার ছায়া মাত্র, যিনি আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছেন আর সসীম বলিয়াই এই ক্ষুদ্র 'আমি'র উপর ভালবাসা অন্যায় ও মন্দ বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, তাহাকেই স্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু উহা সসীমভাবে দৃষ্ট হইতেছে। এমন কি, স্ত্রীও

যখন স্বামীকে ভালবাসে, সে জানুক বা নাই জানুক, সে সেই আত্মার জন্যই স্বামীকে ভালবাসিতেছে। জগতে উহা স্বার্থপরতারূপে ব্যক্ত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আত্মপরতা বা আত্মপ্রীতির ক্ষুদ্র অংশমাত্র। যখনই কেহ কিছু ভালবাসে, তাহাকে সেই আত্মার মধ্য দিয়াই ভালবাসিতে হয়।

এই আত্মাকে জানিতে হইবে। যাহারা আত্মার স্বরূপ না জানিয়া উহাকে ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসাই স্বার্থপরতা। যাহারা আত্মাকে জানিয়া উহাকে ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসায় কোনরূপ বন্ধন নাই, তাহারা সাধু। কেহই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের জন্য ভালবাসে না কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া যে আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই সে ব্রাহ্মণকে ভালবাসে।

"ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন, ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন, লোকসমূহ বা জগৎ তাঁহাকে ত্যাগ করে, যিনি জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন, দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বিশ্বাস করেন। সকল বস্তুই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, যিনি তাঁহাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসমূহ, এই দেবগণ, এমন কি, যাহা কিছু জগতে আছে, সবই আত্মা।"

এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য ভালবাসা অর্থে তিনি কি লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা বুঝাইলেন। যখনই আমরা এই প্রেমকে এক বিশেষ প্রদেশে সীমাবদ্ধ করি, তখনই যত গোলমাল। মনে করুন, আমি কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসিতেছি, যদি আমি সেই স্ত্রীলোককে আত্মা হইতে পৃথক্ ভাবে, বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করি, তবে উহা আর নিত্যস্থায়ী প্রেম হইল না। উহা স্বার্থপর ভালবাসা হইয়া পড়িল, আর দুঃখই উহার পরিণাম, কিন্তু যখনই আমি সেই স্ত্রীলোককে আত্মারূপে দেখিতে পারি, তখনই সেই ভালবাসা যথার্থ প্রেম হইল, তাহার কখন বিনাশ নাই। এইরূপ যখনই আপনারা সমগ্র জগৎ অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া জগতের কোন এক বস্তুতে আসক্ত হন, তখনই তাহাতে প্রতিক্রিয়া আসিয়া থাকে। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহারই ফল শোক ও দুঃখ। কিন্তু যদি আমরা সমুদয় বস্তুকে আত্মার অন্তর্গত ভাবিয়া ও আত্মাস্বরূপে সম্ভোগ করি, তাহা হইতে কোন কষ্ট বা প্রতিক্রিয়া আসিবে না। ইহাই পূর্ণ আনন্দ।

এই আদর্শে উপনীত হইবার উপায় কি? যাজ্ঞবল্ক্য ঐ অবস্থা লাভ করিবার প্রণালী বলিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত; আত্মাকে না জানিয়া জগতের প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বস্তু লইয়া উহাতে আত্মদৃষ্টি করিব কিরূপে?

"দূরে যদি একটী দুন্দুভি বাজিতে থাকে, আমরা উহা হইতে উৎপন্ন শব্দকে, শব্দতরঙ্গগুলিকে জয় করিয়া জয় করিতে পারি না, কিন্তু যখনই আমরা দুন্দুভির নিকটে আসিয়া উহাকে গ্রহণ করি, তখনই ঐ শব্দও গৃহীত হয়।

"শঙ্খ বাজিতে থাকিলে যতক্ষণ না আমরা গিয়া ঐ শঙ্খটীকে গ্রহণ করি, ততক্ষণ শঙ্খ হইতে উৎপন্ন শব্দকে কখনই গ্রহণ করিতে পারি না।

"বীণা বাজিতে থাকিলে যেখান হইতে শব্দের উৎপত্তি হইতেছে, সেই বীণার নিকট আসিয়া উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেই শব্দোৎপত্তির কেন্দ্রকে আমরা জয় করিতে পারি।

"যেমন কেহ ভিজা কাঠ জ্বালাইতে থাকিলে তাহা হইতে নানা প্রকার ধূম ও স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ সেই মহান্ পুরুষ হইতে ইতিহাস, নানাবিধ বিদ্যা প্রভৃতি, এমন কি, যাহা কিছু বস্তু সমুদয়ই নিঃশ্বাসের মত বহির্গত হইয়াছে। তাঁহার নিশ্বাস হইতে যেন সমুদয় জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে।

"যেমন সমুদয় জলের একমাত্র আশ্রয় সমুদ্র, যেমন সমুদয় স্পর্শের ত্বকই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় গন্ধের নাসিকাই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় রসের জিহ্বাই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় রূপের চক্ষুই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় শব্দের কর্ণই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় চিন্তার মনই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় জ্ঞানের হৃদয়ই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় কর্ম্মের হস্তই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদয় বাক্যের বাগেন্দ্রিয়ই এক কেন্দ্র, যেমন সমুদ্রের জলের সর্ব্বাংশে জমাট লবণ রহিয়াছে, অথচ উহা চক্ষুতে দেখা যায় না, এইরূপ হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকে চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি এই জগতের সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া আছেন। তিনি সব। তিনি বিজ্ঞানঘনস্বরূপ। সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতে উত্থিত হয় এবং পুনরায় তাঁহাতেই যায়। কারণ, তাঁহার নিকট পঁহুছিলে আমরা জ্ঞানাতীত অবস্থায় চলিয়া যাই।"

ক্রমশঃ।

সখ্যরস ও বৈষ্ণব কবিকুল।

[শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।]

অতঃপর বৈষ্ণব কবির সখ্যরসের চিত্র আমরা উদ্ঘাটিত করিব। বৈষ্ণব কবির সখ্যরস কেবল প্রেমের অন্তর্ভুক্ত, অতএব উহাতে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানোৎপন্ন সংকোচ নাই। উহাতে সেবা আছে, কিন্তু দাসত্ববোধ নাই। উহাতে যথার্থ সখ্যের মধুরতা আছে প্রাণভরা ভালবাসা আছে, কিন্তু মহিমাবোধের প্রায় একান্ত অভাব। এখনও সখা-সম্বোধন-সম্বলিত ভগবৎ সঙ্গীত রচিত হয় কিন্তু সে সকলে সখা-সম্বোধন যেন মুখের সম্বোধন বলিয়া মনে হয়। সে সকলে কেবল "দাও দাও", "তুমি বড়", "তুমি মহৎ" ইত্যাদি স্তুতিবাচক খোসামুদি কথারই অধিক প্রাদুর্ভাব। যে নিঃসঙ্কোচ হৃদ্যতা বৈষ্ণব কবির সখ্যরসের চিত্রের উপাদান, তাহা সে সকলে পাইবার সম্ভাবনা অল্প। শ্রীভগবানের সহিত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিবর্হিত সরল সখ্যের চিত্র জগতের সাহিত্যে বড়ই বিরল। ভগবানের প্রতি ঐ ভাব কেবল ব্রজেই পূর্ণভাবে সম্ভবিয়াছিল। গীতাধর্ম্মাধিকারী ধনঞ্জয় ও এ সখ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কারণ, তিনি শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনানন্তর ভয়ে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন -

> "সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
> হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
> অজানতা মহিমানং তবেদং
> ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
> যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
> বিহারশয্যাসন ভোজনেষু।
> একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
> তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

গীতা—একাদশ অধ্যায়, ৪১, ৪২

এই যে ভয়সঙ্কুচিত ভাব, এই যে 'কাকে সখা বলিয়াছি—কি কুকর্ম্মই করিয়াছি' এইরূপ মাহাত্ম্যজ্ঞানে মনের সঙ্কোচ ইহাদের স্থান গোপ-বালকদিগের সরল অটুট সখ্যের মধ্যে নাই। তাহারা—

"কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।"

ব্রজবালকদের হৃদয়ের ভাব এত গভীর যে, তাহারা ভগবানের আত্মীয়তা ভিন্ন আর কিছু চাহে না। তাহারা বলে "তুমি কত বড়, তাহা জানিতে চাহি না; আমরা শুধু জানি, তুমি আমাদের ও আমরা তোমার।" এই সুন্দর ভাবে তাহারা বিভোর; তাহাদের অসঙ্কোচ সখ্যতার ভিতর মোসাহেবি আদৌ নাই। এই সরস উপাদানে বৈষ্ণব কবির সখ্যরসের চিত্র সকল সংগঠিত। ভগবানের কাছে সখার আব্দার ও সখ্যরসবিমোহিত ভক্তের প্রতি ভগবানের কত কৃপা, বৈষ্ণব কবির হৃদয়ে তাহা সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; তাই এই সকল চিত্রগুলি বড় স্বাভাবিক, বড় তৃপ্তিজনক, নিতান্ত সবল ও আশাপ্রদ। ভক্ত ভগবানের এই মধুর লীলা যখন বৈষ্ণব কবির হৃদয়ে প্রতিফলিত হইত, তখন ভক্ত কবির হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সেই লীলাময়ের লীলা-নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিয়া উঠিত ও তাহাদের ভাব-সংক্ষুব্ধ হৃদয় হইতে যেন সঙ্গীত আপনা আপনি উছলিয়া পড়িত।

"গিরিধর লাল গিরিপর খেলল
তরু হেলন পদপঙ্কজ দোলনীয়া।
অতিবল সুবল মহাবল বালক
কান্ধে ছান্দ করে ভাণ্ড দোহনীয়া॥
গিরিবর নিকট খেলত শ্যামসুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল।
নৌতুন তৃণ হেরিয়ে যমুনাতট
চঞ্চল ধায় গোপাল॥

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দনন্দন
উপনীত যমুনাতীর।
পাঁচনি বেত্র বাম কক্ষে দাবই
অঞ্জলি ভরি পীয়ে নীর॥
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল
তীরে রহি হেরত রঙ্গ
শ্যামল সুন্দর মূরতি মনোহর
হেরি যমুনা অতি বাড়ল তরঙ্গ

জ্ঞানদাস কহে পরিমল সুন্দর
কুসুম ষট্পদ জোর
যমুনাক তীর রমণ অতি মধুর
সুরস রসের ওর"

এই খেলার জন্য, সখাগণের সাথে মিলিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণের যে কত উৎসাহ, তাহাও বৈষ্ণব কবি বর্ণনা করিয়াছেন :—

"গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়া বাঁধি দেগো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়ে শ্রীদাম দাড়াঞা রাজপথে॥"

বৈষ্ণব কবিতা সখ্যের সমগ্রভাব ব্যক্ত করিয়াছে; খেলাধূলা আমোদ-আহ্লাদ, সকলি চিত্রিত করিয়াছে। ব্রজবালকগণের শ্রীকৃষ্ণ সহ বন-ভোজন বৈষ্ণবকবি বর্ণনা করিয়াছেন, সে চিত্রটী সারল্যে ও স্বাভাবিকতায় মনোরম, অথচ স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভগবৎপ্রেমে পরিপুষ্ট :—

"ভাগ্যবতী যমুনা মাই
যার একূলে ওকূলে ধাওয়া ধাই
শ্বেত শ্যামল দোনো ভাই
যার জলে দেখে আপন ছাই।
খেলা সমাপিয়া শ্রমযুত হইয়া
সখাগণ লইয়া সঙ্গে।
ভোজন সম্ভার ছিল ভার ভার
ভোজনে বসিলা রঙ্গে॥
যমুনাপুলিনে বেড়ি সখাগণে
মাঝে করি বৈসে কানু।
পাড়ি বন পাত তাহে নিল ভাত
জল ভরি শিঙ্গা বেনু॥
সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া মুখ হইতে লইয়া
সবে দেয় কানু মুখে॥

সখে কহে ভাই আমার কানাই
মোরে বড় ভালবাসে।
আমার সম্মুখে বসি খায় সুখে
সদা রহে মোর পাশে॥
এহি করি মনে করায় ভোজনে
আনন্দ সাগরে ভাসে।
বিশ্বম্ভর দাস করি মনে আশ
রহে সুবলের পাশে॥"

সবল সম্প্রীতির এমনি আর একটী চিত্র সাহিত্যে বড় বিরল। ইহাতে আড়ম্বর নাই, কথার বাঁধাবাঁধি, সাজগোজ নাই, আছে কেবল নিবিড় আত্মীয়তার অলন্ত নিদর্শন।

"সখে বলে ভাই আমার কানাই
মোরে বড় ভালবাসে।
আমার সমুখে বসি খায় সুখে
সদা রহে মোর পাশে॥"

এই কয়েকটী ছত্রে হৃদয়ভরা ভালবাসা যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই জানা যায়, ব্রজবালকের কৃষ্ণপ্রেম কত গভীর, কত সুন্দর।

সখ্যের সেবা বড় উপাদেয়, ইহাতে দাস্যের প্রভুত্ববোধ নাই, কেবল সখার সেবায় সখার যে আমোদ, তাহাই আছে।

"ভোজন সমাপি সবহুঁ ব্রজবালক
বৈঠল নীপকি ছায়।
কালিন্দী নীর সমীর বহই মৃদু
শীতল করু সব গায়॥
সুন্দর শ্যাম শরীর।
শ্রীদামক কোরে অলস তঁহি শুতল
সুবল কোরে বলবীর॥
নব নব পল্লব লেই সখাগণ
বীজই দুহুঁ জন অঙ্গ।
কোকিল ভ্রমর কানু মুখ হেরি হেরি
গায়ই শবদ তরঙ্গ॥

অঙ্গস তাজি বৈঠল নন্দনন্দন
ঢুবহি গেও সব বেনু।
হেরইতে হুতসে একযোগ কাননে
বাজই মোহন বেণু॥"

সখার স্নেহ, একপ্রাণতা ও বিচ্ছেদব্যাকুলতা নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে পরিব্যক্ত।

ছিয়ায় কণ্টক দাগ বদনে বন্ধন নাগ
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া কোন্ বনে ছিলা গিয়া
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥
নবঘনশ্যাম তনু ঘামের হইয়াছে জনু
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে হাতে হাতে সুঁপি দিলে
ঘরকে গেলে কি বলিবে মায়॥
খেলাব বলিয়া বনে আইলাম তোমার সনে
বসিয়া তরুর ছায়।
বনে বনে উকটিয়া তোর লাগি না পাইয়া
আমা সভা প্রাণ ফাটি যায়॥
জ্ঞানদাস কহে বাণী শুন ভাই নীলমণি
এ কোন্ চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে যাও তুমি অন্য স্থানে
তুমি মোদের এক যে সম্বল॥"

সুখে দুঃখে, আমোদে রহস্যে, ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সখা। যে ভগবানকে এমনি প্রেম দিতে পারে, ভগবান্ তাহার কাছে বাঁধা। বুঝি তাহার কাছে আর ভগবানের কোনও রহস্য থাকে না। তাই দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ের সমগ্র নিগূঢ় কথা এই সখাদের কাছে বিবৃত করিয়াছেন। ভক্ত ভগবানের এই নিগূঢ় সম্বন্ধ খ্যাপন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান মহিমা।

সখ্যরসের দুইটী বিভাগ আছে—সখার প্রেম ও সখীর প্রেম। সখীর প্রেম মধুর রসের অন্তর্নিহিত, এই জন্য এখানে তাহার বিস্তৃত বিবরণ

লিপিবদ্ধ করিলাম না। সখিচরিত্র আমাদিগকে ভাগ করিয়া বুঝিতে হইবে, কিন্তু তাহা মধুর রস ব্যাখ্যার কালেই সহজে বুঝা যাইবে। আপাততঃ মধুররসান্তর্গত সখ্যের দুই একটা চিত্রাংশ প্রদর্শন করিয়া সখ্য রসের চিত্র সম্পূর্ণ করিব।

"সখা হে ও ধনী কে কহ বটে
গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপর পা ॥

* * * * *

আনহি ছল করি; সুবল করে ধরি
গমন করল বন মাহ।
তরু সব হেরি কুসুম তহি তোড়ল
যতনহি হার বনাই ॥
মাধব কুণ্ডকতীর সুন্দরী মনে করি
ভাবই পথ হেরি কাতরে মনো নহে থির।
নব নব পল্লব শেজ বিছায়ল
নব কিশলয় তঁহি রাখি।
কুসুম তোড়ি চিত ভেল আকুল
হেরইতে অথির ভেল আঁখি ॥
তৈখনে মদন দ্বিগুণ তনু দগধল
জর জর শ্যামকু অঙ্গ।
গোবিন্দ দাস পঁহু সুবল কোরে রহু
ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ ॥"

এমনি খেলার আমোদ, সুখে দুঃখে সমত্ব বোধ ও বিশ্রব্ধতায় বৈষ্ণব কবির সখ্যরস পরিপুষ্ট। এই সখ্যের ভিতর, গরিমাজ্ঞানজনিত অথবা ঐশ্বর্য্য বোধহেতু প্রীতির সঙ্কোচ আদৌ নাই। এই প্রীতি স্বতঃ উচ্ছ্বসিত, এই

প্রীতি অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা রাখে না, খোসামুদি করিতে চাহে না, কেবল ভাল বাসিতে জানে।

"গোপাল যাবে কিনা যাবে আজি গোঠে।
একবোল বলিলে　আমরা চলিয়া যাই
গোধন চলিয়া গেল মাঠে॥

উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা　ডাকিতে আইনু মোরা
যতেক গোকুলের রাখ জনে।
একেলা মন্দির মাঝে　আছ তুমি কোন্ কাজে
এ তোমার কোন্ ঠাকুরাণী॥

যদি বা এড়িয়া যাই　অন্তরেতে ব্যথা পাই
যাইতে কেমতে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান　সদাই অন্তরে টান
তিল আধ না দেখিলে মরি॥

এমন করিয়া ভাল বাসিতে পারিলে, এমন করিয়া জোর করিয়া ডাকিতে পারিলে ভগবান সে আবদার হাসিমুখে সহ্য করেন—

"মাথেতে ছিন্দন দড়ি,　হাথেতে কনক লাড়
বার হইল বিহারের বেশে!
সকল বালক লৈয়া　যমুনার তীরে যাইয়া
জ্ঞানদাস ছিল তার পাছে॥"

ধন্য জ্ঞানদাস যাঁর হৃদয়বৃন্দাবনে এই অমৃতময় ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গোষ্ঠের চিত্রে বৈষ্ণব কবি কত পবিত্রতা কত সাত্বিকতা, কত অপার আনন্দ ঢালিয়াছেন—তাহা বর্ণনার বিষয় নহে, উপভোগের বিষয়। এ সকল চিত্রে প্রেমের তুফান ছুটিয়াছে। শুধু মানুষ নহে, স্থাবর জঙ্গম, পশু পক্ষী সেই প্রেম বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে।—

"আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা　আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই॥

ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখাল গণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণু রবে ॥
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিল পূরিল উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে ॥
দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘন ঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশু পক্ষী পাইল চেতন ॥"

এইরূপ পরম পবিত্র সাত্ত্বিক ভাবে সখ্যরসের অবয়ব সুগঠিত ও তাহার আধ্যাত্মিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত। ভক্তহৃদয়ের এই সুন্দর রহস্য ভক্ত কবির নিপুণ তুলিকায় সুচারুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ভক্তাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আধ্যাত্মিক জীবনে সখ্যরসের অপরূপ বিকাশ হইয়াছিল। তিনি নিজ ভক্তগণকে লইয়া সখ্যরসের যে সুমধুর লীলা করিতেন, তাহা বৈষ্ণব ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন। কখনও বা তিনি কৃষ্ণতন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া কলিকালে আবার সেই বৃন্দাবনের সখ্যরসের অবতারণা করিয়া জনমাত্রকে আনন্দের বন্যায় ভাসাইতেন। বৃন্দাবন দাস কহিয়াছেন :—

"কয়া কয়া বলি করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে ॥
গোকুল শিশুর ভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলেন গোকুলেন্দ্র অবতার ॥

"বাহ্য নাহি কারো মনে হইলা বিহ্বল।
নির্ঝরে ঈশ্বরদেহে বহে যেন জল॥
অদ্বৈত চৈতন্য দোঁহে জল ফেলা ফেলি।
প্রথমে লাগিলা দোঁহে মহা কুতূহলী॥"

পুনশ্চ লোচনদাস :—

"এ বোল শুনিয়া গৌর বিহ্বল হিয়ায়।
বালকের হেন সেই ইতস্ততঃ ধায়॥
ময়ূরের শব্দ করে, ধরয়ে পেখম।
পুলকে পূরিল অঙ্গ অরুণ নয়ন॥
ভাই ভাই বলি ডাকে হৈ হৈ বোলে।
শ্রীদাম সুদাম বলি গাছে কৈল কোলে॥
সখ্যভাবে ব্যাকুল হইয়া গৌর রায়।
প্রেময়ে আকুল হইয়া চারিদিকে ধায়॥"

আমরা এই স্থলেই সখ্যরসের চিত্র সমাপ্ত করিলাম। সখ্যরসের আরও অনেক মধুময় চিত্র বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যে আছে, কিন্তু সকল চিত্র এস্থলে উদ্ধৃত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আশা করি পাঠকগণ সেইগুলি নিজেরা পড়িয়া দেখিবেন।

অমরকণ্টক তীর্থ।

হিমাচলে ৺গঙ্গোত্রী এবং ৺যমুনোত্রীর যেরূপ মাহাত্ম্য, মধ্য ভারতে বিন্ধ্যগিরিমধ্যস্থ নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তিস্থান অমরকণ্টক নামক তীর্থের মাহাত্ম্য উহার কোন অংশে কম নহে—বরং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের অনেকের মতে ৺নর্ম্মদার মাহাত্ম্য এ কালে ৺গঙ্গা ও যমুনার অপেক্ষা অধিক এবং তাঁহারা এ বিষয়ে পৌরাণিক প্রমাণও দিয়া থাকেন। স্বাভাবিক দৃশ্যেও অমরকণ্টকের গঙ্গোত্রী বা যমুনোত্রীর সহিত তুলনা হইতে পারে; কেবল

হিমগিরির চিরতুষারমণ্ডিত শিখরশ্রেণী আর ভারতে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব এবং সেই তুষার ভেদ করিয়াই গঙ্গা ও যমুনা নির্গতা। নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থানে কেবল ঐ তুষার নাই, নতুবা অন্যান্য সমস্ত শোভাই বর্ত্তমান—শুধু বর্ত্তমান কেন, আমাদের বিবেচনায় কোন কোন বিষয়ে অমরকণ্টক গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রায় পনর বৎসর গত হইল, আমি আর একটী সন্ন্যাসীর সহিত আষাঢ় মাসে অমবকণ্টক দর্শনাভিলাষে যাত্রা করি। বর্ত্তমান সময়ে জড়-বিজ্ঞানের উন্নতিতে কোথাও যাত্রা করা বড় কঠিন ব্যাপার নয়—রেলওযের কৃপায় মহা কঠিন দুর্গম স্থানও সহজ ও সুগম হইযা গিয়াছে। সুতরাং আমরা রেলযোগে যাত্রা করিলাম।

অমরকণ্টক যাইতে হইলে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বিলাসপুর—কট্‌নি শাখা লাইনস্থিত পেণ্ড্রা রোড (Pendra Road) ষ্টেশনে নামিতে হয। বিলাসপুরের পর ষষ্ঠ ষ্টেশন (Pendra Road) পেণ্ড্রা রোড নামে অভিহিত। আমরা তথায় নামিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, সেখান হইতে প্রায় ৭।৮ মাইল পদব্রজে যাইলে তবে অমরকণ্টক পৌঁছান যায়। কাজেই আমরা ঐরূপে চলিলাম। রাস্তা প্রাযই অরণ্যের মধ্য দিয়া; মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম অদূরে দৃষ্ট হয। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, স্বাভাবিক শোভায় প্রকৃতি এখানে সদাই হাস্যমুখ। বিশেষতঃ বর্ষার ধারাসম্পাত আরম্ভ হওয়ায় বৃক্ষলতাদি যেন স্নানান্তর নবীন আবরণে আবরিত, এবং ছোট ছোট পার্ব্বতীয় স্রোতস্বিনীকুল অন্য সময় জলশূন্য হইলেও এখন বর্ষাগমে তদ্রূপ নহে—তবে এখনও অনায়াসে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। এই রূপে তিন বা সাড়ে তিন মাইল সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া অমরকণ্টক পর্ব্বতের পাদদেশে আসিযা উপস্থিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত অন্য যাত্রী আর একটীও দেখিলাম না; কেবল আমরা দুই জন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে এরূপ দুই এক জনের সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা হইয়াছিল, তাহাদেরই নিকট আমরা অপরিচিত পথের বিষয় অনুসন্ধান কবিতে করিতে চলিলাম।

এই ধার পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ হইল। প্রায় চারি বা সাড়ে চারি মাইল আরোহণের পর তবে নর্ম্মদা মায়ীর উৎপত্তিস্থানে পৌঁছান যাইবে। এই পর্ব্বতপাদমূলে এক নূতন জাতি মনুষ্য দেখিলাম, ইহাদের বনজারা বা বনচর্ বলে। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই। বাঙ্গালা

দেশে যেমন বেদে নামে এক জাত আছে—যাহারা দুই মাস এক গ্রামে, চারি মাস অপর গ্রামে, টোল ফেলিয়া বাস করে এবং ঝুড়ি, চুব্‌ড়ি, ডালা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া জীবন যাপন করে—মধ্য ভারতবর্ষে সেইরূপ এই বন্‌জারা জাতি। ইহাদের আদিম নিবাস রাজপুতনায় ছিল, বহুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন ভারতবর্ষে রেলের সৃষ্টি হয় নাই। ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি হইয়া কোন সময় মনুষ্য ও পশুর নিদারুণ কষ্ট হওয়ায় ইহারা নিজ নিজ পরিবার এবং পশুপাল লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াই জীবন যাপন করিতে থাকে এবং তদবধি এখনও ঐরূপ করিয়াই আসিতেছে। বনে পশুর খাদ্যের ও জলের অভাব নাই এবং আপনারা ব্যাপারীদের পণ্য দ্রব্য এই সকল পশুপৃষ্ঠে এক সহর হইতে অন্য সহরে লইয়া যাইয়া তাহার দ্বারা যাহা আয় হয় তাহাতেই নিজেদের ভরণ পোষণ চালায়। ইহারা কখন রাজপথ দিয়া চলে না; কারণ, সেখানে পশুর খাদ্যের অভাব। ইহাদের এক এক পালে ৩০০।৪০০।৫০০ পর্য্যন্ত বলদ, গাভী ও বৎস থাকে। ইহাদের সম্প্রদায়ের সংখ্যাও বহু; ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত আরণ্য প্রদেশেই ইহাদের দেখা যায়। অবশ্য রেলওয়ে আরম্ভ হওয়া অবধি ইহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। অনেকে কোন কোন দেশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী ভাবে অবস্থানও করিতেছে; যথা রোহিলখণ্ডে পিলিভিত জেলার উত্তর ভাগে—হিমালয়ের তরাইয়ে অনেকগুলি পল্লি এই বন্‌জারাদের বাসস্থান হইয়াছে। সেখানে এ জাতিদের থার বা থারো বলে। ইহাদের প্রধান গুণ, ইহারা বড়ই সত্যবাদী। এই কারণে পূর্ব্বকালে ব্যাপারীরা ইহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া সহস্র সহস্র টাকার মাল ইহাদের হস্তে বিনা সন্দেহে নিশ্চিন্ত মনে অর্পণ করিত এবং ইহারাও ব্যাপারীদের আদেশানুযায়ী যথাস্থানে ঐ সকল মাল পৌঁছাইয়া দিত। এখনও ভারতের কোন কোন স্থানে এরূপ চলিতেছে। ইহারা রাত্রে পথ চলে না; যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সন্ধ্যা সমাগতা হইলে কোন জঙ্গলের মধ্যে বা পার্শ্বে ছোট ছোট তাঁবু, যার দুইদিক্ অনাবৃত, তাহারই ভিতর বিশ্রাম করে। ঐরূপ বিশ্রামস্থলের মধ্যভাগে পশুর পাল রাখিয়া ব্যাপারীদের মাল সকল স্তরে স্তরে সাজাইয়া চতুষ্পার্শ্বে নিজেদের তাঁবু দ্বারা বেষ্টন করিয়া থাকে। প্রত্যেক দলের সহিত কতকগুলি কুকুর থাকে—রাত্রে ইহারাই রক্ষক। অরণ্য সকল প্রায়ই হিংস্রক জন্তুতে পূর্ণ; এই কুকুরেরা রাত্রে ইহাদের চতুষ্পার্শ্বে শুইয়া থাকে, কোন হিংস্রক জন্তুর

আগমন ইহারা দূর হইতেই স্বভাবসিদ্ধ ঘ্রাণশক্তি দ্বারা বুঝিতে পারে এবং ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকে, সুতরাং বনজারা সকলে জাগিয়া উঠে এবং পশুদের রক্ষা করে। ইহাদের বিবাহ ইত্যাদিও এই বনে বনে! এক বনের এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য বনের সম্প্রদায়ের সহিত বিবাহ হয়। বনে বনেই বিবাহ,, বনে বনেই বাস!

এই বার আমাদের পর্ব্বতারোহণ ঠিক ঠিক আরম্ভ হইল। পার্ব্বতীয় পথ মন্দ নয়, বৃক্ষলতাদিতে পূর্ণ, মধ্যে মধ্যে নির্ঝরিণী। এই বৃক্ষ সকলও অনন্ত প্রকারের। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিমালয় অপেক্ষাও অমরকণ্টক পর্ব্বত কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; তাহার কারণ,এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত বৃক্ষলতাদির মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ ফলে পরিপূর্ণ অরণ্যজাত আম্র ও জাম। অবশ্য অরণ্যজাত বলিয়া ঐ সকল ফলে অধিক শস্য নাই—কেবল আবরণ এবং বীজেই পরিপূর্ণ বলিলেও হয়, কিন্তু উহা অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে কদলীবন—তাহাতেও ফল অপর্য্যাপ্ত! অন্যান্য অনেক অপরিচিত ফলবান্ বৃক্ষলতাদিও দেখিলাম; কিন্তু, সে সকল আমাদের খাওয়া চলে কিনা লোকা-ভাবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। হরীতকী বৃক্ষও অনেক।

এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা চলিতে লাগিলাম। এখানেও মধ্যে মধ্যে দুই একজন বন্‌জারা রমণী নির্ঝরিণী হইতে কলসী করিয়া জল আনিতেছে দেখিলাম। মধ্যে মধ্যে আমরাও বিশ্রাম করিলাম এবং পর্ব্বতা-রোহণের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য বনজাত জাম,আঁব খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিলাম, ঋষিরা যে বনজাত ফলমূল আহার করিয়া এই সকল অরণ্যে ভগবানের জন্য তপশ্চরণ করিতেন, সে সকল সত্য কথা। দেখিয়া শুনিয়া পথে ঐরূপ চিন্তাই মনে আসিতে লাগিল।

প্রায় তিন মাইল রাস্তা এই রূপে আরোহণ করিয়া একটী প্রকাণ্ড ময়দানে উপনীত হইলাম। আর চড়াই নাই। ঐ ময়দানটীর চতুষ্পার্শ্ব নিবিড় জঙ্গলে বেষ্টিত। এটীও বন্‌জারাদের একটী বিশ্রামস্থান। এখান হইতে অল্পে অল্পে অবরোহণ করিয়া অর্দ্ধ মাইল বা কিছু অধিক নামিয়া যাইয়া নর্ম্মদা মায়ীর উৎপত্তিস্থান পাইলাম।

অমরকণ্টক মহারাজা রেওয়ার রাজ্যে স্থিত। গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই মহারাজা রেওয়ার একটী পুলীস ষ্টেসন—দুই তিন জন মাত্র কর্ম্মচারী থাকেন। তৎপরে পাণ্ডাদের দুই চারি খানি বাটী এবং কতকগুলি দোকান

অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদা মায়ীর উৎপত্তিস্থানে আমরা উপনীত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ ময়দান হইতে এখান পর্য্যন্ত সমস্তই প্রায় সমতল ভূমি। অমরকণ্টকশৃঙ্গ সমুদ্রতট হইতে প্রায় তিন হাজার ফিট উচ্চ। পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর এতটা সমতল ভূমি প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা দীর্ঘে প্রায় আড়াই তিন মাইল এবং প্রস্থেও প্রায় তত।

নর্ম্মদা মায়ী এই সমতল ভূমির প্রায় কেন্দ্রস্থল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছেন। একটী কুণ্ড বা ছোট পুষ্করিণী খনন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই পবিত্র বারি জমিয়া আছে। কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট। কুণ্ডটি অধিক গভীর নয়, প্রায় ৩।৪ হস্ত হইবে। দীর্ঘে প্রায় ২০ হাত, প্রস্থেও প্রায় ততই। কুণ্ডের একদিকের মন্দিরে নর্ম্মদা মায়ীর শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপিত এবং সেই মন্দিরের সম্মুখেই নর্ম্মদেশ্বর মহা-দেবের মন্দির ও আরো কতকগুলি ছোট ছোট মন্দির। নিকটেই নর্ম্মদা মায়ীর এক প্রাচীন ব্রহ্মচারীর ভক্তের কুটীর। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এখানে নর্ম্মদা মায়ীর সেবা করিতেছেন। আমরা ইঁহারই অতিথি হইলাম। কুণ্ডের আর একদিকে রাস্তা এবং পার্শ্বে কোন কোন পাণ্ডাদের বাটী ও গোশালা এবং কয়েকখানি মুদীর দোকান। ব্রহ্ম-চারীজিরও একটী ছোট গোশালা আছে, তাহাতে দুই তিনটী গাভী ও বৎস ছিল। কুণ্ডের অপর দুই দিকেই ছোট ছোট অনেকগুলি মন্দির।

নর্ম্মদা মায়ীর উৎপত্তিস্থান এই কুণ্ড পরিপূর্ণ হইয়া এক দিক্ দিয়া জল বাহিয়া যাইতেছে। এই জলধারা সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রায় দেড় বা দুই মাইল যাইয়া পর্ব্বত হইতে নিম্ন ভূমিতে পতিত হইয়া ক্ষুদ্র একটী নির্ঝ-রিণী আকারে বহিয়া ক্রমে অন্যান্য নির্ঝরিণীর সহিত মিলিয়া বৃহৎ নদীর আকার ধারণ ও শত শত পর্ব্বত গ্রাম সহর ভেদ করিয়া পশ্চিম সমুদ্রে বোম্বাই প্রান্তে সুরট জেলায় ভড়োচ নামক স্থানে মিলিত হইয়াছে।

অমরকণ্টক একটী ছোট পল্লীগ্রাম। ব্রাহ্মণেতর বর্ণেরও বাস আছে। গ্রামের তিন দিক্ ভয়ানক অরণ্যে বেষ্টিত, শালবনই অধিক। পল্লীর অনতিদূরেই পুরাণকার মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যাস্থান—সে পর্য্যন্ত অরণ্য তত গভীর নয়। এখানে একটী বহু প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতেই জঙ্গলের গভীরতার আরম্ভ; প্রায় এক মাইল

পর্য্যন্ত নিবিড় জঙ্গল। তার পর পর্ব্বতের শেষ, কিন্তু জঙ্গলের শেষ নয়। এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ৬০ ক্রোশ পর্য্যন্ত এই অরণ্য ব্যাপিয়া আছে।

পর্ব্বতের নীচের জঙ্গলে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী গোঁড জাতিদের বাস। এখানে ইহারা চাষবাস করিয়া জীবন যাপন করে। অমরকণ্টকে ইহারা নিত্যই শাক, অরণ্যজাত আঁব, কলা, জাম ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসে। তারা পয়সার প্রয়াসী নয়। তাদের জিনিসের বিনিময়ে চাল, মসলা, ডাল, কাপড় বা অন্য কোন আবশ্যকীয় জিনিস, যাহা তাহাদের জঙ্গলে পাওয়া যায় না, তাহারই প্রার্থী।

অমরকণ্টকের এই জঙ্গলে গঙ্গার শাখা সোন নদীরও উৎপত্তি স্থান। এই গভীর অরণ্য মধ্যে একটী অল্প উন্নত স্থান আছে। সেই স্থানটী অবশ্য প্রস্তরময়। তাহাই ভেদ করিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া ক্ষুদ্র একটী কুণ্ডে পরিণত হইয়াছে এবং উহাই ক্রমে পূর্ণিত হইয়া ধারাকারে ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে উত্তরণ করিতেছে। আরা সাহাবাদ। জেলায় সোন নদীর গাম্ভীর্য্য এবং প্রসার দেখিয়া বোধ হয় না যে, ঐ নদের উৎপত্তিস্থান এত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু বাস্তবিকই তাই।

অমরকণ্টক জঙ্গলে ব্যাঘ্র ভয় খুব। আমাদের অবস্থানকালে এক দিন রাত্রি প্রায় তিনটার সময় ভীষণ গর্জ্জনে গ্রামের সকল লোকেরই নিদ্রাভঙ্গ হয়। সকলে বলিতে লাগিল অতি নিকটেই, বোধ হয় এক মাইলের মধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়াছে। কোন দুর্ঘটনার শীঘ্রই সম্ভব। বলিতে বলিতেই পরদিন প্রাতে সংবাদ আসিল যে পূর্ব্বোক্ত অরণ্যবেষ্টিত প্রশস্ত ময়দানে ব্যাপারীরা প্রায় ২০০ হরিতকী ভার-বাহী বলদের সহিত রাত্রিতে বিশ্রাম করিতেছিল, তন্মধ্যে একটী বলদ ব্যাঘ্রে সংহার করিয়াছে। পরে গোলমাল চীৎকার ইত্যাদি হওয়ায় আর অধিক অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় দিন রাত্রে গ্রামে এক জনের গোশালায় ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া সমস্ত গরুগুলিকে (প্রায় ১০০ হইবে) গোঠের দরজা ভাঙ্গিয়া বাহিরে আনিয়া জঙ্গলের ধারে লইয়া যাইতেছে এমন সময় গৃহস্থ জাগিয়া উঠিয়া গোলমাল চীৎকারাদি করায় পল্লীর আরো লোক সকল আসিয়া পশুপালকে রক্ষা করে। প্রতি বৎসরেই সময় সময় এরূপ উৎপাত হয়। ব্রহ্মচারী বলিলেন, তিনি যখন উপরোক্ত মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা স্থানের কাছে

পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সাধন করিতেছিলেন তখন একবার এক ভীষণ ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। তাঁকে দেখিয়া ব্যাঘ্র ভীষণ একটী গর্জ্জনমাত্র করিয়া চলিয়া যায়। আর একদিন ব্রহ্মচারী পূর্ব্বোক্ত গোঁড়েদের গ্রামে কদলীপত্র সংগ্রহের জন্য যাইতে যাইতে তাঁহার বাম পার্শ্বে উচ্চ শৃঙ্গের উপর গভীর অরণ্যে এক দীর্ঘকায় ভীষণ ব্যাঘ্র দেখিতে পান। সে দিনও তাঁকে দূর হইতে দেখিয়া ব্যাঘ্রটি একটী ভীষণ গর্জ্জন করিয়া চলিয়া যায়।

গ্রামে কিন্তু প্রায় সকলেই এক বাক্যে বলে যে এখানে ব্যাঘ্রে কখনও মনুষ্য সংহার অদ্যাপি করে নাই।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য পেণ্ড্রা রোড ষ্টেসনে টাট্টু ঘোড়া পাওয়া যায় এবং একটু অনুসন্ধান করিলে ডুলিও পাওয়া যায়। যাইবার সময় বর্ষাকাল ছাড়া, অপর সকল ঋতুতে অর্থাৎ শীতকাল, গ্রীষ্মকাল ইত্যাদিতে যাওয়াই সুবিধা। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

আলমোড়া

১০ই জুলাই ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু,

আজ এখান হইতে সভার উদ্দেশ্যের যে proof পাঠাইয়াছিলে, তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। Rules & regulations টুকু (যে টুকু আমাদের সভায় সভ্যেরা পড়িয়াছিলেন) ভ্রমপূর্ণ। বিশেষ যত্নের সহিত সংশোধিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিবে, নহিলে লোকে হাসিবে।

* বহরমপুরে যে প্রকার কার্য্য হইতেছে, তাহা অতীব সুন্দর। ঐ সকলকার্য্যের দ্বারাই জয় হইবে—মতামত কি অন্তর স্পর্শ করে? কার্য্য কার্য্য জীবন জীবন—মতে ফতে এসে যায় কি? ফিলসফি যোগ তপ ঠাকুরঘর আলোচাল কলা মূলা—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, দেশগত ধর্ম্ম—পরোপকারই এক সার্ব্বজনীন মহাব্রত। আবালবৃদ্ধবনিতা আচণ্ডাল আপশু সকলেই এ ধর্ম্ম বুঝিতে পারে। শুধু negative ধর্ম্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে

* স্বামি অখণ্ডানন্দের উদ্যমে সম্পাদিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষ কার্য।

না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না, তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, ৪ঘন্টা ধ্যান কর, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও—"মধু তা কার কি?" ঐ যে কাজ অতি অল্পও হল, ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বল্‌বে লোকে তাই শুন্‌বে। এখন 'রামকৃষ্ণ, ভগবান্' লোককে আর বোঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেক্‌চারের কর্ম্ম—কথায় কি চিঁড়ে ভেজে। ঐ রকম যদি ১০টা ডিষ্ট্রিক্টে পার্‌তে, তাহলে ১০টাই কেন হয়ে যেত। অতএব বুদ্ধিমান্ এখন ঐ কর্ম্মবিভাগটার উপরই খুব ঝোঁক আর ঐটারই উপকারিতা বাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। কতকগুলো ছেলেকে দ্বারে দ্বারে পাঠাও—আলখ জাগিয়ে টাকা পয়সা ছেঁড়া কাপড় চাল ডাল যা পায় নিয়ে আসুক, তারপর সে গুলো ডিষ্ট্রীবিউট কর্‌বে। ঐ কাজ, ঐ কাজ। তার পর লোকের বিশ্বাস হবে, তার পর যা বল্‌বে শুন্‌বে।

কলিকাতায় মিটিং এর খরচ খরচা বাদে যা বাঁচে ঐ famine এতে পাঠাও বা কলিকাতার ডোমপাড়া হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরিব আছে, তাদের সাহায্য কর—হল ফল ঘোঁড়ার ডিম থাক্ প্রভু যা কর্‌বার তা কর্‌বেন। আমার এখন শরীর বেশ সেরে গেছে।

(—র সঙ্গে কোনও সম্বন্ধে কাজ নেই—) মেটিরিয়াল যোগাড় কচ্চ না কেন? আমি এসে নিজেই কাগজ start কর্‌ব। দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়, লেক্‌চার বই ফিলসফি সব তার নীচে

—কে ঐ রকম একটা কর্ম্মবিভাগ গরীবদের সাহায্যের জন্য কর্ত্তে লিখ্‌বে।

* * * * * * *

* ঠাকুর পূজোর খরচ দু এক টাকায় মাসে করে ফেল্‌বে। ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্চে * * * শুধু জল তুলসীর পূজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রদের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে—তা হলে সব কল্যাণ হবে। যোগেনের শরীর এখানে খারাপ হয়েছিল, সে আজ যাত্রা করিল—কলিকাতায়। আমি কাল পুনশ্চ দেউলধার যাত্রা করিব। ইতি আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে।

ইতি বিবেকানন্দ।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

বেলুড় নীলাম্বর বাবুর বাগানে এখনও মঠ রহিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ। স্বামিজী এই সময় সংস্কৃত শাস্ত্রাদির বহুধা আলোচনায় তৎপর। 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ' শ্লোকদুটী এ সময়ই তিনি রচনা করেন। আজ স্বামিজী "ওঁ হ্রীংঋতং" স্তবটী লিখে শিষ্যের হাতে দিয়ে বল্লেন, দেখিস্ এতে কিছু ভ্রমাদি আছে কিনা। শিষ্য Original খানি না নিয়ে তার একখানি নকল লিখে নিল। এই স্তবটী সম্বন্ধে একটু লিখে তৎপর মূল প্রবন্ধের অবতারণা করিব।

স্তবটী রচিত হবার চার পাঁচ দিন পরে স্বামিজী একদিন শিষ্যকে বল্লেন, ওটা কোন সংশোধন করার দরকার দেখ্‌লি কি? শিষ্য বল্লে যে, সে এখনো তা ভাল করে পড়ে দেখেনি। তার পর ঐ স্তবের Original কপি মঠে অনেক খুঁজিয়াও আর পাওয়া গেল না। শিষ্যের নিকট যে কাপি ছিল তাহাও আর মিলিল না। সুতরাং "ওঁ হ্রীংঋতং" স্তবটী লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। স্বামিজীর স্বস্বরূপ সম্বরণের প্রায় ৪ বৎসর পর শিষ্যের পুরাতন কাগজ খুঁজিতে খুঁজিতে স্তবটী পাওয়া যায় এবং ঐ সময়ই উহা উদ্বোধনে ছাপা হয়। কিন্তু শিষ্যলিখিত ঐ স্তবের বিস্তৃত ভাষ্যটী কোথায় যে হারাইয়া গিয়াছে তাহার এখনো খোঁজ হয় নি।

যে দিন স্বামীজি ঐ স্তবটি রচনা করেন, সে দিন—স্বামীজির জিহ্বায় যেন সরস্বতী আরূঢ়া হইয়াছিলেন। শিষ্যের সহিত অনর্গল সুললিত সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দু ঘণ্টা পর্য্যন্ত আলাপ করেন। এমন সুললিত বাক্যবিন্যাস, শিষ্য মহা মহা পণ্ডিতের মুখেও শোনে নাই; যেন সাক্ষাৎ শঙ্কর, বেদান্ত ভাষ্যের সুললিত ভাষার পুনরাবতরণ করিতেছেন।

স্বামীজি—দেখ্, ভাবে ও ভাষায় এক কত্তে গিয়ে সময় সময় আমার সংস্কৃত লিখ্‌তে ব্যাকরণগত স্খলন হয়; তাই তোদের বলি দেখে শুনে দিতে।

শিষ্য—মশায়, ও সব স্খলন নয়—উহা আর্ষ প্রয়োগ।

স্বামীজি—তুইত বল্লি; লোকে তা বুঝ্‌বে কেন? এই যে সেদিন "হিন্দু-

ধর্ম্ম কি" বলে একটা বাঙ্গালায় লিখ্‌লুম্‌—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বল্‌ছে কট মট বাঙ্গলা হয়েছে। তা হোগ্‌গে—তুই হরমোহনকে দেখা করে বল্‌বি যেন ঐ গুলিই ঠিক ঠিক ছাপা হয়; তবে তুই দেখে শুনে এক আধটা কথা ছাড়্‌তি বাড়্‌তি করে দিস্‌।

শিষ্য—যে আজ্ঞে, কালই হরমোহন বাবুকে বলে দিব।

স্বামীজি—ভাষা আর ভাব, জানিস্‌, সবই কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়্‌তে হবে। ঠাকুরের আগমনে সব বিষয়ে নূতন নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে প্রচার কত্তে হবে। এই দেখ্‌না আগেরকার কালের সন্ন্যাসীদের চাল চলন ভেঙ্গে আমি নূতন ছাঁচে গড়্‌ছি। সমাজ ও দেশ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্‌বে। আহাম্মকেরা করুক্‌—যত পারুক্‌ চেঁচাক্‌। তাতে কি আমি ভয় খাই রে। এখন এসব সন্ন্যাসীদের দূর দূরান্তরে প্রচারকার্য্যে যেতে হবে—ছাই মাখা, অর্দ্ধ উলঙ্গ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বেশভূষায় গেলে প্রথম ত জাহাজেই নেবে না, কোনরূপে ওদেশে পঁহুছিলেও কারাগারে তাকে অবস্থান কত্তে হবে। দেশ সভ্যতা ও সময়োপযোগী সবই কিছু কিছু Change (পরিবর্ত্তন) করে নিতে হবে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ। আপনার সব কল্পনাই অদ্ভুত।

স্বামীজি—দেখ্‌বি এর পর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখ্‌বো। সাহিত্যসেবিগণ তা দেখে গাল মন্দ কর্‌বে। করুক্‌—তবু ভাষাকে নূতন ছাঁচে গড়্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। তোদের দেশে লেখকেরা লিখ্‌তে গেলেই বেশী Verbs (ক্রিয়ার) এর use (ব্যবহার) করে, তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে Verbএর ভাব প্রকাশ কত্তে পাল্লে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপ লিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ দিকি।

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ, লিখে আপনাকে দেখাব।

স্বামীজি—উদ্বোধনে ঐরূপ লিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বি। Verbগুলির মানে কি জানিস্‌? ভাবের pause বা বিরাম। যেন ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা—ওগুলি দুর্ব্বলতার চিহ্ন, যেন ভাষার দম নাই—সেজন্য বাঙ্গলা ভাষায় lecture হয় না। ভাষার উপর যার Control (দখল) আছে, সে অত শীগ্‌গির শীগ্‌গীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের দাল ভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আহার,

চাল চলন ভাব ভাষাতে তেজস্বীতা আন্‌তে হবে। চাল, চলন্ মানুষের মত কত্তে হবে। সবদিকে প্রাণের বিস্তার কত্তে হবে—সব ধমনীতে রক্তের স্পন্দন অনুভব কত্তে হবে—সব নূতন ছাঁচে ফেল্‌তে হবে; তবে এই ঘোর জীবনসংগ্রামে তোরা Survive কত্তে (বাঁচ্‌তে) পার্‌বি। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে তোরা মিশে যাবি। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—অনেক কাল থেকে লোকের এক রকম ধাত হয়ে গেছে, একি, আর দু এক দিনে পরিবর্ত্তন হবে?

স্বামীজি—তুই যদি পুরোণো চালটা খারাপ বুঝে থাকিস্ ত যেমন বল্লুম নূতন ভাবে চল্‌তে শেখ্‌না। তোর্ দেখাদেখি আর দশ জনে তাই follow কর্‌বে, তাদের দেখে আবার আর ৫০ জনে শিখ্‌বে—এইরূপ করে করে কালে জাতের ভেতর এই ভাব জেগে উঠ্‌বে। আর বুঝেও যদি সেরূপ কাজ না করিস্, তবে জান্‌ব তোরা কেবল কথায় পণ্ডিত—practically (কাজের বেলায়) মূর্খ।

শিষ্য এ সব কথা আপনার কাছে শুন্‌লে মহা সাহসিকতার সঞ্চার হয়—উৎসাহ, বল, তেজে হৃদয় ভরে যায়। দূরে গেলে যেন তত থাকে না।

স্বামিজী—তা ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে বল আন্‌তে হবে। একটা "মানুষ" যদি তৈয়িরি হয়, ত লাখ বক্তৃতার ফল হবে। মন মুখ এক হয়ে idea (ভাব) গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বল্‌তেন, ভাবের ঘরে চুরি না থাকা। সবদিকে practical হতে (কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মতের বা ভাবের বিকাশ দেখাতে) হবে। Theory তে theory তে (মতে, মতে) দেশটা উচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এই যে দেখ্‌ছিস্ ঠাকুরের সন্তান—এরা সব এই practicality (সব জিনিষ কাযে পরিণত কর্‌বার উপায়) দেখাতে শরীর ধারণ করে এসেছে। এরা কেহই লোকের বা সমাজের কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না—আপন মনে কার্য্য করে যাচ্ছে। তুলসী দাসের সেই কবিতা পড়েছিস্ না—

> হস্তী চলে বাজার মে কুত্তা ভুকে হাজার,
> সাধুনকো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার॥

এই ভাবে চল্‌তে হবে। লোককে জান্‌তে হবে পোক্। তাদের ভাল মন্দ কথায় কান দিলে এই জীবনে কোন মহৎ কার্য্য কত্তে পারা যায় না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শরীরে, মনে বল না থাকলে এই আত্মাকে লাভ

করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়্‌তে হবে; তবে ত মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—খাবার দাবার কোন বিশেষ নিয়ম পাল্‌তে হয় কি?

স্বামীজি—দেশকালপাত্রভেদে আহারের ব্যবস্থা ভিন্ন। কিন্তু সর্ব্ব-কালে সর্ব্বদেশেই পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। ডাল ভাত চচ্চড়ীতে কি আর এখন জীবন-সংগ্রাম চল্‌তে পারে রে বাপ্?

কথা হতে হতে শিষ্য স্বামিজীর জন্য তামাক্ সেজে আন্‌তে গেল। স্বামীজি তামাক্ খেতে খেতে বল্‌ছেন—মনে মুখে খুব জোর্ কর্‌বি। হীন হীন্ বল্‌তে বল্‌তে মানুষ হীন হযে যায—তোর শাস্ত্রকার বল্‌ছেন—

মুক্তাভিমানী মুক্তোহি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিম্বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতি সা গতির্ভবেৎ॥

যার মুক্ত অভিমান সর্ব্বদা জাগরূক সেই মুক্ত হযে যায়, যে ভাবে আমি বদ্ধ, জন্মে জন্মে জান্‌বি তার বন্ধন দশা। এই ভাব জান্‌বি, ঐহিক পার-মার্থিক উভয দিকে। ইহ জীবনেও যারা সর্ব্বদা হতাশচিত্ত, তাদের দ্বারা কোন কাজ হতে পারে না; তারা জন্মে জন্মে হা হুতাশে দেহ বদ্‌লায়। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে। বীর হ—সর্ব্বদা বল্ "অভিঃ" "অভিঃ"। সকলকে শোনা "মাভৈঃ" মাভৈঃ"—ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই পাপ—ভয়ই নরক—ভয়ই অধর্ম্ম—ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু negative thoughts, সব এই ভয়রূপ সয়তান্ থেকে বের্ হয়েছে, এই ভয়ই সূর্য্যের সূর্য্যত্ব—ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব—ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে—নিজের নিজের গণ্ডীর বাইরে যেতে দিচ্চে না। তাই শ্রুতি বল্‌ছেন "ভয়া-দস্যাগ্নিস্তপতি ভযাৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম"। যেদিন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ভয়শূন্য হবেন—সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন—সৃষ্টিরূপ অধ্যাসের লয সাধিত হবে। তাই বলি—"অভিঃ" "অভিঃ"।

বলিতে বলিতে স্বামীজির সেই নীলোৎপল নয়নপ্রান্ত যেন অরুণরাগে রঞ্জিত হইযাছে। যেন 'অভিঃ' মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বামীরূপে শিষ্যের সাম্‌নে সশরীরে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্য সেই অভয়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে করিতেছে—আশ্চর্য্য, এঁর কাছে থাক্‌লে, কথা শুন্‌লে মৃত্যুভযও যেন কোথায় পলায়!

স্বামিজী আবার বল্‌ছেন—এই দেহ ধারণ করে কত সুখে দুঃখে—কত

সম্পদ বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হবি। কিন্তু জান্‌বি, ও সব মুহূর্তকাল-স্থায়ী। ও সব গ্রাহ্যের ভিতর আন্‌বি নি। আমি অজর অমর চিন্ময় আত্মা—এইভাবে জীবন অতিবাহিত কত্তে হবে। আমার জন্ম নাই, আমার মৃত্যু নাই, আমি নির্লেপ আত্মা, এ ধারণায় তন্ময় হয়ে যা। এই যে সে দিন বৈদ্যনাথ দেওঘরে প্রিয়নাথ মুখুজ্যের বাড়ী ছিলুম। * এমন হাঁপ যে প্রাণ যায় যায়। তখন ভেতর থেকে শ্বাসে শ্বাসে গভীর ধ্বনি উঠ্‌তে লাগ্‌লো "সোঽহং সোঽহং"। বালিশে ভর করে প্রাণবায়ু বেরোবার অপেক্ষা কর্‌ছিলুম আর দেখ্‌ছিলুম—ভেতর থেকে কেবল শব্দ হচ্চে "সোঽহং" "সোঽহং"—কেবল শুন্‌তে লাগ্‌লুম "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহনানাস্তি কিঞ্চন॥"

স্বামীজি এই কথাগুলি এমন ভাবে বল্‌তে লাগ্‌লেন যে, শিষ্যের মনে হল যেন তাঁর ঐ "ভাবটি" ঐ ভাষার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিমান্ হয়ে বেরিয়ে আস্‌চে। শিষ্য শুনে স্তম্ভিত হয়ে রইল।

স্বামীজি বল্‌ছেন—এ সব কথা নীচে নূতন ব্রহ্মচারীদের শুনাবি। আর সব্বাইর কাছে এই সকল কথা বল্‌বি।

শিষ্য-যে আজ্ঞে। আপনার সঙ্গে কথা কইলে আর শাস্ত্র মাস্ত্র পড়ার প্রয়োজন হয় না।

স্বামীজি—না রে! শাস্ত্রও পড়্‌তে হয়। শাস্ত্রজ্ঞানলাভের একান্ত প্রয়োজন। আমি মঠে শীঘ্রই class খুল্‌চি। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবৎ এই সব পড়া হবে। ব্যাকরণ পড়াবার জন্য যতদিন একটা ভাল পণ্ডিত না পাই, ততদিন আমিই অষ্টাধ্যায়ী পড়াব। হরি * গীতা পড়াবে। তুল্‌সী † বেদান্ত উপনিষৎ এই সব আলোচনা কর্‌বে।

শিষ্য—আপনি কি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পড়েছেন?

স্বামীজি—যখন জয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহা-বৈয়াকরণিকের সঙ্গে দেখা হয়। তার কাছে ব্যাকরণ পড়্‌তে ইচ্ছা হল। ব্যাকরণে মহা পণ্ডিত হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম সূত্রের ভাষ্য তিন দিন ধরে বুঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাত্র ধারণা কত্তে

* স্বামীজি এক সময় Change এর জন্য বৈদ্যনাথ প্রিয় মুখুজ্যের বাড়ী গিয়াছিলেন।

* ইঁহার সন্ন্যাসনাম স্বামী তুরিয়ানন্দ।

† ইঁহার সন্ন্যাসনাম নির্ম্মলানন্দ ইনি সম্প্রতি Bangalore এ আছেন।

পাল্লুম না। চার্ দিনের দিন অধ্যাপক অবাক্ হয়ে বল্লেন্, স্বামীজি! এই তিন দিনে আপনাকে প্রথম সূত্রের মর্ম্ম বুঝাতে পাল্লুম না। আমা দ্বারা আপনার অধ্যাপনায় কোন ফল হবে না বোধ হয়। ঐ কথা শুনে মনে বড় তীব্র ভর্ৎসনা এলো। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে—প্রথম সূত্রের ভাষ্য নিজে নিজে পড়্‌তে লাগ্‌লুম। তিন ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র ভাষ্যের অর্থ যেন করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল; তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কথায় কথায় বুঝিয়ে বল্লুম। অধ্যাপক শুনে ত অবাক্। বল্লেন, আমি তিন দিন বুঝিয়ে যা না কত্তে পাল্লুম, আপনি তিন ঘণ্টায় তার এরূপ চমৎকার ব্যাখ্যা কিরূপে উদ্ধার কর্‌লেন। তারপর প্রতিদিন জোয়ারের জলের মত অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যেতে লাগ্‌লুম। স্বামীজি আরও বল্লেন, মনের তীব্রতা থাক্‌লে সব সিদ্ধ হয়—সুমেরু চূর্ণ কত্তে পারা যায়।

শিষ্য—মশায়, আপনার সবই অদ্ভুত!

স্বামীজি—অদ্ভুত বলে একটা কিছু ন'ই। অজ্ঞতাই অন্ধকার। তাইতে সব ঢেকে রেখে অদ্ভুত দেখায়। জ্ঞানালোকে সব উদ্ভিন্ন হলে কিছুতে আর অদ্ভুতত্ব থাকে না। এমন যে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া, তাও লুকিয়ে যায়। যাঁকে জান্‌লে সব জানা যায়, তাঁকে জান্—তাঁর কথা ভাব্—সেই আত্মা প্রত্যক্ষ হলে শাস্ত্রার্থ করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হবে। পুরাতন ঋষিগণের হয়েছিল আর আমাদের হবে না? আমরাও মানুষ। একবার যা হয়েছে, তা অবশ্যই হতে হবে। History repeats itself—যা একবার ঘটেছে, তাই বার বার ঘটে। এই আত্মা সর্ব্বভূতে সমান। কেবল তাঁর বিকাশের তারতম্য আছে মাত্র। এই আত্মাকে বিকাশ কর্‌বার চেষ্টা কর্। দেখ্‌বি, বুদ্ধি সব বিষয়ে প্রবেশ করবে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি একদেশ দর্শিনী। আত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি সর্ব্বগ্রাসিনী। দর্শন, বিজ্ঞান সব আয়ত্ত হয়ে যাবে। সিংহগর্জ্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর্—জীবকে অভয় দিয়ে বল্—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত। Awake, arise rest not till the goal is reached.

শিষ্য আজ দুদিন থেকে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটীতে স্বামিজীর কাছে রহিয়াছে। কলিকাতা থেকে অনেক যুবক এ সময় স্বামিজীর কাছে যাতায়াত করায় মঠে যেন আজকাল চির-উৎসব। কত ধর্ম্মচর্চ্চা—কত

সাধন ভজনার উদ্যম- কত দীন দুঃখ মোচনের উপায় আলোচিত হচ্ছে; সন্ন্যাসী মহারাজগণ সকলেই মহা উৎসাহী—মহাদেবের গণরূপে স্বামীজির আজ্ঞাপালনে উন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ তখন ঠাকুরসেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মঠে পূজা ও প্রসাদের বিপুল আয়োজন—সমাগত ভদ্রলোকের জন্য সর্ব্বদা প্রসাদ প্রস্তুত।

আজ স্বামীজি শিষ্যকে তাঁহার কক্ষে রাত্রে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। শিষ্যের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। প্রসাদ গ্রহণান্তে শিষ্য স্বামীজির পদসেবা করিতেছে এবং একান্ত মনে স্বামীজির মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতেছে। স্বামীজি বল্‌ছেন "দেখ্। এমনি জায়গা ছেড়ে তুই কিনা কল্‌কাতায় যেতে চাস্—এখানে কেমন পবিত্র ভাব—কেমন গঙ্গার হাওয়া—কেমন সব সাধুর সমাগম। এমন স্থান কি আর কোথাও খুঁজে পাবি?"

শিষ্য—মহাশয়, বহু জন্মান্তরের তপস্যায় আপনার সঙ্গলাভ হয়েছে। আমায় কিছু প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিন্, যাতে আর না মায়ামোহের মধ্যে পড়ি। এখন কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মন আঁকু পাঁকু করে।

স্বামীজি—আমারও অমন হত। একদিন ঠাকুরের কাছে ঐরূপ প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তার পর রাত্রে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। দেহটা একেবারে নাই মনে হয়েছিল। ঠাকুর বল্‌লেন ওরূপ হয়ে থাক্‌লে তাঁর কোন কাজ হবে না। তাই আবার কাজে ফিরতে হল।

শিষ্য—ঐ অবস্থায় আপনার কেমন অনুভব হলো?

স্বামীজি—চন্দ্র, সূর্য্য, দেশ, কাল, আকাশ যেন একাকার হয়ে কোথায় মিশিয়ে যেতে লাগ্‌লো। দেহাদি বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, কেবল মাথায় consciousness ছিল, তাই ফিরে এলুম। নতুবা লয় হয়ে গিছিলুম আর কি? ওরা গোল করে আমায় নীচে নিয়ে এলো।

শিষ্য শুনে বল্‌ছে, মশায়, একটু 'অহং' না থাক্‌লে আর সমাধি থেকে কেউ ফির্‌তে পারে না। আমি ব্রহ্ম এই ধারণাতেও আমি আর ব্রহ্ম এই দ্বৈত ভাব থাকে। নয় কি?

স্বামীজি—হাঁ থাকে, কিন্তু সমাধিকালে আমি আর ব্রহ্মের ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়—যেন মহাসমুদ্র—জল—জল, আর কিছু নাই ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। অবাঙ্‌মনসগোচরম্ কথাটা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়

শিষ্য—নিঃশেষ সমাধি থেকে তবে কি করে আবার ব্যুত্থান হবে?

স্বামীজি—ঠাকুর বল্‌তেন একমাত্র অবতারেরা জীবহিতকামে ঐ সমাধি থেকে নেবে আস্‌তে পারেন। সাধারণ জীবের আর ব্যুত্থান হয় না; একুশ দিন জীবিত থেকে দেহটা যায়।

শিষ্য—মন বিলুপ্ত হয়ে যখন সমাধি হয়—যখন মনের কোন তরঙ্গ থাকে না—তখন সেই মনের আবার বিক্ষেপের সম্ভাবনা কোথায়? কি ধরে সমাধি অবস্থা থেকে নেবে আস্‌বে? যে মন ধরে আস্‌বে, সে মনই যখন নাই।

স্বামীজি—বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, নিঃশেষ নিরোধ সমাধি থেকে পুনরাবৃত্তি হয় না "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ"। কিন্তু অবতারেরা এক আধটা সামান্য বাসনা রেখে দেন্ জীবহিতকল্পে। তাই ধরে আবার superconscious state থেকে conscious stateএ আসেন।

শিষ্য—তবেই হচ্চে, যদি এক আধটা বাসনাও থাকে, তবে তাকে নিঃশেষ নিরোধ সমাধি বলি কিরূপে? সমাধিতে ত সর্ব্ব বৃত্তির নিরোধ হয়ে যাবে।

স্বামীজি—তোর মহাপ্রলয়ের পর তবে সৃষ্টিই বা কেমন করে হবে? মহা প্রলয়ে ত সব ব্রহ্মে মিশে যায়—আবার যখন শাস্ত্রমুখে সৃষ্টিপ্রসঙ্গ শোনা যায়—যখন cycleএর পর cycleএ সৃষ্টি ও লয় হয়, তখন সৃষ্টি ও লয়ের পুনরাবর্ত্তনের ন্যায় অবতারাদির নিরোধ ও ব্যুত্থান অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—আমি বল্‌ব যে লয়ে পুনঃসৃষ্টির বীজ ব্রহ্মে লীনপ্রায় থাকে, তাহা মহাপ্রলয় বা নিরোধ সমাধি নহে। আপ্‌নি যেমন বলেন potential ও Kinatic, সুতরাং তাকে আমি নিঃশেষ নিরোধ বল্‌তে পারি না।

স্বামীজি—যে ব্রহ্মে কোন বিশেষণের আভাস নাই—যাহা নির্লেপ নির্গুণ,—তাঁর দ্বারা তবে এই সৃষ্টিই বা কিরূপে projected হবে?

শিষ্য—এ ত seeming projection, বস্তুতঃ সৃষ্টি প্রভৃতি ত কিছুই হয় নি। ব্রহ্মের সেই মিথ্যা মায়া শক্তি বশতঃ এ সব ভ্রম দেখাচ্ছে। শাস্ত্রে ত এইরূপ বলে।

স্বামীজি—এটা যদি মিথ্যা হয়—তবে জীবের নিরোধ সমাধি ও ব্যুত্থানটাকেও তুই seeming (মিথ্যা) ধরে নিতে পারিস্ ত। জীব

স্বতঃই ব্রহ্মস্বরূপী ; তার আবার অনুভূতি কি ? তুই যে "আমি আত্মা" এই অনুভব কত্তে চাস্ সেটাও নয় ;—কারণ, শাস্ত্রে বল্ছে You are already that "অয়মেব হিতে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি।" এও তোর বন্ধন যে, তুই সমাধি লাভ কত্তে চাচ্ছিস্।

শিষ্য—এ ত বড় মুস্কিলের কথা, আমি যদি আত্মা, তবে তার অনুভূতি নাই কেন ?

স্বামীজি—conscious plane এ অনুভূতি কত্তে হলে একটা করণ বা যাহা দ্বারা অনুভব কর্‌বি তা একটা চাই (some instrumentality)। মনে হচ্ছে আমাদের সেই করণ। মন ত জড়। পেছনে আত্মার প্রভায় সে মনটা চেতনের মত প্রতিভাত হচ্ছে। তোর পঞ্চদশীকার বল্‌ছেন—

"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনের বিভাতি সা।"

অতএব 'মন' দিয়ে আর তো শুদ্ধ চৈতন্য আত্মাকে জান্‌তে পার্‌বি না—মনের পারে যেতে হবে। মনের পারে আর তো কোন করণ নাই—এক আত্মাই আছেন সুতরাং যাকে জান্‌বি, সেটাই আবার করণ স্থানীয় হযে দাঁড়াচ্ছে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ এক হযে দাঁড়াচ্ছে—এই জন্য শ্রুতি বল্‌ছেন্ "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" এই conscious planeএর উপরে একটা অবস্থা আছে, যেখানে কর্ত্তা কর্ম্ম করণাদির দ্বৈত ভাণ নাই। মন নিরুদ্ধ হলে তা প্রত্যক্ষ হয়। ভাষান্তর নাই বলে ঐ অবস্থাটীকে প্রত্যক্ষ বল্‌ছি। নতুবা তার ভাষা নাই। শঙ্করাচার্য্য তাকে 'অপরোক্ষানুভূতি' বলে গেছেন। ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতি হলেও অবতারেরা নীচে নেবে এসে তার আভাষ দেন—তাই বেদাদি শাস্ত্র কথিত হয়। সাধারণ জীবের অবস্থা লুণের পুতুলের সমুদ্র মাপিতে গিয়ে গলে—যাওয়ার ন্যায়—বুঝ্‌লি ?

শিষ্য—হাঁ, খানিকটা ধারণা হল। কিন্তু বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হলো না।

স্বামীজি—কি বুঝ্‌তে পাল্লিনে বল্।

শিষ্য—মশায়, আপনার তর্কের ফাঁদে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। আজ আর কিছু ধারণা কত্তে পাচ্ছি না।

স্বামীজি—আচ্ছা আজ্ থাক্। আর একদিন এ সম্বন্ধে কথা হবে। তবে মোট কথা হচ্ছে এই যে "তুই যে ব্রহ্ম" এটা "জান্‌তে" হবে মাত্র ; তুই already সেই আত্মাই, মাঝখান্ থেকে এক জুড় মন (যাকে শাস্ত্রে

মায়া বলে) এসে সেটা বুঝ্তে দিচ্ছে না; সেই স্বপ্ন জড় মন প্রশমিত হলে—আত্মার প্রভায় আত্মা আপনিই উদ্ভাসিত হয়। এই মায়া বা মন যে মিথ্যা তার একটা প্রমাণ এই যে, মন নিজে জড় অন্ধকার, পেছনে আত্মার প্রভায় চেতনবৎ প্রতীত হয়। এটা যখন বুঝ্তে পার্বি, তখন এক অখণ্ড চেতনে মন লয় হয়ে যাবে, তখন অনুভূতি হবে "অয়মাত্মাব্রহ্ম"।

শিষ্য আর উচ্চবাচ্য না করে স্বামীজির পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া অবস্থান করিতেছে। স্বামীজি বল্ছেন, তোর ঘুম পাচ্চে বুঝি। তবে শো। শিষ্য স্বামিজীর পাশের বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত্র দূরে যেন শুন্তে পাচ্ছে—"অয়-মাত্মা ব্রহ্ম" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। রাতে ত স্বামীজির নিদ্রা প্রায়ই নাই। মাঝে মাঝে উঠ্ছেন্। চকিতে শিষ্যেরও মধ্যে মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। শিষ্য শেষ রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন প্রত্যক্ষ করিতেছে। সে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্বামীজির বারণ থাকায় প্রকাশ করা গেল না। রাত্রি ৪॥০ টার সময় শিষ্য উঠিয়া নীচে নাবিয়া গিয়াছে। তার একান্ত বাসনা—আজ ধতুরাফুল দিয়ে স্বামিজীর পাদপদ্ম অর্চ্চনা করে। তাহার কারণ হচ্চে শেষ রাত্রের স্বপ্ন। শিষ্য প্রায় দুই ঘণ্টা বেলুড়ের নানা স্থান ধতুরা ফুল পাবার জন্য খুঁজিয়া বেড়াইল। কিন্তু কোথাও সে ফুল মিলিল না। তবে স্বপ্নটা মিথ্যা এই ভাবিতে ভাবিতে নিরাশ চিত্তে শিষ্য মঠে ফিরিয়া আসিতেছে। বেলা প্রায় আটটা। মঠের অতি নিকটবর্ত্তী একটা আঁস্তাকুড়ে শিষ্য দেখিতে পাইল, একটা ধতুরা গাছে প্রায় ১৫।২০টা সদ্যোজাত ফুল ফুটিয়া আছে। ঐ ফুলগুলির মধুগন্ধে কতগুলি ভ্রমর উদ্দাম ঝঙ্কার করিতেছে। দেখিয়া শিষ্যের মনে আর আনন্দ ধরে না। আঁস্তাকুড় বলিয়া শিষ্যের আর ধারণা নাই। আস্তে আস্তে সমস্ত ফুলগুলি তুলিয়া মনের আনন্দে শিষ্য মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। গঙ্গাস্নানান্তে শিষ্য আসিয়া দেখে, স্বামিজী চা খেয়ে মঠের নীচের তলায় বড় বেঞ্চখানির উপর পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। শিষ্য নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করায় স্বামীজি বল্ছেন—এখনি? শিষ্য বল্ছে—হাঁ। তবে পূজার জিনিস পত্র এখানে নিয়ে আয়। শিষ্য ঠাকুরঘর থেকে পূজার জন্য বাসন্, চন্দন, ধূপ সব নিয়ে এল। আর সেই ধুতুরা ফুলগুলি থালায় করে নিয়ে এল। মঠের সকল সন্ন্যাসী মহারাজ ও ব্রহ্মচারিগণ শিষ্যের এই পূজা পদ্ধতি দাড়াইয়া দেখিতেছেন। একমাত্র স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ কার্য্য উপলক্ষে তখন মঠে নাই।

শিষ্য প্রথমতঃ স্বামীজির পাদপদ্ম দুখানি, একখানা বড় থালায় রাখিয়া

পবিত্র গঙ্গাজলে ধুইয়া দিল। আজ তার আর লজ্জা সম্ভ্রম নাই; সে আপন ভাবে মাতোয়ারা। "ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ" মন্ত্রে স্বামীজির স্নানকল্পে শ্রীপাদপদ্মে গঙ্গাজল ঢেলে দিল। ধূপ দীপ গন্ধ চন্দন পুষ্প দিয়ে স্বামীজির দুই কর্ণে দুটী ধুস্তুর পুষ্প গুঁজিয়া দিল। মস্তক উপরি একটী ধুতুরা ফুল লম্বা-লম্বি ভাবে রাখিল। স্কন্ধদেশে দুটী রাখিল, আর বাকী ফুলগুলি বিল্বপত্র-সমেত স্বামিজীর পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া স্বামীজির মুখপদ্ম দেখিতে লাগিল। তৎপর গুরুস্তব পড়িয়া পূজা শেষ করিল। স্বামীজি একেবারে স্থির হয়ে বসে আছেন। মঠের মহারাজ ও ব্রহ্মচারিগণ সেই পূজার সাক্ষিরূপে অদ্যাপি শরীর ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন। স্বামীজি বল্‌ছেন, তোর পূজা হয়েছে—কই নৈবেদ্য কোথায়? শিষ্য বল্‌ছে, মশায়, এখানে কোথাও এত সকালে নৈবেদ্যের কিছু সংগ্রহ কত্তে পারিনি। স্বামীজি বল্‌ছেন, আচ্ছা থাক্—নৈবেদ্য আর একদিন হবে।

এখানে বলা উচিত, স্বামীজি শিষ্যের একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়েই ঐরূপ পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিষ্য সে দিন নাছোড়বান্দা হইয়া ঐ জন্য স্বামিজীকে ধরে ছিল। নতুবা স্বামীজিকে প্রকাশ্যে ঐরূপ পূজা লইতে আর কখনো দেখা যায় নাই।

পূজান্তে স্বামীজি শিষ্যকে বল্‌ছেন—তোর পূজা ত শেষ হল। কিন্তু বাবুরাম এলে তোকে এখনি খেয়ে ফেল্‌বে। তুই কিনা ঠাকুরের পূজার বাসন দিয়ে আমায় পূজা কর্‌লি—ঐ থালায় (পুষ্পপাত্রে) আমার পা রেখে পূজা কর্‌লি? বল্‌তে বল্‌তে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ সেখানে এসে উপস্থিত! স্বামীজি তাঁকে দেখে বল্‌ছেন, "ওরে, দেখ্ আজ কি কাণ্ড করেছে!! ঠাকুরের পূজার থালা বাসন গন্ধ চন্দন এনে ও আমার আজ পূজা করেছে।" স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ছেন -"তা বেশ করেছে; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন?" কথা শুনে শিষ্য নির্ভয় হল। আজ তার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। মঠের মহারাজগণ আজ শিষ্যকে ধন্য ধন্য করিতেছেন। পূজান্তে শিষ্য মঠের অন্যান্য মহারাজ ও ব্রহ্মচারিগণের সঙ্গে আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। স্বামীজি তখন কক্ষান্তরে গিয়েছেন এবং সামান্য জলযোগ করিতেছেন। শিষ্য তখন গোঁড়া হিন্দু; একমাত্র গুরু ভিন্ন অন্য কাহারও ছোঁয়া খায় না। এজন্য স্বামীজি শিষ্যকে কখন কখনো ভট্‌চাজ্ বলে ডাক্‌তেন। প্রাতর্জ্জলযোগ কত্তে কত্তে স্বামীজি নিকটস্থ সদানন্দ স্বামীজিকে বল্‌ছেন, ঐ ভট্‌চাজ্‌কে ধরে নিয়ে আয় তো।

আদেশ শুনে শিষ্য স্বামীজির নিকট উপস্থিত হয়েছেন; স্বামিজী যা যা খাচ্ছেন তার কিছু কিছু শিষ্যকে প্রসাদ দিতেছেন; শিষ্য দ্বিধা না করে তাহাই গ্রহণ করিতেছে। স্বামীজি শিষ্যকে বল্‌ছেন, "কি খেলি জানিস্ কি?" এগুলি * * *। শিষ্য বল্‌ছে, আপনার প্রসাদ পেয়েছি, তা যাই থাক্, আমি আজ অমৃত খেয়ে অমর হলুম। স্বামীজি বল্‌ছেন, আজ থেকে তোর গোঁড়ামী যাক্—জাত্, বর্ণ, অভিমান, আভিজাত্য, পাপ, পুণ্য জন্মের মত দূর হোক্—আমি আশীর্ব্বাদ করছি। শিষ্য তাই এখনো অনুভব করে থাকে যে—স্বামীজির সেই আশীর্ব্বাদের দিন থেকে সে যেন সকল বিধিনিষেধের বহির্ভূত হইয়াছে—যেন মুক্তি অভিমান তার সমগ্র হৃদয় জুড়ে বসিয়াছে—যেন জান্‌তে পেরেছে, সে জন্মে জন্মে স্বামীজির দাস—যেন সংসারের সুখ-দুঃখে, ভালমন্দে সে অচল অটল—যেন মৃত্যুর আহ্বানে তার কিছুমাত্র দৃক্‌পাত নাই—যেন এ শরীর ফেলে স্বামীজির পাদপদ্মে পঁহুছিতে তার আর বিলম্ব সইছে না।

সেদিন স্বামীজির অযাচিত অপার দয়া স্মরণ করিয়া শিষ্য মানবজন্ম সার্থক বলিয়া মনে করে।

স্বামীজির কাছে বিকালে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন। এমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে মান্দ্রাজে স্বামীজি অনেক দিন ইঁহার বাটীতে ছিলেন এবং তদবধি ইনি স্বামীজির একজন বিশেষ admirer। মঠে নূতন লোহার উনন আনান হইয়াছে; তাতে স্বামীজির জন্য নানা জিনিষ তৈয়ারি হচ্ছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্বামীজি অনুরোধ করায় তিনি তা থেকে খেতে খেতে স্বামীজির সঙ্গে পরম বন্ধুর ন্যায় নানা প্রসঙ্গ করিতেছেন। পাশ্চাত্যদেশের নানা কথা হচ্ছে। স্বামীজি তাঁহাকে নানা ভাবে আপ্যায়িত করিতেছেন। কতক্ষণ পরে বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদায় চাহিতেছেন। স্বামীজি বল্‌ছেন, "একদিন থেকেই যান্ না"। মন্মথ বাবু বল্‌ছেন, আর একদিন এসে নিলিবিলি থাকা যাবে। নীচে নামিতে নামিতে জনৈক বন্ধুকে বলিতেছেন, ইনি যে পৃথিবীতে একটা মহাকাণ্ড করে ছাড়বেন, তা আমরা পূর্ব্বেই মান্দ্রাজে টের পেয়েছিলুম। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা মানুষে দেখা যায় না।"

স্বামীজিও মন্মথ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ধার অবধি আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছেন। মন্মথ বাবু চলিয়া গেলে, স্বামীজি খানিকক্ষণ নীচে পাইচালি করে উপরে বিশ্রাম করিতে গেলেন।